রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়

অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, ডি. লিট্

মল্লিক ব্রাদার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫৫, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ
এ. কে. মল্লিক
১১০-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ কুমার অজিত
ও
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

মুদ্রক ঃ
অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

৺'প্রতিভা'র উদ্দেশে

পঞ্চম সংস্করণে মন্তব্য

এবার ভাষার পরিমার্জন ও আলোচনায় নোতুন কিছু যোগ-সাধনও করা হ'ল। স্থানে স্থানে বাক্যের আড়ষ্টতা আমাকেই আহত করেছে। সেগুলির যথাসম্ভব সরলীকরণ করা হ'ল। এই সঙ্গে নোতুন প্রকাশকের উপর প্রকাশনার ভারও অর্পিত হ'ল।

✳

শিক্ষা-সংস্কৃতি-রক্ষার উপকরণ সমূহের মূল্য ক্রমাগত বেড়ে চরমে এসে পেঁছেচে। এ বৎসর কাগজের দামও আবার বাড়ানো হ'ল। এই অবস্থায় লেখক, প্রকাশক, ছাত্র-ছাত্রী সকলেই দুর্বিপাক ভোগ করছেন। দরিদ্রদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে আসছে। প্রকাশকেরাও নিম্নমানের কাগজসহ বইয়ের দাম ধাপে ধাপে বাড়িয়েই চলেছেন দেখি। এমন পরিস্থিতিতে আমাকেও দুঃখিতচিত্তে বইটির মূল্যবৃদ্ধি মেনে নিতে হ'ল। তবে এটুকু স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, যে, কাগজ বাঁধাই জ্যাকেট প্রভৃতি নিয়ে নোতুন প্রকাশক হয়ত বা অযথা মূল্যবৃদ্ধি করেন নি।

✳

অবকাশ স্বল্প থাকলেও মুদ্রণ-প্রমাদ না হয় এবিষয়ে সতর্ক ছিলাম। তবু সামান্য কয়েকটি থেকে গেছে দেখছি। এজন্যও লজ্জিত আছি, কারণ, ছাত্রদের বেশী দাম দিতে হচ্ছে।

✳

মদীয় ছাত্র ও বর্তমানে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুসা কালিম এবারেও শব্দসূচীটি তৈরী ক'রে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, বইটি আমার হাতের এই শেষ সংস্কার। সুতরাং এই প্রসঙ্গে বইটির প্রথম মুদ্রণের (১৯৫৩) পূর্বাবস্থায় যাঁদের সঙ্গে যোগ ছিল তাঁদের কথা স্মরণ ক'রে নিই : (১) বিগতা প্রথমা পত্নী—প্রতিভা, (২) কবি শঙ্খ ঘোষ, যিনি তখন ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করেছেন ও আমার ঝটপট লেখা থেকে মুদ্রণ-উপযোগী কপি তৈরি করতে সাহায্য করেছেন, (৩) 'পুঁথি-ঘরের' অন্যতম স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরী, (৪) রায়বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, যিনি কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা বিষয়ে আমাকে উদ্‌বোধিত করেছিলেন।

—গ্রন্থকার

আগেকার সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় বইটি এবার চতুর্থ সংস্করণ ও মুদ্রণ থেকে বের হচ্ছে। ছাত্র ও অধ্যাপকদের উপযোগীতার দিক মনে রেখে কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন আবশ্যক মনে করেছি। কবিচিত্তে সমাজ-অভিঘাতের বিষয়টিও এই সঙ্গে পরিস্ফুট করার প্রয়াস করেছি।

বইটি লেখার একেবারে প্রারম্ভ ১৯৪৯ খ্রীঃ বৈশাখে গ্রীষ্মাবকাশে। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করি। মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা লেখার পর প'ড়ে থাকে। ইতিমধ্যে ঐ বৎসর নভেম্বর-শেষে সহধর্মিণীর মৃত্যু হয়। পরবর্তী প্রায় দু'বৎসর সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিক রাজ্যে আমার সঞ্চরণ ঘটে। লৌকিক সংবিৎ ফিরে এলে পর মাস-পাঁচের মধ্যে অনায়াসে সব বইটা লেখা হয়ে যায়। সন্দেহ নেই উক্ত আঘাত এবং তার ফলে অধ্যাত্মে পরিভ্রমণ আমার কাব্যোপলব্ধিকেও আশাতীতভাবে বাড়িয়ে তোলে।

আমি এটুকু বলতে পারি, স্বাধীন ও মুক্ত মন নিয়ে মৌলিকভাবে আমি লিখতে চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্র-সমালোচক পূর্বসূরীদের অনেকেরই লেখা আমি পড়িনি, যাও বা পড়েছি তার কোনো সংস্কার আমাকে আক্রমণ করতে পারে নি। আমার বহু-অভিজ্ঞতার পর আজ আমি ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই তাঁরা যেন প্রথমে মুক্তচিত্তে স্বকীয়ভাবে রবীন্দ্র-কাব্যকবিতা পড়ে নেন। এতে তাঁরা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন যে রবীন্দ্রকাব্যকল্পে বিশুদ্ধ কবিত্ব ও বাস্তব সমাজ-প্রসঙ্গই আছে, কোথাও সামান্য তত্ত্ব-সংস্পর্শ থাকলেও তা কাব্যসংগতিহীন নয়।

বাগ্-বিস্তারকে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে আলোচনার কোনো কোনো অংশে ভাষা ন্যায়ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ঐসব স্থান পাঠকদের একটু ধৈর্যসহকারে অনুসরণ করার অনুরোধ জানাই।

লোকেঽস্মিন্ বিস্ময়স্থানং যদ্বৃত্তং প্রতিভা কবেঃ ।
রবীন্দ্রানুগতং বঙ্গবাণীষু স্ফুরিতপ্রভম্ ॥
রূপোত্তরস্য রূপেষু সমন্বেষণতৎপরম্ ।
সংসক্তমপি প্রত্যক্ষে দেশকালাতীতং তু যৎ ॥
তৎস্বরূপং যথাশক্তি স্বমতেন নিরূপিতম্ ।
তৎসূত্রেণ চ কাব্যানাং মুখ্যানামীক্ষণং কৃতম্ ॥
"নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিৎ নানপেক্ষিতমুচ্যতে" ।
মহাবাক্যস্য চৈতস্য সারং স্মৃত্বা পুনঃপুনঃ ॥
পরামৃশ্য চ ভূয়শঃ কাব্যদর্শন-পদ্ধতিম্ ।
পুরাভূতানাং প্রাচ্যানাং পাশ্চাত্ত্যসুধিয়ামপি ॥
রবীন্দ্রবচনং মৌলং সমাহৃত্য যথাবিধি ।
সাবধানং বিরুদ্ধানাং মতানাং খণ্ডনং কৃতম্ ॥

Approved by the Calcutta University
as thesis for the Degree of
Doctor of Literature
[1962]

"বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে
আমায় দেখো না বাহিরে।"

"...সেই সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হ'লে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম ক'রে প্রবহমান, সেইটে বিচার ক'রে দেখা চাই। বস্তুত সেটা অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না। সমগ্রভাবে অনুভব ক'রে তবে তাকে পাই।"

—রবীন্দ্রনাথ

বিষয়-সূচী

ছয়

প্রতিভার বিকাশ, তৃতীয় পর্যায়—অরূপ-অনুভবের প্রারম্ভ ঃ

নৈবেদ্য থেকে শারদোৎসব, পৃঃ ১৫৪—১৭৮

সাত

প্রতিভার বিকাশ, চতুর্থ পর্যায়—অরূপ-অনুভবের পূর্ণরূপ ঃ

গীতাঞ্জলি থেকে গীতালি, পৃঃ ১৭৯—২৪৬

আট

প্রতিভার পরিণাম—জীবন ও অরূপের সমন্বয় ঃ

গীতালি—বলাকা—ফাল্গুনী - পূরবী—মহুয়া—মুক্তধারা—রক্তকরবী

পৃঃ ২৪৭—৩৩২

নয়

গোধূলি-পর্যায় ঃ পরিশেষ, তাসের দেশ, কালের যাত্রা, পুনশ্চ থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত পৃঃ ৩৩৩—৪১৮

রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়

প্রস্তাবনা

আমরা বাঙ্‌লা ভাষায় ও আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যস্বরূপ পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

কবির সৃষ্টি অতি বিস্ময়কর 'ব্যাপার'-বিশেষ। কাব্যের বাইরে থাকে বাণীর অজস্রতা, অর্থের বৈচিত্র্য, অন্তরে থাকে কল্পনার নিগূঢ় ঐক্য। আবার স্বতন্ত্র কবির স্বভাব স্বতন্ত্র হওয়ার জন্য কাব্যের রূপে এরূপ পার্থক্য, আবেদনে এত অভিনবতা। কাব্যের অন্তরে যে-কবি প্রচ্ছন্ন থাকেন তাঁর রহস্যময় নৈসর্গিক শক্তিকে কবিপ্রতিভা ব'লে উল্লেখ করছি, আর তারই স্বরূপ যথাসাধ্য নির্ণয় করবার জন্য আমাদের এই প্রয়াস।

বিশাল রবীন্দ্র-কাব্যের একটি বিশেষ ধর্ম হচ্ছে ওর অন্তর্নিহিত গতি-শীলতা এবং বহিরঙ্গ বৈচিত্র্য নিয়ে ক্রম-বিকাশের পথে যাত্রা। একটি নির্দিষ্ট ধারায় বহমান রবীন্দ্র-কবিমানসের বিকাশ ও পরিণামের প্রকারই কাব্যামোদী পাঠককে সমধিক চমৎকৃত করে। রবীন্দ্রনাথ উচ্চকোটির গীতিকবি হ'লেও ঠিক মন্ত্রদ্রষ্টা প্রজ্ঞানী ঋষি নন। যদিও পরিণত কাব্যজীবনে তাঁর উপলব্ধি কোথাও কোথাও দার্শনিক বা ঋষির উপলব্ধির মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং এরকম অরূপ-পথ-সঞ্চারী ও মানব-রহস্য-সন্ধানী গীতিকবিকে আমরা ধর্ম-প্রবণ ভাব-সাধকদের সঙ্গে হয়ত বা তুলনা ক'রে দেখতেও পারি (পরবর্তী 'প্রতিভার বিকাশ' পর্যায়ে কবির ধর্মপ্রবণ দার্শনিক উপলব্ধির স্বরূপ বিচার অংশ দ্রঃ) তিনি কৈশোরে বা যৌবনে স্বাভাবিকভাবেই এরকম প্রৌঢ় পরিণামের অধিকারী হন নি। কারণ, যথার্থ কবি ঐন্দ্রিয়ক বাস্তব প্রমাণকেই মান্য করেন, তুরীয় কোনো প্রভাবের বশবর্তী হতে চান না। আপ্তবাক্যেও তাঁদের অনাস্থা বিশ্রুত। কবির উপলব্ধি স্বকীয় অনুভূতিময় পথে যাত্রার মধ্যেকার উপলব্ধি, কবির ধর্ম পথে-চলার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ কবীন্দ্র, ঋষি অথবা দার্শনিক যে-রূপেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ পাঠকের কাছে প্রতিভাত হোন না কেন, তাঁর বিচিত্র বাণীর মধ্যে বেদ-বেদান্ত, আর্ষ বা লৌকিক ধর্ম ও দর্শনের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের যেমন প্রতিবিম্বনই ঘটুক না কেন, শুদ্ধ কবি-স্বভাবের দিক দিয়ে বিবেচনা না করলে তাঁর সর্বসংস্কারমুক্ত কাব্যের যথার্থ উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হতে হবে, এই আমাদের বিশ্বাস।

উল্লেখযোগ্য কবিদের প্রতিভায় দুটি বাহ্য উপাদান কাজ করে। একটি বহুকাল-আগত অতীত আর একটি তাৎকালিক বর্তমান। একটির ক্রিয়া নিগূঢ়, অন্যটির বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ। কিন্তু অতীত এবং বর্তমানের দ্বন্দ্বের

মধ্যেই কবিমানসের স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা, অথবা আরও যৌক্তিক প্রসঙ্গ হ'ল অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে কবিমানসের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ে পরস্পরের রূপান্তর। রবীন্দ্র-কাব্যের উৎসমূলেও একদিকে বিপুল ভারতীয় সাহিত্য ও জীবনের ঐতিহ্যমূলক স্মৃতি রয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে তাঁর জীবৎকালের বিচিত্র অভিঘাত। আধুনিক যুগে কোনো একটি সমগ্র দেশ তার অতীত, বর্তমান, এমনকি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে একজন কবির রচনায় রূপ পরিগ্রহ করেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। কালিদাস সম্পর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, যে, তপোবনের যুগের ভারতবর্ষ গুপ্তযুগের ঐ কবির মধ্যে প্রকাশ লাভ করেছে। এমন বিস্ময়কর ঘটনা কেমন ক'রে ঘটে তা সহজবুদ্ধিগম্য নয়। অতীতের এই যে বর্তমানে প্রতিক্ষেপ একে কি প্রাচীনের প্রভাব বলা সমীচীন হবে? লৌকিকভাবে আমরা হয়ত বলতে পারি যে কালিদাসে তপোবনের কি বাল্মীকির প্রভাব রয়েছে, অথবা রবীন্দ্রনাথে বৈষ্ণব প্রভাব কি বাউল-প্রভাব লক্ষণীয়, কিন্তু অনুসন্ধানী মন এরূপ পল্লবগ্রাহী মন্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারে না। লক্ষ্য গভীরতর প্রদেশে নিবদ্ধ ক'রেই কবি স্বয়ং বলেছেন যে এরূপ ভাবসাদৃশ্য একটি অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়া।* বস্তুতঃ কেবল অতীতের অনুসরণ নয়, অতীত ও বর্তমানের সমঞ্জসীকরণই ঐ প্রাকৃতিক শক্তির কাজ। এইভাবে মহামানব ও মহৎ কবি-প্রতিভা যুগের মানবিক প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়। এইভাবেই অপ্রত্যক্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঐতিহ্যমূলক মিলনসূত্রে গ্রথিত হয়ে থাকে।

ধরা যাক কালিদাসের কথা। কালিদাস ধর্মপ্রবর্তক নন, সাহিত্যাদর্শের প্রদর্শক, প্রসঙ্গতঃ জীবনাদর্শের পরিচায়ক। গুপ্তযুগের অভ্যুদয়কালে ভারতবর্ষ পার্থিব সমৃদ্ধির দিকে বেগে অগ্রসর হচ্ছিল। এই পার্থিব সমৃদ্ধির চিত্র কালিদাস নানা স্থানে প্রকাশ করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর কাব্যে চিত্তাকর্ষক-ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, রাজ্যজয়ের মহিমা নয়, তপোবনের শান্তি ও মাধুর্য; রাজধানীর কৃত্রিমতা নয়, প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য। তৎকালীন জীবন-কোলাহলের মধ্যে কবি ধর্মানুভূতির আশ্রয়ে পরিত্রাণ চাইলেন না, জীবনকে নিসর্গের ও নিসর্গাশ্রিত মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। একটু অগ্রসর হয়ে একথা বললেও অসংগত হবে না, যে, নির্বাণ-আশ্রিত বৌদ্ধধর্ম ও আস্তিক্যবাদী বেদধর্মের মধ্যে শৈব জীবনবাদী দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তিনি একটা সমন্বয় সাধন করেছিলেন। সাহিত্যাদর্শের দিক থেকে বলা যেতে পারে, কালিদাস নবজাগরিত আলংকারিক বাগ্‌ভঙ্গি এবং প্রাচীন ব্যাস-বাল্মীকীয় সরলতা এই দুয়ের সামঞ্জস্যবিধান করেছিলেন।

* The Message of the Forest প্রবন্ধ।

এইভাবে যুগোচিত মহৎ প্রতিভার মধ্যে পুরাতন ও প্রত্যক্ষের যাবতীয় বিচ্ছিন্ন, অনৈক্যযুক্ত, পরস্পরবিরুদ্ধ অথচ সমন্বয়ের জন্য আগ্রহশীল জীবনাদর্শের ঐক্য সাধিত হয় এবং নূতনের জন্ম হয়। এই নূতন যদিও অতীতের আশ্রয়ে এবং তৎকালের প্রতিক্রিয়ায় জন্মলাভ করে, তথাপি দূরবর্তী ভবিষ্যতের দিকেও এর লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে। কবি-প্রতিভা এই কারণে কালবাহিত হ'লেও কালাতিক্রমী। এই কারণেই তদানীন্তনতার সঙ্গে এর প্রকট বিরোধও দেখা যায়। প্রতিভাশালী মহাপুরুষেরা এজন্য বিদ্রোহীও বটে। যুগ ও জীবনের দিক থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাৎকালিক জীবন-নীতির বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এবং অতীত ও বর্তমানের সমন্বয়ে নূতন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রয়েছে। প্রত্যক্ষ বর্তমানের সঙ্গে দ্বন্দ্বে কবির নবীন সৃষ্টির পরিচয় কোথায় ? এর জন্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য কবির সমাজসাম্যবাদী এবং প্রথা ও পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক কবিতাবলী, আর অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ, কালের যাত্রা-র মত নাট্যনিচয়। কবির ভাষণ, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও পল্লীতে সাংগঠনিক কর্মের উদ্‌যোগের সঙ্গে এই মানসিকতা মিলিয়েও নিতে হবে। কথা এই যে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও দেশ অনির্বচনীয় দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ। বিচ্ছিন্নতা ব'লে কোথাও কিছু নেই। সাধারণ কবির আত্মপ্রকাশে সমাজ-দেশ তেমন পরিস্ফুট না হলেও মহাকবির চেতনা ও কল্পনায় দেশকালের অভিঘাত অনিবার্য সত্য, আর রবীন্দ্রনাথ একালের মহাকবিই।

কবি-কালিদাসের আবির্ভাবের দেড় হাজার বছর পরে উনিশ শতকে ভারতীয় জনমানসের বিপুল পরিবর্তন-উৎসুক পাঠককে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। গুপ্তসাম্রাজ্যের অবনতির পর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের দীপ হর্ষবর্ধনের হাতে ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে নানা বিন্দুতে বিকীর্ণ হয়ে পড়ল। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি নূতন অবয়ব গ্রহণ ক'রে পূর্বভারতে একাধিপত্য করতে লাগল বটে, কিন্তু নবম শতকে শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের জীবনাদর্শে গুরুতর পরিবর্তন সাধন করলে, এবং অব্যবহিত পরেই রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবপ্রবাহে অদ্বৈত ও নির্বাণ-শূন্যতা ভেসে গেল। ক্রমে এলেন সুফী-সাধকবৃন্দ, কবীর, নানক এবং সকলের শীর্ষে শ্রীচৈতন্য। অতঃপর রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিচূর্ণ হ'লেও একটি সর্বভারতীয় ভাবৈক্য প্রতিষ্ঠার বিলম্ব হ'ল না।

ভাবগুরু রামানুজাচার্যের ও রামানন্দ-সম্প্রদায়ের মতবাদ পরবর্তী ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে অভিনব শক্তিরূপে কাজ ক'রে সুফীভাবের মিশ্রণে আজও ভারতবাসীর চিত্তে একটি মৌলিক প্রবণতারূপে বিদ্যমান রয়েছে। এই মতবাদে বিশ্ব ও জীবনকে অনিত্য ব'লে অস্বীকার করা হয়নি।

দ্বাদশ শতক থেকে ভারতীয় সাহিত্যে মূলতঃ এই ভাবধর্মই বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যভারতে কবীর, দাদূ, সুরদাস, মীরাবাঈ, তুলসীদাস এবং বাঙলায় জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসাদি ঐ ভাবধর্মেরই সাহিত্যিক প্রতিমা। ঠিক এই সময় সংস্কৃত মহাকাব্য ও মানবীয় প্রেমকাব্যের মহিমা জনমানসে প্রায় লুপ্ত হয়েছে। সংস্কৃতে কাব্যরচনার প্রতিভার যেমন অবসান ঘটেছে তেমনি সংস্কৃত ভাষাভঙ্গির সরল উদার সৌন্দর্য তিরোহিত হয়ে শব্দচাতুর্যই ক্ষণদীপ্ত কবিদের প্রায়শঃ আশ্রয় হয়ে উঠেছে। এই সাহিত্যিক পরিবর্তনের যুগে অমরু, রাজশেখর, শরণ, গোবর্ধন, ধোয়ী প্রভৃতি বহু অর্বাচীন-সংস্কৃতের কবি প্রকীর্ণ রচনার মধ্য দিয়ে রোম্যান্টিক প্রেম-কবিতার উজ্জীবনের প্রয়াস করছেন। এই শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সংস্কৃতমিশ্র ভাষা-সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন কবি-জয়দেব ঐ পরিবর্তন-প্রবাহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপূর্বপ্রজ্ঞা-সহকারে লৌকিক প্রণয় থেকে ঈশ্বর-ভাবুকতার দিকে এবং সংস্কৃত থেকে ভাষাসাহিত্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছেন।*

বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ প্রচারের ফলে যে ভাববিবর্তন শুরু হয়েছিল তা অতি দ্রুত সার্থকতার পথে চালিত হয়েছিল আর একটি গুরুতর ঘটনায়। তা হ'ল তুর্কী অভিযান। শাস্ত্র, প্রথা ও অনুষ্ঠানসম্বল ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর তীব্র আঘাত দিয়ে লৌকিক ভাবধর্মের পথ মুক্ত করতে পাঠান-মোগল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম ধর্ম প্রবলভাবে সাহায্য করেছিল। খ্রীঃ বারো শতক থেকেই সুফী ভক্তিভাবের ভারতে প্রবেশ ও ভারতীয় ভাবধর্মের সঙ্গে তার অনিবার্য মিশ্রণে মরমিয়া সাধকদের অনুসৃত সহজ লৌকিক ধর্মই সর্ব-প্রধান আসন দখল করলে। একদিকে যেমন কবীর বোঝালেন যে শাস্ত্রপাঠ, ভজন, পূজা, সাধন, আরাধনা এবং যাবতীয় বৈধ কর্মের কোনো প্রয়োজন নেই,

* কবি জয়দেব তাঁর গীতগুলি মূলে সংস্কৃতে বিন্যস্ত করেছিলেন কিনা এবিষয়ে আজও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যদি সংস্কৃতেই রচনা ক'রে থাকেন তবু স্থানবিশেষে অনুপ্রাস বা ছন্দোরক্ষার্থে তিনি যে অপভ্রংশ বা 'ভাষা' থেকে স্বচ্ছন্দ শব্দাহরণ করেছেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায়। মোটের উপর সংস্কৃতকে তিনি 'ভাষা'র কাছাকাছি আনতে চেষ্টা করেছিলেন এবং গীতিকবি হিসাবে নিরংকুশ হওয়ার প্রবর্তনা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। (তু°— নাথ হরে, সীদতি রাধা বাসঘরে; সজলনলিনিদল, ইত্যাদি। দেখতে হবে জয়দেবের গীতগুলি কোনো সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থে ধৃত হয়নি এবং গীত-গোবিন্দের প্রারম্ভে স্থাপিত কবি-পরিচিতি (জয়দেব এব জানীতে সন্দর্ভ-শুদ্ধিং গিরাম্) তাঁর ভাষায় রচিত অথবা ভাষামিশ্র গীতগুলি সম্পর্কে প্রযুক্ত কিনা সন্দেহ।

আপনার মধ্যেই ঈশ্বরের অনুসন্ধান কর, এবং সহজযান মতের † সাধকেরা জানালেন যে "দেহহি বুদ্ধ বসন্ত" অর্থাৎ দেহের মধ্যেই প্রার্থিত সম্পদ রয়েছে, বা "অনুভব সহজ মা ভোলোরে জোঈ" অর্থাৎ সহজ অনুভূতিই একমাত্র যোগমার্গ, অন্যদিকে তেমনি বৈষ্ণব পদকর্তারা অহেতুক অনুরাগেই ঈশ্বর-সাধনা সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁরা ঈশ্বর সম্পর্কে ঐশ্বর্যবুদ্ধি ও পুরাতন আচারনিষ্ঠা, "লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম" সমস্ত পরিত্যাজ্য ব'লে ঘোষণা করলেন। আঠারো-উনিশ শতকের শ্যামা-সংগীত এবং বাউল-সংগীতেও শাস্ত্রনির্দেশ ত্যাগ ও আপন অন্তর-মধ্যে ঈশ্বর-অনুসন্ধানের এই তত্ত্ব প্রকটতর হয়ে চলেছে দেখা যায়।

'আপনাতে আপনি থেকো মন যেয়োনাক কারু ঘরে।
যা চা'বি তা কাছেই পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥'

অথবা,

'আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা?'—

প্রভৃতি বহু লোক-সংগীতে বিধি-বহির্ভূত মুক্ত জীবনের মধ্যেই জীবনাতীতের অনুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া যাবে।

পাঠান-মোগল-শাসনের সময়কার ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীচৈতন্য। তিনি অহেতুক প্রেমের শ্রেষ্ঠ সাধক, ভাবজীবনের চূড়ান্ত প্রকাশ এবং ভক্তদের কাছে ভগবৎস্বরূপ। স্বয়ং সাহিত্যিক না হ'লেও এবং সংসারজীবন বহন না করলেও ভাবোন্মাদকতাময় বিপুল পদ-সাহিত্যের প্রেরণাদাতা এবং সামাজিক অসাম্যের ঘোর প্রতিবাদী। দ্বাদশ শতক থেকে যে-ভাবধর্ম ভারতের এখানে-ওখানে দীপ্তি পাচ্ছিল, ইতস্ততঃ সাধকদের সংগীতে আত্মপ্রকাশ করছিল, তা এখন মূর্তি পরিগ্রহ করলে, এবং অতঃপর সহজ পথ অনুসরণ ক'রে এবং বর্ণাশ্রম ও 'বৈধমার্গ' পরিত্যাগ ক'রেই যে কাম্যবস্তু লাভ করা সম্ভব সে বিষয়ে কারো সন্দেহ রইল না। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে পদকারদের বাণী এই অতিনিশ্চিত বৈপ্লবিক ভাব-বিবর্তনেরই জীবন্ত পরিচয় বহন করছে।

শ্রীচৈতন্য-আশ্রিত ভাবধর্মও কিন্তু গতিহীন অবস্থায় আবদ্ধ রইল না। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ যদ্যপি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য সহকারে বৈষ্ণবধর্মের সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকলনে নিরত থেকে অহেতুক ঈশ্বর-প্রেমের প্রারম্ভ ও পরিণামের একটা নিয়মানুগ চিত্র ও নূতনতর শাস্ত্র লোকচক্ষে উপস্থাপিত করছিলেন, তথাপি নিয়ম-লঙ্ঘন-রূপ গতিশীলতা থেকে এই ভাবধর্মকে

† তন্ত্রোক্ত সহজসাধন-মতের দ্বারা নিঃশেষে সমাচ্ছন্ন, অথচ বৌদ্ধ পরিচয়বাহী।

নিবৃত্ত করতে পারেন নি। এই বাঙলা দেশেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার পাশাপাশি চলমান, আবার এর থেকেই বিশেষভাবে প্রেরণাপ্রাপ্ত সহজ ভজনের ধারা বাউলজাতীয় বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে পড়ল। যদ্যপি এক মূল ভাবকেন্দ্র থেকে বৈষ্ণব ও পরবর্তী সহজিয়া মতের উৎপত্তি, তথাপি পরিণামে স্বরূপতঃ উভয়ে বিলক্ষণ হয়ে পড়ল। বৈষ্ণবধর্ম অনেকটাই সন্ন্যাসধর্ম। ভক্ত বৈষ্ণব যথার্থ বৈরাগী, তাঁদের শান্ত দাস্যাদি পঞ্চরস দিব্যরস। ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য তাঁদের যে আর্তি, মানবীয় প্রেমের আর্তির সদৃশ হলেও তা অত্যন্ত ভিন্ন। "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বূনদ-হেম, হেন প্রেমা নৃলোকে না হয়।" জগতে স্বার্থবাসনাহীন শুদ্ধ প্রেমের অত্যন্ত অভাব দেখিয়ে তাঁরা ঈশ্বরীয় রতিকে সর্ববিধ লৌকিকতা থেকে মুক্ত করতেই চেয়েছিলেন। অথচ সহজ-সাধন-পথে মানুষই একমাত্র অবলম্বন। মানুষী প্রেমের মধ্য দিয়ে মানুষের মর্মে প্রবেশ ক'রে অন্তর-দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা এই সম্প্রদায়ের সাধনা। কাজেই এই শাখার সাধকেরা প্রেমস্নেহাদি মানুষী বৃত্তিকে গ্রহণ ক'রেই অরূপপথাবলম্বী হলেন। আমরা পরে গ্রন্থের মধ্যে দেখব রবীন্দ্র-কল্পনায় এই ধরনের সাধন-পন্থাই কিভাবে কাব্যিক আশ্রয় লাভ করেছে। রবীন্দ্র-পক্ষে 'অরূপ' বলতে কবি-কল্পিত কাব্যধর্মী পরমার্থকে বুঝতে হবে। কেবল নিসর্গমূলক মর্তপ্রীতি নয়, মর্ত-জীবনানুরাগের সঙ্গে মিলিত অরূপানুরাগে এবং পরিশেষে জীবন ও অরূপের সমন্বয়েই রবীন্দ্র-কাব্যের বিশিষ্টতা। কবির নিজমতেও তাঁর অনুভবের বিচিত্র ধারা রহস্যময় মানুষের সত্যে এসে শেষ হয়েছে। কিন্তু বাউল হোক, বৈষ্ণব হোক, সবই ভাব-সাধনার অঙ্গ, এবং অধ্যাত্ম-প্রধান মধ্য-যুগে, দ্বাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত, এই সাধনারই বিচিত্র সুর নানারূপে অব্যাহতভাবে ঝংকৃত হয়ে এসেছে। প্রাচীনের সংস্কৃতে নিবদ্ধ সাহিত্য-বস্তু থেকে পৃথক্, ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যের এই নূতন রসধর্মের দিকটি ভালো ক'রে বুঝতে হবে। আঠারো শতকে গোস্বামী-শাসিত বৈষ্ণব-ধর্মের নিয়মনিষ্ঠাকে অতিক্রম ক'রে রামপ্রসাদ শাক্ত ভাবধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটালেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রনীতিক ও সামাজিক অবস্থাবিপাকে 'ঈশ্বরে পরানুরক্তি'কে পিছনে রেখে পার্থিব জীবনাসক্তিই প্রবলভাবে জাতীয় মানসকে আক্রমণ ক'রে বসল। এবং অতঃপর আমাদের ব্যবহারিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনে যে বিপদ এসে দেখা দিলে, আমাদের ইতিহাসে কোনো সালে ইতিপূর্বে তা ঘটেনি।

আমরা ইংরেজ বণিকদের অনুপ্রবেশ ও তার পরের অবস্থা সম্বন্ধে বলছি। মোগল প্রশাসনের কালে সাধারণ মানুষের জীবনে যে স্বাচ্ছন্দ্য, অবকাশ, প্রীতি ও আদর্শ-অনুরাগ সুলভ হয়েছিল, পতনের সঙ্গে সঙ্গে তা অন্তর্হিত হতে লাগল। নব-উদ্গত শাক্ত ভূম্যধিকারীদের উৎপাতে সাধারণ মানুষ গ্রস্ত

ও বিপর্যস্ত হ'ল, আদর্শ রসলোক থেকে স্থূল জীবনে তাদের বিচ্যুতি ঘটল। কামী ও বিলাসী প্রজাশোষক ইজারাদারেরাই হলেন ধর্মের কাব্যের তথা আদর্শের রক্ষক ও ভক্ষক। ফলে ধর্মসম্পর্কিত আখ্যানকে মধ্যস্থ রেখে ঐহিক ও কুরুচিপূর্ণ মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে লাগল* এবং কাব্যের চেয়ে মূল্যবান্ দু'পয়সাই কবিদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। ঐ সব জমিদারের আশ্রয়-পুষ্ট কবি-ওয়ালারাই তৎকালীন বাঙালীর জাতীয় ভাবাদর্শের প্রতিনিধি। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্লায় স্থিতিলাভ ক'রেই কোলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী কোনো কোনো অঞ্চলকে নিজেদের সামরিক এবং অর্থনীতিক আয়ত্তের মধ্যে আনবার চেষ্টা করলে এবং কীভাবে সফলকাম হ'ল তা আজ কারো অবিদিত নেই। বাণিজ্য বিষয়ে এদের সংস্পর্শে এসে তখন কোলকাতা অঞ্চলের অনেকেই বিত্তবান্ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের বংশধর বা আত্মীয়গোষ্ঠীর লোকেরা বিদেশী বণিকদের স্থূল জীবনের অনুসরণে প্রমত্ত হয়ে পড়ল। তখনও শিক্ষা-সংস্কৃতিসম্পন্ন ইংরেজ গুণী লোকেরা আসেন নি এবং আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত বিবিধ-উন্নতি-বিধায়ক নির্দিষ্ট শাসনতন্ত্রের প্রণয়ন হয়নি, শিক্ষা-ব্যবস্থায় নোতুন ধারার আরম্ভ হয়েছিল আরো পরে। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে কোলকাতার সমাজজীবন ধীরে ধীরে দুর্নীতিগ্রস্ত ও ঐহিকতাময় হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলেও তা নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত কতিপয় ব্যক্তি বা পরিবারেই আবদ্ধ রইল। সাধারণভাবে রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জীবন ছিল কামনালিপ্ত, গ্লানিময়, ভোগসর্বস্ব ও অশুচি। তা ইংরেজদের বিষয়াসক্তির অনুসরণে যতটা পটু ছিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুকরণে তেমন আগ্রহশীল ছিল না। রাজধানীর এই অবনত জীবনের পরিচয় তৎকালীন বাঙ্লা সাহিত্যে বেশ ফুটে উঠেছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা, আলালের ঘরের দুলাল, হুতোম প্যাঁচার নক্শা, নববাবুবিলাস, দীনবন্ধুর নাট্য ও কবিতা, মধুসূদনের প্রহসন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য ও প্রবন্ধাবলীতে এই জীবনের বিশেষ প্রকাশ চিহ্নিত হয়েছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বাঙালীর জীবনের সঙ্গে কী গভীর পার্থক্য! পতিতাসংসর্গ ও মদ্যপান তখন কোলকাতার বিত্তবানের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য এবং স্বল্পবিত্তের আকাঙ্ক্ষিত। খেমটা-খেউড়, বুলবুলির লড়াই, নৌকাবিলাস, উদ্যানলীলার কলঙ্কিত ইতিবৃত্তই উনিশ শতকের রাজধানী কোলকাতার অন্ততঃ প্রথমার্ধের পরিচয়। পশ্চিমের

* সংকীর্ণ দু'একটি ক্ষেত্রে, যেমন নিধুবাবুর টপ্পা কি নিতাই বৈরাগীর কৃষ্ণ-ভক্তিগীতে এর প্রতিবাদ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু হৈ-চৈ-এর মধ্যে এঁদের বিশুদ্ধ অনুরাগের সুর গিয়েছিল ডুবে—ডঃ সুশীল কুমার দে।

সভ্যতা তার সাহিত্যসম্পদ নিয়ে সেই আমাদের দ্বারে করাঘাত শুরু করেছে বটে, কিন্তু জীবনে তার কোনো কম্পন তখনো সাধারণে অনুভব করেনি। যুক্তিবাদী রামমোহনের সাহসিক সংস্কারগুলির সুদূর-প্রসারী প্রভাবের মূল্য তখনো হৃদ্‌গত হয়নি। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনগঠন ও সংস্কারের বিষয়টি সমাজে ধীরে ধীরে অনুসৃত হচ্ছিল মাত্র। কিন্তু এ তো কেবল শহর অঞ্চলের কথা, কোটি কোটি গ্রামীণ মানুষের জীবনচিত্র ভিন্ন ধরনের এবং আরো শোচনীয়। সেখানে নিরন্নের শবযাত্রা, অশিক্ষার নিরন্ধ্র তমিস্রা, জীর্ণ প্রথার দাসত্ব, নিম্নবর্ণকে ঘৃণাসহ শোষণের পাকা ব্যবস্থা, ঈর্ষা, দলাদলি, কলহ ও মিথ্যা নিয়ে সর্বব্যাপী ক্লীবতা—বিশ শতকের তথাকথিত শিক্ষিত-জাগরণের ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের পর আজও যার জের কাটেনি। সুতরাং উনিশ শতকে, কেবলমাত্র সাহিত্যের নবায়নে ও কতিপয় ইংরেজী-শিক্ষিতের বিবেকবোধে, জাতীয় রেনেসাঁস বা নবজন্ম ঘটে গিয়েছিল একথা কেউ কেউ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেও তা শ্রোতব্য নয়।

এহেন জীবন-বিপর্যয়ের কালে একদিকে ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে মহর্ষি-কেশবচন্দ্র ও অন্যদিকে ভাবুক ও সমন্বয়ের পথিক শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মপ্রকাশ করলেন এবং স্থূল জৈব জীবনের অসারতা প্রতিপন্ন ক'রে ভোগবাসনা-পরিত্যাগ ও ভাব-জীবনের উপর আস্থা স্থাপনের উপদেশ দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন্মুক্তির বাণী শোনালেন, যা বিশেষভাবে বাঙালীর বিস্মৃত অথচ বহুকাল-আগত সাধনার অন্তরতম বাণী। অথচ যুগোচিত জীবন-দর্শনের মধ্যেই তাঁর উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা করলেন—জীবনকে ত্যাগ ক'রে নয়, জীবনের কামনা ও বৈষয়িকতা ত্যাগ ক'রে মুক্তির আনন্দ লাভ করা যায়। রামকৃষ্ণের বাণী মানুষ-প্রেমিক বিবেকানন্দের মধ্যে নবীনতর রূপ প্রাপ্ত হ'ল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কেশবচন্দ্রও একালের জীবন-অধ্যাত্মের সমন্বয়-মূর্তি। এঁরা সকলে ধর্মাদর্শের মধ্যে যা সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তা ভিন্নভাবে সাহিত্যের মধ্যে সিদ্ধ করলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙলার সেই বিস্মৃত ভাবপ্লাবন-নিষিক্ত আধ্যাত্মের সঙ্গে বর্তমান জীবনের, রহস্যের সঙ্গে সাহিত্যের, অপূর্ব মিলন নূতন দেহে আত্মপ্রকাশ লাভ করলে। সাধক ও সম্যগ্‌দর্শী যথার্থ কবি উভয়ের ধ্যানের সাদৃশ্য দেখা গেল।

ঐ প্রাচীন জীবনরসিকতাই রবীন্দ্রনাথে আধুনিক অভিঘাতে নূতন—ভঙ্গিতে, আকারে, রূপে। এবং তা সাহিত্যের দিক থেকে এ যুগের আকাঙ্ক্ষিতও বটে, কারণ, একদিকে পাশ্চাত্য কাব্যসুধাপানে অতৃপ্ত আধুনিক বাঙালী বাঙ্‌লা সাহিত্যে অধিকতর চমৎকার অশ্রুত রোম্যান্‌টিক্ সংগীত শ্রবণে তৃপ্ত হওয়ার বাসনা করেছিল; অপরদিকে কর্মবিমুখ, ভাববিমুখ, ইহ-সর্বস্ব, শাস্ত্র ও প্রথার দাসত্বে জীর্ণ ও সংকীর্ণ বাঙালীর চিত্ত যেন নবচৈতন্যের

জন্য আগ্রহান্বিতও ছিল। এর ফলস্বরূপে রবীন্দ্রনাথ কাব্যেই জীবন্মুক্তির আনন্দ পরিবেশন করলেন। সে-কাব্যের ভাষারূপে লৌকিকের সঙ্গে পদাবলী ও সংস্কৃতের অপূর্ব মিশ্রণ, জীবনাদর্শে নব্য সমাজবাদের পাশে কালিদাসের তপোবন, এবং কল্পনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যে দৃষ্ট অথচ অধিকতর সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক্ আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙালীর ভাব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন —জীবনের মধ্যেই অরূপের সন্ধান।

জীবন ও অরূপের সমন্বয়েই রবীন্দ্র-কাব্য বিশিষ্ট, কেবল বস্তু-কেন্দ্রিক জীবন-বিশ্লেষণে বা ব্যক্তিমানসের অতি সাধারণ অভিলাষাদির বর্ণনাতে নয়, শ্রেণীস্বার্থময় একান্ত বৈষয়িক জীবনের পূর্তির বাণীতে তো নয়ই। পার্থিবতাকে আশ্রয় ক'রে বিষয়েতর রসের অনুসন্ধান, বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিশ্বোপলব্ধি, গৃহগত সংকীর্ণ যান্ত্রিক ও অমানুষিক জীবনের মধ্যে নয়—মুক্ত প্রকৃতিতে, পলাতকের স্বার্থ-বিলীনাবস্থায়, মানুষপ্রীতি ও নিসর্গ-মাধুর্যের রসাস্বাদে যে অনির্বচনীয় ভাবাবেশ ঘটে—তারই চরম মুহূর্তগুলি কবির আকাঙ্ক্ষায় বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুতঃ রোম্যান্টিক্ অনুভূতি ও কল্পনা এমন একটি জিনিস যা মনকে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রেই জীবনাতীতের জন্য উৎসুক করে, বন্ধনের মধ্যেই অবন্ধনের ব্যাকুলতা জানায়। রবীন্দ্রনাথ একটি অতিপ্রবল চলিষ্ণু রোম্যান্টিক্ কল্পনার অধিকারী ছিলেন।* তাই কেবল (বাস্তব) মর্তপ্রীতি নয়, অতীন্দ্রিয় ভাব-ব্যাকুলতাময় মর্তপ্রীতিও কবির ঈপ্সিত। যে মর্তপ্রীতি সহজেই অরূপানুভবে রূপান্তরিত হতে পারে এমন রসপ্রধান কাল্পনিক মর্তপ্রীতিই কবির কাম্য। আবার নির্গুণব্রহ্মাস্বাদ-তুল্য ঈশ্বরভাবুকতাও কবির অভিপ্রেত নয়, নানাবর্ণময় বাস্তব জীবনের আধারে প্রতিষ্ঠিত অনির্বচনীয় রসস্বরূপ অরূপই কবির অর্চনীয়। মর্তপ্রীতির সঙ্গে অধ্যাত্ম-প্রীতির, সমাজ ও জীবনের সঙ্গে অরূপের মিলনেই তাঁর প্রতিভা সার্থক হয়েছে। একদিকে পুরাতন ভারতবর্ষ তার বহুবিচিত্র রসসম্পদ্ নিয়ে, আর একদিকে আধুনিক মানুষ তার জীবনের প্রতি অনুরাগ (সে সময় পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে সঞ্চারিত) নিয়ে যেন এই কবির দৃষ্টির সামনে এসে প্রকাশের জন্যে দাঁড়িয়েছে। মহাকবি অপূর্ব শক্তিবলে উভয়কেই পরিতুষ্ট করলেন। পশ্চিমের জীবনরসধারা ও ভারতীয় ভাবসাধনা যেন সম্মিলিত প্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করছিল—রবীন্দ্র-মানসে এসে উভয়ের পরিতৃপ্তি ঘটল।

কবির প্রতিভায় এই দুই আপাত-বিরুদ্ধ ধারার সম্মিলন এত অনায়াসে ঘটেছে যে এদের মধ্যে পার্থক্যের কোনো রেখা টানা সম্ভব নয়। কবির সক্রিয়

* তু° রাজশেখর—'স যৎস্বভাবঃ কবিস্তদনুরূপং কাব্যম্

রোম্যান্‌টিক্‌ অনুভূতি ধীরে ধীরে অরূপ-চেতনায় কিভাবে প্রবেশ করেছে এবং পরে অরূপ থেকে সমাহিত দৃষ্টি কিভাবে সমাজ ও জীবনে নিপতিত হয়েছে তার বিচার যেন সম্ভব নয়, শুধু বিমূঢ় মন নিয়ে যা অনিবার্য তার অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। রবীন্দ্র-কাব্যপাঠে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে তাঁর রচনায় প্রারম্ভ থেকে ক্রমশঃ একটি পরিণাম ঘটেছে, নিসর্গ-আত্মীয়তা থেকে বৈপ্লবিক মানুষ-আত্মীয়তায়, সমাজ-ভাবনায় তিনি পোঁছেচেন, এবং সে পরিণাম তাঁর কবিস্বভাবেরই। পরিণামপ্রবণ গতিশীল কবিস্বভাব অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যাত্রা ক'রে চলেছে যতক্ষণ না তার দৈবনির্দিষ্ট পূর্ণতা আয়ত্ত হয়। উগ্র কবি-স্বভাবের বশবর্তী ব'লেই এই কবির চিত্তে নিতান্ত ব্যক্তিগত কোনো ভাবনা-বেদনা স্থায়ী ও গভীরভাবে দাগ কাটতে পারেনি। বস্তুতঃ শুদ্ধ কবিমানস আসক্তিবিহীন, নির্মম উদাসীন। ঠিক এই জন্যই কোনো শাস্ত্র, তত্ত্ব বা পূর্বনির্দিষ্ট মতবাদও কবির চিত্তকে অভিভূত করতে পারে নি। উপনিষদের বাণী বা ব্রাহ্মধর্মের নির্দেশও এঁর সংস্কারমুক্ত প্রতিভার কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়েছে এবং যতক্ষণ না স্ব-ভাবের অনুকূলতায় ঐসব ঐতিহ্যমূলক ভাবধারা অনায়াসে কবিচিত্তে আশ্রয় লাভ করেছে ততক্ষণ কবি তাদের স্বীকারই করেন নি।* এইজন্য রবীন্দ্রকবিমানসে উপনিষদ্‌ অথবা ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব সম্পর্কে চিন্তাসহকারে বচনবিন্যাস কর্তব্য। এমন কি কবি কালিদাসের রোম্যান্‌টিক্‌ ভাববিলাস বা প্রকৃতিপ্রীতিমূলক তপোবনাদর্শও কবির স্বধর্মের অনুকূলভাবেই গৃহীত হয়েছে একথা স্বীকার না করলে তাঁর কবি-প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হবে,† এহেন প্রতিভা যে একটি বিশেষ যুগের প্রয়োজনে আবির্ভূত এই সত্যে বিশ্বাস হারাতে হবে এবং রবীন্দ্রনাথ যে স্রষ্টা, কতকগুলি পূর্বনির্দিষ্ট ভাবধারার অনুবাদক মাত্র নন, তাও ভুলতে হবে।

উপরি-উক্ত কারণে রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত মিলিয়ে তাঁর সৃষ্টির রহস্য সম্যক্‌ অনুধাবন করা সম্ভব নয় বলে'ই আমরা মনে করেছি এবং তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টিগুলির কোনোটিকেই অতি সাময়িকতার কেবল অনুবর্তন-রূপে গ্রহণ করতে পারিনি। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র জীবনচরিতের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ ক'রে কাব্যবিচারের বিরুদ্ধে কবিও বারবার আপত্তি জানিয়েছেন। দেশ ও সমাজের পক্ষে গুরুতর সমস্যাগুলিতে কবি অবশ্য সাড়া দিয়েছেন বারংবার, কিন্তু আমাদের অপ্রত্যাশিত সংগ্রামী ও বৈপ্লবিক ভাবদিগন্তের অভিমুখেই তিনি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন সে-সব ক্ষেত্রে। প্রচলিত কোনো মত বা

* ধ্বন্যালোক—'ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া।'

† 'আত্মপরিচয়'—'আমার ধর্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অনুশাসনের সঙ্গে আপোষ-রক্ষা ক'রে কোনোকালেই তিনি চলেন নি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কবি ক্ষীণভাবে কোনো ঘটনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন সত্য, কিন্তু এর আশ্রয়ে যে সুদূর কল্পলোকে ধাবিত হয়েছেন তাতে ঘটনার স্মৃতি কোনো রেখাপাত করতে পারেনি এবং সাময়িকতা শাশ্বতভাবের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে।* মোটকথা, কবি-জীবন ও কেবল তাৎকালিক ঘটনা কবিমানসকে জানার দিক দিয়ে কোথাও সহায়তা করলেও তাদের সীমা সম্পর্কে যেন অবহিত হতে পারি এবং একথা ভুলে না যাই যে, রবীন্দ্ররহস্যালোকের দীপবর্তিকা সেই গোপনচারী কবি স্বয়ং।

কবি-স্বভাবের ঐ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী † বিকাশের দিক লক্ষ্য ক'রে 'প্রভাব' বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায়, ঐ শব্দটির প্রয়োগকালে, ঠিক সে-অর্থে আমরা গ্রহণ করিনি। কারণ প্রতিভা তার স্বকীয় প্রকাশধর্মবশে যা গ্রহণ করে তাকে ঐ প্রতিভারই উপাদান মনে করলে কবিধর্মের প্রতি সুবিচার করা হয় না। বিশেষতঃ যে গীতি-কবির প্রতিভা একটি স্বকীয় গতিপথ অনুসারে চলেছে তাকে কেবলমাত্র উক্তির খাতিরে ছাড়া 'প্রভাবান্বিত' এ-কথাও বলা চলে না। রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বধর্মের প্রতিকূল তাঁর কাব্যে কিছু আছে এমন আমাদের মনে হয়নি। এই কবির কাব্যজীবনের বাল্যাবস্থায় যেখানে দেশীয় এবং ইয়োরোপীয় বিভিন্ন কবির অনুকরণের স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে, এবং কবির স্বকীয়তা প্রকাশ পায়নি, সেখানে প্রভাব শব্দটি বরং সুপ্রযোজ্য হতে পারে। এই প্রতিভার বিকাশের কালে, যেখানে সংস্কৃত কাব্যের ভাব ও ভঙ্গি সহায়তা করেছে, যেখানে কবি অনুকরণ করছেন না, স্বধর্মবশে অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন, সেখানে কোথাও কোথাও আমরা ভাষার খাতিরে 'প্রভাব' শব্দটি ব্যবহার করেছি মাত্র।

স্বরূপে ভাস্বর এই রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচারে নির্দিষ্ট কোনো অভিমতকে কাব্যের পূর্বে স্থাপন করা যেমন যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিনি, তেমনি গতানুগতিক কোনো শব্দ বা বুলির আশ্রয় গ্রহণ করতেও সংকুচিত হয়েছি। কিন্তু ভাবসাদৃশ্য ও উক্তিসংক্ষেপের প্রয়োজনবশে কখনো কখনো 'রোম্যানটিক' বা 'রস' এরকম দু'একটি অতিপরিচিত শব্দ ব্যবহার করেছি। রবীন্দ্রনাথের অভিনব প্রকৃতি-ভাববিহ্বলতা বা রহস্যময় সৌন্দর্য-ধ্যান-স্পৃহার প্রকার যদিও তাঁর স্বকীয় তথাপি ঐগুলির বিকাশমূলে যে-মনোভাব ক্রিয়াশীল হয়েছে তা

** তু°—নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাম্—ইত্যাদি 'কাব্যপ্রকাশ'ধৃত মঙ্গলাচরণ।

† তু°—ধ্বনিকার—অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ত্যতে॥

উনিশ শতকের ইংরেজি রোম্যান্টিক শ্রেণীর কবিদের অভিনব মনোভাবের সদৃশ ব'লে ওগুলিকে সাধারণভাবে ঐ নামেই অভিহিত করেছি। বলা বাহুল্য, পদাবলীর কবিরা এবং কবি কালিদাসও বহুল পরিমাণে এই মনোভঙ্গির অধিকারী ছিলেন।

কবির তথাকথিত ঈশ্বর-ভাবুকতা বা অধ্যাত্ম-অনুরাগ সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা 'অরূপ' শব্দটির ব্যবহারই সমীচীন ব'লে মনে করেছি। যেহেতু বাস্তব নিসর্গ-মানুষ-পথসঞ্চারী কবির ঈশ্বর তাঁর স্বকীয় একটি উপলব্ধি-বিশেষ, তা না-দ্বৈত, না-অদ্বৈত, না-বৈষ্ণব, না-ব্রাহ্ম, তিনি রূপমধ্যবর্তী অনির্বচনীয় রসস্বরূপ, সেইহেতু, কবির অধ্যাত্ম-অনুভূতির যথাসম্ভব প্রকাশক ঐ শব্দটিই আমরা বেছে নিয়েছি, যদিও বর্ণনের খাতিরে 'ঈশ্বর' শব্দও কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাব্যিক ধারণার বাচক 'অরূপ' শব্দটি স্বয়ং কবিরও নির্বাচিত।

রবীন্দ্র-প্রতিভা বহুমুখী হ'লেও যেহেতু কবিত্বেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়, সেজন্য রবীন্দ্র-প্রতিভা বলতে রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভাকেই আমরা লক্ষ্য করেছি। এই কবিপ্রতিভার অনুসরণে আমরা তাঁর উপন্যাস ও গল্পকে বর্জন করেছি। তার কারণ এই নয় যে, উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্র-কবিস্বভাবের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না ; তার কারণ এই, যে, কবির লেখা হ'লেও উপন্যাস স্পষ্টতঃ চলমান-জীবন-অনুগামী এবং ভিন্নতর কলাকৌশলের অধীন। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে যে কাব্যাদর্শের প্রভাব পড়েছে তা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার বিষয়। কিন্তু ভাব-সংকেতময় নাটকগুলি তাঁর কবিতার সমধর্মী রচনা ব'লে আলোচনায় তাদের অবশ্যই গ্রহণ করা হয়েছে। আবার এমনও ঘটেছে যে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রয়োজনবশে কবির কাব্যগ্রন্থগুলির সবক'টিরই বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর হয়নি,—কোথাও মাত্র দিগ্‌দর্শন করতে হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত লঘু রচনাসমূহ অনায়াসেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, কবির উপলব্ধি একটি ঐক্যের সূত্র ধ'রে অগ্রসর হ'লেও বিভিন্ন কালের বিশেষ প্রবণতা ও বিকাশের পর্যায় অনুসারে তাঁর কবিকৃতিকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত ক'রে দেখেছি। এইভাবে, প্রারম্ভ থেকে কড়ি ও কোমল পর্যন্ত—'অপ্রকাশের কাল' ; মানসী ও সোনার তরীতে 'প্রতিভার উন্মেষ' ; চিত্রায় 'বিকাশের প্রথম পর্যায়' ; চৈতালি থেকে নৈবেদ্যে 'বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়'—সংস্কৃত সাহিত্যের ও প্রাচীন জীবনাদর্শের অনুসরণের কাল ; নৈবেদ্য কাব্যটিকে ভারতীয় জীবনাদর্শ ও ধর্মাদর্শের পূর্ণতম অভিব্যক্তির অথচ অরূপানুভূতিতে পদক্ষেপের সন্ধিক্ষণের রচনা ধ'রে নৈবেদ্য, উৎসর্গ, খেয়া ও শারদোৎসবে 'অরূপানুভূতির প্রারম্ভকাল—তৃতীয় পর্যায়' ; গীতাঞ্জলি, ডাকঘর,

গীতিমাল্য প্রভৃতি রচনার কালে 'অরূপানুভূতির পূর্ণতা—বিকাশের চতুর্থ পর্যায়' ; এবং গীতালি-বলাকা থেকে ঋতুনাট্যগুলি, রক্তকরবী, মহুয়া পর্যন্ত 'বিকাশের শেষ পর্যায়—অরূপের সঙ্গে জীবনের সমন্বয়,' এবং এই সমন্বয়েই রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণতা, তার যাত্রার পরিণাম। পরিণামের পরবর্তী নিঃশেষে মানবিক কালের-যাত্রা ও তাসের-দেশ নাট্যকৃতি সহ পরিশেষ, পুনশ্চ কাব্য থেকে শেষজীবনের বিস্তৃত অধ্যায়টি আমরা 'গোধূলি-পর্যায়' নামে অভিহিত করেছি।

গোধূলি নামে অভিহিত হ'লেও এবং আন্তরধর্মের দিক থেকে ক্ষেত্র-বিশেষে রবির প্রতিভা-রশ্মির সংবরণ লক্ষিত হ'লেও একালটি উত্তম কাব্যসৃষ্টি থেকে বঞ্চিত নয়। বিষয়বৈচিত্র্যে, সমাজমুখীতায়, নিজমানসের নিপুণ বিশ্লেষণে এবং প্রকাশরীতির অভিনবত্বে সায়াহ্ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির মানুষপ্রীতির পূর্ণ পরিচয়ের জন্যও এই পর্যায়ের অধ্যয়ন অপরিহার্য।

অপ্রকাশের কাল

'বনফুল' থেকে 'কড়ি-ও-কোমল'

বাণীর সাধনা সহজ নয়, কাব্য-সাধনা আরও কঠিন। সুকবির সৃষ্টি যে নিরলস-প্রযত্ন-সাপেক্ষ তাতে সন্দেহ কি? কবি রবীন্দ্রের সুবিশাল সৃষ্টির পশ্চাৎপটে একটি বিস্তৃত সাধনার ইতিহাস বর্তমান। অনৈসর্গিক না হলেও রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ অ-লৌকিক শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা যদি উপযুক্ত প্রয়াসের দ্বারা অভ্যর্থিত না হ'ত তাহ'লে বাণীর অধীশ্বর, বাঙালীর পূর্বসঞ্চিত পুণ্যফলের মূর্তবিগ্রহ এই কবিকে আমরা পেতাম কি না সন্দেহ। আমাদের প্রাচীনেরা কবির এই সাধনার দিকটিকে অভ্যাস, অভিযোগ † অর্থাৎ রচনাবিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি প্রভৃতি নানাভাবে অভিহিত করেছেন। সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে অনুক্ষণ বিজড়িত নিজের কঠিন অভিনিবেশকে লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ চিত্রা-কাব্যের 'সাধনা' নামক কবিতায় বলেছেন—

তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,
শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবেলা
শতেক বার।

এবিষয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের কথা এই যে, কৈশোরে পদার্পণের সঙ্গেই তিনি দুরূহ অভিনিবেশে ব্রতী হয়েছিলেন। শক্তি যখন প্রকাশের আনুকূল্য লাভ করে নি, বাণী যখন প্রতিপদে স্খলিত, ব্যুৎপত্তি যে-সময়ে পরানুকরণেই প্রবৃত্তি দেয়* তখন বিরামহীন লেখনী-চালনা যে কী অপরিসীম অনুরাগের পরিচায়ক তা সহজেই অনুমেয়।

কবি রবীন্দ্রের স্বরূপে আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর অপ্রকাশের একটি কাল রয়েছে। তখন কবির প্রতিভার ঠিক উন্মেষ হয়নি। কাব্যজীবনের দিক থেকে দেখলে এটি নেহাত বাল্যকাল। ভিন্ন ধরনের উপমা দিয়ে এটিকে প্রত্যুষের পূর্বাবস্থা বা নীহারিকার অবস্থা বলা যেতে পারে। 'বনফুল' থেকে আরম্ভ ক'রে 'ছবি ও গান', এমনকি 'কড়ি-ও-কোমল' পর্যন্ত তেরো-চোদ্দটি কাব্য ও নাট্যকল্প রচনা নিয়ে এই দীর্ঘ অপ্রকাশকালের রচনা। প্রথমে কাহিনীকে

† তু° দণ্ডী—নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতং চ বহু নির্মলম্।
অমন্দশ্চাভিযোগোঽস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ॥

* তু°—কবিত্বং জায়তে শক্তেঃ বর্ধতেঽভ্যাসযোগতঃ।
তস্য চারুত্বনিষ্পত্তৌ ব্যুৎপত্তিস্তু গরীয়সী॥

আশ্রয় ক'রে এবং পরে নির্বিষয়ভাবে, কিশোর কবির সেকালের হৃদয়-বেগ এগুলিতে যথাসম্ভব আকার লাভ করেছে। আধুনিক গীতিকাব্য বলতে যা বোঝায় এই সময় বাঙ্‌লা সাহিত্যে সেই শ্রেণীর কবিতা-রচনা সবে আরম্ভ হয়েছে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কয়েকটি খণ্ডকবিতায় এর আভাস দেখা গেছে, এবং নির্বিষয় হৃদয়ভাব-বিলাসের পথ বিহারীলাল উন্মুক্ত করেছেন। এ ছাড়া যে নূতন ধরনের কাব্যরচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাল্যে পরিচিত হয়েছিলেন তা হ'ল দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্য। এই নিয়েই যে-সাহিত্যে গীতিকাব্য রচনার ব্যাপ্তি সে-সাহিত্যে কালবিচারে রবীন্দ্রের এতগুলি রচনার আপেক্ষিক মূল্য আছে নিশ্চয়ই। এই কারণে তিনি বঙ্কিম-প্রমুখ অনেকের কাছে পুরস্কৃতও হয়েছিলেন। কিন্তু যখন থেকে তাঁর প্রতিভার স্বরূপ সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়েছে তখন থেকে ঐ রচনাগুলির মূল্য সাধারণের কাছে ও তাঁর দৃষ্টিতে নগণ্য হয়ে পড়েছে। তার কারণ কেবলমাত্র এই নয় যে সেগুলির ভাষা ও ভঙ্গি দুর্বল, হৃদয়ভাব বালকোচিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্ব, তার কারণ এই যে, নিসর্গ এবং মানুষ সম্বন্ধে যে-একান্ত-অভিনব কল্পনাভঙ্গি 'মানসী' থেকে আরম্ভ ক'রে একটি নির্দিষ্ট পথে বিবর্তনের মুখে অগ্রসর হয়েছে তার পরিচয় ঐ রচনাগুলিতে পাওয়া যায় না। ভাষাশিল্পের দিক থেকে বা প্রেমকেন্দ্রিক কাব্যস্বপ্নের রোম্যান্‌টিক্ মনোভাবের দিক থেকে 'কড়ি-ও-কোমল' কাব্যে তাঁর সাহিত্যিক নৈপুণ্য পরিস্ফুট হ'লেও যেহেতু এর মধ্যেও একমাত্র রবীন্দ্রেরই কবি-স্বভাবের অন্তর্নিহিত বস্তু—ঐ বিশিষ্ট কল্পনা (সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকর্ষণ ও নিসর্গের তাবৎ বস্তুর সঙ্গে রহস্যময় আত্মিক সম্পর্ক) অলভ্য, সেইহেতু ঐ কাব্যটিকেও যথার্থভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্তরঙ্গ ব'লে গ্রহণ করা যায় না; যদিও এটুকু বোঝা যায় যে 'কড়ি-ও-কোমল' তার পূর্বেকার 'ছবি-ও-গান' 'প্রভাত-সংগীত' ও 'সন্ধ্যা-সংগীত' থেকে ভিন্ন ও উন্নততর সাহিত্যিক রচনা, এবং সন্ধ্যা-সংগীত বা প্রভাত-সংগীত তারও পূর্বেকার শৈশব-সংগীত, কবি-কাহিনী প্রভৃতি থেকে স্বতন্ত্র ও উন্নত সৃষ্টি।

বনফুল, কবিকাহিনী, শৈশব-সংগীত, প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রভৃতি পড়তে পড়তে আমরা কখনো স্কট, ওআর্ডস্‌ওআর্থ, শেলি, ব্রাউনিং প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের, এমনকি কবি কালিদাসেরও সম্মুখীন হয়েছি এবং প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেছি রবীন্দ্র-কৈশোরের আদর্শ—প্রেম ও নিসর্গ-সৌন্দর্যের উপাসক কবি বিহারীলালের। ভাবে ও ভাষায় বিহারী-কবির সজ্ঞান অনুসরণের মধ্যেই কবি-কিশোর সার্থকতার পথ খুঁজছিল এবং তা-ই ছিল তার তখনকার উচ্চতম অভিলাষ। একালের রচনার স্বরূপ নির্ণয় করতে কবি 'গদগদ্‌ভাষণ',

'প্রলাপ', 'কাঁচা হাতের রচনা' প্রভৃতি কথা ব্যবহার করেছেন। 'ছবি-ও-গান' পর্যন্ত রচনায় ছন্দের স্খলন, অনুপযুক্ত শব্দের ব্যবহার, একই শব্দের পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি নানা ভাষার দোষ লক্ষিত হ'লেও ক্বচিৎ উচ্চভাবের বাহন হওয়ায় দোষগুলি তেমন চোখে পড়ে না। যেমন ধরা যাক নিম্নলিখিত দু'টি দৃষ্টান্ত ঃ

অতীত সুখের স্মৃতি বর্তমানে দুখজ্বালা
ভবিষ্যতে এ কী রে কুয়াশা !
যেন এই জীবনের আঁধার সমুদ্র-মাঝে
ভাসায়ে দিয়েছি জীর্ণ তরী,
এসেছি যেখান হতে অস্ফুট সে নীল তট
এখনো রয়েছে দৃষ্টি ভরি। * * *
সম্মুখে আসন্ন ঝড় সম্মুখে নিস্তব্ধ নিশি
শিহরিছে বিদ্যুৎ-শিখায় ! (শৈশব-সংগীত)

চাও তুমি দুখহীন প্রেম ছুটে যেথা ফুলের সুবাস,
উঠে যেথা জোছনা-লহরী, বহে যেথা বসন্ত-বাতাস,
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম, আছে যেথা অনন্ত পিয়াস,
বহে যেথা চোখের সলিল, উঠে যেথা দুখের নিশ্বাস
(সন্ধ্যা-সংগীত)

সন্ধ্যা-সংগীত থেকে প্রভাত-সংগীতে যে ভাবান্তরই ঘটুক না কেন এখানেও অন্তরের অসংবদ্ধ প্রলাপ, এলোমেলো উচ্ছ্বাস। একমাত্র 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় উচ্ছ্বাসের এবং ভাষার অসংযমের মধ্যেও একটা বিশিষ্ট মনোভঙ্গির সূত্র পাওয়া যায় এই পর্যন্ত। বিশিষ্ট এইজন্য যে, এই ব্যাকুলতা, এই ক্রন্দন, পরিশেষে প্রবল বিদ্রোহ, এ রবীন্দ্র-কবিস্বভাবেরই স্বধর্ম এবং তা পরবর্তী বহু কবিতায় আরও সুপরিস্ফুট। ঐ 'গুহা' ঐ 'আঁধার' দিয়ে কবি নিজের অজ্ঞাতেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, প্রথমত, তাঁর ভাষায় আত্ম-প্রকাশের অবরুদ্ধতাকে—কারণ, সেকালকার কবিসম্প্রদায়ের ভাবুকতা ছিল লোকসামান্য সুতরাং সীমিত, আর সংকেতশক্তিহীন পরিস্ফুট-অর্থ-বহনক্ষম ভাষাতেই তা ব্যক্ত হতে চেয়েছিল ; দ্বিতীয়ত, লৌকিক প্রথা ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনে জীর্ণ সমাজের অচলায়তনকে। 'শেলি'র সগোত্র বাঙালী কবি এই কারাগারকে, মুক্ত স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ও বিচরণের বাধাকে ভাঙতে চেয়েছেন। লক্ষণীয় এই যে, দেশ ও সমাজ কবির অপরিণত চৈতন্যকেও আশ্রয় ক'রে নিজকে ব্যক্ত করতে চেয়েছে। কবির ভূমিকা হয়েছে বীণাযন্ত্রের, যন্ত্রীর নয়। বস্তুতঃ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবির অস্ফুট বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও একালকার ব্যতিক্রম হিসাবেই স্মরণীয়।

'ছবি-ও-গানে' ইতস্ততঃ প্রকৃতির যে চিত্র-পরিচয় দেওয়া হয়েছে, কল্পনার অপরিণত অবস্থা মনে রেখে তা উল্লেখযোগ্য হতে পারে। পূর্বোক্ত ঐ স্বপ্নভঙ্গের ব্যতিক্রম ছাড়া একালের রচনাগুলিকে সমগ্রভাবে দেখলে কৃত্রিমতার মধ্যেও নীহারিকার আভাসের মত যা দৃষ্টিগোচর হয় তা হ'ল প্রকৃতিপ্রীতি এবং মানবীয় স্নেহ-প্রেমের ও রূপগত সৌন্দর্যের আকর্ষণ। এই অপরিণত মানবীয়তার দিকটি কড়ি-ও-কোমল (তু°—মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই) বা মানসীর কোনো কোনো কবিতা পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ এই মানুষপ্রীতির এবং কবির অতিপ্রসিদ্ধ পৃথিবী-প্রীতির এবং ধরা-ছোঁওয়া যেতে পারে এমন একটা দৃষ্টিকোণের প্রথম পরিচয় দুর্বল প্রকাশরীতির মধ্য দিয়েও সূচিত হয়েছে এই মাত্র। মোটের উপর 'মানসী'-পূর্ব এই কাব্যরচনার কালটি আমরা অনুকৃতির কাল ব'লে মনে করেছি। স্বদেশী-বিদেশী বহু কবির রচনার মধ্যে এই সময় কবিকে বিচরণ করতে দেখেছি এবং কবির নিম্নলিখিত উক্তিরই যাথার্থ্য অনুভব করেছি ঃ

তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা দিবস-নিশি।

এই অনুকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। বাঙলা সাহিত্যে এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অনুকরণের চিহ্ন আর নেই। অনুরাগের বলিষ্ঠতার সঙ্গে রূপ ও মর্ম উভয়েরই প্রবল অনুকরণপ্রয়াস কবির কৈশোরেরই যোগ্য হয়েছে। আর সেই কারণে আধুনিক কবির এই প্রাচীন রচনা কৃত্রিম, স্বতস্ফূর্তিহীন এবং নানা ত্রুটিতে পূর্ণও হয়েছে। কবি ঠিকই বলেছেন—'একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে।' আত্মসমালোচনায় কবি মর্মগত মেকিত্বের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ পদাবলীর রাধার অকৃত্রিম বিরহ ও আর্তি এখানে অবিদ্যমান। ঠিকই, কিন্তু তার পরিবর্তে কিশোর আধুনিক কবির স্বকীয় প্রকৃতি-সৌহার্দের সঙ্গে কল্পিত কোনো মানবী কিশোরীর মুগ্ধ ভাববিকাশের যে অস্ফুট চিত্রাঙ্কন লক্ষ্য করা যায় সে সম্বন্ধে আত্মসমালোচনায় তিনি নীরব থেকে গিয়েছেন দেখি। অর্থাৎ বৈষ্ণবীয়তায় কৃত্রিম হলেও মানবীয়তায় স্বাভাবিকই তাঁর পদাবলীতে আভাসিত হয়ে উঠেছে। উদাহরণ সহকারে বোঝালে এইটুকু বলা যায় যে—'বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন, বিফল রে এ মঝু দেহা' অথবা 'না যমুনা, সো এক শ্যাম মম, শ্যামক শত শত নারী; হ্ম যব যাওব শত শত রাধা চরণে রহব তাঁর' ইত্যাদি স্থলে বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসাদির অনুকরণ যদিও লক্ষ্য করা যায়, 'চকিত গহন নিশি, দূর দূর দিশি' অথবা 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ যামিনী রে' কিংবা 'তৃষিত নয়ানে বনপথপানে নিরখে

ব্যাকুলা বালা' অথবা 'আজু সখি মুহু মুহু গাহে পিক কুহু কুহু' 'শুনহ শুনহ বালিকা, রাখ কুসুম-মালিকা' প্রভৃতির মধ্যে কবি-বর্ণিত পূর্বেকার নলিনী-অনুরজার চিত্র এবং পরবর্তী কড়ি-ও-কোমলের যৌবনোচ্ছ্বাসের স্বকীয় সুরই অনুভবগম্য। বস্তুতঃ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী কবিমানসের সেই প্রবণতাই নির্দেশ করে যা কবি-প্রতিভার অপরিণতির কালে আত্মতৃপ্তির জন্য পূর্বতন কবিদের সৃষ্টির রাজ্যে পরিভ্রমণ করায়, সৌহার্দবশতঃ তাদের অল্প-বিস্তর অনুকরণে ও অনুসরণে প্রবৃত্ত করে। পরিণত কবিমানসে অবশ্য কোনো অনুসরণ স্পটতঃ লক্ষিত হয় না, তখন প্রাক্তন মহাকবিদের সৃষ্টির মধ্যে পরিভ্রমণের পর তাঁদের ভঙ্গি ও ভাব এমন সমন্বিত হয়ে পড়ে যে প্রকাশের মধ্যে তাদের চেনা যায় না। এইভাবে প্রাচীনের অভিব্যক্তি নবীনের মধ্যে জীবন্ত ও সার্থক হয়ে পড়ে। পরবর্তী 'কল্পনা' কাব্যের আলোচনার সময় আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃতি সহকারে উল্লেখ করব। আপাততঃ ভানুসিংহে সচেতন অনুকরণ-প্রয়াসের মধ্যে কবি-সৌহার্দের প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। তবু ভানুসিংহ ছদ্মবেশী হলেও তাঁর বেশ-বিন্যাসে বৈষ্ণব মহাজনদের অনুসরণ অসার্থক হয়নি। কল্পনাতিরেকময় রবীন্দ্রকাব্যের প্রাথমিক স্তরে বৈষ্ণব ভাষাভঙ্গি কবির আত্মপ্রকাশে সহায়তা করেছে। 'মানসী'র কোথাও অনুপ্রাসমধুর কোথাও বা ধ্বনিগৌরবশূন্য সহজ সরল রীতিই তার প্রমাণ। তাছাড়া যে-মাত্রাবৃত্ত অর্থাৎ যৌগিক-দ্বিমাত্রিক ছন্দে কবির সিদ্ধি এত প্রখ্যাত, তার অভ্যাসের ভূমিকা রচনা করেছে এই ভানুসিংহ।

পরবর্তী কড়ি-ও-কোমল ও মানসী'র কয়েকটি কবিতায় ও গানে প্রত্যক্ষ-ভাবে পদাবলীর সুর আমরা শুনতে পাই। কবির অনির্দেশ্য বেদনা ও আকাশবিহারী কল্পনাতেও পদাবলী তার ভাষা ও ভঙ্গি দান করেছে। বস্তুতঃ কবির আত্মলীনতা পদাবলীর সগোত্র ব'লেই এবং এযাবৎ পদাবলীর ভাষা উত্তম গীতিকাব্যের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায় সন্ধ্যাসংগীতের 'চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া' ও ছবি-ও-গানের 'কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া' থেকে আরম্ভ ক'রে মানসীর 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল' পর্যন্ত সবই গোপনে পদাবলীর ভাষা।

সন্ধ্যাসংগীতের অস্পষ্টতা, প্রভাতসংগীতের স্বচ্ছতা প্রভৃতি কোনো কোনো পূর্বসূরীর আলোচনার বিষয় হ'লেও আমরা মনে করি, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের সূত্রে এদের আণবিক মূল্য মাত্র স্বীকার্য—তাও যেমন কাব্যোপযোগী সাবলীল ভাষা গঠনের দিক থেকে, তেমন আন্তর ধর্মের দিক থেকে নয়। সুতরাং এদের সম্পর্কে আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের পর থেকে ধৈর্যশীল বুদ্ধিজীবী গবেষক ছাড়া, রসিক থেকে সাধারণ স্তর পর্যন্ত সকলের কাছে এদের মূল্য অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ

'মানসী' থেকেই যথার্থ রবীন্দ্র-কাব্যের আরম্ভ, মানসী থেকেই এই অসামান্য কবির অসামান্যতার লক্ষণগুলি সুপ্রকাশ। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে মানসীর সব কবিতাই কড়ি-ও-কোমলের নবশৃঙ্গারময় অপূর্ব-সুন্দর সনেট-গুলি থেকে উৎকৃষ্টতর রচনা। রবীন্দ্র-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই মানসীর কতকগুলি কবিতা স্মরণীয়। মানসীতে যা অনায়াসেই লভ্য, মানসী-পূর্ব কড়ি-ও-কোমলে অনুসন্ধান করলেও তা অবিদ্যমান দেখা যায়। এই কারণে স্বয়ং কবিও মানসী থেকেই তাঁর কাব্য-পর্যায়ের আরম্ভ ব'লে মনে করেন। তথাপি 'কড়ি-ও-কোমল' আমরা একটু বিস্তৃতির সঙ্গেই আলোচনা করব, কারণ, কবিত্বের দিক থেকে অসামান্য এই রচনাটি রবীন্দ্র-কাব্য-নন্দনলোকের প্রবেশদ্বারের সমীপে বিদ্যমান।

'কড়ি-ও-কোমল' যৌবনারম্ভের কাব্য। যদিও প্রথম যৌবনের কাব্য ব'লে রচনার কোনো সাধারণ লক্ষণ নেই, কারণ, কীট্‌স ঐ বয়সেই প্রৌঢ়কাব্য রচনা ক'রে গেছেন এবং শ্রীমৎশংকরাচার্য যৌবনেই জরাহীন বার্ধক্যের অধিকারী হয়েছিলেন, তথাপি ঐ কাব্যের অন্তর্গত লঘু উচ্ছ্বাসময়তা ও প্রণয়-স্বপ্না-বেশকে লক্ষ্য ক'রে যৌবনধর্মের সঙ্গে কবির অনুভূতির সহজ সম্পর্ক দেখানো যেতে পারে। কড়ি-ও-কোমলের আলোচনায় এতে কী আছে শুধু তা দেখলেই এর মর্ম সম্যক্ উপলব্ধি করা যাবে না, এতে কী নেই তা-ও বুঝতে হবে, কারণ এই কাব্যটিকে, রবীন্দ্রস্বভাবে যা প্রত্যাশিত, তার অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কেউ কেউ সম্মানিত করেছেন।

একদিক থেকে কড়ি-ও-কোমল অব্যবহিতপূর্ব রচনা প্রভাতসংগীত ও ছবি-ও-গান থেকে শুধু অগ্রসরই নয়, স্বতন্ত্র। এখানে মানব-হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ আছে, বিরহের দীর্ঘশ্বাস ও মিলনের মোহ আছে, যৌবনের স্বপ্ন-বিহ্বলতা ও আবেশ আছে, অর্থহীন প্রলাপ নেই, অনুভূতির অস্পষ্টতা নেই। সর্বোপরি ভাষা ও ভঙ্গির অ-পূর্বদৃষ্ট পূর্ণতা আছে। কড়ি-ও-কোমলের পূর্বেকার রচনায় এমন কয়েকটিও পঙ্‌ক্তি নেই যা নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। মোটের উপর, কড়ি-ও-কোমল রূপ-রসাদিময় অপরূপ কাব্য হয়েছে, পূর্বেকার রচনা তা হয়নি। আর এমনও বলা যেতে পারে যে কবির অন্য সব রচনা বিলুপ্ত হয়ে যদি এই কাব্যখানিই থেকে যায় তা হ'লেও প্রণয়-স্বপ্নের দিক থেকে তিনি একজন ভালো অন্তর্মুখ কবি ব'লেই জীবিত থাকবেন। এই কাব্য সাধারণ্যে প্রকাশিত হ'লে যে সমালোচনার সূচনা হয়েছিল, কবি তার যথার্থ কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন—'এই রীতির কবিতা

তখনো প্রচলিত ছিল না' (রচনাবলী, কবির মন্তব্য)। রীতি বলতে এখানে কবি-সমালোচক কেবলমাত্র আখ্যান-কাব্যের বিপরীতমুখী গীতি-ধর্ম-প্রবণতাকেই বোঝাচ্ছেন না, সেই সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত দেহ ও মনের বিচিত্র সুখ-দুঃখাদি বিষয়ক স্বপ্নময় অনুভূতির প্রকাশেরও ইঙ্গিত দিচ্ছেন। খাঁটি লিরিক-কবিতার ক্ষেত্রে বিহারীলালের প্রকাশ ইতিপূর্বেই সিদ্ধ হ'লেও (সারদামঙ্গল, 'আর্যদর্শন' পত্রিকা, ১৮৭৪) তাঁর কাব্যের বক্তব্য অস্পষ্ট ও ভাবালু, ক্বচিৎ মৌখিক ভাষাভঙ্গিতে অ-রমণীয় এবং নিতান্ত অন্তর্মুখ, একলা তাঁরই কল্পলোকের ব্যাপার ছিল। অথচ এই যুবক কবির স্বপ্নময়তা পার্থিব বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঐভাবে আদর্শায়িত করেনি ব'লে সহজেই তা সমালোচনার যোগ্য হয়েছিল; দেহ ও মনের বিচিত্র বাসনা নিয়ে 'বেআইনী প্রমত্ততা' স্বাভাবিকভাবেই কটাক্ষ-ভাজন হয়েছিল।

কড়ি-ও-কোমলের কবিতাগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত ক'রে দেখলে অসংগত হবে না। প্রথম, বাইরের মানুষের সুখদুঃখাদি হৃদয়ভাব সম্পর্কে; এই শ্রেণীতে পড়ে মোটামুটি—পুরাতন, নূতন, যোগিয়া কাঙালিনী, ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি, মথুরায়, বনের ছায়া, কোথায়, শান্তি, পাষাণী মা, বিরহীর পত্র, মঙ্গলগীত প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতায় কবির বস্তুহীন নিরাকার যৌবনস্বপ্নাবেশের পরিচয় অভিব্যক্ত। সারাবেলা, আকাঙ্ক্ষা, তুমি, যৌবনস্বপ্ন এবং এরই বিস্তাররূপে প্রেমকেন্দ্রিক সৌন্দর্য-বাসনাশ্রিত চুম্বন, বাহু, চরণ, দেহের মিলন, তনু, স্মৃতি প্রভৃতি সনেটগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। তৃতীয় পর্যায়ে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তির একটা অভিলাষ এবং প্রকৃতির বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে স্বানুভূতির প্রকাশচেষ্টা রূপায়িত হয়েছে। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সনেটগুলিতে বন্ধনের মধ্যে অবন্ধন-রূপে গীতিকবি-হৃদয় সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। রূপ এবং রসের, অনুভূতি ও তার প্রকাশের, আলংকারিক অভিমতে শব্দার্থের বক্রোক্তিময় একান্ত মিলন সর্বপ্রথম এই স্তরের কবিতাগুলিতেই পরিস্ফুট হয়েছে। পূর্বেকার কোনো রচনাতেই এহেন কবিকৃতি লক্ষ্য করা যায় না। তাই 'কড়ি-ও-কোমল' যথার্থ কাব্য, পূর্বেকার রচনা অর্থনির্ভর চিত্রকাব্যের সগোত্র।

কড়ি-ও-কোমলে ভাষাকে আধুনিক গীতিকাব্যের অনুভূতিশীলতার যোগ্য বাহকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কবিকে অজ্ঞাতসারে কখনো বৈষ্ণব কবিদের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে, কখনো ক্ষীণভাবে কোনো সংস্কৃত কবির, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহস অবলম্বন ক'রে অর্থ ও অলংকারের প্রচলিত যুক্তি-মত্তাকে অগ্রাহ্য ক'রে ভাষা তাঁকে স্বয়ং গঠন করতে হয়েছে। 'নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুল নয়ন রে' এবং 'এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াসা কেমনে আছে সে পাসরি, সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী, সেথা কি বাজে না

বাঁশরি' এবং 'শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে' প্রভৃতি কবিতার ভাষায় পদাবলীর ছায়াপাত অবশ্যই লক্ষণীয়। আবার 'সন্ধ্যার বিদায়' কবিতার—'যেতে যেতে কনক-আঁচল বেধে যায় বকুলকাননে' 'গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে' 'নিশীথিনী রহিল জাগিয়া বদন ঢাকিয়া এলোচুলে' অথবা, 'স্মৃতি' কবিতার 'কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা, কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ'—প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভাষার সঙ্গে সহজ-আগত আলংকারিকতা ও প্রাচীন-অনুগত চিত্রের অনুসরণও অবহেলার যোগ্য নয়। কিন্তু নিম্নলিখিতরূপ উদাহরণে কবির বক্র ভাষা ও ইমেজ গঠনের সাহসিক প্রচেষ্টা সুনিশ্চিতভাবে স্মরণীয় হয়েছে—

ঝরে আলোকের কণা, রবি শশী তারা,
ঝরে প্রাণ, ঝরে গান. ঝরে প্রেমধারা। (সিন্ধুগর্ভ)
গভীর তিমির-স্নিগ্ধ শান্তির পাথার
নিবায়ে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া (অস্তমান রবি)
হোথায় কি বিস্মরণ নিঃস্বপ্ন নিদ্রার
শয়ন রচিয়া দিবে ঝরা ফুলদলে। (বৈতরণী)
দেখো ঐ দূর হতে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপ-শিখা
দহিবে আঁধার-নিদ্রা বিমল অনলে। (মরীচিকা)

কেবল বিষয়বস্তু নয়, লিরিক-কবির ভাষার বেআইনীও তৎকালীন দিঙ্‌নাগদের অসহনীয় ছিল; তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে, ভাষাকে যিনি বহুবিচিত্র 'অনর্পিতচরী' ভাবনা ও অতীন্দ্রিয় কল্পনার বাহন ক'রে গৌরবান্বিত করতে চান, তিনি ভাষার অনুবর্তী হবেন না, ভাষাকেই তাঁর বশ্যা হতে হবে। বলা বাহুল্য, ভাষা ও ভঙ্গীর প্রয়োজন-অনুরূপ যথেচ্ছ পরিবর্তন মানসীতে আরো প্রকট এবং এর পর কিছুকাল যাবৎ কাব্যরাজ্যের এই 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' ভাষাকে স্ববশে আনবার প্রত্যক্ষ চেষ্টা থেকে বিরত হ'লেও 'কল্পনা' রচনার সময়ে ভাষার শক্তি যে নূতনভাবে পরীক্ষা করেছেন তা রবীন্দ্র-রসিকের বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য হয়েছে এবং পরে আমরাও তার আলোচনায় সাধ্যমত প্রয়াসী হয়েছি।

কড়ি-ও-কোমলের কয়েকটি কবিতায় আধুনিক কবিহৃদয়ের অ-সম্যগ্‌-জ্ঞাত, আলো-অন্ধকারের মধ্যবর্তী সুদূর কল্পলোকের প্রতি অনুরাগ ও সেই সঙ্গে বেদনাময়তার প্রতিফলন ঘটেছে। একদিকে মদির স্বপ্নবিহ্বলতা, আবেগময় উচ্ছ্বাস এবং সম্ভব-অসম্ভবের সীমা বিলুপ্ত ক'রে কল্পলোকে ধাবমান হওয়া, কখনো-বা মানবলোকে বিচরণের অভিলাষ, আর একদিকে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে শৃঙ্খলমোচনের আগ্রহ, সকলে মিলে এই কাব্যটিকে সর্বাঙ্গ-

সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক কাব্য ক'রে গ'ড়ে তুলেছে। এই কল্পনাময়তার সহজ ও বিশুদ্ধ উদাহরণ 'উপকথা' কবিতাটি। এর সঙ্গে কল্পনার 'প্রকাশ' কবিতা তুলনার যোগ্য এবং 'মেঘরাজ্যে'র পটভূমিকার সঙ্গে পরবর্তী 'মেঘদূত' 'সোনার-তরী' প্রভৃতির সুদূর সঞ্চরণ একত্র আলোচ্য।

এর আদিরসাত্মক সনেটগুলির মধ্যে কবির সৌন্দর্যস্বপ্নাবেশের যে আশ্চর্য সহজ ও সীমিত প্রকাশ ঘটেছে তার তুলনা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংগীত ছাড়া অন্যত্র বিরল। চুম্বন, চরণ, তনু, হৃদয়-আকাশ, নিদ্রিতার চিত্র এই শ্রেণীর অন্যতম। এগুলিতে স্থূল যৌনবাসনাকে অতিক্রম ক'রে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের মায়ারাজ্য নির্মাণ করা হয়েছে। নারীর রূপ-কে আশ্রয় করা হয়েছে ব'লেই কবির নিন্দাবাদ ক'রে এককালে আমরা অরসিকত্বের পরিচয় দিয়েছি। কবি কল্পনামূলক অতিশয়ের সাহায্যে বাস্তবের রূঢ়তাকে দলিত ক'রে যথার্থ আর্টের রাজ্যেই আমাদের আমন্ত্রণ করেছেন। যেমন, চুম্বনের অপার্থিব রম্যানুভব নির্দেশ করতে গিয়ে—

গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সংগমে।...
দুখানি অধর হতে কুসুম-চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।

অথবা 'চরণে'র সৌন্দর্যসার ব্যক্ত করতে গিয়ে ভাষা খুঁজে না পেয়ে কবি অতিশয়ের সমাহার করতে বাধ্য হচ্ছেন—

শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শত লক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপন।
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্যলোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণছায়ায়।...

রবীন্দ্রের বিশুদ্ধ কবিত্ব এবং কলাকৈবল্যপ্রীতির স্মরণযোগ্য পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর 'কল্পনা-মধুপ' সনেটটির মধ্যে। বস্তুতঃ যথার্থ কবির যে-কোন সৃষ্টিই এক দিক থেকে প্রয়োজনসম্পর্কহীন ব'লে অভিহিত হতে পারে, তবে রবীন্দ্র-স্বপ্ন-প্রবণতায় বাস্তবের রূঢ়তা থেকে উত্তরণ যেন খুব অনায়াসেই ঘটতে পেরেছে। সুতরাং ঐ সনেটের শেষাংশ রবীন্দ্রকাব্যপাঠকের পক্ষে স্মরণীয় এমন বলা যায়—

কুসুমদলের বেড়া, তারি মাঝে ছায়া,
সেথা বসে করি আমি কল্পমধু পান;
বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া,

তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান ;
রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি,
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী ॥

আদ্যন্ত প্রসারিত এই নিতান্ত কাব্যিক প্রবৃত্তির জন্যও রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনেকেরই এত প্রিয় কবি।

কড়ি-ও-কোমল এই রকম উচ্চস্তরের কাব্যলক্ষণযুক্ত হ'লেও রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এর মধ্যে পাওয়া যায় না। যে-প্রকৃতি-প্রীতি রহস্যময় বিশ্বাত্মবোধে পরিণতিলাভ করেছে তা এখানে নেই। নিসর্গ সম্পর্কে এখানে কবির স্বতন্ত্র কোনো মনোভাবই যেন নেই, নিসর্গ গৌণ-ভাবে কবির বিভিন্ন অনুভূতির জাগরণের সহায়ক-মাত্র হয়েছে। 'বনের ছায়া' কবিতাটিতে নাগরিক জীবনের প্রতি আস্থাহীন ও গ্রামজীবন-পক্ষপাতী বিহারীলালের সদৃশ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। অন্যত্র ('খেলা' কবিতায়)—

মাঠের থেকে বাহুর আসে, দেখে নূতন লোক,
ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে ড্যাবা ড্যাবা চোখ।
কাঠবিড়ালী উসুখুসু আশেপাশে ছোটে···

প্রভৃতির মধ্যে বিহারীলালের অনুকরণ স্পষ্টতর। আবার,

আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়—

প্রভৃতিতে নিসর্গ শুধু কবিহৃদয়ের রোম্যান্টিক্ অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা ও উদাসীনতার উৎসমাত্র হয়েছে। ঐ ব্যাকুলতা জাগানোর জন্যই যেন নিসর্গের বর্ণিত পরিবেশগুলির প্রয়োজন,· নতুবা নিসর্গ স্বকীয় গৌরবের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল নয়, কতকটা কবি-কালিদাসের ঋতুসংহারে বর্ণিত নিসর্গের মত।* অথচ মানসীর 'প্রকৃতির প্রতি' 'কুহুতান' প্রভৃতি কবিতার প্রকৃতি-সাহচর্য-বাসনা কেমন প্রত্যক্ষ ও গভীর। যে অনির্দেশ্য সৌন্দর্যব্যাকুলতা মানসীর 'মেঘদূত' ও সম্ভবতঃ অস্ফুটভাবে 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতার জন্ম দিয়েছে এবং যা কবির কাব্যজীবনের বিকাশের মধ্যে একটি স্থির সৌন্দর্যসাধনার রূপ পরিগ্রহ করেছে, কড়ি-ও-কোমলে তার স্পর্শও অলভ্য। 'যৌবন-স্বপ্ন' ও 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় প্রত্যক্ষের অতীত ছায়ালোকবাসিনী অচেনা বিদেশিনীর পদধ্বনি শোনা গেলেও তা কবির বিশিষ্ট সৌন্দর্যরসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি। এই অনির্দেশ্য রোম্যান্টিক্ ব্যাকুলতা মানসীতেও আছে (বিরহানন্দ, ভুলে, ভুলভাঙা প্রভৃতি দ্রঃ), কিন্তু তা ধীরে ধীরে সৌন্দর্য-ব্যাকুলতায়

* তু°—'প্রোৎকণ্ঠয়ত্যুপবনানি মনাংসি' 'সৈকতিনী বনস্থলী সমুৎসুকত্বং প্রকরোতি চেতসঃ' ইত্যাদি।

রূপান্তরিত হয়েছে। ঐ সৌন্দর্যে রূপান্তরের পূর্বাবস্থাই মানসীর উল্লিখিত কবিতাগুলির মতো এখানেও নিম্নে-উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে সূচিত হয়েছে—

প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ,
সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে।
যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ,
শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।······
যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

অথবা—

কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।

এরপর থেকে যে সৌন্দর্যকল্পনার বস্তুকে কবি 'তুমি' অথবা 'কে' অথবা 'বিদেশিনী' ব'লে আহ্বান করতে আরম্ভ করলেন,† সে-নারী যে কবির অনতি-পরিস্ফুট রোম্যান্টিক্ ব্যাকুলতা থেকেই মূর্তি পরিগ্রহ করেছে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

সোনার তরী এবং চিত্রার আলোচনাকালে দেখতে পাব কবির মানবপ্রীতি কত ব্যাপক এবং গভীর, এবং তার কারণ হ'ল এর বিশিষ্ট-কল্পনাশ্রয়ী বিশ্বাত্মবোধের ভিত্তি। কবি বিশ্বকে যে-মুহূর্তে একটি অন্য-নিরপেক্ষ পৃথক্ সত্তা, জন্ম-জন্মান্তরের পুরাতন বাসগৃহ ব'লে কল্পনা করলেন সেই মুহূর্তেই এই মানবপ্রীতির আরম্ভ হ'ল। এর পূর্বে অর্থাৎ মানসী এবং কড়ি-ও-কোমলে মানুষের সুখদুঃখ সম্বন্ধে কবিতা আছে এবং জীবনের প্রতি কবির সাধারণ অনুরাগ রয়েছে, মাত্র এইটুকু জানা যায়। অর্থাৎ মানসীর 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' 'গুপ্তপ্রেম', কড়ি-ও-কোমলের 'কাঙালিনী' প্রভৃতি কবিতায় বাহিরের মানুষের আশা, বাসনা, সুখদুঃখের প্রতি কবির সমবেদনা মাত্র প্রাপ্তব্য, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। যে-গভীর আত্মীয়তাসূত্রে কবি প্রকৃতির তথা মানুষের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ব'লে কল্পনা করেছেন ('বসুন্ধরা' দ্রঃ) তার প্রকাশ মানসী এবং কড়ি-ও-কোমলে নেই। যদিও মানসীর 'অহল্যা' কবিতাটিতেই কবির পৃথিবীপ্রীতিমূলক জন্মান্তরীণ ব্যাকুলতার আবির্ভাব, তথাপি তার সঙ্গে সুগভীর মর্তপ্রীতি ও মানবপ্রীতি যুক্ত হয়েছে আরও পরে। প্রশ্ন হতে পারে—তাহ'লে কড়ি-ও-কোমলের মুদ্রিত প্রথম সুবিখ্যাত কবিতাটি—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। —ইত্যাদি

† তু° সোনারতরী—'কে গো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে

কবির প্রাণের যে-কথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে উচ্চারণ করছে তা কি মানবপ্রীতি নয়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে এ-মানবপ্রীতি প্রায় সর্বকবিসুলভ সাধারণ বস্তু। সোনারতরী-চিত্রা-পর্যায়ের সুদৃঢ় বিশ্বাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত অনন্যসাধারণ মানবপ্রীতি নয়। এ মানবপ্রীতির কথা যেন যে-কোনো কবিই বলতে পারতেন এবং অনেকে বলেছেনও। এই মানবানুরাগ কতকটা আমাদের সাহিত্যের humanism বলা যায়; ধর্ম নয়, অলীক কল্পনাও নয়, মানুষের কথা। কবি তাঁর মন্তব্যে (রচনাবলী দ্রঃ) এমন কথা বলেন নি যে, এই হ'ল কড়ি-ও-কোমল কাব্যের কেন্দ্রবর্তী সুর বা একমাত্র ধুয়া। কবিবন্ধু আশুতোষ চৌধুরী কাব্যটির প্রকাশনার সময় তাঁর পছন্দমত এই কবিতাটিকে যে প্রারম্ভে স্থাপন করেছিলেন তার একটা কারণ এই হতে পারে যে, প্রত্যক্ষ মানুষের সুখদুঃখের কথা কবির পূর্বেকার কোনো রচনার যথার্থ-ভাবে বিষয়ীভূত হয়নি। প্রভাতসংগীতের 'জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি' প্রভৃতির অস্পষ্ট ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে এই কাব্যেই বিষয় হিসাবে মানুষের আত্মকথা অবলম্বিত হ'ল। তা ছাড়া সমস্ত কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট উপলব্ধ হবে যে, এখানে মানুষের সঙ্গে কবির আত্মিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা গৌণ, মুখ্য হচ্ছে কাব্যরচনার দ্বারা মানুষের প্রীতির মধ্যে বেঁচে থাকার অভিলাষ। মানুষ কবিকে প্রীতির সঙ্গে বরণ করবে বা মানুষের স্নেহ-ভালোবাসার মধ্যেই তাঁর জীবন কাটবে, এমনতর সাধারণ অভিলাষই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। এই কবিতাটি সম্ভবতঃ কড়ি-ও-কোমলের তৃতীয় পর্যায়ের— প্রণয়কেন্দ্রিক স্বপ্নবিহ্বলতা থেকে নৈরাশ্যময় মুক্তির অবসরে রচিত। 'মরীচিকা' কবিতাটিতে এই অপসরণের প্রত্যক্ষ উদাহরণও রয়েছে—

> এস, ছেড়ে এস, সখী, কুসুম-শয়ন!……
> চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
> সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
> হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
> সংসার-সংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।

এই পর্যায়ে কবির এই শ্রান্তি ও ভোগবিরতির আগ্রহ অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। যদিও একথা ঠিক যে বিলাস-বিরতির অন্তরালে অন্তরঙ্গভাবে বিলাসস্বপ্নের চিত্রই ফুটেছে ভাল। তবু বহিরঙ্গ হলেও ভাব বা বস্তুর দিক থেকে স্বপ্নত্যাগের একটা ইচ্ছা রয়েছে এমন বলা যায়। এর কারণ কি? আমাদের মনে হয় এর একটা কারণ তাঁর এ যুগের কবিমানসের একটা সদাচঞ্চল দ্বৈধ। এবং আর একটা হ'ল যুগোচিত মহাকবি হিসেবে তাঁর সামাজিক ব্যক্তিসত্তার কাছে সংকীর্ণ ব্যক্তিসত্তার আত্মসমর্পণের আগ্রহ। দেখা যায়, তিনি কল্পনায় অনির্দেশের সন্ধানেও ধাবিত হয়েছেন, আবার কল্পনায় মর্তের

মাটিতেও ফিরে এসেছেন, কর্মময় বন্ধুর সামাজিক জীবনকে গ্রহণ করেছেন, আবার কর্মবৈরাগ্যের দিকেও আকৃষ্ট হয়েছেন (বিশেষভাবে 'চিত্রা' ও 'কল্পনা' দ্রঃ)। এখানেও বিশ্ববিহীন কল্পনারাজ্য ও স্বপ্নালুতা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিহত হতে চেয়েছে কিছুদিন পরেই। আর সম্ভবতঃ ভাববাদীত্বের জন্যও কামনার ও দেহাত্মিকতার আধিক্য থেকে তিনি কবিতাকে ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে চান। ফলতঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের স্বপ্নকেন্দ্রিকতা ও বাসনানুরাগ (বাহু, চুম্বন প্রভৃতি কবিতা দ্রঃ) হয়ত বা সহজেই কবিকে শীঘ্র মুক্তি দিয়েছে। পরবর্তী মানসীর 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় এই বাসনা-উত্তরণের দিকটি পরিস্ফুট সৌন্দর্য-প্রেরণার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতঃ এখানকার 'ক্ষুদ্র আমি', 'আত্ম-অপমান' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় স্পষ্টভাবে বাসনাময় অহং-এর জন্যে কবি আক্ষেপ করেছেন ও এর হাত থেকে পরিত্রাণ চেয়েছেন—

ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার,
শীর্ণ বাহু—আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
করিছে আমারে হায় অস্থিচর্মসার।

সমকালীন রচনা 'রাজা ও রানী' নাট্যকাব্যেও এই বাসনা-উত্তরণের ছবি ফুটে উঠেছে। বিক্রমের বাসনাময় আত্মকেন্দ্রিকতা তিরস্কৃত হ'ল, ক্ষুধার অগ্নি রাজ্য গ্রাস ক'রে ক্ষুধার বস্তুকেও বিনষ্ট করলে। ইতিহাসকল্প কাহিনীর উপর ভিত্তি ক'রে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম, সরোজিনী প্রভৃতি নাটকের (মেলোড্রামার) প্রযুক্তির অনুসরণে এই নাট্যকাব্যখানি রচিত হ'লেও কবির অজ্ঞাতসারেই এই সময়কার আত্মসুখ-বিমুখ মনোভাব এতে আরোপিত বাস্তব আধারে প্রকাশ লাভ করেছে। 'বিসর্জন' নাটকেও অহংএর উগ্রতার উপর যে-প্রেম জয়ী হ'ল তাতে এই সামাজিক ভাবই ভিন্ন আকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। 'বিসর্জনে'র ভিত্তিস্থানীয় রাজর্ষি উপন্যাসে এবং কিছু পরিমাণে বৌ-ঠাকুরানীর হাটেও ঐ প্রেরণাই ভিন্নভাবে কাজ করেছে। স্বার্থময় বাসনা থেকে মুক্ত সর্বজনীন মানবিকতার রাজ্যে বিচরণের এই স্পৃহাও একালের রবীন্দ্র-কবিমানসের একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন সৌন্দর্যে তেমন প্রেমে কয়েকটি ক্ষেত্রেই কবি এই সামাজিক মনোভাবের বশবর্তী হয়েছেন। অবশ্য এই মনোভাব প্রবল হয়ে যেখানে আদর্শবোধে দাঁড়িয়েছে সে-স্থান যে কাব্যাংশে খুব সংগতিপূর্ণ হয়েছে এমন বলা যায় না। কালিদাসের প্রেমকাব্যের ব্যাখ্যায় কবি প্রেমসম্পর্কে একটি আদর্শমূলক স্থির ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। কতকটা এই আদর্শানুরাগের আশ্রয়ে 'রাজা ও রানী' সংশোধিত হয়ে বহু পরে 'তপতী'র রূপ পরিগ্রহ করেছে। এক্ষেত্রে পাঠক ও দর্শকের চিত্তে সহজেই এরকম প্রশ্নের উদয় হয় যে সুমিত্রা ও বিক্রমের দ্বান্দ্বিক মনোভাব খুব স্বাভাবিক হয়েছে কি না।

কড়ি-ও-কোমলের এই শৃঙ্গারস্বপ্নাবেশ থেকে উত্তরণের অনুভূতির মধ্যে দু-একটি এমন কবিতা আছে যাতে মৃত্যু, জীবন ও প্রেম সম্পর্কে কবির চিন্তাশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি তাঁর মন্তব্যে বলেছেন 'যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব।' বধূঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু কবিকে যে কী পরিমাণ বিচলিত করেছিল তার বিশেষ পরিচয় এ-কাব্যে না পাওয়া গেলেও আভাস আছে এবং সে-কথা মনে রেখেই কবি উক্তরূপ মন্তব্য করেছেন। 'চিরদিন' শীর্ষক চারটি কবিতায়, বিশেষতঃ তিন সংখ্যক কবিতায় যদিও উক্ত ভাবের প্রকাশ, তথাপি এর সঙ্গে কোথায়, বিরহ, বিরহীর পত্র, মৃত্যু সম্পর্কিত বিলাপ প্রভৃতি কবিতাগুলিও একত্র দ্রষ্টব্য। উক্ত চিরদিন-শীর্ষক তৃতীয় কবিতাটিতে মায়াবাদ সম্পর্কে কবির সংশয় প্রকাশিত হয়েছে—'তাই কি ? সকলি ছায়া ? আসে থাকে আর মিলে যায় ?' সোনার-তরীতেই আমরা দেখতে পাব এই সংশয়ের নিরসন হয়েছে এবং কবি মর্ত্য-প্রেমের ধ্রুবত্ব ও সত্যতা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ধারণায় উপনীত হয়েছেন।

কড়ি-ও-কোমলের এই অস্তি-নাস্তির মধ্যে পরবর্তী কাব্যের মূল প্রেরণা-রূপে যদি কিছু আমাদের রসলোকেব গোচর হয় তা ঐ অপরিস্ফুট রোম্যাণ্টিক্ কল্পনাবিহ্বলতা ; মানসীর প্রথমের দিকের কয়েকটি কবিতার অনির্দেয় ব্যাকুলতার মূলেও সূক্ষ্মভাবে এই রোম্যাণ্টিক মনোধর্মেরই অনুবর্তন রয়েছে। পরে আমরা দেখতে পাব, এই বিহ্বল ভাবাকুলতাই সৌন্দর্য-প্রেরণামূলক তথা বিশ্বানুভূতিমূলক কবিতাগুলির মধ্যে পরিস্ফুটভাবে উৎসারিত হয়েছে ; বিশ্বের বাইরের প্রাণচঞ্চলতার উৎসরূপে একটি সর্বব্যাপী মৃত্তিকাময়ী মাতৃসত্তার সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা কবিকে অধীর করেছে, কখনো প্রবল আত্মবিলোপ-বাসনা জাগ্রত করেছে ; তারপরে স্বীয় ব্যক্তিত্বের অন্তরশায়ী নৈসর্গিক চালকশক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিস্ময়ে বিহ্বল করেছে এবং পরিশেষে রূপলোকের অন্তরালে অবস্থিত রসানুগত সুদূর অরূপের অনুসন্ধানে প্রলুব্ধ করেছে। এই অনির্বাচ্য অনির্দেয়-স্বরূপ রোম্যাণ্টিক্ অনুভূতির একটি বিশেষ রাবীন্দ্রিক ভাব 'মানসী' থেকেই স্বপ্রকাশ, কড়ি-ও-কোমলে তার সাধারণ ও আদিম রূপ 'আজি শরত-তপনে' এবং 'আমার যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে গেছে' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় পাওয়া যায়, এবং ঐগুলিই এ-কাব্যের কেন্দ্রীয় কবিতা, অপরিণত মানবপ্রীতি বা মানুষী সুখদুঃখের কবিতাগুলি নয়। অবশ্য প্রেমের বিচিত্র প্রসাধন এবং দেহসৌন্দর্য বিষয়ক সনেটগুলির যে স্বতন্ত্র এবং উন্নত কাব্যমূল্য রয়েছে সেকথা পূর্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রতিভার উন্মেষ

'মানসী' ও 'সোনার তরী'

কড়ি-ও-কোমলের কবিতাগুলির রচনাকাল সন ১২৯১-৯৩ ; তারপর প্রায় চার বৎসরের রচনা মানসীর পর্যায়ভুক্ত। অতিবিশাল রবীন্দ্রকাব্যের পৌর্বা-পর্য বিচার ক'রে এবং একটি নির্দিষ্ট ধারায় তাঁর প্রতিভার ক্রমপরিণাম লক্ষ্য ক'রে মানসী-শেষ থেকেই ঐ বিশিষ্ট প্রতিভার উন্মেষ ব'লে মনে করা যায়।

কড়ি-ও-কোমলের পূর্বেকার রচনা অতিক্রম ক'রে কড়ি-ও-কোমলে এসে পেঁছালে যেমন কাব্যের উত্তাপ ও আলোক অনুভব করা যায়, তেমনি কড়ি-ও-কোমল থেকে মানসীতে এসে একটা উদার উন্মুক্ততা ও কল্পনার অকৃত্রিম বিশালতা উপলব্ধ হয়। কড়ি-ও-কোমলে কোথাও কোথাও ভাষার মধ্যে আড়ষ্টতা আছে, ভঙ্গিতে দুর্বলতা আছে, কোথাও ছন্দোবন্ধে ত্রুটিও লক্ষণীয় ; অপরপক্ষে মানসীতে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি যেন আপনা থেকেই রস-মূর্তি লাভ করেছে ; মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ও অশিথিলবন্ধ রীতিনৈপুণ্যে ভাষা মানবীয় সাধারণ দুঃখসুখের বিবৃতি-ক্ষমতা-মাত্র অতিক্রম ক'রে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার সামর্থ্য লাভ করেছে। উচ্ছ্বাসময়তা থেকে মুক্তি লাভ ক'রে রূপ ও রসের প্রগাঢ়ত্বের মধ্যে মানসীর কয়েকটি কবিতা যেমন অপরূপ প্রসন্নতা লাভ করেছে, কড়ি-ও-কোমলে সর্বত্র তেমন দেখা যায় না। কিন্তু কড়ি-ও-কোমলের অপূর্ণতার পূর্তিতেই মানসীর প্রতিষ্ঠা নয়, ভিন্নত্বেই এর গৌরব। যদিচ এমন কথা মনে করা অসংগত হবে না যে, কড়ি-ও-কোমলের উল্লিখিত দু-একটি কবিতায় দৃষ্ট রোম্যান্টিক্‌ মনোভাব মানসীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়েছে, তথাপি এই বিশেষত্বটুকুও উপলব্ধি না করলে চলবে না যে, কড়ি-ও-কোমলের বিদেহী অস্পষ্ট ব্যাকুলতা এখানে বিশেষ ভঙ্গিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—'airy nothing' পেয়েছে 'a local habitation and a name' ; তাই নামরূপের দ্বারা চিহ্নিত অভিব্যক্ত-স্বরূপ সবল রোম্যান্টিকতা মানসীকে একটি অপূর্বত্বের দ্বারা মণ্ডিত করেছে। এই অপূর্বতা মোটামুটি তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে অনুভবগম্য। প্রথমতঃ এর সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা ও কাম-মালিন্যহীন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ('নিষ্ফল কামনা' 'সুরদাসের প্রার্থনা' ও 'মেঘদূত' কবিতা), দ্বিতীয়তঃ এর বিশ্বাত্মবোধের ব্যাকুলতা ('অহল্যার প্রতি'), তৃতীয়তঃ এর নিগূঢ় প্রকৃতিপ্রীতি।

মুখবন্ধের 'উপহার' কবিতায় ('নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে জগতের তরঙ্গ-আঘাত' ইত্যাদি) কবি সাধারণভাবে কাব্য-রচনার মর্মগত কবি-মানস সম্পর্কে একটা অনুভব ব্যক্ত করেছেন ; অতিরিক্ত সৌন্দর্যস্পৃহা বা

বিশ্বের জীবনস্পন্দনের লীলার সঙ্গে অন্তরাত্মার মিলনের আগ্রহ সম্পর্কে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি। ব্যাখ্যার মধ্যে তা ধরা পড়ে কিনা এই কবিতাটি পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। কবি বলছেন, জগতের নানান্ রূপ ও ঘটনা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যস্থতায় মনে প্রবেশ ক'রে তাঁর মনকে ব্যাকুল ক'রে তুলছে। এই ব্যাকুলতার অভিজ্ঞতা অর্থাৎ রসানুভব হ'ল অসীম—যাকে নামরূপের মধ্যে ধরা যায় না। অথচ কবির কাজ হ'ল 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে' অর্থাৎ কবিহৃদয়ের সহানুভূতি অর্পণ ক'রে তাকে 'বিভাবিত' ক'রে, ধরা-ছোঁওয়া-যায় এমন একটি আকার দিয়ে বাইরে প্রকাশ করা। এইভাবে কবির অলক্ষ্যেই তাঁর অন্তরে একটি সৌন্দর্যপ্রতিমা সৃষ্ট হতে থাকে এবং তাকে বাইরে রূপায়িত করার ব্যাকুলতা জাগতে থাকে। এই অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা বা 'ভাবনা'কে কবি 'বিরহী' বলেছেন ('জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা')। বস্তুতপক্ষে কবিচিত্ত কর্তৃক বিভাবিত হবার আগেই তো তারা বিরহী ছিল। অন্তরে বাহিরে যখন মিলন হ'ল এবং যখন কবি তাকে রূপ দিতে পারলেন তখন 'বিরহী' সংজ্ঞার তাৎপর্য কোথায়? এখানে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে আসলে কবি ঐ ভাবনার মূল তাঁর চিত্তলোককেই বিরহী বলছেন। অর্থাৎ বহির্জগতের শব্দ-স্পর্শাদিময় অনুভূতি থেকে কবির চিত্তে যে বিরহ-ব্যাকুলতার উদয় হচ্ছে তা কবিচিত্তের বিশিষ্ট স্বভাববশতই ঘটছে। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে ঐ অনির্দেশ্য সৌন্দর্য-বিরহের কথা বলা হয়েছে—

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে।
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।

এর থেকে এমন অনুমান অসংগত হবে না যে, মানসীর গোড়ার দিকের 'ভুলে' 'ভুলভাঙা' 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা' 'বিরহানন্দ' প্রভৃতি কবিতায় যে-অনির্ণেয় বিরহব্যাকুলতা প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা-ই ধীরে ধীরে একটি অনির্দেশ্য সৌন্দর্যলিপ্সার রূপ পরিগ্রহ করেছে। অর্থাৎ এই অস্ফুট এবং অনেকাংশে বহির্নিরপেক্ষ বিরহমিলনের আক্ষেপগুলি কবির অজ্ঞাত অশরীরী নারীসৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষাই। এগুলি পূর্বেকার কড়ি-ও-কোমলের 'আজি শরত-তপনে' প্রভৃতি কবিতার সগোত্র। এগুলি ঠিক প্রেমের কবিতা নয়, কারণ, প্রেমের রক্তদ্যুতি ও বাস্তব উত্তাপের কোনো পরিচয়ই এগুলির মধ্যে ধরা পড়ে না। এরকম নিরাকার প্রেমনিবেদনও সাহিত্যে দেখা যায় না। আর যদিই প্রেমের কবিতা ব'লে ধরে নেওয়া যায় তা'হলে স্বীকার কবতে হয় কবির মানসলোকের অধিবাসিনী অশরীরী এমন কোনো প্রিয়তমাকে লক্ষ্য ক'রে এগুলি লেখা যার সঙ্গে বাস্তব ব্যক্তিত্বের কোনো সম্পর্কে কবি আবদ্ধ নন।

অর্থাৎ এই কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত রোম্যান্টিক্ অনির্দেশ্যতা সম্পর্কে আমরা যেন সন্দেহাতীত হই।*

এই অনির্দেশ্যতা যখন প্রায় পরিস্ফুট সৌন্দর্য-বিরহের রূপ পেলে তখন বিরহের তীব্রতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল। এই অবস্থা মানসীর 'মেঘদূত' থেকে আরম্ভ ক'রে সোনার তরী ও চিত্রার কয়েকটি কবিতার মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, এই রোম্যান্টিক্ ব্যাকুলতাবোধের স্বরূপ কি?

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এ সুখস্বরূপ নয়, অথচ যথার্থ দুঃখের বা নৈরাশ্যের উপরেও এর প্রতিষ্ঠা নয়। বিরহে জর্জর হ'লেও কবি যেহেতু এই মনোভাবেরই পুনঃপুন আস্বাদন কামনা করেন সেইহেতু বিশেষ ধরনের আনন্দও এর সঙ্গে মিশ্রিত আছে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতের কৃষ্ণ-প্রেমের রোম্যান্টিক্ অভিজ্ঞতার বিখ্যাত বর্ণনা স্বতই মনে পড়ে—'এই প্রেমা আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বণ, জীভ জ্বলে না যায় ত্যজন।' উর্বশীর প্রেরণা সম্পর্কে বর্ণনাতেও কবি এই বিষামৃত-মিশ্রিত বিকারবিশেষেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন—'ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে।' তাহ'লে এই অনির্বাচ্য চেতনা কি বিস্ময়বিমিশ্র অদ্ভুত রস? ঠিক তাও হতে পারে না, কারণ, মানস-সুন্দরীর রূপ পরিগ্রহ ক'রে তা বহুল পরিমাণে আদিরসাশ্রিত হয়ে পড়েছে। সর্বকাব্যসাধারণ wonder-spirit বা বিস্ময়রসের অনুভব অনুসারে (তু° ধর্মদত্ত—'রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।') এর ধারণা অসম্পূর্ণ হবে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-চেতনার প্রকাশে নারীরূপের স্পর্শ তাঁর স্বভাবের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নারীরূপ-বিমণ্ডিত হয়ে অপূর্বতা প্রাপ্ত হয়েছে ব'লেই এই শ্রেণীর কবিতা সাধারণ সৌন্দর্যের কবিতা থেকে পৃথক্ হয়ে পড়েছে।† যদিও কবির এই কল্পনা প্রকৃতিভাবুকতার যোগেই জন্মলাভ করেছে, তথাপি এখানে প্রকৃতি কোনো বিশেষ তরুলতা বা

---

* পরবর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† এখানে আমরা কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে কবির নিতান্ত ভাবানুরাগ সম্পর্কের বিষয়টি অনুধাবন ক'রেই কথা বলছি। নিঃসন্দেহে ঐ মানসিক অনুরাগ উপাদান-কারণের অন্তর্ধানের পর বিরহবিকারমিশ্র সৌন্দর্যস্বপ্নের পথে কিছুকাল কবিকে চালিত করেছে। তা ছাড়া 'পূরবী' কাব্যের কয়েকটি ব্যাকুলতাময় অন্বেষণের কবিতায় এবং পরিশেষ, শেষ সপ্তক, সানাই প্রভৃতির কয়েকটি স্মৃতিচারণার কবিতায় কখনও রূপান্তরিতভাবে কখনও প্রত্যক্ষ-ভাবে এই বিরহ ক্রিয়াশীল হয়েছে। কিন্তু কবি-জীবনের এই মূল্যবান্ নিগূঢ় ভাবাত্মক ঘটনাটিকেও গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবাদের অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া যায় না এবং বিষয়টির পুনঃ পুনঃ উল্লেখে কাব্যসৌন্দর্য আস্বাদনে কোনও উন্নতি ঘটে না ব'লেই মনে করি। কারণ, ঐ ঘটনায় এবং অনুরূপ

নদীপর্বত নয়, পরন্তু যেন নিসর্গের সারভূত একটি সত্তা, কবির উপলব্ধ নারীরূপময় সৌন্দর্যসত্তা, কিছুটা কবি বিহারীলালের মত। এই অনুভবের যেখানে প্রথম প্রকাশ সেখান থেকেই এর স্বরূপ আবিষ্কার করার চেষ্টা করা যাকঃ

অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধমূরতি, স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরণ সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূরদিশি,
সুনীল গগনে ঘনতরনীল অতিদূর গিরিমালা,
* * *
ইহারা আমারে ভুলায় সতত, কোথা লয়ে যায় টেনে।
মাধুরী-মদিরা পান ক'রে শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না-প্রবাহ সর্বশরীরে পশে!
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবন-মোহিনী মায়া,
যৌবন-ভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া।
চারি দিকে ঘিরি করে আনাগোনা কল্পমূরতি কত,
—ইত্যাদি (সুরদাসের প্রার্থনা)

অন্যাবিধ ঘটনায়, যেমন, পদ্মা-সান্নিধ্যে বা আমেরিকার ধনতান্ত্রিকতার সংস্পর্শে অবস্থিতিতে রবীন্দ্রকল্পলোকের যে-যে বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে, কাব্য-রসপ্রমাতার পক্ষে তা-ই অবধারণ ও রক্ষণের যোগ্য। রবীন্দ্রজীবনের ঘটনা-সমূহের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানের দায়িত্ব কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই, আমরা শুধু রহস্যময় কাব্যপ্রবৃত্তির পথ-পরিচায়ক মাত্র। সংবাদসমূহের প্রাপ্য উল্লেখ-মূল্য দিয়ে কাব্যবিশ্লেষণে শ্রম নিয়োগ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তা ছাড়া আমরা দেখেছি, সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া, ঘটনাবিশেষকে কবিতায় প্রতিক্ষেপ করতে গেলে নানাবিধ অসংগতির উদ্ভব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

কিছুকাল পূর্বে এই গ্রন্থের আলোচনায় কোনও সুধী সমালোচক উপরি-লিখিত "সৌন্দর্য-কবিতাগুলির মূলে নারীরূপের অবস্থিতি" বিষয়টি নিয়ে এই প্রশ্ন করেছিলেন যে, গ্রন্থকার এখানে এত কথা বলছেন অথচ কাদম্বরী দেবীর নাম উল্লেখ করছেন না কেন। ঐ প্রশ্ন স্মরণে রেখে এবং সম্প্রতি প্রকাশিত কাদম্বরী দেবী ও কবির অন্যান্য প্রণয়-প্রসঙ্গ জড়িত ক'রে গঠিত আলোচনা-প্রত্যালোচনার বিষয় বিবেচনা ক'রে আমাদের অভিপ্রায় জানানোর প্রয়োজন বোধ করলাম।

এই অংশে কবির সৌন্দর্য-প্রেরণার উৎসভূমির পরিচয় স্পষ্টাক্ষরে ও বিশেষ বর্ণনা সহকারে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে এতটা আত্মবিশ্লেষণ আমাদের পঠিত কোনো আধুনিক কবির কাব্যে পাইনি। প্রকৃতির মাধুর্য-রস-পানে বিহ্বল কবি নিসর্গজাত সৌন্দর্যের কল্পমূর্তির আকর্ষণে অধীর হয়ে এই তৃষ্ণা নিবারণ করতে নারীরূপকে আশ্রয় করেছিলেন। প্রকৃতি থেকে মানবদেহে আশ্রিত হতেই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-কামনা কলঙ্কিত হয়ে পড়ল, তার আক্ষেপই সুরদাসের প্রার্থনার বিষয়।

দেখা যাচ্ছে, আদিরসের 'আলম্বন' থেকে সৌন্দর্যবোধকে বিচ্ছিন্ন না ক'রেও কবি 'আদি'র বাসনা থেকে মুক্ত হতে চান। সুতরাং বোঝা যায়, ঐ সৌন্দর্যবোধ (যে সূত্র থেকেই আসুক) যথার্থ রসরূপ প্রাপ্ত হয়েছে বলেই তা রতি বা অন্য যে-কোনো স্থায়ী ভাববাসনার স্পর্শ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। অর্থাৎ রসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রাচীনেরা রসোপলব্ধির অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন, সূক্ষ্ম আনন্দ-চৈতন্যে মানসের স্থিতি, তা কবির এই সৌন্দর্যবোধ থেকে প্রমাণিত হয়।

কিন্তু কেবল রসের স্বরূপ অবগত হ'লেই কবির বর্তমান রোম্যাণ্টিক্ পর্যাকুল অবস্থার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ এ অনুভূতির ব্যাখ্যায় আমাদের ভাষা অযোগ্য। ইংরেজী সাহিত্যে রোম্যাণ্টিক্ যুগের কবিদের রচনায় এই ধরনের কল্পনামূলকতার প্রাথমিক সহজ অভিব্যক্তি নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। বৈষ্ণব-পদসাহিত্যকে কাব্যের দিক থেকে অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর রোম্যাণ্টিক্ বলা যায়। মানসীর প্রণয়-কবিতাগুলির মধ্যে এক প্রকারের অতৃপ্তি, বিরহ-বিলাস এবং অনন্ত প্রেমের প্রতি আগ্রহ পদাবলীর নিগূঢ় প্রণয়ব্যাকুলতামূলক '(সখি) কি পুছসি অনুভব মোয়', '(এ সখি) হমারি দুখের নাহি ওর', 'তুমি মোর নিধি, রাই, তুমি মোর নিধি' প্রভৃতি কবিতার ভাবের সদৃশ। 'মেঘদূত' সম্পর্কে গদ্যে আলোচনায় কবি পদাবলীর সাক্ষ্য নিয়ে তাঁর বিরহ-মনোভাব এবং সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষার দিকটি উপস্থাপিত করেছেন।*

* 'কিন্তু এ কথা মনে হয়, আমরা যেন কোনো এক কালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, তোমায় 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির'…

মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ পদাবলীর ধর্মভাবুকতার দিকটি কোনো কালেই অঙ্গীকার করেন নি। অথচ তার আশ্চর্য ব্যাকুলতাময় প্রণয়মহিমার বিষয়টি আত্মসাৎ করেছেন এবং তা ঘটেছে একালেই, প্রাথমিক রোম্যাণ্টিক অনুভবের পর্যায়ে।

সংস্কৃত সাহিত্যকে আমরা মোটামুটি সাংকেতিকতাশূন্য চিত্রধর্মী প্রাচীন রচনা ব'লেই জানি। কিন্তু অর্বাচীন সংস্কৃতে এমন বহু শ্লোক রয়েছে যার মধ্যে ঠিক এই অনির্বচনীয় রোম্যান্টিক মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে। মহাকবি কালিদাসও একজন শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক মনোভাবের কবি ছিলেন। 'মেঘদূত' তার অন্যতম প্রমাণ। এই ব্যাকুলতার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে কালিদাস পর্যাকুলত্ব, উৎকণ্ঠা ('প্রোৎকণ্ঠয়ত্যুপবনানি মনাংসি পুংসাম্'—ঋতুসংহার), পর্যুৎসুকীভাব ('রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ'—অভিজ্ঞানশকুন্তল) চিত্তের অন্যথাবৃত্তি ('মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ'—মেঘদূত) বিকার, উৎসুকত্ব, 'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু' ইত্যাদি রূপে বিবৃত করেছেন। কবি ভবভূতি প্রিয়াস্পর্শজাত বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক হর্ষের স্বরূপ অপূর্বভাবে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে বিবৃত করার চেষ্টা করেছেন—

বিনিশ্চেতুং ন শক্যো সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোদো মোহো বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ ॥

অর্থাৎ 'আমি নির্ণয় করতে পারছি না—এ সুখ না এ দুঃখ, আনন্দের পরিপাকাবস্থা না মোহ,—বিষক্রিয়া না মদবিকার! যতই তোমার স্পর্শ পাই ততই আমার ইন্দ্রিয়গুলি অবশ হয়ে পড়ে। কী এক বিকার চৈতন্যকে বিক্ষিপ্ত করে—কখনও বা বিমূঢ়তা থেকে অকস্মাৎ প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে।'

অপর এক অজ্ঞাত কবির বা শীলাভট্টারিকার বহুশ্রুত 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ' প্রভৃতি শ্লোকটিতে সুখিনী কোনো নারীর নিসর্গ-সৌন্দর্যের মধ্যে উদ্ভূত গোপন-মিলনের স্মৃতিবিকার বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সের একটি প্রবন্ধে এই মনোভাবের বর্ণনায় বলেছেন—

"ভাবুক লোকমাত্রই অনুভব করিয়াছেন আমরা মাঝে মাঝে এক-প্রকার বিষণ্ণ সুখের ভাব উপভোগ করি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রখর সুখ। তাহা আর কিছু নয়, সীমা হইতে অসীমের প্রতি নেত্রপাত মাত্র। কোন্ কোন্ সময়ে আমাদের হৃদয়ে ঐ প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইবে। জ্যোৎস্না-রাত্রে, দূর হইতে সংগীতের সুর শুনিলে, সুখস্পর্শ বসন্তের বাতাস বহিলে, পুষ্পের ঘ্রাণে আমাদের হৃদয় কেমন আকুল হইয়া উঠে, উদাস হইয়া যায়। কিন্তু জ্যোৎস্না, সংগীত, বসন্তবায়ু, সুগন্ধের ন্যায় সুখ-সেব্য পদার্থের উপভোগে আমাদের হৃদয় অমন আকুল হয় কি কারণে?"

[বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা—অচলিত সংগ্রহ, ১ম]

তাঁর 'ছিন্নপত্র' নামক একালের অপূর্ব কবিমানস-পরিচায়িকায় স্বকীয় রোম্যান্টিক অনুভবের ব্যাপারটি তিনি নানাভাবে আমাদের জানিয়েছেন :

"তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার অপরূপ জগৎ···প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতিবিস্ময়পূর্ণ ছমছম নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন—যখন সাতসমুদ্র তেরোনদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত"—ইত্যাদি ২৩।

"কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে"—ইত্যাদি ৩৫।

"অন্ধকারাচ্ছন্ন দুইকূল নিদ্রিত, মাঝে মাঝে কেবল গ্রামের বনে শৃগাল ডাকছে, এবং পদ্মার নীরব খরস্রোতে ঝুপঝাপ ক'রে পাড় খসে খসে পড়ছে—এই সমস্ত পরিবর্তনশীল ছবি যেমন চোখে পড়তে থাকে অমনি মনের ভিতরে একটা কল্পনার স্রোত বইতে থাকে এবং তার দুই পারে তটদৃশ্যের মতো নব নব আকাঙ্ক্ষার চিত্র দেখা দিতে থাকে। ······বোধ হয় সেই ছেলেবেলায় তখন আরব্য উপন্যাস পড়তুম······তখন যে আকাঙ্ক্ষাটা মনের মধ্যে জন্মেছিল সেটা যেন এখনও বেঁচে আছে, ঐ বালিচরে নৌকা বাঁধা দেখলে সে-ই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে।"—ইত্যাদি ৫৬।

"এর যে কী মানে ঠিক ধরতে পারিনে—এর সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে ঠিক বুঝতে পারিনে। এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান।··· যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর ক'রে কাঁপছে"—ইত্যাদি ৬৪।

"এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়। পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হোতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে। কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গনরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব

এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানবমনের জড়িত-জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার।"—ইত্যাদি ৭৭।

এইসব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কবির অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ মনোধর্মটি কিভাবে গড়ে উঠেছে। মানসী-সোনারতরী যুগের নানান্ কবিতায় কবি তাঁর এই মানসের প্রকাশ ধরে রেখেছেন।

কবি ঐ রোম্যাণ্টিক কল্পনা থেকে জাত সম্মোহাবস্থার বর্ণনা নিম্ন-লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে বিভিন্ন 'অনুভাবে'র ও 'সঞ্চারীভাবে'র আশ্রয়ে দিয়েছেন—

এই যে বেদনা
এর কোনো ভাষা আছে? এই যে বাসনা,
এর কোনো তৃপ্তি আছে? (মানস-সুন্দরী)
সব কথা গেছি ভুলে;
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রুপারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার (মানস-সুন্দরী)

বিকলহৃদয় বিবশশরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
'কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি।'
(নিরুদ্দেশ যাত্রা)

আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা, (অন্তর্যামী)

তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়,
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়,
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায় চিত্ত মাতিয়া উঠে,
কোথা হতে আসে ঘন সুগন্ধ,
কোথা হতে বায়ু বহে আনন্দ,
চিন্তা ত্যজিয়া পরাণ অন্ধ মৃত্যুর মুখে ছুটে। (অন্তর্যামী)

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার উপসংহারেও কবি তাঁর অনির্দেশ্য বাসনা-পর্যাকুল এই মনোভাবের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বস্তুত রোম্যাণ্টিক মনোভাব কী বস্তু তারই পরিচয় সন্নিবেশিত করেছেন (স্বল্প পরেই উদ্ধৃত)। কবির একালের কবিতা থেকে ঐরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রোম্যাণ্টিক বেদনা-

ব্যাকুলতার স্বরূপ অবগত হ'লে এর বিচিত্র প্রকাশ ও পরিণাম সহজেই উপলব্ধ হবে।

দেহকে ত্যাগ না করেও দেহাতীতে এই সৌন্দর্য-রসের প্রতিষ্ঠা ব'লে অতি স্বাভাবিক ভাবেই 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় সুরদাস-কাহিনীর রূপকে কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য কবির ব্যগ্রতা লক্ষ্য করা যায়। কবি পরিণামে ইন্দ্রিয়াতীত বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-চেতনায় সমাহিত হবেন এই আশা নিয়ে কবিতাটি শেষ করেছেন—

হৃদয়-আকাশে থাক না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি ?
বাসনা-মলিন আঁখি কলঙ্কছায়া ফেলিবে না তায়।……

সৌন্দর্য-রস আস্বাদনে কামনা থেকে কামনাহীনতায় যে-উত্তরণ সুরদাসের প্রার্থনায়, তার অনিবার্য প্রভাব পড়েছে 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় প্রেয়সীর রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধানে। সেখানেও কবি দেহকামনাযুক্ত অবস্থায় দেহাতীতকে পান নি। বৈষ্ণবীয় 'প্রেমবৈচিত্ত্যে'র মত আক্ষেপ জানিয়েছেন—

খুঁজিতেছি কোথা তুমি,
কোথা তুমি।
যে-অমৃত লুকানো তোমায়,
সে কোথায় ?

এই কামনাহীনতা মানসীর মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে তার প্রমাণ, আরো কয়েকটি কবিতায় কবি এই ভাব ব্যক্ত করেছেন—

দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন ;
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস। (নিষ্ফল প্রয়াস)

নাই, নাই—কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ ;
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন ;
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া। (হৃদয়ের ধন)

এই কামগন্ধহীন (যদিও নারীরূপের আশ্রয়ে গঠিত) সৌন্দর্যের প্রতি স্থির আগ্রহ কবির সৌন্দর্য-অনুভবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সোনারতরীর নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের দুর্নিবার আকর্ষণের মধ্যে এই দিকটি অপরিস্ফুট থাকলেও 'চিত্রা'য় যখনই ব্যাকুলতা স্থিরত্ব-প্রাপ্ত হয়েছে এবং পূর্ণতা ও প্রশান্তি এসেছে তখনই আবার নিষ্কাম ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি কবির পরিণত আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। উর্বশী, বিজয়িনী প্রভৃতি কবিতার রসবিচারে আমরা এই আকর্ষণের স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করব।

সৌন্দর্য-প্রেরণার মধ্যে যে একটি নিরুদ্দেশ আকর্ষণের প্রবলতা আছে তা সুরদাসের-প্রার্থনায় তেমন পরিস্ফুট হয়নি। উপরে উদ্ধৃত 'ইহারা আমারে ভুলায় সতত, কোথা লয়ে যায় টেনে' প্রভৃতি চরণের মধ্যে আভাসে ঐ সুর ব্যক্ত হয়েছে মাত্র, কিন্তু 'মানসী'র মেঘদূত কবিতায় এর প্রবলতা এবং সোনার-তরী ও নিরুদ্দেশ-যাত্রা কবিতায় এই ব্যাকুলতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। মেঘদূত কবিতার উপসংহারের তীব্র আর্তিই এই কবিতার মর্মকথা, যদিও এই বিলাপের আধাররূপে বিখ্যাত সংস্কৃত খণ্ডকাব্যটি বিদ্যমান। আধুনিক কবি কালিদাসের কাব্য থেকেই নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের প্রেরণা পেয়েছিলেন এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকলেও এবং ঐ প্রেরণার অবলম্বনরূপে কবিহৃদয়ে নিসর্গের ও নারীর একটি বিশেষ স্বকীয় রূপ কাজ করেছে মনে করা গেলেও, মেঘদূত যে প্রবলতম উদ্দীপনের ভূমিকা নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছেন—

> কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
> রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা।
> লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক—

কালিদাস যা বিশেষ চরিত্রে ব্যক্ত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই নির্বিশেষভাবে গ্রহণ করলেন। কে জানে, কালিদাসের হৃদয়েও যক্ষ-যক্ষপত্নী ও অলকার ঊর্ধ্বে একটি আকার-প্রকারহীন নির্বিশেষ বিরহ-চেতনা বিদ্যমান ছিল কিনা। মেঘদূত কবিতায় বিপ্রলম্ভের আশ্রয়রূপে একটি নারীমূর্তি বিরাজ করছে। যেমন—

> মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
> কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।

উপসংহারে কবির আর্তির সঙ্গে Matthew Arnold-এর স্মরণীয় একটি ছোট কবিতার ভাবের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কবি স্বয়ং 'মেঘদূত' নামক গদ্যরচনায় ঐ অকারণ বিরহের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং উক্ত কবি সম্পর্কে উল্লেখও করেছেন।* মেঘদূত কবিতার অকারণবিরহমূলক উপসংহারের পঙ্‌ক্তিগুলি এই—

> ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান—
> কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান।
> কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ।
> কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।

* *Isolation* (To Marguerite)

সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,……

এরই ব্যাখ্যায় 'মেঘদূত' গদ্যরচনায় লিখলেন—

"মনে পড়িতেছে কোনো ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রু-লবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে।"

উপরে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে যে সুগভীর বেদনার কথা ব্যক্ত হয়েছে তা একালের সৌন্দর্যপ্রেরণামূলক সমস্ত কবিতার মধ্যেই সুলভ। 'সোনারতরী'তে এক অপরিচিত বিদেশিনী এসে কবির সৌন্দর্য-বাসনা জাগরিত ক'রে কবিকে তীব্র বিরহের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে গেলেন। কবি তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন মাত্র, তাঁর সঙ্গে সশরীরে মিলন ঘটল না।* 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী' প্রভৃতিতে এই তীব্র কাল্পনিক সৌন্দর্য-বিরহই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। "আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে। সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই।" 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় কবি যদিচ এক তরণীতে বিদেশিনীর সঙ্গে যাত্রা করলেন, সেই চঞ্চলগামিনীর সঙ্গে নিজ ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ মিলন ঘটাতে পারলেন না, কারণ তা অসম্ভব। বিরহই এর প্রকৃতি, বিরহেই এই কল্পনার স্থিতি। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-র শেষেও তীব্র-বিরহজনিত আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে—

বিকলহৃদয় বিবশশরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—

*তু° In Memoriam-এর নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তি—

I hear the noise about the keel;
I hear the bell struck in the night;
I see the cabin-window bright;
I see the sailor at the wheel. (X)
I watch thee from the quiet shore.
Thy spirit up to mine can reach;
But in dear words of human speech
We two communicate no more. (LXXXV)

এবং উক্ত কবির লেডি অফ্ শ্যালট্-এর ছবি।

কোথা আছ; ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি।
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি।

মানসীর সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা থেকে সোনারতরীর নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-প্রেরণায় উত্তরণের অবস্থায় লেখা, মানসী কাব্যের শেষাংশে মুদ্রিত 'বিদায়' এবং 'সন্ধ্যায়' কবিতা দু'টি অবশ্য স্মরণীয়। নিরুদ্দেশ-যাত্রার বাসনার প্রকৃতি এদের মধ্যেও রয়েছে, এমনকি ভাষা ও প্রকাশরীতিতেও নিরুদ্দেশ-যাত্রার সঙ্গে এই কবিতা দু'টির সাম্য লক্ষণীয়। এই সময়ে লেখা একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় মানসী-কাব্যের মধ্যে 'একটা প্রবল despair ও resignation-এর ভাব দেখেছিলেন' ব'লে কবি জানিয়েছেন (চিঠিপত্র, ৫)।

যাই হোক, নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্য-সম্পর্কিত কবিতাগুলির উপসংহারে কবির তীব্র বেদনা বিচ্ছুরিত হয়েছে। অর্থাৎ মেঘদূত কবিতার ঐ 'সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে' অথবা অন্য আর একটি কবিতার 'নাই, নাই,—কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ'-এর ভাবই 'সোনারতরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' এবং 'নিদ্রিতা' 'সুপ্তোত্থিতা' প্রভৃতি কবিতায় সুপ্রকট। কিন্তু সৌন্দর্যপ্রেরণামূলক কবিতাগুলির মধ্যে এ ছাড়া অন্যবিধ মিলও আছে যা থেকে এদের সগোত্রত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এই শ্রেণীর কবিতাগুলির বেদনার পিছনে রয়েছে একটি ছায়াচ্ছন্ন মেঘলোকের, অথবা অস্ফুট উষার, অথবা ধূসর সন্ধ্যার আধ-আলো আধ-অন্ধকার অস্পষ্ট প্রাকৃতিক পটভূমিকা। 'মেঘদূতে'র মত 'সোনারতরী' কবিতায়ও মেঘান্ধকার দিবসের বর্ণনা রয়েছে—

তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা।

'নিদ্রিতা' ও সুপ্তোত্থিতা' কবিতায়—

শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা,
পূর্বতটে হতেছে নিশি ভোর

অথবা,

একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার

প্রভৃতির মধ্যে এই কুহেলিকাময় প্রকৃতির চিত্র রয়েছে। পরবর্তী কল্পনা-কাব্যের 'স্বপ্ন' কবিতার আশ্চর্য প্রিয়াসম্মিলন-ক্ষণটিকেও আবিষ্ট ক'রে রয়েছে সন্ধ্যার ছায়াময় নিসর্গ। কিন্তু এবিষয়ে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'ই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এটি রবীন্দ্র-রচিত এ-সময়কার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম। সমুদ্রমধ্যবর্তী আলো-ছায়াচিত্র, মোহিনী ও নিষ্ঠুরা বিদেশিনীর ব্যর্থ পশ্চাৎ-ধাবনের বিরহকরুণ ইতিবৃত্ত, দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি ও শ্রান্তি এ সবই

কবিতাটিতে পরিমিত ভাষণের মধ্য দিয়ে কবি আশ্চর্যভাবে আমাদের গোচরে এনেছেন এবং মানুষজীবনের সর্বজনীন ও চিরকালের দীর্ঘশ্বাস এর প্রতি ছত্রে মর্মরিত করেছেন। Tennyson-এর The Voyage নামীয় কবিতার সঙ্গে এই কবিতাটির অবশ্য বহিরঙ্গ মিল আছে, কিন্তু অন্তরঙ্গে রয়েছে পার্থক্য। Voygae-এর সামুদ্রিক নিসর্গ এতে প্রতিবিম্বিত, যাত্রার অবসাদও যদ্যপি ধ্বনিত হয়েছে, কবিতাটির প্রকৃতি হয়েছে স্বতন্ত্র। আর বাণিজ্যবাহী উপনিবেশ-প্রসারের অধ্যবসায়ের চিহ্নমাত্র নিরুদ্দেশ-যাত্রায় নেই। Voyage-এর রাজ্ঞী এবং নিরুদ্দেশ-যাত্রার বিদেশিনী রূপে না হলেও ভাবে অত্যন্ত বিভিন্ন। এই কবিতাটি ব্যাপ্ত ক'রে রয়েছে সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার রহস্যময় নিসর্গ চিত্র। 'পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন অস্তাচলে' অথবা 'আঁধার-রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা' প্রভৃতি সন্ধ্যার বর্ণনার সঙ্গে কবিহৃদয়ের হতাশ্বাস সম্পূর্ণ মিলে গেছে। মানস-সুন্দরীও কবির কাছে দেখা দিয়েছেন সন্ধ্যায় অথবা রাত্রে—

জানালায়
একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়······
তখন, করুণাময়ী, দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আসিয়া।

কখনো বা 'ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে' বকুলতলায় অথবা 'নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে'-এর আবির্ভাব। কবিতাগুলির অভ্যন্তরে সব ক'টিতেই বিদেশযাত্রার ও অপরিচিতা বিদেশিনীর কথা আছে। তা ছাড়া এই কবিতাগুলির প্রত্যেকটিতে স্বর্ণবর্ণের কল্পনা রয়েছে। আমাদের মনে হয় স্বর্ণবর্ণই হ'ল এসময়কার বিশিষ্ট সৌন্দর্য-কল্পনার দ্যোতক কবিমানসের সংকেত। কাব্যখানির নাম সোনারতরী, ঐ নামাঙ্কিত কবিতায় ধানও সোনার। 'মানস সুন্দরী'তে—

সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিতস্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ;

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য়—

আঁধার-রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক পড়িবে ঢাকা

অথবা,

তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ।

'নিদ্রিতা'র—

একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা।

সোনারতরীর মত 'মানস সুন্দরী'র সঙ্গেও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র পারস্পরিক সাদৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় বিদেশিনীর সঙ্গে তরীতে যাত্রার যে-কল্পনা প্রসারিত হয়েছে, মানস-সুন্দরীতেও তা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, —ইত্যাদি

আবার, 'অভয়-আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল হেরিয়া ভরসা পাই' এবং 'হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন কথা না ব'লে'—উভয়ত্র প্রায় একই চিত্র-কল্পনা। মোটের উপর সৌন্দর্য-সম্পর্কিত কবিতাগুলি কয়েকটি বিশিষ্ট প্রেরণা ও কল্পনা বহন করছে যা দিয়ে অন্য কবিতা থেকে এদের অনায়াসে পৃথক করা যায়।* এই বিশিষ্ট নিরুদ্দেশ-কল্পনা চিত্রা-কাব্যে যে স্থির সৌন্দর্য-সাধনায় রূপান্তর লাভ করেছে তা আমরা পরবর্তী পর্যায়ে দেখতে পাব।

মানসীতে প্রকৃতি স্বরূপে অবস্থান ক'রেই কবিকে আকৃষ্ট করেছে দেখতে পাওয়া যায়। কড়ি-ও-কোমলে প্রকৃতির এই স্বরূপাবস্থান নেই। সেখানে প্রকৃতি কবির মিলনবিরহজনিত উচ্ছ্বাসের উদ্বোধনে সহায়ক হয়েছে মাত্র। কৈশোরের রচনা বনফুল ও কবিকাহিনীতে অবশ্য এক প্রকারের প্রকৃতি-প্রীতি বিদ্যমান, কিন্তু তা ওয়ার্ডস্‌ওআর্থ বা বিহারীলালের অনুকরণসূত্রে গঠিত। মানসীর কয়েকটি কবিতা আলোচনা করলে দেখা যায় কবির এই প্রকৃতি-প্রীতি সহসা উদিত হয়নি। এর ভাবনামূলে প্রথমে একটা সংশয়বোধ ছিল। এই সংশয় সৃষ্টির সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে। যেমন—

পাশপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই,
বিষম সংশয়। (সিন্ধুতরঙ্গ)
মনে হয় সৃষ্টি যেন বাঁধা নাই নিয়ম-নিগড়ে (নিষ্ঠুরসৃষ্টি)

অন্ধ সৃষ্টিলীলার একদিকে যে-ধ্বংসের মূর্তি ফুটে উঠেছে কবিকে তা

* পাঠকেরা এই সব প্রসঙ্গে Tennyson-এর The Lady of Shalott কবিতার এবং Whitehouse-এর আঁকা তরণীতে উপবিষ্টা ঐ রমণীর ছবির বিষয়টি নিশ্চয়ই স্মরণ করবেন। আর ঐ সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন কবি কীট্‌সের কল্পিত Le Belles Dame Sans Merci-কে, যার স্বভাব হ'ল রূপদগ্ধ ক'রে পথিককে ত্যাগ করা।

ক্ষণিকের জন্য আচ্ছন্ন করলেও তিনি একমাত্র প্রকৃতি-প্রীতির বশেই এই সংশয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, এবং কিছু-পরবর্তী 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় ধ্বংসের উপর প্রেমকেই মৃত্যুঞ্জয়ী সত্য ব'লে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন—

'দিব না দিব না যেতে ডাকিতে ডাকিতে
হুহু ক'রে তীব্র বেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
.....................তবু প্রেম বলে,
'সত্য-ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকারলিপি'।

মানসীর প্রকৃতি-প্রীতিই কবিকে সৃষ্টি-সম্পর্কিত সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি থেকে পরিত্রাণ করেছে। 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'র পরের দিন লেখা 'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতায় কবি গভীর অনুরাগের সঙ্গেই প্রকৃতির উদার মধুর ও গম্ভীর রূপের বর্ণনা দিয়ে পরে স্বকীয় কবিমানসের একটি উল্লেখ্য পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন—

নিত্যনিশ্বসিত বায়ু, উন্মেষিত উষা,
কনকে শ্যামলে সম্মিলন,
দূরদূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস,
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন,
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি'
জগতের মর্ম হতে মোর মর্মস্থানে
আনিতেছে জীবনলহরী।

তখনকার কবিমানসের রসাবস্থা কবি নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করেছেন—

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহ-বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষস্থল।
শুধু জেগে ওঠে প্রেম মঙ্গল-মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্র শান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ-মূরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,

বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন-কুহরে
মঙ্গল-আনন্দ-ধ্বনি বাজে।

বাঙলা সাহিত্যে এই অনাবিল শান্তরসের বর্ণনা দ্বিতীয়রহিত। তা ছাড়া রবীন্দ্রপক্ষে বিশেষ এই যে, রসাবস্থায় তিনি আত্মসমাহিত থাকতে চান না, পৃথিবী ও মানুষকে চান, নিজকে প্রসারিত ক'রে দিতে চান দেশ ও সমাজের জীবনের মধ্যে।

কবির এই প্রাথমিক যুগের প্রকৃতি-প্রীতি আরো সহজ ও স্পষ্টভাবে উৎসারিত হয়েছে 'প্রকৃতির-প্রতি' কবিতায়। 'শত শত প্রেম-পাশে টানিয়া হৃদয়, এ কী খেলা তোর' থেকে আরম্ভ ক'রে 'প্রাণমন পসারিয়া ধাই তোর পানে, নাহি দিস্ ধরা' এবং 'যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে মহারূপ-রাশি; তত বেড়ে যায় প্রেম, যত পাই ব্যথা, যত কাঁদি হাসি' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবি তাঁর প্রকৃতি-সম্পর্কিত দুর্নিবার আকর্ষণ আমাদের গোচরে এনেছেন। আদিতে যে-অপরিস্ফুট প্রকৃতি একটি অনির্দেশ্য অপরিণত মনোভাবের পোষক মাত্র ছিল, বর্তমানে তা স্বরূপে অবস্থান ক'রে কবিকে মুগ্ধ ও বিহ্বল ক'রে তুলেছে। এরপর 'কুহুধ্বনি' কবিতায় পল্লীর সঙ্গে বিজড়িত এই প্রকৃতির মানবজীবনের উপর অপরিসীম প্রভাব বর্ণিত হয়েছে—

যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে,
যেন কোন সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি।……

প্রকৃতি-সম্পর্কিত এই বাসনার বিকাশের মূলে কবিচিত্তের একটি বিশেষ ভাব বা দৃষ্টি প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃতিতে ভয়ংকরতা ও মাধুর্য, মহান্ এবং সুন্দর পাশাপাশি থেকেই কবিকে মুগ্ধ করেছে। ঝটিকা, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ধ্বংসের অনিবার্যতায় এবং সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতির দুরধিগম্য ভীষণতায় প্রকৃতি নিষ্ঠুর হ'লেও এর লীলাময় রমণীয় রূপ—যার মধ্যে বিবিধ বর্ণের খেলা, আলোকের সমারোহ, পত্রের শ্যামলিমা ও ফুলফলের বিকাশ থেকে আরম্ভ ক'রে পশুপাখি ও মানুষে প্রাণের ও প্রেমের লীলা প্রকাশিত—তাও অপূর্ব। নিষ্ঠুর জড়ত্বকে অতিক্রম ক'রে প্রাণের স্ফূর্তি জয়ঘোষণা ক'রে চলেছে, এই ভাবই কবিকে ক্রমশ প্রকৃতির দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' ও 'সিন্ধুতরঙ্গে' কবিচিত্তের সংশয়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রথমটির নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে ঐ সংশয় আরো প্রকট—

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে ?
যার লাগি সদা ভয়,

পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে?

এই সংশয় থেকে মুক্তির ও প্রীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে উপরি-লিখিত 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায়। কবি তাঁর এই মনোভাবের সঙ্গে স্বভাবতই এ দেশের চিরন্তন মায়াবাদের তুলনা ক'রে দেখেছেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে দ্বৈতের বা বহুত্বের এই ভ্রান্তিকে অতিক্রম ক'রে নয়, একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রেই তিনি বেঁচে থাকতে চান—

এই সুখে দুঃখে শোকে
বেঁচে আছি দিবালোকে,
নাহি চাহি হিমশান্ত অনন্তযামিনী।

সোনার-তরীতে যখন কবির প্রকৃতি-প্রীতি সুগভীর বিশ্বাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্থির মর্তপ্রীতি বা মানবানুরাগে পরিণত হয়েছে তখন কবি যে আরো স্পষ্টভাবে মায়াবাদকে অস্বীকার করলেন তা একটু পরেই আমরা দেখতে পাব। এবং আরো পরবর্তী কালে রুদ্র ও সুন্দরের, ধ্বংস ও সৃষ্টির রহস্যময় লীলা-অনুভূতি কেমনভাবে তাঁর কাব্য-প্রতিভাকে পরিণামের পথে নিয়ে গেছে তখন সেই বিস্ময়কর ইতিহাসও দেখব।

প্রকৃতি সম্পর্কে কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি 'একমাত্র প্রকৃতির কবি' ও 'সাধারণ মানুষের কবি' ওয়ার্ডস্‌ওআর্থ থেকে অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র। ওয়ার্ডস্‌ওআর্থের প্রকৃতি-ভাবুকতা প্রকৃতির এই সমগ্রতাবোধ থেকে উদ্দীপ্ত হয়নি, ঐহিকতাবাদী ইয়োরোপের অকস্মাৎ-আগত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্রে এসেছিল ব'লে সৃষ্টির নিষ্ঠুর দিক সম্পর্কে ঐ কবি প্রায় অচেতন ছিলেন। আবার রবীন্দ্র-আবির্ভাব কালে যদিও বাঙালি-সমাজে ভোগলিপ্সা, অকর্মণ্যতা, আদর্শচ্যুতি ও নীতি-হীনতা সর্বত্র প্রকট হয়ে নবতম নিসর্গ-দর্শনের আবির্ভাবের উপযুক্ত পটভূমি সৃষ্টি করেছিল, তথাপি, প্রকৃতি ও জীবনকে অবলম্বন ক'রে অরূপাশ্রয়ণই ঐ সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির সমাধানরূপে মনীষীদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল—কেবলমাত্র প্রকৃতির মধ্যে আশ্রয়-গ্রহণ নয়। সম্ভবতঃ ভারতীয় জীবন ও সাধনার বৈশিষ্ট্যই এজন্য দায়ী। আর এই সঙ্গে রবীন্দ্রপক্ষে বিরোধ-বৈচিত্র্য-সমন্বয়ী নব্য-হেগেল সম্প্রদায়ের ভাবদর্শনের সাজাত্যও অনুমেয়। রবীন্দ্র-নাথের মধ্যে রোম্যান্টিক ভাবভঙ্গির যে সর্বতোমুখী পরিণাম আমরা দেখতে পাই, তাতে এটুকু বোঝা যায় যে উনিশ শতকে প্রারব্ধ বিশ্বের এই নবীন মনোভাব যেন রবীন্দ্রনাথেই পূর্ণতা পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেজন্য প্রকৃতির একদেশানুবর্তী প্রীতিসম্পর্ককে অতিক্রম ক'রে সমগ্র সৃষ্টি-গত দ্বান্দ্বিক রহস্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী মর্তানুরাগ এবং রুদ্র-সুন্দরের লীলারস এই কবির কল্পনার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়ীভূত হ'ল।

ওয়ার্ডস্‌ওআর্থ অতি ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যেও যে-অর্থ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন তা-ই যেন অধুনা অধিকতর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা গৃহীত হয়ে সুনির্দিষ্ট ও চিরন্তন সত্যের রূপ লাভ করলে। নিসর্গের সঙ্গে মানবজীবনও একসূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়ল।

নিসর্গ-প্রীতি সম্পর্কে বর্তমান কবিমানসের এই যে পর্যাকুল অবস্থা, এ কি অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সংবেদনাবস্থা, না এ অনির্বচনীয় আহ্লাদরূপ রসতাপ্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে? বলা বাহুল্য, প্রকৃতিগত কবিতার কাব্যমূল্য সম্পর্কে এই সংশয় উনিশ শতকের পূর্বে দেখা দিলে অর্থহীন হ'ত না, কিন্তু বর্তমানে তার অবকাশ নেই। নিসর্গপ্রীতিরূপ স্থায়ীভাব যে যথার্থভাবে রসপর্যায়ী-ভূত হতে পারে তা ওয়ার্ডস্‌ওআর্থ ও রবীন্দ্রনাথ এবং বিহারী-লালও সমভাবে দেখিয়েছেন। 'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতার পূর্বোদ্ধৃত অংশ-টুকুতে যে কবির এই রসাবস্থা বিবৃত হয়েছে তা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এই আনন্দ-অনুভবকে যদি প্রাচীন কোন রসের পর্যায়ে ফেলতেই হয় তাহলে শান্তরসেরই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পূর্বেকার উদ্ধৃতিতে এই রসেরই অনুভাব ও সঞ্চারীগুলি কবি বিবৃত করেছেন। নিসর্গভাবুকতার শান্তরসপরিণামের ইঙ্গিত কবি চিত্রার 'সুখ' শীর্ষক কবিতাটিতেও দিয়েছেন—

আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা; মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো, —ইত্যাদি

কবি ওয়ার্ডস্‌ওআর্থ তাঁর Prelude কাব্যে নিসর্গ-প্রীতিসঞ্জাত মানসিক অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, আর নিম্নলিখিত বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি কয়েকটিতে সংক্ষেপে প্রকৃতি-প্রীতি সম্পর্কে স্বীয় চিত্তের প্রায় সমাহিত যোগাবস্থাই বিবৃত করেছেন—

* * * * that blessed mood,
In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world
Is lightened—that serene and blessed mood,
In which the affections gently lead us on,—
Until, the breath of this corporeal frame
And even the motion of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul—

(*Lines composed a few miles above Tintern Abbey*).

প্রকৃতি-প্রীতির সঙ্গে বিজড়িত বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে একটি সমগ্র দৃষ্টির পরিচয় অপর কোনো সমকালীন বাঙালি কবির রচনায় পাওয়া যায় না। কী সৌন্দর্য-কল্পনা, কী বিশ্বাত্মবোধ, সবই রবীন্দ্রনাথের একটি কাল্পনিক নিগূঢ় সমগ্রতাবোধ থেকে উৎসারিত। রবীন্দ্র-সমসাময়িক দেবেন্দ্রনাথ সেন ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির নিসর্গ-প্রীতি বা সৌন্দর্য-স্পৃহা ইয়োরোপীয় কবিদের মতই বিশিষ্ট বস্তুর প্রেরণায় ও বিশিষ্ট বিষয় ও ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অপরপক্ষে কল্পনার এই সমগ্র দৃষ্টি থাকার ফলে নিসর্গ-প্রীতি থেকে বিশিষ্ট বিশ্বাত্মবোধ, সমাজজীবনবোধ এবং রূপময় অরূপের লীলার অনুভবে রবীন্দ্র-কবি-মানসের উৎক্রান্তি অতি স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে।

মানসী কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় কবির বিশ্বাত্মবোধের বাসনা প্রথম প্রকাশিত হ'ল। তারপর সোনার-তরী কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা'য় এই বাসনা সম্যক্ পরিস্ফুট হয়ে অন্যকবিদুর্লভ সুগভীর মর্ত-প্রীতির জন্ম দিলে। এই বোধের কাজ হ'ল প্রবল কল্পনাশক্তির বশে নিখিলের তাবৎ বস্তুর সঙ্গে কবি-আত্মার নিগূঢ় যোগ স্থাপন করা। এর ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্বকীয়। এই বিশিষ্ট কল্পনা যে-কবিতাগুলিতে প্রকাশলাভ করেছে তাদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা অবশ্য-স্মরণীয়। প্রথম, এগুলির মধ্যে মর্তকে একটি জীবন্ত সত্তারূপে গ্রহণ করা হয়েছে, এবং মর্তের অতিরিক্ত অন্য কোনো সত্তা এ-প্রসঙ্গে স্বীকার করা হয়নি—যাঁর সঙ্গে কবি কল্পিত মিলন কামনা করবেন। দ্বিতীয়, পূর্বোক্ত প্রকৃতি-প্রীতির ব্যাকুলতাই বিশ্বকে সমগ্রভাবে আত্মস্থ করার ব্যাকুলতা এনে দিয়েছে। তৃতীয়, এই ব্যাকুলতার ফলে পৃথিবী ও মানুষকে নির্বিচারে ভালোবাসার প্রেরণা কবির চিত্তে জেগেছে। চতুর্থ, ঐ ব্যাকুলতা ও প্রীতি অভিনব এবং বিশুদ্ধ কবি-কল্পলোকের বস্তু,—দ্বৈত বা অদ্বৈত, পুরাণ বা উপনিষদে কথিত পূর্ব-নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্বের মধ্যস্থতায় কবি বিশ্বকে গ্রহণ করছেন না, এ বাসনা কবিহৃদয়ে স্বত-উৎসারিত, অহেতুক অর্থাৎ রোম্যান্টিক।

পাষাণী অহল্যার মধ্যস্থতায় কবি প্রথম এই ব্যাকুলতার স্বাদ অনুভব করলেন, এবং যে-কল্পিত গোপন প্রাণকেন্দ্র থেকে জীবনরসধারা নির্গত হচ্ছে তার সঙ্গে নিজেকে মিলিত করার আগ্রহ ব্যক্ত করলেন—

> জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
> মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত,
> অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
> সুপ্ত আত্মা-মাঝে ?..............
> মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটি-জীবস্পর্শ-সুখ,
> কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে ?

পৃথিবীকে জীবন্ত মাতৃসত্তারূপে কবি এই প্রথম উপলব্ধি করলেন। কবিতাটির শেষে কবি সদ্য-উদ্ভিন্নচেতনা অহল্যার যে বিস্ময়ের বর্ণনা দিচ্ছেন সে-বিস্ময় ব্যাকুল কবিচিত্তেরই, অহল্যার মধ্যস্থতায় বিবৃত হয়েছে মাত্র,—

তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয়;
দোঁহে মুখোমুখি। অপার রহস্যতীরে
চিরপরিচয়-মাঝে নব পরিচয়।

ঐ বিস্ময়ের বশে কবি পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যুগযুগান্তরব্যাপী অচ্ছেদ্য নাড়ীর বন্ধন অনুভব করেন। কল্পনা করেন, নিসর্গময়ী পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর 'আত্মীয়তা সম্পর্ক শুধু এ-জন্মের নয়, পূর্বেকার বহু জন্মান্তর থেকে সংক্রমিত'। এই অত্যদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব সংগীত তিনি আমাদের শোনালেন 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়—

মনে হয়, যেন মনে পড়ে,
যখন বিলীন ভাবে ছিনু এই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে।

কবির এই ব্যাকুলতা যে অকারণসঞ্জাত, অনির্দেশ্যস্বরূপ, সুদূরগামী এবং জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্য-সূত্রে আবদ্ধ রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা তা পরবর্তী পঙ্‌ক্তি-গুলি থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায়—

সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ—
................অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত......

পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবি এই সুদূরের প্রতি আকর্ষণরূপ রোম্যান্টিক মনোভাবের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন—

আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্মরস্বর। মানবহৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে; মনে তার দিয়াছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা—
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।

স্বীয় রোম্যান্টিক মনোভাবের স্বরূপের এই যে ব্যাখ্যা কবি করলেন, তা যখন

পুনরায় 'বসুন্ধরা' কবিতার মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করছেন, অর্থাৎ বসুন্ধরার তাবৎ বস্তুর সঙ্গে অজ্ঞাত এক বন্ধনের আগ্রহে অধীর হচ্ছেন, তখন কবির এই মনোভাবের অন্য-নিরপেক্ষ বিকাশ সম্পর্কে আর আমাদের সংশয় থাকে না। এই আগ্রহ ও ব্যাকুলতা অনন্য-সাধারণ, তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই প্রাপ্তব্য, এবং তাঁর রচনা থেকেই তাঁকে বুঝতে হবে, অন্য কোনো উপায় নেই।

মানুষের আবির্ভাব পৃথিবীতে হ'লেও কবির কল্পনায় সে পৃথিবীর অনাত্মীয়। অথচ তৃণলতা বা ইতর প্রাণী মাটির কাছাকাছি আছে ব'লেই যেন তারা ধরিত্রীর আত্মীয়। বহুজন্মপূর্বে কবি যেন তৃণতরুলতারূপে এমনকি অপ্রাণ-রূপেও সকলের সঙ্গে তথা পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন। মানুষ-জীবন লাভের পর সেই আত্মীয়তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কবির এই অভিনব কল্পনা—বসুন্ধরার সঙ্গে পুনরায় একাত্ম হওয়ার অতি প্রবল আগ্রহ এবং অন্যথায় আক্ষেপ—'বসুন্ধরা' কবিতাটির বিষয়বস্তু।

বিজ্ঞান-আশ্রয়ী যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে কবির এই একাত্মতা-তত্ত্বের বাইরের দিক থেকে (৺অজিতকুমার চক্রবর্তীর আলোচনাক্রমে) একটা মিল দেখা গেলেও অমিল গুরুতর। কারণ সংগ্রাম, বিরোধ এবং আত্মকেন্দ্রিকতা-মূলক জীবধর্ম ঐ অভিব্যক্তির মূলে। কিন্তু কবির অভিপ্রেত মহা-আত্মীয়তা-বন্ধন অনুভব নিশ্চয়ই সর্ববিধ জৈব-সম্পর্কমুক্ত স্বার্থলেশহীন আত্ম-বিলোপময় মিলনের বা পশ্চাতে প্রত্যাবর্তনের আগ্রহ, অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা নয়। যাই হোক, কবির এ মনোভাব কোনো তত্ত্বের মাপকাঠিতে বিচার্য নয়। এ আশ্চর্য কবিকল্পনা মাত্র।

'বসুন্ধরা' কবিতায় দেখা যায়, জন্মজন্মান্তরের সংস্পর্শ-ক্রমে আগত সৌহৃদ্যের বাসনা প্রবল বিরহভাবে ও মিলনের আগ্রহে কবিকে অস্থির ক'রে তুলেছে। "যেন কার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে"। তাই কবি কোনো সংশয়ের অবকাশ না রেখেই ব'লে উঠলেন—

> আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
> কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
> বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
> তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,

তারপর কবি বসুন্ধরার বহুবিচিত্র প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রার যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং যে-বিরহবিলাপে সমস্ত কবিতা মুখরিত করেছেন এখানে ভাষায় তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। শুধু ঐ রোম্যাণ্টিক বিরহের স্বরূপ দেখাতে গিয়ে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মাত্র উদ্ধার করছি—

> তাই আজি কোনোদিন শরৎকিরণ
> পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র-'পরে,

নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা—
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন। সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের নানাবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব।

কবির এই বাসনা যে জন্মান্তরীণ সৌন্দর্য্য-ক্রমে আগত স্থির রোম্যাণ্টিক্ বাসনা এ সম্পর্কে আর সংশয় নেই। অথচ এই একই বাসনার দুই বিভিন্ন প্রকাশ তাঁর এই সময়কার কাব্যের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটি হচ্ছে সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা, নিরুদ্দেশ সুদূরশায়ী এবং প্রায়-বস্তুর-অতীত কোনো সৌন্দর্য-সত্তার প্রতি আকর্ষণ, আর একটি বসুন্ধরার তাবৎ প্রাণের প্রকাশের প্রতি আকর্ষণ। একটি সৌন্দর্য-বিরহ, অপরটি নিসর্গ-বিরহ, উভয়ই কল্পনামূলক। নিসর্গ থেকে সৌন্দর্য-স্পৃহা, আবার, নিসর্গ থেকেই বিশ্বাত্মীয়তার বাসনা—মূলত এই একক রোম্যাণ্টিক্ ভাবপ্রবাহ কবির এ-যুগের সমস্ত কবিতা পরিব্যাপ্ত ক'রে বিদ্যমান।

ভেবে দেখতে হবে, কবির শিলাইদহ-বাস এবং নদীপথে মধ্য-উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে মাটি, মানুষ ও পল্লীনিসর্গের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় ঘটে তা তাঁর বিস্ময়ব্যাকুলতার উদ্দীপনে প্রভূত সাহায্য করেছে এবং ভিন্নদিকে মাটি, কৃষক ও গ্রাম-প্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাঁকে পল্লীসংগঠন কর্মেও প্রবৃত্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথের রোম্যাণ্টিক্ কল্পনা প্রবল, চলিষ্ণু এবং জীবনমুখী ব'লেই এরকম প্রসার ও বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। ফলে এমনও হয়েছে যে তাঁর সমাজভাবনা, শিক্ষাভাবনা এবং কবিকল্পনা মিলিত মিশ্রিত হয়ে তাঁকে বৈপ্লবিক নূতনের পথিক ক'রে তুলেছে। নিগূঢ় কল্পনার সঙ্গে পরিস্ফুট বাস্তবের এরকম বন্ধন বিস্ময়করই বটে।

পদ্মাতীরে সোনার-তরীর অধিকাংশ কবিতা যখন রচিত হচ্ছিল সেই সময়কার অতি নিগূঢ় প্রকৃতি-প্রীতির বা প্রকৃতি-আত্মীয়তার পরিচয় ছিন্নপত্রে

গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে
কত যে লোক-লোকান্তরের অরণ্যে পর্বতে।
—ইত্যাদি, গীতালি

এবং

মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে। —ইত্যাদি, বলাকা

মর্ত্য-উপলব্ধি সম্পর্কে যেমন, সৌন্দর্য-উপলব্ধি সম্পর্কে তেমনি, যদি বলা যায়, যে, কবি উর্বশীতে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' এই আদর্শকেই মূর্তি দিয়েছেন, অথবা 'যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা' কি '**Beauty is truth**' এই বচনকেই প্রমাণিত করেছেন তাহ'লে ঠিক বলা হয় না। সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির ধারণাও তাঁর অনন্যসুলভ স্বকীয় অনুভূতির বিকাশের সূত্রেই জানতে হবে। তবে একথা মাননীয় যে তুলনা ক'রে দেখতে দোষ নেই।

সোনারতরীর সুগভীর মর্তপ্রীতির অভ্যুদয়ে কবি যে বৈদান্তিক মায়াবাদকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করছেন তা কয়েকটি সনেটকল্প রচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। "লক্ষকোটি জীব ল'য়ে এ বিশ্বের মেলা, তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা", "চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর, লক্ষকোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর", "বিশ্ব যদি চ'লে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে, আমি একা বসে রব মুক্তি সমাধিতে?" প্রভৃতি কবির প্রসিদ্ধ মর্ত-জীবনানুরাগের পঙ্‌ক্তিগুলি এই সব কবিতায় প্রাপ্তব্য। এই 'দৃঢ় অনুরাগ' কবির পরবর্তী অরূপের প্রতি আগ্রহে দৃঢ়তর হয়েছে মাত্র, কারণ, অসীম বা অরূপকে কবি জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখেই পূর্ণতালাভ করেছেন। আর, কবির জীবনব্যাপী কাব্য-সাধনার ভিত্তিতে রয়েছে সোনারতরীর প্রতিভাস্ফুরণের মধ্যেকার এই কল্পনামূলক বিশিষ্ট মর্ত-উপলব্ধি ও সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকর্ষণ।

প্রতিভার বিকাশ

প্রথম পর্যায়

'চিত্রা'

প্রতিভার বিকাশ বলতে 'চিত্রা' কাব্যকেই লক্ষ্য করা হয়েছে, কারণ, এই কাব্যেই পূর্বোক্ত বিভিন্নমুখী রোম্যাণ্টিক্ প্রবণতাগুলির পূর্ণতা দেখা গেছে এবং ভবিষ্যতের অতিমহান্ পরিণতির আভাস সূচিত হয়েছে। কাব্যকলার ক্রমবিকাশের পথে 'চিত্রা' হ'ল সেই উচ্চভূমি, যেখানে পূর্বেকার সব পথ একটা স্থিরত্ব ও সংহতি লাভ করেছে, যেখানে উচ্চতা, পূর্ণতা ও বিরাম, এবং যেখান থেকে দেখা যায় যে পথ বহুদূরে অরূপমিশ্রিত জীবনভাবুকতার অনন্তে গিয়ে মিশেছে। চিত্রাতেই সর্বপ্রথম বোঝা গেল যে কবির ব্যক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিণতির মুখে ধাবমান।

চিত্রা কাব্যের এই পরিপূর্ণতাই চিত্রার বিশেষ লক্ষণ। এখানে দেখা যায়, কবির নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যব্যাকুলতা স্থির সৌন্দর্য-অনুধ্যানে রূপান্তরিত হয়েছে, মর্ত-উপলব্ধির আগ্রহ সাধারণ মর্তপ্রীতিকে অতিক্রম ক'রে বিশেষ ও বাস্তব মানবপ্রীতির চরিতার্থতায় উপনীত হয়েছে, কাব্যের প্রকাশরীতিতে —শব্দবিন্যাসে ও বচনভঙ্গিতে বিস্ময়কর অনবদ্যতা এসেছে এবং সর্বোপরি কবি আপন অথচ সামাজিক, সৃষ্টিক্রিয়ারত সুতরাং গতিশীল ব্যক্তি-সত্তার অজ্ঞাত পরিণামের পথে যাত্রা অনুভব ক'রে অপরিসীম বিস্ময় বোধ করছেন।

চিত্রার সৌন্দর্য-সম্পর্কিত সব কবিতার মধ্যেই পূর্বদৃষ্ট ব্যাকুলতা এবং অধুনা-উপলব্ধ স্থিরতা ও প্রশান্তি মিশ্রিত রয়েছে। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় কবি যে-চঞ্চলতাময় 'কম্পমুরতিস্রোতে' ভেসে থাকার বেদনা থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিলেন এবং আপন অন্তরে 'দেহহীন জ্যোতি' রূপে সৌন্দর্য-ময়ীকে অনুভব করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, চিত্রায় যেন সেই বাসনারই পূর্ণতা লক্ষিত হয়। এই সৌন্দর্যপ্রেরণার একদিকে চঞ্চলতার আধিক্য, আর একদিকে সমাহিত শান্তির আধিক্য—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির সম্পূর্ণ একটি উপলব্ধি গড়ে উঠেছে। মুখবন্ধের 'চিত্রা' কবিতায়—

> জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
> তুমি বিচিত্ররূপিণী……
> দ্যুলোকে ভূলোকে বিলাসিছ চলচরণে
> তুমি চঞ্চলগামিনী।

এই হ'ল এর চঞ্চল এবং তীব্রবিরহোদ্দীপক সত্তা, সোনারতরী এবং

নিরুদ্দেশ-যাত্রা কবিতার নিষ্ঠুরা 'বিদেশিনী'র প্রতিরূপ। আবার 'একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে, ...একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে' এই হ'ল ধ্যানের দ্বারা অনুভূত-প্রায় শৃঙ্গারস্পর্শহীন এর স্থির জ্যোতির্ময় রূপ। বলা চলতে পারে, প্রথমটি বিশেষভাবে বহির্জগতের রূপগত বা প্রকৃতিগত ব'লে তার ঐ চাঞ্চল্য, আর দ্বিতীয়টি কবিমানসের একটি বোধিময় উপলব্ধি ব'লে তার ঐ ধ্রুবত্ব ও অচঞ্চলতা। যদিচ এই নামতঃ-দ্বিতীয় অনুভবও রূপ থেকে কদাচ বিচ্ছিন্ন নয়। 'উর্বশী' কবিতায় পূর্ণসৌন্দর্য-উপলব্ধির মুখে এই দুই অনুভবের সমন্বয় ঘটেছে; ব্যাকুলতা এবং বিরহ কম নয়, আবার ধ্যানময় স্থিরত্বেরও পরিচয় সেখানে রয়েছে। 'ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড ল'য়ে বাম করে' অংশের মধ্যে সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির উপলব্ধ দুই রূপের সামঞ্জস্য কল্পনা করা হয়েছে। 'বিষ' অর্থে কবিচিত্তকে বিরহ-জর্জর করার প্রকৃতি এবং 'সুধা'-অর্থে ব্যাকুলতা-মুক্তির এবং রসাস্বাদময় তৃপ্তির ব্যঞ্জনা অনুভব করা যায়। সৌন্দর্য-কল্পনার সঙ্গে মিশ্রিত তীব্র বিরহ বা বেদনার ভাব 'সোনার-তরী'র মত চিত্রার 'জ্যোৎস্নারাত্রে' কবিতাতেও সুলভ, যেমন,—

আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তরমন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি,—বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত-যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে নাহি তার সীমা।

এবং

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি— কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর—
......খোলো দ্বার, খোলো দ্বার।
তোমাদের মাঝে মোরে লহো একবার
সৌন্দর্যসভায়।

এই পঙ্‌ক্তিগুলি কবির অপ্রাকৃত সৌন্দর্যবিরহের তীব্রতার পরিচয় দিচ্ছে, অথচ প্রকৃতির শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের অনুভূতি থেকেই যে এ সৌন্দর্য-ব্যাকুলতার উদ্ভব তাও পরিস্ফুট করছে। কবিতাটির শেষে 'বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী জ্যোতির্ময়ী বালা' প্রভৃতি কল্পনায় ঐ সৌন্দর্যব্যাকুলতারই মনঃ-কল্পিত রসমূর্তি কবি প্রত্যক্ষ করছেন।

কবির সৌন্দর্য সম্পর্কিত অনুভূতির উদ্ভব ও বিকাশ পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতঃ চিত্রার এই পরিবর্তন এবং পরিণতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানসীর অনির্দেশ্য নিরুদ্দেশ-ব্যাকুলতা কেমন ক'রে একদিকে প্রকৃতি-ও-মর্ত-বিরহ এবং আর একদিকে সৌন্দর্য-বিরহের জন্ম দিয়েছে, এবং তারপর ইন্দ্রিয়-অনুভূতির মাধ্যমে আগত মানসিক-আবেগযুক্ত চঞ্চল সৌন্দর্য-বিহ্বলতার উপর ধ্যানজ জ্যোতির্ময়ী মূর্তির কিরূপে আলোকপাত ঘটেছে তা বিস্ময়ের ব্যাপার। এই বিবর্তনধারায় আগত কবির সৌন্দর্যনিষ্ঠা কবির রচনাতেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে। কবির ঐ উদ্‌যোগ এবং এই পরিণতি সৌন্দর্যতত্ত্বের বিচারে স্বতন্ত্রতা ও অসামান্যতার দাবি রাখে। বলা যেতে পারে, এখানকার প্রয়োজনসম্পর্কহীন সৌন্দর্য-আরাধনার উদ্‌যোগে আমাদের কবি ইংল্যাণ্ডের প্রি-র‍্যাফেলোইট্ কবিগোষ্ঠীর সগোত্র হয়েও একান্ত ভাবে মৌলিক। এসবের যথাযথ ও বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, আমরা দিগ্‌দর্শন মাত্র সমাধা ক'রে অন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

চিত্রার দু'টি কবিতা—'চিত্রা' এবং 'উর্বশী'—কবির সৌন্দর্য-প্রেরণার অভ্যন্তরে আমাদের নিয়ে যায়। 'চিত্রা' কবিতার দু'টি বিভাগ। প্রথমাংশে পঞ্চভূতাত্মক জগতের শব্দস্পর্শাদির অনুভূতিকে কবি সৌন্দর্যের অলক্ষ্য সঞ্চরণ ব'লে বোধ করছেন। 'অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে' ইত্যাদির মধ্যে কবির রূপের অনভূতি, 'মুখর নূপুর' ইত্যাদির মধ্যে ধ্বনির, 'অলকগন্ধ' ইত্যাদির মধ্যে গন্ধের অনুভূতি বিবৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'জ্যোৎস্নারাত্রে' কবিতার পূর্বে-উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির পুনরনুসরণে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করা যেতে পারে—

১

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি,—কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর ;
কার কেশপাশ হতে খসি পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনাপ্রবাহ। কোথায় গাহিছ গান।
তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান
কিরণকনকপাত্রে সুগন্ধি অমৃত
মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণবিকশিত
পারিজাত—গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া

"এতদিন নিশ্চিত স্থির ক'রে রেখেছিলুম, সৌন্দর্যরচনাই* সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতা মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না। তখন মনে এল, এতদিন যা উল্টো ক'রে বলেছিলুম তাই সোজা ক'রে বলার দরকার। বলেছিলুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।"**

অর্থাৎ বাহ্য বস্তু বা বাহ্য সুন্দর-অসুন্দর অপর একটা অন্তরগত ধারণার বশীভূত হয়ে পড়ল। একে রসবোধও বলা চলতে পারে। অন্যত্র কবি সৌন্দর্য ও সত্যকে এক ক'রে দেখার প্রসঙ্গে বলছেন—"আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা-কিছু জানি, কোনো না কোনো ঐক্যসূত্রে জানি, এবং যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তা-ই সুন্দর।" অর্থাৎ বস্তু-জাগতিক লোক-ব্যবহারে তা মন্দ বা অ-সুন্দর হলেও কাব্যে চিত্রিত হয়ে স্বচ্ছন্দে আনন্দের বাহক হতে পারবে।

উপরে উদ্ধৃত কবির পরিণত বয়সের উক্তি থেকে এই ধারণায় আসা গেল যে ভাববাদী কবির মতে সৌন্দর্য এবং সাহিত্য এক হ'লেও ঐ সুন্দর অন্তরগত একটি নিবিড় ঐক্যবোধের প্রেরণাতেই সত্যরূপ লাভ করে। 'চিত্রা' কবিতায় এই নামতঃ-দ্বিতীয় সৌন্দর্য-প্রেরণায় ঐ নিগূঢ় সৌন্দর্যবোধ বা সত্যবোধের স্বকীয় প্রকাশময় উপলব্ধির (Intuition is Expression) কথাই বলা হয়েছে। কবি প্রথমটি থেকে আত্মবিচারণায় দ্বিতীয়টিতে এসে উপনীত হয়েছেন সত্য, কিন্তু মূলত উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য নেই, একটি অপরটির সঙ্গে একত্র অবস্থান করতে পারে। অর্থাৎ কবিচিত্তের একটি স্থায়ী সৌন্দর্যবোধই কবিকে উভয় ধারণায় অনুপ্রাণিত করেছে এমন কথা অযৌক্তিক হবে না। নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের প্রেরণাও কবির বিশিষ্ট সৌন্দর্যবোধের প্রেরণা, আর সৌন্দর্যের ধ্যানমূর্তিও তারই সৃষ্টি। 'উর্বশী' কবিতায় এই দুইয়ের মিলন ঘটেছে দেখতে পাব। একদিকে কামনাহীন, অপ্রয়োজন সৌন্দর্যসত্তার অচঞ্চল প্রেরণা, অপরদিকে ঐ সৌন্দর্যেরই নিরুদ্দেশ মূর্তির বিরহবিষক্রিয়া

---

* অর্থাৎ নির্দিষ্ট শ্রেণীগত সৌন্দর্যবস্তুর অবলম্বনে রচনা।

** অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র। বস্তুবিশ্বের বিচারে আমাদের দেওয়া ভালোমন্দ সুন্দর-অসুন্দর শ্রেণীভেদ কবি মানতে রাজি নন। যে-কোনো বস্তু, ব্যাপার বা মানুষ কবি-কবিকল্পনায় গৃহীত হয়ে সুন্দর হতে পারে, এমনতর চলিষ্ণু মতবাদের পথিক তিনি।

কবিচিত্তে বাসনার উদ্রেক করেছে। ইংরেজির অদ্বিতীয় সৌন্দর্যের কবি কীট্‌স্‌-এর এই সৌন্দর্য-বেদনায় বিশ্বপরিক্রমণ ছিল না। একটি স্থির প্রশান্ত সৌন্দর্যের ধ্যানমূর্তিকে বিশ্বের কেন্দ্রে স্থাপন ক'রে তার জ্যোতির্ময় আলোকে বিশ্বের তাবৎ বস্তুকে সমগ্রভাবে নিরীক্ষণ করার ও তার সঙ্গে পূর্ণ আত্মিক সংযোগ স্থাপনের ব্যাকুলতাও ছিল না। কীট্‌স্‌ বিশিষ্ট বস্তুতেই কেবল সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং একান্ত পরিতৃপ্ত ছিলেন। তাঁর কেবলা সৌন্দর্য-প্রীতি যদিও দার্শনিকতার স্পর্শমুক্ত, মননশীলতার সঙ্গে অসম্পৃক্ত, এবং নির্দিষ্ট বস্তু দ্বারাই উদ্বোধিত ছিল, তথাপি Beauty is truth, truth beauty—that is all ye know on earth, and all ye need to know—এরকম বলিষ্ঠ ভাষণের থেকে এরূপ অনুমান অসংগত নয় যে, তাঁরও ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি একটি মানসিক সৌন্দর্যবোধের দ্বারাই পরিচালিত ছিল। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যই যে একমাত্র সত্যবস্তু তা সৌন্দর্যরসিক রবীন্দ্রনাথ অন্য জায়গায় বলেছেন—যেমন, 'স্বপ্ন শুধুই মর্তে অমর, আর সকলই বিড়ম্বনা।' ফলত এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কলাকৈবল্যবাদীদের পর্যায়ে দাঁড়াচ্ছেন।

চিত্রার 'পূর্ণিমা' কবিতাটিতে এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আস্বাদনের স্পৃহা দেখা যায়। গ্রন্থের মধ্যে কবি যাকে পাননি, তাকে পেলেন নিসর্গের মধ্যে, বুদ্ধির সংস্পর্শ থেকে মুক্ত একটি বিশুদ্ধ অনুভবরূপে। রবীন্দ্রনাথ এখানে কীট্‌সের মত একই কথা বলেছেন, যদিও দৃপ্ত গদ্যময় ভঙ্গিতে নয়—কাব্যে, উপলব্ধিতে। সৌন্দর্য যে হৃদয়ানুভব,—তাত্ত্বিকতা নয়, কবি তা জানালেন নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে—

এ কী মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্কচিত্ত সৌন্দর্য-উচ্ছ্বাসে
মুহূর্তে ডুবালে।.........আমি গৃহকোণে
তর্কজালবিজড়িত ঘন বাক্যবনে
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ অক্ষরের পথে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে
তোমারি সন্ধানে।

অপরপক্ষে, আদর্শবাদী ভাবুক শেলির সৌন্দর্য-প্রতিমা, যাকে তিনি Intellecfual Beauty আখ্যায় অভিহিত করেছেন, তা তাঁর বিশিষ্ট সমাজ, জীবন, প্রেম সম্পর্কে একটি আদর্শমূলক ধারণারই কল্পিত মূর্তি এবং সংজ্ঞা। তা কেবল-সৌন্দর্য নয়। এই কেবল-সৌন্দর্যপ্রীতিতে শেলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আকাশ-পাতাল পার্থক্য দৃষ্ট হ'লেও কীট্‌স্‌-এর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মিল নেই। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যকল্পনার

সহগামী সমগ্রতাবোধ কীট্‌স্‌-এর পরবর্তী স্বাভাবিক পরিণাম। এই সব কারণে আমাদের আরো মনে হয় যে উনিশ শতকের পশ্চিমের বিখ্যাত কবিদের রোম্যাণ্টিক্‌ ভাবুকতা যেন রবীন্দ্রনাথে পূর্ণতা লাভের জন্য তখন প্রতীক্ষা করছিল। রবীন্দ্রনাথের অরূপ-চেতনায় এবং অরূপ ও জীবনের সমন্বয়ে আমাদের এরূপ ধারণার শেষ সমর্থন পাওয়া যাবে।

সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার মিশ্রণে শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত 'উর্বশী' কবিতাতেই কবির সৌন্দর্য-বাসনার পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছে। ঐ কবিতাটির রসবিচারের পূর্বে আমাদের দেখতে হবে যে কবির উপলব্ধ রসের স্বরূপ যাই হোক, তাকে আবৃত ক'রে রয়েছে একটি নারীর সৌন্দর্য। হোক সে অমানবী, তবু, এই নারীরূপের আবরণই 'উর্বশী' কবিতার একমাত্র কৌশল বা আর্ট। নতুবা কবির সৌন্দর্যবোধের প্রকার গদ্যের ভাষায় কি কীট্‌স্‌-এর উপরি-উক্ত পঙ্‌ক্তিগুলির মত আধা-গদ্য আধা-কবিতার নিছক তত্ত্বের ভঙ্গিমাতে জ্ঞাপন করলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। বস্তুতঃ এই অপার্থিব নারীরূপকল্পনাই পাঠকচিত্তে এই কবিতাটির প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ উদ্বোধিত করেছে। উর্বশী ছাড়া কবির অন্য সমস্ত সৌন্দর্য-সম্পর্কিত কবিতার মধ্যেও নারীরূপের কল্পনা রয়েছে। 'মেঘদূত' কবিতায় "মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা, কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা" থেকে আরম্ভ ক'রে সোনার-তরী ও নিরুদ্দেশ-যাত্রার 'বিদেশিনী', 'মানস-সুন্দরী' এবং চিত্রার প্রশান্তহাসিনী 'বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী' সবই নারীরূপের কল্পনা। সৌন্দর্যসত্তাকে বাস্তব নারীরূপে দেখার আগ্রহ কী তীব্র তা মানস-সুন্দরীর নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি-গুলি থেকে বোঝা যাবে—

মানসরূপিণী ওগো বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা, ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমিই কি মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ ল'য়ে
অনিন্দ্য সুন্দরী ? * *
* * সেই তুমি
মূর্তিতে কি দিবে ধরা ?……
সব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি ?
* * *
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—

পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি,
প্রণয়ে বিকশি ?

সর্বত্র এই নারীরূপমণ্ডনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ-সম্পর্কিত কবিতাগুলি যে অপূর্বতা ও বিস্ময়কর কাব্যগুণ লাভ করেছে তা পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন। ভারতীয়ের চোখে উর্বশীতে নারীরূপের চরমোৎকর্ষ আছে—তাই কবি উর্বশীর কল্পনাই গ্রহণ করলেন। কবিতাটির ঐরূপ নামকরণের সঙ্গে ঐ অপ্সরের বহুশ্রুত অলৌকিক রূপের দিকটি লক্ষ্যে না রাখলেই নয়।

বস্তুত এই অপ্সরোনারীরূপ-কে, অপার্থিব বাসনার বস্তুরূপে চিত্রিত করতে কবি নিজ কল্পনারও চরমোৎকর্ষ দেখিয়েছেন, কিন্তু ভারতীয় কবিদের উর্বশী-কল্পনার উপর ভিত্তি করেই তাঁকে এই সৌন্দর্যমূর্তি গ'ড়ে তুলতে হয়েছে। প্রধানভাবে কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকে উর্বশীর অলোকসামান্য, কল্পনাতেও অনধিগম্য রূপ বর্ণিত হয়েছে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের উর্বশীতে বহুল পরিমাণে কালিদাসের উর্বশীর রূপ ও ভঙ্গি মিশ্রিত আছে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের নারীরূপমোহ অনায়াসেই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সৌন্দর্য-বাসনায় কবির আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই, এবং কবিতাটি স্ববিরোধী ভাবযুক্ত হয়েছে এমন মনে করাও বহিদৃষ্টিপ্রবণতার পরিচায়ক। সত্য বটে, রসজ্ঞ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কর্তৃক প্রদর্শিত উর্বশীর কয়েকটি পঙ্ক্তিতে ইংরেজ কবি Swinburne-এর Aphrodite-এর কল্পনার প্রভাব রয়েছে (দ্বিতীয় স্তবক দ্রঃ), কিন্তু এই ক্ষীণ প্রভাব বিস্ময়াশ্রিত কাব্যকলার মণ্ডনেরই সহায়ক হয়েছে,—তাও সমগ্রভাবে নয়, সমগ্রভাবে কালিদাসই এই নারীরূপকল্পনার প্রেক্ষাপটে আলোছায়ার মত অবস্থান করছেন। উর্বশী কবিতার সৌন্দর্যনিষ্ঠার আধার—রূপকল্পনার এই চরমোৎকর্ষ সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে এর তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করেছে ; এবং কবিকল্পনার এই স্বরূপ সম্পর্কে সম্যগ্‌বোধের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি ব'লেই বহিদৃষ্টিতে কবিতাটি কারও কাছে স্ববিরোধীও হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ আন্তরিক কেবল-সৌন্দর্য-প্রেরণাই কবির কবিতার বিষয় হলেও রূপাশ্রয়ণে—ব্যঞ্জনায় নয়, এর বাহ্য অর্থে কল্পিত বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। কবিতাটির রূপনির্মাণ এত সুন্দর ও সম্পূর্ণ যে কেউ যদি এমন তর্ক করেন যে কবিতাটি বস্তুত উর্বশী সম্পর্কেই কবির স্তুতি, নিরুপাধি বা সোপাধি কোনো সৌন্দর্যতত্ত্ব এতে নেই, তাহলে সে-তর্কের সাক্ষাৎ জবাব

দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। † কেবল কয়েকটি পঙ্‌ক্তির ব্যঞ্জনা এবং শেষ স্তবকটির ক্ষীণ আর্তি থেকে কবির অভিপ্রায় উপলব্ধ হতে পারে।

কবিতাটিতে উর্বশীর কল্পনায় তার অলৌকিক রূপ এবং অদম্য পলায়নপর স্বভাব এই দু'টি বস্তুর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি মোটামুটি উর্বশী সম্পর্কে বৈদিক ধারণা। পুরূরবা পলায়মানা উর্বশীকে যখন স্ত্রীরূপে থাকবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছে তখন উর্বশী বলছে, 'আমি বায়ুর মত দুর্লভ' 'স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না, এদের হৃদয় নেকড়ের হৃদয়ের তুল্য।'* উর্বশীর এই স্বভাবের সঙ্গে মিলেছে তার ভুবনমোহন রূপ। 'উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা', অথবা 'স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী' প্রভৃতি কবির উক্তি থেকে অনুমান হয়, বৈদিক উষাও কিয়ৎপরিমাণে উর্বশীর রূপে স্বীয় রূপ দান করেছে। যেমন, উষা সম্পর্কে বহু বর্ণনার মধ্যে একটি মন্ত্রে রয়েছে—

অব স্যূমেব চিন্বতী মঘোনী
উষো যাতি স্বসরস্য পত্নী।
স্বর্জনন্তী সুভগা সুদংসা
আন্তাদ্দিবঃ পপ্রথ আ পৃথিব্যাঃ। (ঋগ্বেদ ৩/৬১)

অর্থাৎ "ধনবতী উষা সূর্যের পত্নী যেন তিমিরাংশুক উন্মোচন করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে। স্বকীয় দীপ্তি বিস্তার করতে করতে সৌভাগ্যবতী শোভনা উষা স্বর্গ ও পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে।" কিন্তু উর্বশীর রূপে ও ভাবে যে অপার্থিবত্ব তার মূলে বিক্রমোর্বশীয়ের উর্বশীর রূপ ও চরিত্রই প্রধানভাবে কাজ করেছে মনে হয়। কবি কালিদাস যদিও নাটক রচনা করতে গিয়ে উর্বশীকে পরিশেষে অনেকটা গৃহরমণীর স্বভাব দিতে বাধ্য হয়েছেন, তথাপি তাঁর রূপাঙ্কন ও চরিত্রবর্ণনার এমনি বৈশিষ্ট্য যে উর্বশীকে ঠিক মানবী ব'লে মনে হয় না। অর্থাৎ বিক্রমোর্বশীয়ের মধ্যেই উর্বশী প্রায় একটি অপার্থিব সৌন্দর্যসত্তার রূপ আগেই পরিগ্রহ করেছে এমন বললে অন্যায় হবে না। কালিদাসের রোম্যান্টিক কবি-স্বভাবই এজন্য দায়ী। যেমন, উর্বশীর রূপবর্ণনায় অতিশয়োক্তির চূড়ান্ত ক'রে রাজা বলছেন,—এর সৃষ্টিতে কান্তিমান্ চন্দ্র স্বকান্তি দান করেছে,

† আসলে সৌন্দর্য নিরুপাধি কোনোকালেই হতে পারে না, তা অযৌক্তিক, সোনার পাথরবাটির মত শোনায়।

* ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল—দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি।...
ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি, সালাবৃকাণাং হৃদয়াণ্যেতাঃ।

স্বয়ং মদন যেন একে আদিরসের মায়া-বিগ্রহ ক'রে গ'ড়ে তুলেছে, বসন্ত যেন তার সমস্ত ফুলের সার দিয়ে একে সৃষ্টি করেছে। 'ত্বয়া বিনা সোঽপি সমুৎসুকো ভবেৎ' ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে রাজা উর্বশীর রোম্যান্টিক্ বেদনাজনকত্বেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্যত্র বিদূষকের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যও উর্বশীর অলৌকিকত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। রাজা বলছেন—

আভরণস্যাভরণং প্রসাধনবিধেঃ প্রসাধনবিশেষঃ।
উপমানস্যাপি সখে প্রত্যুপমানং বপুস্তস্যাঃ ॥

'এর দেহ আভরণেরও আভরণ, প্রসাধনেরও প্রসাধন হওয়ার যোগ্য। সৌন্দর্যের উপমানবস্তু যা আছে এ তারও উপমান হতে পারে'। এও হল অতিশয়োক্তি সহকারে উর্বশীর অপার্থিব রূপ বর্ণনের প্রয়াস। নাটকটিতে এমন বহুস্থান আছে যেখানে উর্বশীর বিমান-গতি, পলায়নপরতা এবং অপ্রাপ্যতা বর্ণিত হয়েছে। 'অচিরপ্রভাবিলাসিতৈঃ পতাকিনা' 'গূঢ়ং নূপুরশব্দমাত্রমপি মে কান্তং শ্রুতৌ পাতয়েৎ' প্রভৃতি উক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা, বিদ্যুৎ-চঞ্চলা' বা 'মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে' প্রভৃতি মিলিয়ে দেখার যোগ্য হতে পারে। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রাজা যেখানে উর্বশীকে হারিয়ে ফেলেছেন সেখানে উর্বশীও মানবীরূপ একেবারে ত্যাগ করেছে এবং রাজাও উর্বশী-বিরহে রোম্যান্টিক কাতরতা অনুভব করেছেন।

যাই হোক, কালিদাসের উর্বশী নাটকের খাতিরে মানবীরূপে চিত্রিত হ'লেও, তার মধ্যে নানান্ জায়গায় অপার্থিবত্বই অভিব্যক্ত হয়েছে। পুরূরবার সঙ্গে তার মিলন হ'লেও তার স্বভাবের অবন্ধনই দর্শকের চিত্তে প্রধান ভাবে রেখাপাত করে। রবীন্দ্রনাথের উর্বশীও কোনো সম্পর্কের মধ্যে ধরা দিতে চায় না। সে শুধু 'ইন্দ্রের সভার অমৃতপান-সখী', সে রূপের দ্বারা প্রলুব্ধ করে, কিন্তু কারো কাছে সম্পূর্ণ ধরা দেয় না। স্বর্গের দেবতারা তার ক্ষণিক সঙ্গলাভ করতে পারেন বটে, কিন্তু মর্তের মানুষের কাছে সে একেবারেই অপ্রাপণীয়। মাত্র একজন সৌভাগ্যবান্ কিছুদিন তার সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছিলেন, আবার নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যক্তও হয়েছিলেন। এই নিয়ম-লঙ্ঘন তার অতীব দুষ্প্রাপ্যতারই পরিচয় দেয়, তথা মর্তের মানুষের চিত্তকে তীব্র বিরহে ব্যাকুল করে। অপ্সরদের আর একটি বিশেষ ধর্ম মানুষের কাছে পরিচিত। স্বর্গের চক্রান্তে তারা কঠোর তপস্বীদের ধ্যানভঙ্গ ক'রে চ'লে যায়। উর্বশী-চরিত্রের এই লক্ষণগুলি রবীন্দ্রনাথের কল্পিত সৌন্দর্যের নারী-মূর্তির কল্পিত আচরণের সঙ্গে মিলে যায়। সোনারতরী ও নিরুদ্দেশ-যাত্রার রহস্যময়ী বিদেশিনী কবিকে কেবল পর্যাকুলই করেছে। তার স্পর্শলাভের জন্য কবি ব্যাকুলকণ্ঠে আবেদন করেছেন, কিন্তু স্বভাববশত সে প্রত্যুত্তর দেয়নি। আবার, কঠোর কর্তব্যে রত মানুষকে যে-প্রকৃতির দূত এসে বিভ্রান্ত

করে, কাজ ভুলিয়ে সৌন্দর্যে বিহ্বল ক'রে তোলে, সে এই নন্দনেরই নন্দিনী, প্রকারান্তরে—উর্বশী। 'মানস-সুন্দরী' কবিতায় কবি বলেছেন—

বারে বারে
শৈশব কর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালাকারা হতে।

এই হ'ল কবির তপোভঙ্গ। উর্বশীর সঙ্গে পূর্বেকার মানস-সুন্দরীর অন্তর-ধর্মগত মিলনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে উভয়ের এই বন্ধনহীনতা এবং পার্থিব-সম্পর্কশূন্যতাও তুলনীয়।

যেহেতু প্রত্যক্ষ কোনো লৌকিক সম্পর্কে আবদ্ধ নয়, সেইহেতু উর্বশীর প্রতি তথা মানস-সুন্দরীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ নিষ্কাম। পূর্বেই বলেছি, মেনকার সঙ্গে বিশ্বামিত্রের বা উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার যে সকাম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল তা নিয়ম-লঙ্ঘনের দ্বারা নিয়মকেই সিদ্ধ করছে এবং সেখানেও কোনো স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সন্তানকে ত্যাগ ক'রে নিষ্ঠুরভাবে চ'লে যাওয়ার মধ্যেই তাদের স্বরূপের প্রকাশ, ক্ষণিকের ধরা দেওয়ার মধ্যে নয়। উর্বশী সম্পর্কে মানুষের এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির যে-বাসনা তা দেহজ বা কামজ নয়, ইন্দ্রিয়ানুভবের মধ্যবর্তী হয়ে শেষ পর্যন্ত তা অবৈষয়িক আকর্ষণ মাত্র। কবি উর্বশী সম্পর্কে আলোচনায় যুক্তিযুক্ত নির্দেশই দিয়েছেন যে 'বাসনা' অর্থে আমরা যেন 'লালসা' মনে না করি অর্থাৎ যে-অপূর্ব নারীরূপ আমাদের সৌন্দর্যস্পৃহার আধার তা বাসনাব্যথিত করলেও সকামদৃষ্টি-কলুষিত হবে না। বস্তুত কবির সৌন্দর্যকল্পনা নারী-রূপকে আশ্রয় করলেও যেহেতু এ-নারী অমানবী, অপ্রাকৃত (তু°—'মা ভবং মানুসীধম্মং দিব্বাএ সম্ভাবেদু'—অর্থাৎ, 'দিব্যনারীতে মানুষীর ধর্ম কল্পনা কোরো না'—বিদূষক, বিক্রমোর্বশীয়), ন ভূতো ন ভবিষ্যতি কবিকল্পনার বস্তুমাত্র, সেইহেতু এর সঙ্গে কোনো স্থূল কামনার সম্পর্ক স্থাপিত হতেই পারে না। এইজন্য এই সৌন্দর্য (তথা উর্বশী) সম্পর্কে সবচেয়ে অধিক উপলব্ধ সত্যটিকেই কবি প্রাধান্য দিয়ে কবিতার প্রারম্ভে স্থাপন করলেন—'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ।'

প্রয়োজন-সম্পর্করহিত একটি অকুণ্ঠিত সৌন্দর্যমূর্তিরূপে উর্বশীর স্বচিত্তে অধিষ্ঠান বর্ণনা ক'রে কবি এর রূপ, আচরণ ও প্রভাব সম্পর্কে যে কল্পনাকুশলতা দেখিয়েছেন তার সাদৃশ্য দুর্লভ। কবির কল্পনা উর্বশীর চিত্র আঁকতে স্বর্গ থেকে মর্ত, আকাশ থেকে সমুদ্রতলের গভীরতা পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। কবি এই উদ্দাম কল্পনার দ্বারাই উর্বশীকে সাধারণ

নারীরূপের ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছেন, এবং অতিমর্ত ভাববিহ্বলতার মধ্যে স্থাপন করেছেন, ফলতঃ উর্বশী বিশেষ নারী না হয়ে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত একটি অপার্থিব সৌন্দর্যসত্তার রূপ পরিগ্রহ করেছে। বসন্তপ্রাতে যার আবির্ভাবে সমুদ্র লহরী-ফণা অবনত ক'রে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল, 'আঁধার-পাথারতলে' 'প্রবাল-পালঙ্কে' নিদ্রায় এবং মণি নিয়ে খেলায় যার দিন কেটেছে, যে মুনির ধ্যান ভঙ্গ ক'রে ক্ষিপ্রপদে নূপুর-ধ্বনি সহকারে আকাশ-পথে চলে যায়, যার মদিরগন্ধে বাতাস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং যার নৃত্যের পদবিক্ষেপে মর্তে সিন্ধু তরঙ্গিত হয়, ধরণীর শস্যশ্যাম অঞ্চল কম্পিত এবং আকাশে তারা-রূপে যার স্তনভারচ্যুত মণি ভ্রষ্ট হয়—সে নারী যে মানবী নয় এবং কোনো নির্দিষ্ট শরীরী রূপ-বর্ণনার মধ্যে ধরা পড়ে না, তা অতি স্পষ্ট। ফলে এই অপরূপ নারীরূপ সমস্ত সম্পর্ক-রহিত এক অতিবিস্ময়কর কল্পনার বস্তু হয়ে পড়েছে।

কালিদাসের উর্বশী-রূপ-বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার মিলের কথা আগেই বলেছি। 'ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে' ইত্যাদিতে গ্রীক ধারণা ও সুইনবার্নের প্রভাব কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন। আমাদের মনে হয়, বাইরে সুইনবার্নের সঙ্গে রূপগত মিল হয়ত আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনাটি কবির স্বকীয়। কবিকল্পিত এই সৌন্দর্যের বিশিষ্ট প্রকৃতিই ঐ পঙ্‌ক্তিটিতে বিবৃত হয়েছে। এই সৌন্দর্য যেমন একদিকে বিরহব্যাকুল ক'রে তোলে, তেমনি আর একদিকে ধ্যানজ প্রশান্তি নিয়ে আসে। এই অংশের সুধাপাত্রধারিণী নারীকে লক্ষ্মী ব'লে কল্পনা করা চলে না, এবং নারীর দ্বিবিধরূপও এখানে বর্ণিত হয়নি। কারণ, উর্বশীতে নারীতত্ত্ব নেই এবং কল্যাণধর্মী পৌরাণিক লক্ষ্মীর কল্পনা অত্যন্ত অসংগত, যদিও প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত 'লক্ষ্মী' ও 'শ্রী' শব্দ সৌন্দর্যেরই বাচক। আবার এমনও বলা যেতে পারে যে 'প্রেয়সী' বিশেষণ ব্যবহারের দ্বারা এবং 'বিশ্ববাসনা' শব্দ প্রয়োগের জন্যও স্ববিরোধী ভাবের প্রশ্রয় ঘটেছে। কিন্তু আমাদের ধারণায় 'প্রেয়সী' বিশেষণ 'অত্যন্ত প্রিয়' এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে আর বাসনা বলতে সেই তীব্র অভিলাষ যা অকারণেই মানুষের মধ্যে বর্তমান তা-ই লক্ষিত করা হয়েছে—কামজ দেহাভিলাষ নয়। নইলে 'বিশ্ববাসনার অরবিন্দ' এই রূপকটিই বা কবি ব্যবহার করবেন কেন, আর 'অতি লঘুভার' বিশেষণেরই বা সার্থকতা কী? 'লঘুভার' শব্দটি একান্ত সংকেতময়; আদিম সৌন্দর্যের এই পূর্ণতার স্পর্শ মানুষ পেতে পারে মাত্র, তাকে সমগ্রভাবে পাবার উপায় নেই—এই ব্যঞ্জনা।

সুতরাং আমদের মনে হয়, উর্বশীর এই রূপকল্পনার আশ্রয়ে কবিমানসের অতি-সূক্ষ্ম স্থির সৌন্দর্যানুভূতিই ব্যঞ্জিত হয়েছে। যে-কোন রূপের আশ্রয়ে কবির এ ধরনের অনুভব প্রকাশলাভ করুক, যদি এ বিষয়ে কবির নিষ্ঠা

ঐকান্তিক হয়, কবি যদি রূপসর্বস্ব না হন অর্থাৎ রূপ যদি অনির্বচনীয় রসীভবনযোগ্যতা লাভ করে তাহ'লে সাহিত্য পরীক্ষার কালে ঐ কাব্যের বহিরঙ্গের বিচারে সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। বিশ্বের বিচিত্র ও বিভিন্ন বস্তুর মাধ্যমে অনুভবনীয় ঐ সমগ্র সৌন্দর্যমূর্তি (যা কবিহৃদয়ের বিশিষ্ট সৌন্দর্যবোধেরও প্রতিরূপ) আমাদের বহু-পরিচিত উর্বশীর রূপাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব'লেই একদিকে সাধারণভাবে নারীরূপমোহ এবং অপর-দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের নারীজন্য প্রত্যক্ষ বাসনাময়তা এর 'বিভাব' নির্মাণে স্বতই দেখা দিয়েছে। তথাকথিত abstract সৌন্দর্যের তত্ত্বে দাঁড়িয়ে কবির রূপনির্মাণের এই অসামান্যতার দিকটি সম্পর্কে সচেতন না হ'লে ভুল ঘটতে পারে। রবীন্দ্র-উপলব্ধ সৌন্দর্য রূপনিরপেক্ষ বা ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ নয়। এক হিসাবে সমস্ত সৌন্দর্যই এ্যাবস্‌ট্র্যাক্ট ('সাহিত্যের পথে'), তা যে-কোন রূপের আশ্রয়ে কবিহৃদয়ে উদ্বোধিত এবং বাইরে প্রকাশিত হোক না কেন। কারণ, কবিমানসের আনন্দচৈতন্যে অনির্দেশ্য প্রেরণারূপেই এর স্থিতি। এর জাগরণে ও আস্বাদে ব্যক্তিস্বরূপের ঊর্ধ্ব বা নামরূপের অতীত একটি অবস্থার উদ্ভব, যার বর্ণনায় বৈষ্ণব দার্শনিকেরা 'স্বার্থগন্ধহীন' 'অকৈতব' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, কবিরা বলেছেন 'ন সো রমণ ন হাম রমণী' অথবা 'রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়'। সৌন্দর্যদর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ, লৌকিকতা ও বিচারবোধের অতীত এই স্বপ্নাবস্থা সৌন্দর্য-সমালোচনায় অধ্যাত্মবাদী ক্রোচের উপলব্ধির সঙ্গে কিছুটা মিলে যায়। রবীন্দ্রনাথের মত ক্রোচেও সাহিত্য বা সৌন্দর্যকে খাঁটি সত্যবস্তু ব'লে মনে করেন, ধর্মসংস্কার বা বুদ্ধিগত এবং স্বার্থমূলা নীতির সঙ্গে প্রকাশ-ধর্মের মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করেন; যদিও, আত্মস্ফুরণই কাব্য, সুতরাং Expression (বা Intuition) ছাড়া ব্যবহারিক রূপশিল্পের দিক বলতে ভিন্ন এবং বিশেষ কোনো বস্তু সাহিত্যকলায় থাকতে পারে না, ক্রোচের এইসব ধারণার সঙ্গে কবির উপলব্ধির মিল সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। এই প্রকাশ-স্বরূপ কলাবস্তুর সঙ্গে ব্যবহারিক শিল্পকৌশলের গৌণ সম্পর্কের বিষয়ে ক্রোচে (Æsthetic—Douglas Ainslie অনূদিত) বলছেন—

"...But the practical which they aim is not Æsthetic, nor within Æsthetic; it is *outside and beside* it; and although often found united, they are not united necessarily by the bond of identity of nature.

The aesthetic fact is altogether completed in the expressive elaboration of impressions. When we have achieved the word within us, conceived definitely and vividly a figure or a statue,

or found a musical motive, expression is born and complete; there is no need for anything else. If after this we should open our mouths—*will* to open them to speak, or our throats to sing ……this is all an addition, a fact which obeys quite different laws from the former……It is usual to distinguish the internal from the external work of art; the terminology seems to us to be infelicitous, for the work of art (the aesthetic work) is always internal; and what is called external is no longer a work of art".

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-সমালোচনায় সাহিত্যের প্রকাশ এবং শিল্পসৌন্দর্যের রূপনির্মিতির উপর জোর দিয়েছেন নানা স্থানে। এবং সংসাহিত্যের রূপশিল্প ও রসাত্মা যে একই কবিব্যাপারের পৃথক ধর্ম মাত্র এ ইঙ্গিতও নানা ক্ষেত্রেই দিয়েছেন। তবে শিল্প-সাহিত্যের বিশুদ্ধতা বিষয়ে কবির ধারণা ক্রোচেরই সদৃশ। ক্রোচে নিম্নলিখিতভাবে কলাবস্তুর উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে বোঝাচ্ছেন—

"…The search for the end of art is ridiculous, when it is understood of art as art. And since to fix an end is to choose, the theory that the content of art must be *selected* is another form of the same error. A selection among impressions and sensations implies that these are already expressions, otherwise how could a selection be made among the continuous and indistinct? To choose is to will, to will this and not to will that, and this and that must be before us, expressed. Practice follows, it does not precede theory, expression is free inspiration."

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকলার এই উদ্দেশ্যনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে 'সাহিত্যের পথে' পুস্তকে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এদেশীয় প্রাচীন আলংকারিকেরাও সৌন্দর্য, ধ্বনি বা রস ছাড়া সাহিত্যের উপর কোনো উদ্দেশ্য আরোপ করেন নি।* ক্রোচে যাই বলুন, 'উর্বশী'র রসপ্রত্যক্ষ ও শব্দার্থ-শরীর এতই

* তু°—আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবাহ সাধু
তস্মৈ নমঃ স্বাদপরাঙ্মুখায় ॥—'দশরূপক'এ ধনঞ্জয়।

নিরবচ্ছিন্নভাবে একাত্ম যে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে ধারণার মধ্যে আনা যায় না। আর এর অনায়াস-নির্বাচিত দুর্লভ চিত্র-পরম্পরা, ধ্বনিময় শব্দ-সংঘাত, স্তবের ব্যঞ্জনা-অনুগত ছন্দ ও স্তবকবন্ধন কবিতাটিকে বাঙলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ Ode-এর মর্যাদা দিয়েছে। বলা যেতে পারে সংযম ও সংহতি গুণে এটি গীতিকাব্যের ক্লাসিক রচনা।

কবিতাটির প্রথম স্তবকে উর্বশীর চারিত্র্যে লৌকিকতা-বিরোধ দেখানো হয়েছে। সে কারোর স্বকীয়া নয়, তার কুণ্ঠা-লজ্জা দ্বিধা-সংকোচ নেই। দ্বিতীয় স্তবকে উর্বশীর স্বয়ম্প্রকাশ আবির্ভাবের অতিলৌকিক দেশকাল-পরিবেশ। গ্রীক পুরাণ ও কাব্য এই অংশের বিস্মিত কবিকল্পনার সহচর হয়েছে। তৃতীয় স্তবকে উর্বশীর কল্পিত শৈশবের সন্ধানে রূপকথারাজ্যে প্রবেশ করেছেন কবি। চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকে উর্বশীর অলোকসামান্য রূপ ও আত্মবিহ্বল নৃত্যপরতার প্রভাব কয়েকটি নিসর্গচিত্রকল্পে বর্ণনার প্রয়াস। ষষ্ঠ স্তবকে উর্বশীর সঙ্গলাভের জন্য স্বর্গমর্তবাসীদের বেদনাকাতর সতত-স্থায়ী বাসনার পরিচয়। এই তিন স্তবকে এবং পরের স্তবকগুলিতেও এদেশীয় পুরাণ, বিশেষত কালিদাসের কাব্য নাটক একটি আধুনিক রোম্যাণ্টিক কল্পলোকের পটভূমি প্রস্তুত করেছে। কবিতাটির শেষ দুই স্তবকে উর্বশী সম্পর্কে কবির বিরহ ও রোম্যাণ্টিক ব্যাকুলতা বর্ণিত হয়েছে। এখানে স্পষ্টতই উর্বশী তার নারীরূপ ও নারীপ্রকৃতি ত্যাগ না করেও সৌন্দর্যবিরহোদ্দীপক একটি সত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে ;
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রুরাশি।

এই তীব্র বিরহ-ব্যাকুলতার স্বরূপ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। চিত্রায় এই বিরহব্যাকুলতা ও প্রশান্ত সৌন্দর্যরসানুভব উভয়ে মিশে কবির সৌন্দর্যবোধ-সম্পর্কে একটি স্থির ও বিশিষ্ট আদর্শের জন্ম দিয়েছে। †

সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির উপলব্ধ অপ্রয়োজনের বা কামসম্পর্কহীনতার তত্ত্বটি কবি স্পষ্টভাবে বললেন 'বিজয়িনী' এবং 'আবেদন' কবিতায়। বিজয়িনী কবিতায় কবি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন কালিদাস ও বাণভট্টের অনুসরণে। প্রাচীনের রূপধর্ম ও আধুনিক ভাব-

† এইসব কবিতার বিশুদ্ধ সৌন্দর্যাশ্রয়ী আলোচনার জন্য লেখকের "চিত্র-গীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সত্যের মিশ্রণ এইসব কবিতায় লক্ষণীয়। এখানেও নারীরূপের কল্পনার মধ্যেই সৌন্দর্যের সার প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। পরাভূত মদনের এই চিত্রটি পূর্বেকার 'আবেদন' কবিতায় ইতিমধ্যে ভিন্নরূপে ব্যক্ত হয়েছে মাত্র। 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার', এবং 'অকাজের কাজ যত, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে প্রয়োজন-সম্পর্ক-রহিত সৌন্দর্যের অনুরাগী কবির বাসনা প্রকাশিত হয়েছে। 'বিজয়িনী'র মত 'আবেদন' কবিতার মহারানী ও তাঁর পরিবেশ চিত্রণে কবি প্রাচীন সাহিত্যের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী চিত্রপরম্পরা কল্পলোকপ্রয়াসী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এসব থেকে বেশ বোঝা যায়, সৌন্দর্যস্বপ্ন-বিলাসে কবি কী পরিমাণ প্রাচীন সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল হয়েছিলেন। পরের বহু কবিতাতেও কবি এই উপলব্ধিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, এ দৃষ্টি art for art's sake-এর দৃষ্টি। পরবর্তীকালে সাহিত্যবিচারেও কবি রসকে চরম সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন দেখতে পাই। বিজয়িনী কবিতার যা-কিছু কাব্যরস ঐ সৌন্দর্যের আদর্শ নারী-রূপসৃষ্টিতে পাওয়া যায়। উপসংহারের তত্ত্বটুকু কবির উপলব্ধ সত্যের ব্যঞ্জনাময় বিবৃতি মাত্র—

> * * পরক্ষণে ভূমি-'পরে
> জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে,
> নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
> সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
> তূণ শূন্য করি।

চিত্রা কাব্যে কবির পূর্বতন রোম্যান্টিক প্রবণতাগুলির পূর্ণতা আর এক দিক থেকে ঘটেছে। এ হ'ল কবির উপলব্ধ মর্ত-বিহ্বলতার ও সাধারণ মর্ত-প্রীতির স্থির মানবপ্রীতিতে পরিণাম। এই মানবপ্রীতির বাস্তব সংঘাত-ক্ষুব্ধ জীবনের চিত্র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়, এবং প্রশান্ত, করুণ, কোমল জীবনচিত্র—'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি কবির মর্ত-প্রদক্ষিণের পদক্ষেপে দিক্-পরিবর্তনের সুস্পষ্ট চিহ্ন বহন করছে। এর পূর্বেকার 'বসুন্ধরা' কবিতায় প্রগাঢ় প্রকৃতিপ্রীতির সঙ্গে যদিচ মানব-প্রীতি মিশ্রিত রয়েছে,—যেমন নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

> ঘরে ঘরে
> কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
> পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
> কিছু কি রব না আমি।

তথাপি এই আবেগ-উচ্ছ্বসিত ক্ষীণ মানবজীবনকথার কাল্পনিকতা-অতিরিক্ত তেমন বাস্তব কোনো আবেদন নেই। 'বসুন্ধরা'য় বহুধা বিচিত্র ও ব্যাপক নিসর্গই কবির অবলম্বন, কেবল মানুষ নয়। কড়ি-ও-কোমলের 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' কবিতাও কবির বাস্তব মানবপ্রীতির প্রথম প্রকাশ ব'লে গৃহীত হতে পারে না, কারণ গভীর মর্তউপলব্ধির ভিত্তিতে তা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। তা ছাড়া, মানবীয়তার আদর্শে উদ্দীপ্ত কবির দুঃখবরণ ও আত্মবিসর্জনের এহেন উৎসাহ 'এবার ফিরাও মোরে'র পূর্বে আর কোথাও দেখা যায়নি।

সোনারতরীর 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় ('এবার ফিরাও মোরে' রচনার প্রায় এক বৎসর পূর্বে লেখা) মানবজীবনের বাস্তব সংঘাতের কথা অতি ক্ষীণভাবে কবির চিত্তে ধ্বনিত হ'লেও তার অনুভূতি এত অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ (যার জন্যে কবিতাটিকেও উন্নত স্তরের বলা যায় না) যে, এই কবিতাটিকে রবীন্দ্র-কাব্যজীবনে পরিবর্তনের নির্দেশক বিশেষ কবিতা ব'লে অভিহিত করা যায় না। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার আর্ত মানবের জন্য তীব্র বেদনাবোধ, গতির মুখে চলমান মানবজীবনের পূর্ণতা সম্পর্কে একটি স্থির আদর্শবোধ এবং উদার কল্পনা ও বলিষ্ঠ অসাধারণ ভঙ্গি কাব্য হিসাবেও একে প্রথম স্তরে উন্নীত করেছে। এই বিশিষ্ট কবিতাটিতেই যে তাঁর মানব-জীবনবোধের প্রারম্ভ সে-সম্পর্কে কবি 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে বলছেন ঃ

"বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সেদিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। ······এই বড়ো আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি সোনারতরীর 'বিশ্বনৃত্যে'—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা।

কিন্তু এতেও সেই বাজনার সুর··············যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রেয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি চিত্রায় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে।············এর পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল।"

নিসর্গ থেকে মানবজীবনের বাস্তবতায় এই যে উত্তরণ, এ কবির নব-জাগরিত সমাজ-অনুগত আত্মবোধের পরিচয় ব্যক্ত করছে। রূঢ় বাস্তবে কবির আকস্মিক পরিবর্তন সৌন্দর্য-স্বপ্ন-নিলীনতার প্রতিঘাত রূপেই এসেছে। এই নূতন আত্মবোধ কবিকে আত্মবিকাশের ধারণায় কিভাবে নিয়ে গেছে তা আমরা অল্প পরেই অন্তর্যামী-জীবনদেবতার আলোচনায় দেখব। আত্মবিকাশ সম্পর্কিত নূতন ধারণার মধ্যেই কবিকে পূর্ব অনুভূতিগুলির পূর্ণতা বিষয়ে উল্লেখ করতে দেখা যায় ও বোঝা যায় যে রবীন্দ্র-প্রতিভার সামগ্রিক বিকাশ আরম্ভ হ'ল—যার মূলে রয়েছে 'এবার ফিরাও মোরে'র এই পথ-পরিবর্তন। কবিতাটিতে কবির সমাজজীবনবোধে উত্তরণের ইতিহাস এইভাবে বর্ণিত রয়েছে—

> এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
> হে কল্পনে, রঙ্গময়ী।..........
> ....বাহিরিনু হেথা হতে
> উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
> জনতার মাঝখানে।

কবিতাটির প্রারম্ভে রয়েছে মানুষজীবনের দুঃখ ও সংঘাতের বেদনা, অর্থাৎ নিপীড়িত কৃষকের মর্মবাণী—যা ইতিপূর্বে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি। কবিতাটির মাঝখানে নূতন পথে যাত্রার ইঙ্গিত, তার পর সংঘাতের মধ্যে জীবনের গতিশীলতায় মানুষের তথা কবির একটি স্থির অথচ অজ্ঞাত আদর্শের অভিমুখে যাত্রা, এবং পরিশেষে প্রবল আত্মবোধের স্ফুরণে গতিশীল ও সক্রিয় নিজ সামাজিক ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্যপাত বর্ণিত হয়েছে।

> *　*　তারি মাঝে যাব অভিসারে
> তার কাছে—জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
> জন্ম জন্ম ধরি। কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে—

ইত্যাদি উক্তির মধ্যে কবির নব-উপলব্ধ ও বিশ্ব-মিলিত সামাজিক ব্যক্তিত্বের আদর্শমূর্তিই তাঁর গোচরে এসেছে। ইনিই অধিকতর বিশেষত্বে মণ্ডিত হয়ে পরে কবির অন্তর্যামীরূপে দেখা দিয়েছেন। বস্তুত 'এবার ফিরাও মোরে'র ভাবের সঙ্গে 'অন্তর্যামী'র সাদৃশ্য কয়েকস্থানে অত্যন্ত নিকট। একটি স্থির আদর্শপ্রেরণার পরিকল্পনা ও পূর্ণ পরিণাম এই কবিতার উপসংহারে বর্ণিত হয়েছে। 'অন্তরে বহিয়া নিরুপমা সৌন্দর্য-প্রতিমা' এই হ'ল তাঁর পূর্ণপরিণাম-আদর্শের রূপকল্পনা। এর অবস্থান কবির জগৎ, জীবন ও আত্ম-সম্পর্কে নবোদিত একটি স্থায়ী ভাবের মধ্যে। দেখা যায়, কবির কল্পিত মানসী সৌন্দর্যমূর্তিও এখানে জীবনের ভাবাদর্শে

মিলিত হয়ে পড়েছে, নিজ প্রেয়সী বিশ্বপ্রিয়ায় পরিণত হয়ে গেছে। প্রেরণার দিক থেকে এই ভাবাদর্শ শেলির Intellectual Beauty-র সদৃশ, যদিচ এর মধ্যে অপ্রাপ্তির আক্ষেপ নেই। বস্তুত এই আদর্শ রবীন্দ্রের সমাজ-অনুগত কবি-আত্মারই আদর্শ, যার অজ্ঞাত পরিচালনায় তাঁকে অবশভাবে পরিণতির অভিমুখে চলতে হচ্ছে।

তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকন্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী।
* * তার পর দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে।

এই অংশে বিকাশশীল কবি-আত্মার বা কবির অন্তর্নিহিত আদর্শের মুখে পরিণামের যে-বর্ণনা কবি দিলেন, ('প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে পরাবে মহিমা-লক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি' তু°) তাতে কেবল আত্মবোধের স্বরূপই উদ্ঘাটিত হ'ল না, এর প্রতি কবির 'দৃঢ় অনুরাগ'ও প্রকাশ পেলে। পরবর্তী জীবনদেবতা-শ্রেণীর কবিতায় সৃষ্টিক্রিয়ারত কবির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অপূর্ব বিস্ময় এবং কল্পিত প্রেম বর্ণিত হয়েছে দেখব। চিত্রাকাব্যের পরিপূর্ণতার বিভিন্ন পরিচয়ের মধ্যে একটি বিশেষ চিহ্ন হ'ল কবির সমাজজীবনের তথা স্বীয় ব্যক্তিগত বাস্তবজীবনের অভিমুখে এই দিক্‌পরিবর্তন। এই পরি-বর্তনের ফল সুদূরপ্রসারী। অনতিবিলম্বে রচিত 'অন্তর্যামী' কবিতা থেকে পরবর্তীকালে অরূপ-উপলব্ধির দুর্যোগময়তার বা গতিমুখরতার কবিতাগুলি পর্যন্ত এই পরিবর্তনেরই অন্তর্গূঢ় পরিচয় বহন করছে এবং এই মনোভাব গীতাঞ্জলি, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী প্রভৃতির সুদৃঢ় মানবীয়তার মধ্যে সমাপ্তি লাভ ক'রে কবির কাব্য-জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত একটি সমাজমুখী প্রেরণারূপে বিদ্যমান রয়েছে। বাঙ্‌লা সাহিত্যে তৎকালে এ মনোভাব অভিনব, রবীন্দ্রনাথই এর জন্মদাতা।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি যে-সর্বহারা মানুষের জন্য অনুতপ্ত ও কাতর হয়েছেন তারা হ'ল সামান্য-কৃষক, যাদের জীবনধারার সঙ্গে কবি মাত্র কিছুকাল হ'ল পরিচিত হয়েছেন আর যাদের সামগ্রিক উন্নয়নে কবি কিছু পরেই আত্মনিয়োগ করেছেন। "ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির / মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর / বেদনার করুণ কাহিনী" প্রভৃতি কয়েক পঙ্‌ক্তিতে মহাজন-জোতদার-শোষিত কৃষকশ্রেণীর পরিচয়ই পরিস্ফুট। কবির এই আকস্মিক পথ-পরিবর্তনে হয়ত স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণাও কিছু পরিমাণে কার্যকর হয়ে থাকবে, কারণ, এর স্বল্প পূর্বেই ভারতের

নির্যাতিত শূদ্রদের জন্য তাঁর আমেরিকায় বেদনা-প্রকাশ ভারতীয় দু'একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

চিত্রা কাব্যের একদিকে সৌন্দর্য-অনুভবের পূর্ণতা, আর একদিকে প্রত্যক্ষ জীবনবোধের ফলে মর্ত-উপলব্ধির পূর্ণতা, এই উভয়বিধ মনোভাবের বিকাশের সঙ্গে কাব্যরচনাগত একটি পূর্ণতার বোধও অজ্ঞাতসারে মিশ্রিত হয়ে কবিকে এই সময়ে এমন একটি উপলব্ধিতে নিয়ে গেছে যা এই পর্যায়ে কবির অন্তর্মুখ অনুভূতির অন্যতম উল্লেখ্য উদাহরণ হয়েছে। এই উপলব্ধির বস্তুকে কবি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়েছেন, যদিও 'অন্তর্যামী' কবিতাতেই এই উপলব্ধির প্রথম প্রকাশ ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ রূপ দেখতে পাওয়া যায়, এবং 'অন্তর্যামী' ও 'জীবনদেবতা' ছাড়া চিত্রা কাব্যের আরও দু'টি কবিতায় জীবনদেবতার প্রতি তাঁর অনুরাগ ও স্তুতি নিবেদন দেখা যায়। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের পথে এই আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্মদর্শনের অপরিসীম বিস্ময় কবির চিত্তে নূতনতর উপলব্ধির পথে যাত্রার আভাস ও ক্রমপরিণতির অস্পষ্ট অথচ ধ্রুব চেতনা এনেছে, এবং গম্যস্থানে পৌঁছানোর পথে দিক্-পরিবর্তনের ইতিহাস স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে। এইখানেই জীবনদেবতা সম্পর্কিত কবিতার মূল্য। জীবনদেবতা একদিক থেকে তাঁর কাব্যজীবনের ইতিহাস-বিবৃতি-মাত্র। উচ্চ-প্রতিভাসম্পন্ন কবিদের রচনার রসগ্রহণে সচরাচর অনুমানের দ্বারা, তাঁদের প্রতিভা ও কাব্যনির্মাণকৌশলের স্বরূপ অবগত হতে হয়। অন্তর্গূঢ় কোন্ কোন্ প্রবণতা গোপন নিয়মের বলে তাঁদের কোন্ পথে পরিচালিত করে তা পাঠক-সাধারণের সম্যক্ গোচর হওয়া অসম্ভব। আমাদের পরম সৌভাগ্য, এই মহাগীতিকবি আত্ম-দর্শনের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিক্রিয়াশীল অন্তর-রহস্য কতক পরিমাণেও আমাদের অনুভব-গোচর ক'রে তুলেছেন।

জীবনদেবতা-শ্রেণীর কবিতা রসিকসমাজে আলোচনায় অল্পবিস্তর ভিন্ন-মতবাদের সৃষ্টি করেছে এবং পাঠকসমাজে সমস্যারূপে অবস্থান করছে। জীবনদেবতায় কবি কোন্ সত্তাকে লক্ষ্য ক'রে তাঁর অনুরাগের বিহ্বলতা প্রকাশ করেছেন, তিনি কি সর্বভূতান্তরাত্মা ঈশ্বর, না পূর্বেকার মানস-সুন্দরী? এর আরম্ভ কোথায়? এর ব্যাপ্তি কতদূর? এরকম বহু প্রশ্ন জীবনদেবতা সম্পর্কে উদিত হতে পারে। এখনও জীবনদেবতা ব্রহ্ম, এমনকি সোনারতরী কবিতার বিদেশিনীও জীবনদেবতা বা ঈশ্বর এমন ধারণা

প্রচলিত থাকা অসম্ভব নয়। কবির রোম্যান্টিক কবিতাগুলি সম্পর্কে পূর্বনির্দিষ্ট তত্ত্ব বা মতামত আরোপ সুপ্রাচীন—যার ফলে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তৎকালীন রবীন্দ্র-রসিকদের মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সম-অনুভব নিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের সূত্রের অনুসরণেই তাঁর যে-কোন শ্রেণীর কবিতার সহজ পরিচয় পাওয়া সম্ভব। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখলে তাঁর অনেক কবিতাই দুর্বোধ্য লাগতে পারে, ফলে স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যার অবকাশও যে না ঘটতে পারে এমন নয়। বস্তুত এই ভাবে 'সোনারতরী', 'মানসসুন্দরী', এমনকি সৌন্দর্যের সমস্ত কবিতার মধ্যেই জীবনদেবতা দেখা হয়েছে এবং বলাকা-পূরবীতে যেখানে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ পূর্ণ হয়েছে সেখানেও জীবনদেবতা আরোপ ক'রে কয়েকটি কবিতার রসগ্রহণের ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুত জীবনদেবতাই যদি কবির রচনার আদ্যন্ত সর্বত্র বিরাজ করে তাহ'লে ঐ জীবনদেবতার উপলব্ধিতেই রবীন্দ্র-প্রতিভার যাবতীয় প্রয়াস ও চূড়ান্ত বিকাশ ধরতে হয়, আর 'সোনারতরী'তেই সেই বিকাশ ঘটেছে এমন মনে করতে হয়। কিন্তু আমরা দেখি যে, সুদূরের প্রতি বর্তমানে ব্যাকুল কবি পরে রহস্যময় অরূপ-লীলার সঙ্গে কল্পনায় যোগ অনুভব করেছেন, এবং আরও পরে জীবনের সঙ্গে বা সমাজ-বিপ্লবের সঙ্গে অরূপকে নিবিড়ভাবে যুক্ত ক'রে দেখেছেন। সেখানেই তাঁর প্রতিভার পরিণতি। প্রকৃতি-ব্যাকুলতার পরিণামরূপে অরূপানুভূতি স্বাভাবিকভাবে না এলে তিনি ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের মত একজন হতেন, আর প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যে অরূপের প্রতিষ্ঠা না করলে তিনি সাধারণভাবে মধ্যযুগের ভারতীয় ভাব-সাধকদের একটি সংখ্যাবৃদ্ধি করতেন মাত্র।

কবি রবীন্দ্রের কবিতায় তত্ত্ব-আরোপ দুটি প্রবল বাহ্য কারণে ঘটেছে। প্রথমতঃ, তাঁর জীবনসূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত পিতার অস্তিত্ব এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম ও উপনিষৎ-চর্চার পরিবেশ ছিল ব'লে এবং তিনি নিজেও কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন ব'লে তাঁর প্রথম জীবনের যে-কোনো কবিতায় নির্বিচারে তত্ত্ব আরোপ অতি সহজেই করা হয়েছে, আর প্রকৃত কবিধর্মের সঙ্গে সহানুভূতিমূলক পরিচয় না থাকার ফলে বাহ্যত দুর্বোধ্য কবিতা-গুলিতে ঐ প্রকার তত্ত্ব আরোপ ক'রে একটা সহজ সমাধানের পথে সমা-লোচকেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। দ্বিতীয়তঃ, কবির বহু কবিতায় ভঙ্গির দিক থেকে বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদরচনার প্রকৃতি গৃহীত হওয়ার ফলে কবির উপলব্ধ রসবস্তু বৈষ্ণবীয় ঈশ্বর ব'লে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

বাইরে থেকে কবিকে দেখার এই অ-সম্যগ্‌দৃষ্টিকে লক্ষ্য ক'রেই কবি কাতরকণ্ঠে আবেদন করেছেন—

বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে,
আমায় দেখো না বাহিরে।

অর্থাৎ, 'বহির্দৃষ্টিতে আমার কবিতা বিচারের চেষ্টা কোরো না। বাইরের মানুষী চারিত্র্যের অন্তরালে যে-স্বপ্নমূর্তি গোপনচারী যথার্থ কবি রয়েছেন, তাঁকে উপলব্ধি করার চেষ্টা কোরো।' কবি-প্রতিভার স্বরূপ অনুধাবন করাই কবিকে যথার্থ দেখা এবং সেইভাবে দেখতে গিয়ে কবিকে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে বিচার করলে চলবে না, পূর্বনির্দিষ্ট কোনো সংস্কারের মলিন-দর্পণে দেখলেও চলবে না এবং তাঁর চলতি পথের কোনো একটা বিশেষত্বকে সমগ্র ক'রে দেখলে খণ্ডিত দেখা হবে। 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কবিতারও পৌর্বাপর্য বিচার ক'রে এর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি ও যথাযোগ্য স্থাননির্দেশ কর্তব্য। সহজভাবে কবির কাব্য-স্বরূপের অভ্যন্তরে প্রবেশলাভের প্রয়াস না ক'রে মনঃকল্পিত তত্ত্ব আরোপ ক'রে দেখলে কবির উপর নিষ্ঠুর অবিচার করা হবে।*

আমরা পূর্বেই নির্দেশ করেছি, চিত্রার পর্যায়ে একটি সর্বতোমুখী পূর্ণতার বোধ থেকেই 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যের উৎপত্তি। জীবনদেবতা-দর্শন গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে কবির আত্ম-স্বরূপ আবিষ্কার। যে বাস্তব সমাজবোধ চিত্রাপর্যায়ের পূর্বে কবির কাব্যে অবিদ্যমান ছিল, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় সুস্পষ্ট জীবনের অভিমুখে দিক্-পরিবর্তনে সেই সমাজবোধের আবির্ভাবে কবি পরমবিস্ময় সহকারে আত্মজীবন-দেবতাকে প্রত্যক্ষ করলেন। এ সম্পর্কে কবি তাঁর নিজ আলোচনায় যা বলেছেন ('আত্মপরিচয়' দ্রঃ) তার বেশি বলার অবশ্য কিছু নেই। ঐ আলোচনা থেকে তাঁর উক্তির সারসংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায়ঃ জীবনদেবতা তাঁর সমস্ত রচনাকে একটা তাৎপর্যের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে এ-যাবৎ কোনোকালেই কবি সচেতন ছিলেন না। অর্থাৎ কবিতা রচনা যদিও ছিল, তার কর্তা ছিল কবির এমন অনুভূতি পূর্বে দেখা দেয়নি। শুধু কবিতা-রচনার ও সৌন্দর্য-উপলব্ধির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকেই নয়, সুখদুঃখময় চলমান ব্যক্তি-জীবনকেও এই জীবন-দেবতা নিয়ন্ত্রিত করেন। ইনি বাস্তব ব্যক্তি-জীবন এবং অবাস্তব কাব্য-জীবনকে একই সূত্রে গ্রথিত ক'রে, এবং শুধু ইহজীবনেই নয়, জীবনান্তরেও যেন কবিকে চালিত ক'রে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাচ্ছেন। এঁকে কবি অন্তর্নিহিত সৃজনশক্তি ব'লেও অভিহিত করেছেন। **Religion of Man** গ্রন্থে তিনি এঁকে **Creative Personality** ব'লে উল্লেখ করেছেন এবং এই দুর্লভ শক্তির অধিকারী মানুষের মহিমা কীর্তন করেছেন।

*** Be sure that you go to the author to get at his meaning, not to find yours—Ruskin.**

জীবনদেবতা-উপলব্ধির পূর্বে বাস্তব-মানবজীবন বোধ বা সমাজবোধ কবির একটি অভিনব উপলব্ধি। এই উপলব্ধির সূত্রেই তাঁর আত্মস্বরূপ-উপলব্ধির উৎসাহ। 'এবার ফিরাও মোরে'র আলোচনায় আমরা কবিজীবনের নির্দিষ্ট পরিণামের পথের চালক সম্পর্কে ('জানি না কে। চিনি নাই তারে'—ইত্যাদি) কবির কৌতূহল নির্দেশ করেছি এবং এর একটি আদর্শ সৌন্দর্য-মূর্তি কল্পনা ক'রে তার প্রতি ভক্তি বা অনুরাগ-প্রকাশও লক্ষ্য করেছি। তথাপি একথা বুঝতে হবে যে 'এবার ফিরাও মোরে'র মূল কাব্য-প্রেরণা বাস্তবজীবনবোধ ও সমাজবোধ থেকে এসেছে এবং ঐ জীবনবোধের পরিচয় বা মানবীয়তার প্রেরণায় সংঘাতের পথে চলার তীব্র আগ্রহই কবিতাটির প্রাণ। যার প্রেরণায় চলছেন তার সম্পর্কে কৌতূহল আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু গৌণভাবে। ফলতঃ জীবনদেবতা শ্রেণীর কবিতার মূল পটভূমিতে কবির বিকাশমুখী আত্মজীবনবোধ ও সমাজবোধ মিশ্রিত হয়ে পড়েছে। ব্যক্তিক সত্তার সামাজিক প্রসার বিষয়ে সচেতন কৌতূহলই কবির আত্মসত্তা নিরীক্ষণের মূলে। ঐ কৌতূহলের যথার্থ অভিব্যক্তি ও একরকম নিবৃত্তি 'অন্তর্যামী' কবিতায়। সহৃদয় পাঠক লক্ষ্য করবেন, এই কবিতাটির আদ্যন্ত কবিচিত্তের বিস্ময়ে স্পন্দিত হয়েছে। নূতন-পথে-আসার বিস্ময়ের সঙ্গে কল্পনায় আত্মশক্তির সাক্ষাৎকার সহজেই উচ্ছ্বসিতভাবে কবিতাটির প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়েছে এবং ধুয়ার মত সর্বত্র অনুবৃত্ত হয়েছে—

> এ কী কৌতুক নিত্য নূতন
> ওগো কৌতুকময়ী।

এ কবিতাটি বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে কবির অন্তরবাসী ব্যক্তিত্বের উপরি-কথিত স্বরূপ উপলব্ধ হয় কিনা দেখা যাক। আলোচনার জন্যে কবিতাটিকে স্পষ্টত কয়েক অংশে ভাগ ক'রে দেখা যেতে পারে। ঐ বিভাগ কবিতাটিতেই সুনির্দিষ্ট আছে।

কবিতাটির প্রথম অংশে কবির কাব্য রচনার পরিপূর্ণতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কবি যে তাঁর কাব্যরচনা সম্পর্কে একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে এসে পৌঁছেচেন, তাঁর কাব্য যে নূতন ছন্দে নূতনতম বাণী বহন করছে সে সম্পর্কে কবি এখন নিঃসংশয়। এই অংশের "আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে বলিতে দিতেছ কই" থেকে "কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার, কেহ এক বলে কেহ বলে আর, তোমারে শুধায় বৃথা বার বার" প্রভৃতি হ'ল রচনার বিষয়ের ও ভঙ্গির অভিনবত্ব সম্পর্কে কবির বিস্ময়। অতঃপর "যেদিকে পান্থ চাহে চলিবারে চলিতে দিতেছ কই" থেকে "কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে, আমি যে তোমারে খুঁজি" পর্যন্ত কবির গতিমুখর নবজীবনের উপলব্ধির বিস্ময়। এখানে কবি স্পষ্ট অনুভব করলেন যে তিনি পূর্বতন কল্পনার জীবন থেকে

সংঘাতময় কঠোর জীবনে অবতরণ করেছেন, এবং তাঁর অন্তরস্থিত কোন্ শক্তি এপথেও তাঁকে নিয়ে এসেছে তা-ই বিস্ময়সহকারে প্রশ্ন করেছেন। এই অংশের—

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজ নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।

প্রভৃতি 'এবার ফিরাও মোরে'র উল্লেখযোগ্য বিবর্তনের পুনরুক্তি মাত্র, ('বাহিরিনু হেথা হতে, উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসর প্রসর রাজপথে জনতার মাঝখানে'—প্রভৃতি দ্রঃ) এবং—

কভু বা পন্থ গহন জটিল
কভু পিচ্ছল ঘনপঙ্কিল
কভু সংকট-ছায়া-শঙ্কিল
বঙ্কিম দুরগম,
খরকন্টকে ছিন্ন চরণ
ধূলায় রৌদ্রে মলিন বরণ

ইত্যাদি উক্তি ব্যক্তিগত মানবমুখী বাস্তব-জীবনের সংঘাত ও দ্বন্দ্বই সূচিত করছে।

কবিতাটির তৃতীয়াংশে ঐ শক্তির রহস্য সম্পর্কে কবির তত্ত্বজিজ্ঞাসা। কবির জীবনের উপর এই শক্তির সর্বতোমুখী কর্তৃত্ব এবং কবিকে নির্দিষ্ট পরিণামের পথে চালনার বিষয়টি এই অংশের প্রতিপাদ্য। কবি এই চালক-শক্তিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্ন করেছেন—

জেবলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার,
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার,
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে।

কবি আশা করেন, যিনি তাঁকে সংগোপনে চালনা করছেন তিনি পরিণামে সৌন্দর্যের বেশে তাঁর কাছে ধরা দিবেন। "জীবন-পোড়ানো সে হোম-অনল সেদিন কি হবে সহসা সফল" ইত্যাদি পরিণাম-কল্পনা 'এবার ফিরাও মোরে'র শেষাংশের সঙ্গে তুলনীয়। যেমন—

……তার পরে দীর্ঘপথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্তবেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি—ইত্যাদি

কবি কল্পনা করছেন, যে-সৌন্দর্যময়ী এতকাল পর্যন্ত তাঁকে বিহ্বল করেছেন তিনিই সম্ভবত তাঁর কাছে প্রতিভাত হবেন। এখানে কবি তাঁর ঐ কল্পিত-সৌন্দর্যের আদর্শেই নিজ self-এর বা জীবনদেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করছেন—

অচল আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
কিরণবসন অঙ্গে জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে।

বোঝা যায়, চিত্রাকাব্যে কবির সৌন্দর্যবোধে একটা পরিপূর্ণতা এসেছিল ব'লে জীবনদেবতার কল্পিত রূপেও কবি ঐ পূর্ণসৌন্দর্যের আদর্শ দেখতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ঐ সৌন্দর্যমূর্তির পূর্ণতাবোধ জীবনদেবতাবোধে আংশিক ভাবে প্রেরণা দিয়েছে। এ সম্পর্কে বহু পরে লেখা চিত্রার ভূমিকায় (রচনাবলী দ্রঃ) কবি ইঙ্গিত দিয়েছেন। জগতের মধ্যে যিনি বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত, কবির অন্তরে তিনি একটি সৌন্দর্যময় সত্তারূপে সর্বদা পরিলক্ষিত হচ্ছেন—এই ধারণাকে কবি যুগ্মসত্তার প্রকাশ ব'লে অভিহিত করেছেন এবং অন্তরশায়ী একক সৌন্দর্যমূর্তি যে জীবনদেবতার সঙ্গে যুক্ত, একথাও আভাসে ব্যক্ত করেছেন। দেখা যায়, সৌন্দর্যের aesthetic মূর্তির intellectual বা আদর্শ মূর্তিতে রূপান্তর ঘটছে। জীবনদেবতার সঙ্গে এই দ্বিতীয় সৌন্দর্য-মূর্তিরই যোগ। 'অন্তর্যামী'র মধ্যেও তাই নারীরূপে জীবনদেবতাকে দেখার প্রয়াস লক্ষিত হয়। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি পূর্বেকার সৌন্দর্যের কবিতার কোনো কোনো স্থানের সঙ্গে এক—

মরণনিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি।

এর সঙ্গে তুলনীয় 'মানসসুন্দরী'র—

এস প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি,
বক্ষে মোরে লহো টানি ; শোয়াও যতনে
মরণসুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতিশয়নে।

কিন্তু তাই ব'লে 'মানসসুন্দরী' বা 'চিত্রা' কবিতার কেবলসৌন্দর্য-মূর্তিকে জীবনদেবতা আখ্যায় অভিহিত করা অবিধেয়। তাহ'লে কবির সৌন্দর্যানুভূতিরও যথার্থ মূল্য দেওয়া হয় না, আবার জীবনদেবতাকেও একদেশ-দর্শিতার ছায়ায় বোঝবার চেষ্টা করা হয়। বস্তুত জীবনদেবতা বা অন্তর্যামী কবির সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশের বোধের সঙ্গে জড়িত, এবং এই বিকাশ কেবল সৌন্দর্য-উপলব্ধির পূর্ণতাতেই নয়, মানব-প্রীতির চরিতার্থতায়, জীবন-

বোধেও। 'এবার ফিরাও মোরে'র পূর্বে লেখা কোনো কবিতাতেই এই সমাজমূলক জীবনবোধের পরিচয় নেই, সৌন্দর্য-অনুভূতি-বিষয়ক কবিতাগুলিতে তো বাস্তব জীবনবোধের প্রসঙ্গও নেই। 'মানসসুন্দরী'র—

ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ইত্যাদিতে অতিশয়মূলক বর্ণনের আশ্রয়ে কবি সৌন্দর্যসত্তারই অপ্রতিহত প্রভাব ব্যক্ত করতে চাইছেন, সমগ্র ব্যক্তিসত্তার কথা বলছেন না। এই অংশের অব্যবহিত পূর্বেই তৎকালে-ক্ষীণভাবে-উপলব্ধ বাস্তবজীবনাশ্রিত এই অন্তর্যামীর সঙ্গে সৌন্দর্যের ঐ নারীমূর্তির পার্থক্যও কবি নির্দেশ করেছেন—

যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্লপথে
লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম-অম্বরে
বধূ হয়ে প্রবেশিলে চিরদিনতরে
আমার অন্তরগৃহে—যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখদুঃখ লয়ে,

'সোনারতরী'র বিদেশিনী মাঝিও জীবনদেবতা ব'লে উপলক্ষিত হতে পারে না, কারণ তার সঙ্গে কবির যে সম্পর্ক তা অপরিচিতের রহস্যময় সম্পর্ক। তার আবির্ভাব মেঘমেদুর কুহেলিকাময় একটি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। ঐ কবিতাটির শেষের তীব্র বিরহ যে কল্পিত সৌন্দর্যবিরহ তা মেঘদূত, নিরুদ্দেশ যাত্রা প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে তুলনা ক'রে আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি। সৌন্দর্যপ্রেরণামূলক কবিতাগুলির সঙ্গে জীবনদেবতা-শ্রেণীর কবিতাগুলির কাব্যরসের দিক থেকেও পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর কবিতার মধ্যে রোম্যান্টিক কাব্যরস প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। জীবনদেবতা তেমন উৎকৃষ্ট কাব্যরসের অধিকার পায় নি, কারণ জীবনদেবতা প্রায় কবি-ব্যক্তিত্বের ইতিবৃত্ত মাত্র।

কবির উপলব্ধ এই চালক-শক্তিকে তাঁর অন্তরে প্রচ্ছন্ন 'Self' বা সমাজ ব্যক্তি মিশ্রসত্তারূপেই দর্শনীয়। যেমন আমরা, তেমনি কবিও ব্যক্তি-সমাজ দ্বান্দিক সম্পর্কের অধীন। দর্শন বলে, আমরা কেউই বিশ্বের কোনো কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন নই ; এই সম্পর্ক অবশ্য নিগূঢ়, অনির্বচনীয়। সাধারণের পক্ষে যা, কবির পক্ষে তা-ই বিশেষভাবে সত্য। অন্তর্যামী কবিতায় কবি তাঁর আত্মবিকাশের যে-রহস্য উপলব্ধি করলেন, সে এই ব্যক্তিত্বের উপর সমাজ-নিসর্গের ক্রিয়াশীলতার রহস্য। কবির কাব্যরচনা, জীবনের অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে চলা, সৌন্দর্য-অনুভব প্রভৃতি তাঁর অগোচর একটি নৈসর্গিক নিয়মের ফল মাত্র। কবি যন্ত্র, সমাজ-নিসর্গ-সম্পর্ক যন্ত্রী। অন্যত্র কবি

কাব্য, শিল্প সংগীত প্রভৃতিকে দৈব নিয়ম ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন—"সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী।" (সাহিত্য)

কবির অন্তরস্থ এই যে শক্তি কবির বহুমুখী বিকাশের কারণ, তাকে ঐ স্বচ্ছন্দময় 'কবির আমি' নাম দেওয়া যেতে পারে। এই অহং-এর স্বরূপ কী, তার যথার্থ স্থিতি আছে কি না, জন্মে জন্মে কবিকে তিনি বিচিত্রপথে কী ভাবে চালাবেন, এ জন্মেই বা তার কার্য কী, এ-সম্পর্কে তার্কিক মনে নানাবিধ প্রশ্নের উদয় হতে পারে। যেমন হতে পারে যে-কোনো ব্যক্তির নিজের সম্পর্কেও। এইজন্য কবি এই শ্রেণীর কবিতাকে 'মেটাফিজিক্যাল্' কবিতা বলেছেন। মোট কথা, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের মূলে কবির একালের যে সচেতন বিস্ময়বোধ, পথে চলার অবস্থায় একবার নিজের দিকে ফিরে তাকানো, তা থেকেই জীবন-দেবতার উৎপত্তি। চিত্রার পর্যায়ে কবির বিভিন্ন-মুখী কল্পনার বিকাশ অতি দ্রুত সংঘটিত হচ্ছিল। এই বিকাশকে লক্ষ্য ক'রে কবি পরবর্তীকালে জীবনদেবতার আলোচনায় বলেছেন—

"আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশঃ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব—আমার সুখদুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আবরণ সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব।"

ঐখানেই আত্ম-সমালোচক বলছেন যে তিনি তাঁর অদ্ভুত বিশ্বাত্মবোধের স্মৃতির বাহকরূপে জীবনদেবতাকে প্রত্যক্ষ করছেন—

"অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।"

কবির যে-আত্মশক্তি এবংবিধ বিকাশের পথে কবিকে নিয়ে যাচ্ছে, নানা বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে কল্পিত একটি অখণ্ড পরিণতির পথে চালনা করছে, বলা বাহুল্য, তার সম্পর্কে সচেতনতা, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্পর্কে সচেতনতা নয়। এই অন্তর্যামী কবির চিত্তের সঙ্গে অরূপলীলার যোগস্থাপন করতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং ঈশ্বর নন, না দ্বৈত, না অদ্বৈত। কবির এই সময়কার আত্মবোধপরায়ণ চিত্ত কী অপূর্ব বিস্ময়সহকারে তাঁর অন্তর-স্থিত আত্মশক্তি, তমোমুক্ত সমাজ-নিসর্গ-নিয়ন্ত্রিত অহং বা creative personalityকে নিরীক্ষণ করেছেন! 'অন্তর্যামী' কবিতাটি আগাগোড়া এই বিস্ময়াবেগেই স্পন্দিত। 'জীবনদেবতা'য় কবি এই শক্তিকে অনুরাগের চক্ষে দেখেছেন, তার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে একটা সান্ত্বনা অনুভব করেছেন। এই সম্পর্ক (বঁধু, প্রাণেশ, জীবননাথ প্রভৃতি) নিছক কবি-

কল্পনা মাত্র। এই সম্পর্কের যাথার্থ্য আবিষ্কার করতে যাওয়া ভ্রমাত্মক। ভাবটা কী তা কবি তাঁর আলোচনাতেই বিন্যস্ত করেছেন—

"মনে কেবল এই প্রশ্ন উঠে, আমি আমার এই আশ্চর্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি—আমার উপরে যে প্রেম যে আনন্দ অশ্রান্ত রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোনো শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না?"

এই বৈষ্ণবীয় মাধুর্য-আরোপিত সম্পর্কই 'জীবনদেবতা' কবিতার তথ্য ও তত্ত্বকে যা-কিছু কাব্যলক্ষণাক্রান্ত করেছে। এই কবিতাটির মধ্যে খোঁজ করলে যে উপরি-উক্ত আত্মশক্তি-সচেতনতার তত্ত্বগুলি না পাওয়া যেতে পারে তা নয়—কিন্তু এই কবিতাটির প্রণয়সম্পর্ক-কল্পনার কাছে তত্ত্ব একান্ত গৌণ হয়ে পড়েছে।

দেখতে হবে, কবি নিজে জীবনদেবতার উপর ঈশ্বরতত্ত্ব আরোপ করেন নি এবং কাব্যেও কুত্রাপি এমন কথা বলেন নি যে, যিনি তাঁর বিচিত্র আত্ম-বিকাশের মূলে তিনিই বিশ্বের সর্বত্রব্যাপী এবং সর্বভূতে বিদ্যমান (আত্মপরিচয়, ১ ও ৩ সং প্রবন্ধ দ্রঃ)। ঈশ্বর সম্পর্কে ('অরূপ' বা 'রসস্বরূপ' বলাই সংগত) রবীন্দ্রনাথের ধারণা তাঁর সহজ উপলব্ধির সূত্রে নির্দিষ্ট এক সময়ে এসেছে। কবি মর্ত-উপলব্ধি এবং সমাজজীবনবোধের এই স্তর উত্তীর্ণ হয়ে ভারতীয় জীবনাদর্শকে গ্রহণ করার পর প্রকৃতি-ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে অরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অরূপের লীলার সঙ্গে স্বীয় কবি-আত্মার মিলন অনুভব করেছেন। শান্তিনিকেতনে পরীক্ষামূলক-ভাবে ব্রহ্মচর্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠা ও নৈবেদ্য-রচনা ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয়। চৈতালি কাব্যে কালিদাসের সাহিত্যাদর্শের প্রেরণা তাঁর চিত্তে কাব্যোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শবোধও জাগিয়ে তুলেছিল। সম্ভবতঃ ঐ আদর্শবোধের প্রেরণায় কবি এই সময়ে উপনিষদের মধ্যে যথার্থভাবে প্রবেশ করেন। নৈবেদ্য কাব্যে কবির অরূপবোধ বহুল পরিমাণে এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, কিন্তু এ কথা বলা অসংগত হবে না যে, নৈবেদ্যের অব্যবহিত পরের 'উৎসর্গ' ও 'খেয়া' থেকেই নিসর্গবপুঃ অরূপ সম্পর্কে মৌলিক অনুভূতির আরম্ভ, যা 'শারদোৎসব'-এ পরিস্ফুট হয়েছে। যাই হোক, নির্দিষ্ট উপলব্ধির একটা সূত্র অনুসারে যেখানে অরূপলীলার আবির্ভাব তার পূর্বে অরূপ বা (ঈশ্বর)-কে স্থাপন করলে এই মহাকবির প্রতিভা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে বিশ্বাস হারাতে হয় এবং সাধারণের মতই মনে করতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ কাব্যে শুধু উপনিষদের অনুকরণ করেছেন। কবির আত্মবিকাশের এই অনন্য স্বকীয়তার নিয়ম মেনে নিলে তাঁর উপলব্ধ 'অরূপ' সম্পর্কে 'ঈশ্বর' শব্দটির প্রয়োগ থেকেও নিবৃত্ত হতে হয়। অবশ্য দার্শনিক

বিচার আরোপ ক'রে কবির উপলব্ধ এই অরূপ দ্বৈত কি অদ্বৈত সে-সকল তর্কের সমাধানের সামান্য প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আগে থেকেই ঈশ্বর ব'লে গ্রহণ ও ঐ নামে অভিহিত করলে স্বকপোলকল্পিত কোনো ধারণায়, বিশেষতঃ বৈষ্ণবীয় ভগবানের ধারণারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, অথচ রবীন্দ্রনাথ আর যাই হোন, আত্মবিলোপময় জীবনবর্জিত কোনও ভাবসাধনার পক্ষপাতী যে ছিলেন না একথা অনুরাগী পাঠকমাত্রেই অনুভব করতে পারেন।

চিত্রা-কাব্যে আর দু'টি কবিতায় কবি জীবনদেবতাকে লক্ষ্য করেছেন, একটি 'সাধনা', অপরটি 'সিন্ধুপারে'। প্রথমটিতে এই কর্ত্রী-শক্তির কাছে তাঁর জীবনের সার্থকতা-ব্যর্থতার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন এবং দ্বিতীয়টিতে জন্মান্তরেও কবি এঁকে কীভাবে লাভ করবেন তার অপ্রাকৃতরসচিত্র অংকন করেছেন। 'আবেদন' কবিতার 'রানী' কবির সাময়িক অন্তরদেবতা নিশ্চয়ই, তবে সৌন্দর্যসত্তা ও ক্ষীণভাবে অন্তর্যামীরই অতিকৃত ভাবনা। একালকার কলাকৈবল্যবোধের অবসরে কবিতাটিতে শুদ্ধসৌন্দর্যময় ওরিএন্টাল পরিবেশ রচনা ক'রে কবি ঐ সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রীর কাছে নির্লিপ্ত কাব্যিকতার মনোভাব জানিয়েছেন।

চিত্রা-পর্যায়ের পর যখন কবির প্রতিভা পূর্ণ বিকাশের পথে চলল তখন স্বাভাবিকভাবে এই জীবনদেবতাকে বা অহংকে পুনর্নিরীক্ষণের আবশ্যকতা রইল না। কারণ, নবজীবনবোধের মুখে বিকাশের প্রারম্ভেই যা কিছু বিস্ময়। অবশ্য এর পর চৈতালি কাব্যে একবার এবং 'কল্পনা'তে একবার কবি বাস্তব কর্মপ্রেরণার মধ্যে এই শক্তিকে স্মরণ করেছেন। চৈতালির নিম্নলিখিত কবিতাটিতে পল্লীপ্রকৃতি থেকে নগরে কর্মের আহ্বানে যাওয়ার পূর্বে কবি বলছেন—

কাল আমি তরী খুলি লোকালয় মাঝে
আবার ফিরিয়া যাব আপনার কাজে,—
হে অন্তরবাসিনী দেবী, ছেড়োনা আমারে,
যেয়োনা একেলা ফেলি জনতাপাথারে
কর্মকোলাহলে। সেথা সর্বঝঞ্ঝনায়
নিত্য যেন বাজে চিত্তে তোমার বীণায়
এমনি মঙ্গলধ্বনি। বিদ্বেষের বাণে
বক্ষ বিদ্ধ করি যবে রক্ত টেনে আনে,
তোমার সান্ত্বনাসুধা অশ্রুবারিসম
পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষতপ্রাণে মম।

কল্পনার 'অশেষ' কবিতাটিতেও ঠিক এইরূপে কর্মবৈরাগ্য থেকে অনিচ্ছা সহকারে কর্মের মধ্যে যাওয়ার মুখে কবি জীবনদেবতার আহ্বান অনুভব করেছেন—

শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাইনে দেবী
ডাক ক্ষণে ক্ষণে ;······
হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী, করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমময়ী।

কবির নিসর্গমিশ্র অরূপানুভবের পর বলাকা-পূরবী পর্যায়ে যেখানে অরূপ-বোধ ও জীবনবোধ খুব স্পষ্টভাবে এক হয়ে গেছে, সেখানে বিশ্বলীলার মধ্যস্থতায় তিনি হয়ত কোথাও আত্মজীবনলীলা অনুভব করেছেন। বলাকার বিশ্বগত লীলা অরূপেরই জীবনানুগ বিশ্বগত অভিব্যক্তি মাত্র। সেখানে অরূপ-সাধনায় সিদ্ধ কবি কোনো কালেই অ-প্রোচ্ছভাবে কেবল আত্মগত জীবনলীলাকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। এই জন্য জীবনদেবতা সম্পর্কিত বিস্ময় চিত্রার পর আর কোনো কালেই উপলব্ধ হবার অবকাশ পায়নি। বলাকায় 'নেয়ে'র বেশ ধ'রে কবির নিকটে যিনি অভিসার করেছেন ('পাড়ি' কবিতা দ্রঃ) তিনি কায়মনোবাক্যে কবির উপলব্ধ ইতিহাস-বিধাতার ভূমিকায় ঐ অরূপ। পূরবীর 'লীলাসঙ্গিনী' কবির কল্পিত সহচরী,—যিনি পার্থিব সৌন্দর্যরসের সঙ্গে কবির অন্তরের যোগস্থাপন করেন। ঐ কবিতায় এ-কালের 'মানসসুন্দরী'ই বিদায়ের অনুভূতির মধ্যে একটু ভিন্নরূপে কবির স্মরণপথে এসেছেন। আর পূরবীর 'আহ্বান' কবিতায় ঐ সৌন্দর্যময়ীকে কবি বহির্জগতে উপলব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে দেখে তার সঙ্গে সমগ্রভাবে পরিচিত হবার বাসনা করেছেন এবং অসমাপ্ত পরিচয়ের জন্যে আক্ষেপ করেছেন। এগুলির কোনোটিই জীবন-দেবতা ব'লে গৃহীত হতে পারে না। আরও পরে শেষসপ্তক, পত্রপুট প্রভৃতির কয়েকটি কবিতায় কবি আত্মজীবন ও আত্ম-অনুভব বিশ্লেষণ করেছেন বটে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই জীবন-দেবতার জের টানেন নি। জীবন-দেবতা সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলির সারসংক্ষেপ করছি :

এই শক্তি ঈশ্বর নন, কেবল সৌন্দর্যমূর্তিও নন, কবির নৈসর্গিক আত্ম-শক্তি মাত্র ; গতিশীল আত্মবিকাশের মর্মে অপূর্ব বিস্ময়াবেগের সঙ্গে চিত্রার পর্যায়েই এ-শক্তি কবির গোচর হয়েছিল, তার পূর্বে নয়। তৎকালীন নূতন জীবনবোধের সঙ্গেই ইনি যুক্ত এবং পরবর্তীকালে অরূপ-উপলব্ধির পর এঁর পুনরাবির্ভাব ঘটেনি। চিত্রা রচনার পর্যায়ে কবির কাব্যরচনায়, সৌন্দর্য-বোধে, সর্বোপরি বাস্তবজীবনবোধে, ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্পর্কে কবি-মানসে সে সচেতনতা এসেছিল তা-ই কবিকে আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন করে। এই সচেতনতার ফলেই আত্মশক্তির ক্রিয়ার বর্ণনা এবং তার সম্পর্কে অনুরাগের সংক্ষিপ্ত পালা। এই আত্মশক্তি নিগূঢ় সামাজিক ক্রিয়াশক্তিও বটে,

এবং সেইজন্যই কবি একে চালক এবং নিজেকে চালিত মনে করেন। অথচ এ শক্তি তাঁরই অন্তরের বস্তু, বিশ্বান্তর্গত নয়।

চিত্রার পর্যায়ে এই নবোদিত জীবনবোধ কবির অন্তরকে কী পরিমাণ আবিষ্ট ও বিচলিত করেছিল তা একালে রচিত 'মালিনী' নাটকেও পরিস্ফুট হয়েছে। রাজদুহিতা মালিনী পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাস ও প্রথার জালে আবদ্ধ; সে মানবধর্ম-বিহীন রাজকুলে আপনাকে নির্বাসিত মনে করছে। মুক্তির সংগীত কর্ণগোচর হওয়ার পর সমাজসম্পর্কশূন্য রাজকুল সে কীভাবে ত্যাগ করলে, তার মুক্তিমন্ত্র কীভাবে ব্রাহ্মণকুমার সুপ্রিয়কে অনুপ্রাণিত ক'রে গৃহত্যাগী করালে, সুপ্রিয়ের বিরুদ্ধবাদী ক্ষেমংকরই বা কী প্রকারে এই নূতন মানবধর্মের বিপক্ষে সংগ্রাম করলে এবং পরিশেষে দুঃখ-সমাকীর্ণ পথে চলার পর সুপ্রিয়ের আত্মত্যাগের মধ্যে কল্যাণময় মানবীয় আদর্শের কী প্রকারে শেষ জয় হ'ল তা এই নাটিকাটির ভাববস্তু। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার কল্পনাময় আত্মজীবন থেকে বিশ্ব-জীবনের মধ্যে নিষ্ক্রমণ, নিরুপমা সৌন্দর্য-প্রতিমাকে অন্তরে রেখে অকাতরে জীবনবিসর্জন প্রভৃতি কল্পনা এই নাটকে কতকটা বাস্তব আকারে দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে। বস্তুতঃ 'মালিনী' নাটক ভাবের দিক থেকে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার বিস্তৃত রূপ মাত্র। সহৃদয় পাঠক ঐ কবিতার—

বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে।

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির বাস্তব জীবন-চেতনা স্মরণ ক'রে নিয়ে রাজধানীর স্বার্থ-বাসনাকলুষিত জীবন থেকে রাজকুমারীর মুক্তির আগ্রহের পরিচায়ক নিম্ন-লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি ওর সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন—

জন্ম লভিয়াছি রাজকুলে
রাজকন্যা আমি—কখনো গবাক্ষ খুলে
চাহিনি বাহিরে; দেখি নাই এ-সংসার
বৃহৎ বিপুল,—কোথায় কী ব্যথা তার
জানি না তো কিছু। শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়
তোমাদের সাথে।

মালিনীর ও তার ভাবাদর্শের প্রেরণায় সুপ্রিয় যে-মানবীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির "শুধু জানি, সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান" প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির সঙ্গে তা একান্তভাবে তুলনার যোগ্য—

স্বর্গ আছে কোন্ দূরে
কোথায় দেবতা,—কে বা সে সংবাদ জানে।
শুধু জানি বলি দিয়া আত্ম-অভিমানে
বাসিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা
আপন করিতে হবে—যে-কিছু বাসনা
শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়।
যজ্ঞে যাগে তপস্যায় কভু মুক্তি নয়—
মুক্তি শুধু বিশ্বকাজে।

'মালিনী' চরিত্রের প্রথম অর্ধাংশে মালিনী একান্ত ভাবময়ী। শেষাংশে নাট্যের উপকারকতার দিক লক্ষ্য ক'রে লেখক এই নভোচারী ভাবমূর্তিটিকে রক্তমাংসের মানবী ক'রে বাস্তব জগতে নামিয়ে এনেছেন এবং ক্ষেমংকরের সঙ্গে তার ভাবমূলক অপ্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বকেও মানবীয় অনুরাগে পরিসমাপ্ত করেছেন। এই বিরুদ্ধ পরিণাম সম্ভব হয়েছে 'মালিনী'র 'মালঞ্চের মালাকার' সুপ্রিয়ের আকস্মিক আত্মবলিদানে, ঠিক যেমন ঘটেছে বিসর্জনে জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির মুক্তি ও গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে মিলন। সুপ্রিয়ের সঙ্গে মালিনীর সখ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, প্রণয়-সম্পর্ক নয়। মালিনী সুপ্রিয়ের কাছে ক্ষেমংকরের প্রসঙ্গ শুনতে চেয়েছে এবং ক্ষেমংকরের রূপদর্শনে আসক্ত হয়েছে। মালিনীর মূর্চ্ছা পূর্বরাগাত্মক হলেই উদ্দিষ্ট নাট্যধর্ম ঠিক থাকে। কিন্তু এসব হ'ল রোমান্সধর্মী কাব্যনাট্য বা মেলোড্রামার বিচার। বর্তমানে আমাদের লক্ষণীয় বিষয় কাব্যাংশের ভাবসত্যটুকু।

কল্পনামূলক মর্তপ্রীতি থেকে এই পর্যায়ে বাস্তবতামূলক মানবপ্রীতিতে বা এককথায় সমাজবোধে কবি উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই জীবন-অনুভব পরবর্তী কালে কবির অরূপ-অনুভবকে কীভাবে রূপান্তরিত ও পূর্ণতাদান করেছিল তা আমরা যথাসময়ে লক্ষ্য করব।

প্রতিভার বিকাশ

দ্বিতীয় পর্যায়

'চৈতালি' থেকে 'নৈবেদ্য'

(কালিদাস—সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শ—ভারতীয় ভাবাদর্শ—উপনিষদ্)

চিত্রার সৌন্দর্য-উচ্ছ্বাস, বাস্তবজীবনবোধ ও বিস্ময়াবহ আত্মনিরীক্ষণের প্রগল্ভতার পর কিছুকালের জন্য একটা প্রশান্তি ও বিরাম লক্ষ্য করা যায়। চৈতালির সনেটকল্প রচনাগুলি এই সময়ের। কিন্তু উদাসী চৈতালি যে একেবারে চুপ ক'রে আছে তা নয়। এখানে একদিকে কবি পুরাতন মর্তপ্রীতি ও মানবপ্রীতির পুনরাস্বাদন করছেন, আর-একদিকে কালিদাসের আদর্শে নতুন ধরনের নিসর্গ-আত্মীয়তা গ'ড়ে তুলছেন, এবং এখন থেকে ধীরে ধীরে ভারতীয় জীবনাদর্শে প্রবেশ করছেন। এই আদর্শকে এককথায় তপোবনাদর্শ বলা যেতে পারে। দেখা যায়, নৈবেদ্য রচনার সমকালে আনুমানিক তিন বৎসরের মধ্যে কবির সাহিত্যবোধ ও জীবনবোধে একটা পরিবর্তন এসেছে। সেইজন্য চৈতালি রচনার কাল ১৩০২-৩ কে বাহ্যতঃ বর্ণচ্ছটাবিরল অপ্রমত্ত বিরামের যুগ ব'লে মনে হ'লেও অভ্যন্তরে প্রস্তুতির বিরাম ছিল না।

চৈতালির গোড়ার দিকের চোদ্দচরণের দেবতার বিদায় ('দেবতা-মন্দির মাঝে ভকত-প্রবীণ—'), পুণ্যের হিসাব ('—যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা'), বৈরাগ্য ('কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী—'), দুর্লভ জন্ম প্রভৃতি কয়েকটি রচনায় মর্ত-ও মানবপ্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কবির তত্ত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। যদিচ প্রতিভার উন্মেষেই কবির এই দৃঢ় ধারণার উৎপত্তি, তথাপি এই ধারণা ক্রমশ গভীরতর হয়েছে, এবং পরে কবি কুত্রাপি মানবানুরাগ বা মানবজীবনবোধ থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে পারেননি, সীমার এবং বিশেষ ক'রে মানুষের মধ্যেই তাঁর অরূপ-দর্শনের সম্যক্ সমাধান করেছেন। বলা বাহুল্য, শিলাইদহে আসার পর থেকেই কবির এই আশ্চর্য নিসর্গ-মানুষ-অনুরাগের উৎসার ঘটেছে।

এই অংশের 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটিতে কবির পুরাতন অথচ বারে বারে আবর্তিত প্রকৃতি-প্রীতিরসের অনির্বচনীয় স্বাদ অনুভব করা যায়—

> আমি যেন মিলে গেছি সকলের মাঝে ;
> ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
> বহুকাল পরে,—ধরণীর বক্ষতলে

পশুপাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে—মাতৃস্তনে শিশুর মতন—
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

প্রকৃতির সঙ্গে এই জন্মান্তরীণ নিবিড় ঐক্যানুভূতিই কবির অনন্যসাধারণতা। এই স্মৃতির বাহকরূপেই তিনি তাঁর 'অন্তর্যামী'কে পূর্বে দেখেছেন। তাঁর কাব্যজীবনের এই আদিম উপলব্ধিটি শুধু তাঁর সমগ্র কাব্য-প্রতিভার তথা ধর্মবোধের নিয়ামকরূপেই নয়, বারে বারে নানা আকারে ধুয়ার মত তাঁর কাব্যজীবনে দেখা দিয়েছে। সোনারতরী ও চিত্রায় কবির যে সৌন্দর্য-উপলব্ধি, তা স্বতন্ত্র পরিণামে আবদ্ধ। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ ও পরিণামে ঐ সৌন্দর্যবোধ অবিকৃতভাবে পুনরাবির্ভূত হয়নি, সৌন্দর্যের অন্তর্বর্তী সুদূরের ব্যাকুলতা অরূপের ব্যাকুলতায় রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মর্ত-উপলব্ধি ও মানবজীবনানুরাগ কবির অরূপানুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে শেষে পূর্ণ বিকাশের পথে অর্থাৎ জীবন-অরূপ সমন্বয়ে নিয়ে গেছে।

প্রকৃতি-পর্যায়ের কবিতার মোটামুটি দুটো রূপ আমরা কবিদের কাব্যে লক্ষ্য করি। একটাতে প্রকৃতি দূরে থেকে মানুষের হৃদয়ে ব্যাকুলতার সঞ্চার করে, কখনো তার শান্ত সৌম্য প্রভাব দ্বারা মানুষকে মণ্ডিত করতে চায় অথবা অনির্দেশ্য ভাবুকতায় বিহ্বল ক'রে মানুষের চিত্তে অনন্তের আভাস এনে দেয় এবং ঐহিকতামুক্ত করে। তখন প্রকৃতি স্বরূপে অবস্থান করে না, প্রেরণা-বিশেষের জনক হয়ে পড়ে। আর-একটাতে গাছপালা, জীবজন্তু স্বরূপে অবস্থান ক'রেই মানুষের সঙ্গে আত্মীয়সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই দ্বিতীয় রূপে প্রকৃতি ও মানুষ একই বিশ্বসৃষ্টিলীলার বিভিন্ন অংশ, এবং প্রকৃতি জড় বা অচেতন নয়, তা মানুষেরই মত জীবনময়। মানুষের কাজ হ'ল এই মূক অথচ প্রাণবান্, বিচিত্র ও বিভিন্ন সত্তার সঙ্গে আত্মিক মিলন সাধন করা। একটাতে বিহ্বল ভাবাবেশে প্রকৃতিকে প্রাণময় মনে করা, আর-একটায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যহিসাবে এর জীবনময়তা গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হওয়া। এর প্রথমটি মোটামুটি পাশ্চাত্ত্য এবং দ্বিতীয়টি মোটামুটি প্রাচ্য আদর্শ এমন অভিহিত করলে অসংগত হবে না। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে যদিও রোম্যাণ্টিক্ প্রকৃতি-ব্যাকুলতা এবং প্রকৃতি-আত্মীয়তা এই দুই ভাবেরই অবস্থান দেখা যায়, তথাপি তাঁর পরিণত প্রতিভা রঘুবংশ ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলে দ্বিতীয় ভাবটিতেই বিশেষভাবে স্বাক্ষর দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথে এই দুই ভাবাদর্শের সমন্বয় দেখা গেলেও নিসর্গের সঙ্গে জন্মান্তরীণ নিবিড়

ঐক্য উপলব্ধিই তাঁর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক সাহিত্যে সম্পূর্ণ নোতুন। যে অভিনব কল্পনার বলে কবির এই একান্ত স্বকীয় উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে তা ইংরেজ রোম্যাণ্টিক কবিদের কল্পনার সগোত্র হ'লেও তার পরিণামরূপে বিশ্বাত্মবোধ এবং অরূপানুভূতি রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ রোম্যাণ্টিক মনোভাব থেকে অনেকদূরে এগিয়ে গেছেন এবং যেন ঐ স্বভাবের পরিণামকে লাভ করতে পেরেছেন। প্রকৃতি-ব্যাকুলতা থেকে উৎপন্ন সুদূর ও অরূপের প্রতি আকর্ষণ এই স্বপ্নদ্রষ্টা ভাবুক কবির মধ্যে অত্যন্ত সহজে ঘটেছে এবং তা ভারতীয় সাধকদের মতই ব্যাপকভাবে কবির চিত্তকে অধিকার করেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবল ও পরিণামধর্মী রোম্যাণ্টিক ব্যাকুলতা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে অথবা কালিদাসাদি সংস্কৃত কবি থেকে সংক্রমিত, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়; কবি তাঁর প্রথম যৌবনে যেমন ইংরেজি সাহিত্য, তেমনি কালিদাসের কাব্যনাটক, বাণভট্টের কাদম্বরী, অমরুশতক, ভর্তৃহরি, বররুচি, ঘটকর্পর এবং আরও বহু প্রকীর্ণ কবিতাকারদের রচনা কাব্যানুরাগ-বশতই গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। বাল্যে তাঁর পরিবারে যে-সাহিত্যিক হাওয়া বইত তার মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দুই ভাবেরই মিলন ছিল। ঐ সময় শিক্ষার জন্য কুমারসম্ভব, শকুন্তলা এবং সম্ভবত উত্তররামচরিত কিছু কিছু পড়েছিলেন। বাকি যা, তা ক্রমশ আয়ত্ত করেছিলেন। যাই হোক, এই সকল প্রভাব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা সর্বদাই 'স্বপনমুরতি গোপনচারী' কবি-প্রতিভার দিকেই দৃষ্টি দিয়েছি, এবং, রবীন্দ্রনাথে যা ঘটেছে তা অনির্ণেয় নৈসর্গিক শক্তির ক্রিয়া ব'লে নির্দেশ করেছি। কিন্তু তাঁর স্বধর্মের অনুকূলে যদি কোনো সাহিত্যাদর্শ, কোনো রূপভঙ্গি ও ভাবাদর্শ তাঁর প্রতিভায় গৃহীত হয়েছে ব'লে ধরতে পারা যায় তা এই সময়। এই সময় যেমন কালিদাসের তপোবনাদর্শ, তেমনি সংস্কৃতসাহিত্যের ভাষাশিল্প, অর্বাচীন সংস্কৃত কবিদের ক্ষণিকতাবিলাস প্রভৃতি কবির চিত্তকে অধিকার করেছে। কালিদাসের কাব্য থেকে প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগী হয়ে এই সময়ে স্বাভাবিকভাবে উপনিষদের মধ্যেও কবি প্রবেশ করেছেন।

সহজ অনুরাগের বশে কালিদাসের কাব্যপাঠের প্রথম পরিচয় আমরা পাচ্ছি —১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কবির একটি চিঠিতে রয়েছে— এখানকার লাইব্রেরীতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টিদুর্যোগে রুদ্ধদ্বার 'গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় ক'রে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি সুর ক'রে ক'রে পড়া গেছে—কেবল পড়া নয়—সেটার উপর ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি।' আবার ৮ই শ্রাবণ, ১৩০০-এর লেখা একটি চিঠিতে বলছেন, 'কাদম্বরী অল্প অল্প ক'রে এগচ্চে; শ' দুয়েক পাতা

হয়েছে—আরো ততগুলো পাতা বাকি আছে।' এই অধ্যয়নের ফলরূপে আমরা মেঘদূত, প্রেমের অভিষেক, উর্বশী, বিজয়িনী, আবেদন প্রভৃতি কবিতার এবং 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যের প্রাচীনধর্মী সৌন্দর্যচিত্র পাচ্ছি। বস্তু এবং রূপ উভয়ের একান্ত সম্মিলনে এই কাব্যকবিতাগুলি বহুল পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্যের ধর্ম বহন ক'রে চলেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের রাজ্যে পরিভ্রমণ এবং সাহিত্যধর্মের অলক্ষিত অথচ ধ্রুব অনুসরণ সম্বন্ধে একটু পরেই আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি। 'চৈতালি'তে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ কালিদাস সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাক্যে তাঁর কাব্যগৌরব এবং তপোবনাদর্শের মহিমা কীর্তন করছেন।* সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি আকর্ষণ রবীন্দ্রকাব্যে এই প্রথম দেখা গেল। প্রাচীন ভারতবর্ষের কবি-প্রতিনিধি কালিদাসের কাব্যেই আধুনিক কবি শাশ্বত ভারতকে দেখতে পেলেন। বস্তুত কালিদাসই প্রকৃতি-আত্মীয়তামূলক তপোবনাদর্শের সর্বপ্রথম কবি। কালিদাসের পরিণত বয়সের তিনটি রচনায়—কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে তপোবন-প্রকৃতির এবং তার সঙ্গে মানুষের সুনিবিড় আত্মীয়তা সম্পর্কের যে পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় তা বাল্মীকির রামায়ণেও নেই। কালিদাসের পরবর্তীকালে বাণভট্ট ও ভবভূতি কালিদাসের প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি কবির অনুরাগ মূলত কালিদাসের কাব্য ও নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত একথা বলা যায়। কবির অনুরাগ যে কাব্য থেকেই সংক্রমিত, তত্ত্ব বা ধর্মপ্রণালী থেকে নয়, তার বাহ্য প্রমাণ তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি থেকে পাওয়া যেতে পারে—

> 'আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বারবার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে পাইনি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই।' (আত্মপরিচয়—৬ সংখ্যক প্রবন্ধ)।

ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ ও কালিদাসের সাহিত্যের আলোচনা সম্পর্কে প্রস্তুতি প্রসঙ্গে কবি তাঁর "The Message of the Forest' প্রবন্ধে বলেছেন—"When Vikramaditya became king, Ujjayini a great capital, and Kalidasa its poet, the age of India's forest retreats had passed. Then we had taken our stand in the midst of the great concourse of humanity. The Chinese and the Hun, the Scy-

* কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবসম্পর্ক বিচারের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য লেখক কৃতজ্ঞতাসহকারে তখনকার খ্যাতনামা সরকারী উপসচিব ৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ করছে।

thian and the Persian, the Greek and the Roman, had crowded round us. But even in that age of pomp and prosperity the love and reverence with which its poet sang about the hermitage shows what was the dominant ideal that occupied the mind of India ; what was the one current of memory that continually flowed through her life."

কালিদাস কেন তাঁর কাব্যে তপোবনকে প্রধান স্থান দিয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে এবং তা থেকে এই অনুমানও অসংগত নয় যে কবি স্বয়ং ঐ জীবনাদর্শের অনুরাগী। ভোগ থেকে ত্যাগের, জনকোলাহলময় রাজধানী থেকে নির্জন তপোবনের মাধুর্য ও মহত্ত্ব কালিদাসের উপরি-উক্ত তিনটি কাব্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই মনোভাব যখন রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিখ্যাত 'সভ্যতার প্রতি' কবিতাটিতে আবেগ সহকারে প্রকাশ করলেন—

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর ;
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা ; হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি, —ইত্যাদি

অথবা, 'বন' কবিতায় আরণ্যজীবনের মহিমা বর্ণনা করলেন—

শ্যামল সুন্দর সৌম্য হে অরণ্যভূমি
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি।
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন
* * *
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সবল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুলফল,
দাও বস্ত্র, দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা ;
নিশিদিন মর্মরিয়া কহ কত কথা
অজানা ভাষার মন্ত্র * *

এবং তপোবন, প্রাচীন ভারত প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় তপোবনাদর্শের প্রতি যখন অনুরাগ জ্ঞাপন করলেন, তখন আর সংশয় থাকে না যে, ইতিপূর্বে সংস্কৃত সাহিত্য (মূলত কালিদাস) কবির কাব্যবস্তুর আধার ও কায়া বা form-রূপে বর্তমান থাকলেও একমাত্র চৈতালির কালেই কবি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনাদর্শের অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। এখন থেকে পাঁচ ছয় বৎসর ধ'রে ভারতীয় সাহিত্যের ও জীবনাদর্শের প্রতি কবির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ বেড়েই চলেছে এবং নৈবেদ্য-রচনার সমকালে উপনিষদের ধর্মাদর্শের

দ্বারা যখন কবি অনুপ্রাণিত হয়েছেন তখনই এই অনুরাগের চরমতা লক্ষিত হয়েছে। কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন পাঠক অবশ্যই ধরতে পারবেন যে চৈতালির এই তপোবনাদর্শ-বর্ণনার প্রতি ছত্রে গোপনে কালিদাসের তপোবনই প্রকাশিত হচ্ছে।

এ ছাড়া চৈতালির আরো দু'টি বৈশিষ্ট্য থেকে কালিদাসের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। এক হ'ল কবির কালিদাস ও তাঁর কাব্যের প্রশস্তিমূলক কয়েকটি কবিতা রচনা, আর এক, কয়েকটি কবিতায় মূক প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা-সম্পর্ক ঘোষণা। পাঠক লক্ষ্য করবেন, ১৩০৩-এর শ্রাবণ মাসের মধ্যেই এই ধরনের প্রায় সব ক'টি কবিতা লেখা হয়েছিল। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে ঋতুসংহার, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, এবং শকুন্তলা কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। রঘুবংশ সম্পর্কে কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তেমন দেখা যায় না। পরবর্তীকালে কবি বিশ্বলীলায় যে রুদ্রের রূপ কল্পনা করেছিলেন † তাতে কুমারসম্ভবের মহাদেবের ছায়া অল্পাধিক পরিমাণে পড়েছে একথা বলা যায়। কালিদাস ও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে কবির মুগ্ধহৃদয়ের বিভিন্ন উক্তি থেকে উভয়ের কাব্যাদর্শের অন্তত আংশিক সাজাত্যও অনুমেয়। যেমন বলা যেতে পারে যে 'কাব্য' শীর্ষক কবিতায় বিবৃত কালিদাসকাব্যের বাস্তবোত্তর আনন্দময়তা ও নির্লিপ্ততা একালের রবীন্দ্র-কাব্যেরও লক্ষণ—

> তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত
> আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরই মত
>
> *　　　　*　　　　*
>
> তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
> ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল —ইত্যাদি

তা ছাড়া এই কবিতাগুলি কালিদাসের কবি-গৌরব, তাঁর প্রতি আধুনিক মহাকবির গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁর উদার কল্পনার সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ করে। যেমন 'কালিদাসের প্রতি' কবিতায়—

> সন্ধ্যাভ্রশিখরে
> ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্দভরে
> নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
> গর্জিত মৃদঙ্গরবে,

প্রভৃতি অংশে মেঘদূতের একটি বিশিষ্ট কল্পনার প্রতি কবির অনুরাগ প্রকটিত হয়েছে, আর—

† ঋতুনাট্যগুলি ও 'তপোভঙ্গ' প্রভৃতি কবিতার আলোচনা দ্রঃ

কর্ণ হতে বর্হ খুলি স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন উমা তব চূড়া 'পরে।

এর মর্ম বুঝতে গেলে 'জ্যোতির্লেখাবলয়িগলিতং যস্য বর্হং ভবানী পুত্রপ্রেম্না কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি' এই অংশের বাৎসল্যরসানুবিদ্ধ সৌন্দর্য অবগত হতে হয়।

চৈতালি কাব্যের উল্লেখযোগ্য বিশেষ ধর্ম হ'ল ইতর প্রাণী ও জড় প্রকৃতির সঙ্গে কবির আত্মীয়তা স্থাপন। 'সোনারতরী'র যুগের প্রকৃতি বা মর্ত-ব্যাকুলতা থেকে এই ভাবানুভূতি অবশ্যই কিছু স্বতন্ত্র। পূর্বে যদিচ অতিপ্রবল ও সুদূর-প্রসারী রোম্যাণ্টিক চেতনায় কবি প্রকৃতির সকল বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা কল্পনা করেছেন, অধুনা স্থির অনুরাগ-সঞ্জাত আত্মীয়বুদ্ধিতেই নিকটবর্তী প্রাকৃতিক জীবনের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করছেন। লক্ষ্য করতে হবে এই মধুর আত্মীয়তার মধ্যে বাহ্য পার্থক্যের ভাব বিদ্যমান ('বসুন্ধরা'-প্রমুখ কবিতায় ও 'ছিন্নপত্রে' বর্ণিত কাল্পনিক একাত্মতা নয়), এবং এখানে মানুষী আদানপ্রদান সম্পর্কও অপ্রধান নয়,—ঠিক কালিদাসের প্রকৃতি-আত্মীয়তায় যা দেখা গেছে। 'হৃদয়ধর্ম' কবিতাটিতে এই মধুর-করুণ আত্মীয়সম্পর্ক সবিশেষ পরিস্ফুট—

হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায়,
জড় জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়।
মাঝে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত যার,
সে চাহে করিতে মগ্ন লুপ্ত একাকার।
মধ্যাদিনে দগ্ধ দেহে ঝাঁপ দিয়ে নীরে
'মা' বলে সে ডেকে ওঠে স্নিগ্ধ তটিনীরে।
যে চাঁদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উঁকি,
সে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু সুধামুখী।
যে সকল তরুলতা রচি উপবন
গৃহপার্শ্বে বাড়িয়াছে তারা ভাইবোন।
যে পশুরে জন্ম হ'তে আপনার জানি,
হৃদয় আপনি তারে ডাকে পুঁটুরানী।

'মিলনদৃশ্য' কবিতায় শকুন্তলা-বিদায়ের 'তরুলতা, পশুপক্ষী, নদনদী, বন, নরনারী সবে মিলি করুণমিলন' বর্ণিত হয়েছে। এইরূপে কালিদাসের কবি-প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির প্রবল সাধর্ম্য একালে দেখা যায়।

প্রকারে স্বতন্ত্র হ'লেও কবির এই মনোভাবকে পূর্বদৃষ্ট ভাববিহ্বলতারই একটি পরিণামী দিক্ ব'লে মনে করতে হবে এবং তখন থেকে এখন পর্যন্ত, জন্মান্তরীণ ব্যাকুলতা থেকে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ পর্যন্ত, কালিদাসের

আন্তরধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্যও লক্ষ্য করতে হবে। প্রকৃতি-সম্পর্কের বিবর্তন ঋতুসংহার থেকে অভিজ্ঞান-শকুন্তল পর্যন্ত কালিদাসে যেমন ভাবে ঘটেছে রবীন্দ্রনাথেও ঠিক তেমনি ভাবেই ঘটেছে। এই বিবর্তনের ইতিহাস—ভাব-বিহ্বল অনুরাগ এবং জীবনসম্পর্কজাত প্রীতির সম্মিলন, এ দুয়ের একটি থেকে অপরটিতে সংক্রমণের দিক কবি তাঁর 'দুই বন্ধু' কবিতাটিতে বর্ণনা করেছেন—

> মূঢ় পশু ভাষাহীন নির্বাক হৃদয়,
> তার সাথে মানবের কোথা পরিচয়!
> কোন্ আদি স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রভাতে
> হৃদয়ে-হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে
> পদচিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চিরদিনে
> লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দোঁহে চিনে।
> সেদিনের আত্মীয়তা গেছে বহু দূরে—
> তবুও সহসা কোন্ কথাহীন সুরে
> পরানে জাগিয়া উঠে ক্ষীণ পূর্বস্মৃতি,
> অন্তরে উচ্ছলি উঠে সুধাময়ী প্রীতি……

কালিদাসের যৌবনের রচনা 'ঋতুসংহারে' নিসর্গ মানুষের চিত্তে উৎকণ্ঠা জাগানোর সহায়ক মাত্র। বিক্রমোর্বশীয় এবং মেঘদূতে এই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেয়ে বিরহব্যাকুলতার রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং তার পর কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও শকুন্তলায় ধীরে ধীরে গভীরতম আত্মীয় সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৩০২-৩ সাল থেকে ১৩০৯-১০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যজীবনে প্রাচীন সাহিত্যাদর্শের অনুশীলন ও অনুসরণের কাল। এই সময়ের যাবতীয় গদ্যপদ্য-রচনায় কবি যেন ভাবানুপ্রাণিত হয়ে প্রাচীন বা আধুনিক যা-কিছু স্বদেশীয়তার প্রতি গভীর মমতা ও শ্রদ্ধায় অন্তর পূর্ণ করে তুলছেন। এই সময়ে কালিদাসের কাব্যের প্রতি অনুরাগ, সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা, ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত, উগ্র জাতীয় উদ্দীপনায় বিলাতি-অনুকরণের কঠোর সমালোচনা, ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলির রচনা ও বক্তৃতা, সংস্কৃত সাহিত্যের বস্তু ও রূপের নিগূঢ় অনুসরণ, তপোবনাদর্শের জয়গান, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্য-সাহিত্য, দেশীয় যাত্রাগান ও বাউল-সংগীতের প্রতি নিষ্ঠা, বাঙ্‌লা শব্দের সংগ্রহ ও গবেষণা, এবং ছাত্রদের জন্য 'সংস্কৃতশিক্ষা' পুস্তকপ্রণয়ন। পাঠকদের বিবেচনার জন্য একালের প্রধান রচনাগুলির একটা মোটামুটি তালিকা আমরা দিচ্ছি, এর থেকে কবির জাতীয়-আদর্শপ্রবণতার এই কাল সম্পর্কে একটা

স্থির ধারণায় উপনীত হওয়া যেতে পারে। নিম্নলিখিত রচনাগুলি সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন জীবনাদর্শের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে সংশ্লিষ্ট:

চৈতালি (১৩০২-৩), কল্পনা (১৩০৪-৬), কথা ও কাহিনীর কবিতা ও নাটক (১৩০৪-৬), 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ (১৩০৫), ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য বহু রাজনীতিক, সমাজনীতিক ও লোকসাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ (১৩০৫), ক্ষণিকা (১৩০৬-৭), চিরকুমারসভা (১৩০৬), কাদম্বরীচিত্র (১৩০৬), 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধ (১৩০৭), ব্রহ্মমন্ত্র (১৩০৭), নৈবেদ্যের কবিতারম্ভ (১৩০৭), কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার আলোচনা (১৩০৮), 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ (১৩০৯), নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ও পরে 'স্বদেশ' পুস্তকে তপোবনাদর্শ ও বর্ণাশ্রমধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে নানান্ প্রবন্ধ (১৩০৮-১০), 'বিচিত্র-প্রবন্ধ' পুস্তকে সংস্কৃতসাহিত্যধারার উল্লেখ ও আলোচনামূলক নববর্ষা, কেকাধ্বনি, বাজে কথা প্রভৃতি রচনা (১৩০৮-৯)।

রবীন্দ্রকাব্যজীবনে প্রাচীন সাহিত্যাদর্শ ও জীবনাদর্শের বিশেষভাবে অনুসরণের এই যুগটি (প্রায় দশ বৎসর) মোটামুটি দু' দিক থেকে বিবেচনার যোগ্য। এক, সাহিত্যাদর্শের অনুসরণ, যা প্রত্যক্ষভাবে কল্পনাকাব্যে এবং পরোক্ষভাবে ক্ষণিকাকাব্যে বা বিচিত্রপ্রবন্ধ ও প্রাচীন-সাহিত্যের আলোচনা-গুলিতে প্রাপ্তব্য; আর-এক, জীবনাদর্শের অনুসরণ, যা নৈবেদ্য-কাব্যে এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যমূলক ও পাশ্চাত্যজীবনাদর্শের প্রতিবাদমূলক আলোচনাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যাদর্শ থেকে সুদৃঢ় জীবনাদর্শে উত্তরণের এই দিকটি রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার ঠিকই লক্ষ্য করেছেন—'Æsthetics ছাড়িয়া এখন Ethics সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে।'

কিন্তু কেবল নৈবেদ্য নয়, কবির স্বদেশীয়তা 'খেয়া'র কাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে তাঁর স্বাভাবিক কাব্য-উপলব্ধির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে, এমন কথাও অযৌক্তিক হবে না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে কবির বাউল-সঙ্গীত রচনার আগ্রহ তাঁর এই স্বদেশপ্রীতি ও নবাগত আধ্যাত্ম-অনুরাগকে একসঙ্গে যুক্ত করেছে। 'রবীন্দ্র-সংগীতে'র লেখক যথার্থভাবে নির্দেশ করেছেন যে, কবির বাউল-ভাব ও বাউল-সুরের উৎসার একালেই ঘটেছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব থেকেই কবির চিত্ত যাবতীয় স্বাদেশিকতার জন্য অভ্যন্তরে প্রস্তুত হচ্ছিল।

'কথা ও কাহিনী' প্রেরণার দিক থেকে ভারতীয় ভাবাদর্শ এবং আকারে ও অবয়বে কিছুটা প্রাচীন সাহিত্যিকতা অনুসরণ করেছে। এই কবিতা-গুচ্ছের আবির্ভাব ভারতীয় ত্যাগ ও শক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত কবিমানস

থেকে। কাব্যগঠনে এদের দেহে ক্লাসিক্যাল চিত্রধর্মীতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আদর্শের দিক থেকে যাই হোক, এসবের কাব্যমূল্য যথেষ্ট এবং তা নির্ভর করছে এদের ঘটনাসংস্থানের চমৎকারীত্ব, পরিবেশের রমণীয়তা এবং একটির পর একটি মানবীয় ও প্রাকৃতিক চিত্র উন্মোচনের নৈপুণ্যের উপর। এ সম্পর্কে কবির স্বাভিমত উদ্ধার ক'রে তাঁর এই কাব্যের ক্লাসিক্যাল-ধর্মপ্রবণতার সমর্থন দেখানো যেতে পারে—

'এ সব লেখার ভালোমন্দ বিচার করা অনাবশ্যক, চিন্তার বিষয় এর মনস্তত্ত্ব……ভালো ক'রে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথার কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা।………এমনি ক'রে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।' (রচনাবলী দ্রঃ)

এই চিত্রধর্মীতার পরিচয় 'কথা'র প্রায় সর্বত্র থাকলেও পূজারিণী, অভিসার, পরিশোধ প্রভৃতি কয়েকটি কবিতাতেই বিশেষ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। 'কাহিনী' বরঞ্চ এদিক দিয়ে সর্বত্র কাব্যগুণ-প্রধান না হয়ে কোথাও কোথাও ভাবপ্রধান হয়েছে। মহাভারতের কথাবস্তু এবং চরিত্র একালের মহাকবির দ্বারা গৃহীত হয়ে নূতন কাব্যার্থ ব্যঞ্জিত করেছে।* আমরা এর মধ্যে প্রাচীন ও নবীনের সংযোগের রহস্য অনুধাবন ক'রে চমৎকৃত হয়েছি। কবি তাঁর কৈশোরে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' এবিষয়ে তাঁর প্রেরণার কাজ করেছিল। কিন্তু সোনারতরীর 'পুরস্কার' কবিতায় দেখতে পাই রামায়ণ ও মহাভারতের কাব্যগুণ সম্পর্কে কবি স্বকীয়-ভাবে একটি নির্দিষ্ট ধারণায় উপনীত হয়েছেন, এর শান্তকরুণরস ও বৈরাগ্যময় বিষাদ সম্পর্কে নিজ-অনুভব পুরস্কারের 'কবি'র মধ্যস্থতায় ব্যক্ত করেছেন। 'কাহিনী' কাব্যের একটি কবিতায় বাল্মীকির কবিত্বলাভ বিষয়টি উপস্থাপিত ক'রে কবি কাব্যতত্ত্বের দুটি প্রধান বিষয় সম্পর্কে অতি মূল্যবান্ নিজ মৌলিক ধারণা বিন্যস্ত করেছেন ('ভাষা ও ছন্দ')। একই ধারায় রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ-আখ্যানের ভিত্তিতে রচিত 'পতিতা' কবির বৈপ্লবিক মানবিকতায়, বিশেষে সামান্যা নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধে চিহ্নিত। লক্ষণীয় এই যে, একালের যে কয়েকটি কবিতায় তিনি মানুষের বহিরঙ্গ পরিচয় অতিক্রম ক'রে অন্তরঙ্গ সত্তাকে দেখেছিলেন, তার মুখ্য তিনটি—চিত্রাঙ্গদা, পতিতা, ব্রাহ্মণ—প্রাচীনের আশ্রয়েই নির্মিত। মহাভারত অবলম্বন ক'রে লেখা—এর

* কাহিনীর নাট্যকাব্যগুলি এবং ভারতকথার সঙ্গে কবির সম্পর্কের বিষয়টি স্বল্প পরেই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হচ্ছে।

পূর্বেকার 'বিদায়-অভিশাপ' ও 'চিত্রাঙ্গদা' এবং এখনকার আশ্চর্য নাট্যকাব্য-গুলি। 'কথা'-র চিত্রধর্মী কাব্যগুণ পূর্বেই কল্পনার কয়েকটি কবিতার মধ্যে স্ফূর্তিলাভ করেছে এবং তার সঙ্গে মিলেছে কবিবাঙ্নির্মাণের অপূর্ব কৌশল। কল্পনাকাব্যের প্রাচীনাশ্রয়ী কাব্যগুণ সম্বন্ধে অতঃপর আমরা আলোচনা করব।

'কল্পনা' কাব্যের উপর সাধারণভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও প্রাক্তন রচনাগুলির সঙ্গে এর একটা অবিসংবাদী পার্থক্য ধরা পড়ে। তা হ'ল এর বিষয়বস্তু, রূপনির্মাণ ও বাক্যে সংস্কৃতস্বাদ। 'মানসী'র কাল থেকে কয়েকটি কবিতায় ও নাট্যে আধুনিক কবিমানস সংস্কৃত সাহিত্যকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করলেও, এমন কি সংস্কৃত বাক্যের ছাঁদ ও রূপকৌশল কোথাও সবিশেষ অনুসরণ করলেও (চিত্রাঙ্গদা তু°) সংস্কৃত কাব্যের রসে আপ্লুত তদ্গত চিত্তকে এমন নোতুনভাবে প্রকাশ করতে পারে নি। সংস্কৃত সাহিত্যকে আধুনিক কবি যেন পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুললেন। কিন্তু প্রাচীনের মধ্যে কবির এই বিচরণ কেবল রোম্যান্টিক্ খেয়ালের বশবর্তী হয়েই, কোনো পূর্ব-সূরীর এ কথা অর্ধ-সত্য, যেমন, চৈতালির কালিদাস-প্রীতিসম্পর্কে—কবি সমসাময়িক সভ্যতার প্রতি "বিরক্তমনে কালিদাসকে স্মরণ" করেছেন—এরূপ উক্তি শ্রদ্ধেয় নয়। কারণ, কল্পনা-কাব্যের নবীকৃত প্রাচীনরসের গভীরতা, 'আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে' সংস্কৃতের অনুশীলন এবং তার সঙ্গে একালের কবিচিত্তের পূর্ব-বর্ণিত প্রবণতাগুলি কবির গভীরতর রসাবেশেরই পরিচয় বহন করে, আর চৈতালির সর্বতোমুখী তপোবনাদর্শ-প্রীতি কালিদাসকে গভীরভাবে আত্মস্থ করারই প্রমাণ দেয়। বস্তুত কবি তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার অগ্রগতির বশেই সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শের অনুরাগী হয়ে উঠেছেন।

'কাহিনী'তে প্রাচীনের বস্তু আছে, 'কথা'য় আছে প্রাচীনের চিত্রধর্ম, 'কল্পনা'য় ও 'ক্ষণিকা'য় রূপ ও রসের একান্ত সমন্বয় ঘটেছে। ১৩০৪-এর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে স্বপ্ন, মদনভস্মের পূর্বে ও মদনভস্মের পর, বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ প্রাচীন চিত্রের কবিতাগুলি রচিত হয়। এগুলিতে কালিদাসের মেঘদূত-কুমারসম্ভব-ঋতুসংহার, ঘটকর্পরের যমককাব্য ও মদন-মহিমা-জ্ঞাপক বিচ্ছিন্ন শ্লোকে গ্রথিত বহু চিত্রের যেন যথাযথ অবতারণা করা হয়েছে। প্রাচীন কবিদের কাব্যের এই স্বাদ আধুনিক মহাকবি যদি না দিতেন তাহলে আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ। মনে হয়, প্রাচ্য সাহিত্যিকতাকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব নিয়েই যেন রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের অনুরাগী পাঠক লক্ষ্য করবেন যে

সংস্কৃত সাহিত্যের যা রমণীয়, যা প্রণিধানযোগ্য, যা অবিস্মরণীয় তার প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথ কাব্যে, নাট্যে, সংগীতে ও চিঠিপত্রে কোনো না কোনো সূত্রে ব্যক্ত করেছেন। সংস্কৃত নাটক ও কথাসাহিত্যের রাজা, মন্ত্রী, বিদূষক, নায়িকা, নাগরিক, কবি, চেটী, কঞ্চুকী প্রভৃতি অগণিত নরনারীর জীবনযাত্রার বিচিত্র পদক্ষেপ, এমনকি তাদের কথাবার্তার ভঙ্গিগুলিও যেমন কবির অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিতে ধরা পড়েছে ও স্মৃতিতে রক্ষিত হয়েছে, তেমনি প্রকৃতি-জগতের, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বৈচিত্র্য কবির মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। 'কল্পনা'র বহু পরে রচিত ঋতুনাটকগুলিতে ও সাংকেতিক নাটক-গুলিতে বাহ্যভাবে হ'লেও জীবন ও মানব-প্রকৃতি-সম্পর্কের প্রাচীনাশ্রয়ী আর একটা দিক লক্ষিত হবে। মনে হবে কবি যেন সংস্কৃতের লেখনী ভুলক্রমে বাংলার পুস্তকে পরিচালিত করেছেন। এবং সব মিলিয়ে বিচার ক'রে একথা স্বীকার করতেই হবে যে সংস্কৃতসাহিত্যের সঙ্গে কবির সম্পর্ক পল্লবস্পর্শী ভাসা-ভাসা ধরনের নয়।

সংস্কৃতসাহিত্যের প্রতি কবির এই অকুণ্ঠ অনুরাগ যেন 'স্বপ্ন' কবিতার প্রথম কয় পঙ্‌ক্তির মধ্যে তাঁর অজ্ঞাতসারেই ব্যঞ্জনাক্রমে পরিস্ফুট হয়েছে—

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

উজ্জয়িনীর শিপ্রাতীরের পূর্বজন্মের এই প্রিয়া আর কেউ নয়, সংস্কৃত কাব্যের (মূলতঃ কালিদাসের) অকলঙ্ক কেবল-সৌন্দর্যের রাজ্য, এবং কবি-প্রিয়ার সঙ্গে কবির নির্বাক মিলন ঐ অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যলোকে কবিমানসের স্বপ্ন-প্রয়াণ। কবির এই সুগভীর অনুরাগের সাক্ষ্যস্বরূপ কবিতাটিতে বর্ণিত মনোহর চিত্রগুলি কোন্ কোন্ স্থান থেকে কীভাবে গৃহীত হয়েছে তার পূর্ণ পরিচয় দিতে পারি সে অবকাশ এখানে নেই। শুধু দেখি, যে-সুদূরসঞ্চারিণী মানসী-প্রতিমা কবিকে বারংবার বিরহজর্জর করেছে, প্রাচীনে প্রয়াণ ক'রে কবি তাকে পুনরায় পেলেন, এবং এবার যদিচ আরও প্রত্যক্ষভাবে, তবু অবকাশ হ'ল নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, মিলনের ক্ষীণ দীপশিখা মুহূর্ত মধ্যেই নিবল অতলস্পর্শ অন্ধকারে। কবিতাটি 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা'র সগোত্র, এতেও সেই আলো-অন্ধকারের পটভূমি, সেই মিলনের আশ্বাস নিয়ে পরিণামে তীব্র বিরহ অনুভব। কবিতাটির শেষ কয় চরণে যে-চিত্রনির্মাণের মধ্য দিয়ে ঐ ভাব-সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়েছে, প্রকাশরীতিতে তা তুলনাহীন।

'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটির মধ্যে ঋতুসংহার, মেঘদূত, ঘটকর্পরের যমক-কবিতা এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের বর্ণসম্পাত ঘটেছে। বর্ষার এই উল্লাস ঠিক

বাঙ্‌লার বাস্তব পল্লীজীবনের নয়, এবং কবিও এখানে পল্লীকবি নন; অথচ খাঁটি বাঙ্‌লার পরিচিত দু' একটি মাত্র দৃশ্য গ্রহণ ক'রে (গুরুগুরু গর্জনে নীল অরণ্য* শিহরে; যূথীপরিমল আসিছে সজল সমীরে, ডাকিছে দাদুরী তমাল-কুঞ্জ-তিমিরে) তার উপর সংস্কৃত কবিকল্পনার বাস্তবাতিশায়ী মাধুর্য আরোপ ক'রে কবি প্রাচ্যভাবানুগত আর্টের চূড়ান্ত নিদর্শন দিয়েছেন। 'ক্ষণিকা'র বিখ্যাত 'নববর্ষা' কবিতাটিতেও বাস্তব বর্ষাপ্রকৃতি অপেক্ষা কবিমানসের কল্পলোকই অধিকতর রমণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে বাদলের ধারার সঙ্গে নবীন ধান্যের নৃত্যকে অতিক্রম ক'রে প্রাসাদশিখরে আলুলায়িতকবরী তরুণী, বিদ্যুদ্‌বিদ্ধনয়না অভিসারিকা এবং দোলায় দোদুল্যমানা নায়িকার অলীককল্পনাই আমাদের চিত্তকে অধিকতর রসাবিষ্ট করেছে, মুহূর্তের মধ্যে সংস্কৃত কাব্যরাজ্যে প্রবেশ করিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। 'স্বপ্ন' কবিতাটির মাধ্যমেও কবি আমাদের মনোরাজ্যে বিভ্রাট বাধিয়েছেন; দৈনন্দিন জীবনে বিস্মৃত, কেবল পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ সংস্কৃতকাব্যের কল্পলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন ক'রে শিপ্রানদীর তটে প্রিয়ার ভবনের সামনে একাকী দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। 'মদনভস্মের পূর্বে ও পর' অপূর্ব প্রেমের কাব্য কুমার-সম্ভবের প্রণয়লীলার উদ্দীপন বিভাবগুলিকে আশ্রয় ক'রে উপস্থাপিত দক্ষ কবির লিরিক কল্পনা মাত্র। 'মদনভস্মের পূর্বে' কবিতার মদন ও তরুণীদের চারিত্র্য-চিত্রও প্রাচীনের নানানু কবিতার চিত্রচ্ছায়া অনুসরণের সাক্ষ্য বহন করে। ঐ কবিতার 'শাসনতরে বাঁকায়ে ভুরু' প্রসঙ্গে বক্রোক্তিজীবিতে উদ্ধৃত একটি প্রাকৃত শ্লোকের ('কণ্ণুপ্পল—' ইত্যাদি, ৬১)† দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'মদনভস্মের পর' কবিতাটিতে মদনকে প্রকৃতি ও মানবের যাবতীয় রমণীয় সম্পর্কের সারভূত বস্তুর অদৃশ্য কারণরূপে আধুনিক কবি দেখেছেন—

> বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
> নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
> বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
> চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।

* ছন্দসুষমারক্ষার্থে 'নীল অরণ্য' স্থলে পরিবর্তিত 'নীপমঞ্জরী' পাঠ তত উৎকৃষ্ট হয়নি। অনুরূপ ধ্বনিমাধুর্য বিস্তারের জন্য পরিবর্তিত 'কেকাকল্লোলে' এবং 'তড়িৎ-চকিত-নয়না' স্থলে 'কিঙ্কিণী-কলকলনা' পাঠও। সংস্কৃতের চিত্র ও ধ্বনির বিমুগ্ধ অনুসরণের ফলে কবিতাটিতে ভাবসংগতি স্থানে স্থানে ব্যাহত হয়েছে।

† কর্ণোৎপলদলমিলিতলোচনৈ হেলালোলনমানিতনয়নাভিঃ।
লীলয়া লীলাবতীভির্নিরুদ্ধঃ শিথিলীকৃতচাপো জয়তি মকরধ্বজঃ॥

'ক্ষটলগ্নে' যে অনুতাপদগ্ধা বিরহিণীর চিত্র আঁকা হয়েছে তিনি সাজে সজ্জায় ভঙ্গিতে বাক্যে প্রাচীনা, যদিও বয়সে নবীনা। 'অলস চরণে বসি বাতায়নে এসে, নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে' অথবা 'কনকমুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে, বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন মনে' প্রভৃতি সম্পূর্ণ একালের নায়িকার চিত্র নয়। 'সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী......ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ' প্রভৃতি চিত্র সেকালের প্রতীক্ষমাণা নায়িকাদের বিলাসগৃহ-চিত্র। আর, যে প্রেমভিক্ষু বিরহী পথিক স্বর্ণমুকুট ও মুক্তার মালা ধারণ ক'রে অশ্বারোহণে এলেন তিনিও আধুনিক কোনো নায়ক নন, বরঞ্চ 'ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি, বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি'র চিত্র নিয়ে স্ফুট বর্ণিত মধ্যযুগের কোনো প্রেমিকের চিহ্ন দাবি করতে পারেন।

বলা বাহুল্য, এসব কবিতার কোনো নিগূঢ় অর্থ বা তত্ত্ব নেই, কল্পিত ক্ষীণ বিপ্রলম্ভ আশ্রয় ক'রে সৌন্দর্যসৃষ্টি মাত্র এবং সে সৌন্দর্যের উপকরণ বহন করেছে প্রাচীন সাহিত্য। আমাদের মনে হয়, কবির এই প্রকার কল্পনা-বিলাসের মূলে প্রেরণামাত্ররূপে কোনো বিক্ষিপ্ত সংস্কৃত শ্লোক কাজ করেছে। অনুসন্ধানের দ্বারা তা ধরা পড়তে পারে। ঠিক এই ধরনেরই কাল্পনিক অর্থহীন অভিসারের বর্ণনাময় 'ঝড়ের দিনে' কবিতাটির প্রাচ্য শব্দচিত্র যেমন অনবদ্য, প্রকাশের সংযমও তেমনি সুন্দর। 'দেখিছ না ওগো সাহসিকা, ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা' অথবা 'কেন আজি যাও একাকিনী, কেন পায়ে বেঁধেছ কিঙ্কিণী' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি লেখার সময় কবি যেন প্রাচীনকালের নাগরিকাদের প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অভিসারিকার বর্ণনা কেবল "রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ" অগ্রসর উজ্জয়িনীর যোষিৎগণের কথাই শোনায় না, দু'একটি প্রকীর্ণ শ্লোকে দৃষ্ট পথিকের প্রতি রমণীর আদিরসাত্মক বিনয়োক্তির প্রতিধ্বনিও ক'রে থাকে—

হে উতলা শোনো, কথা শোনো,
দুয়ার কি খোলা আছে কোনো?
এ বাঁকা পথের শেষে মাঠ যেথা মেঘে মেশে
ব'সে কেহ আছে কি এখনো।

'পসারিনী' কবিতার কল্পনামূলেও বৃন্দাবনের গোপী এবং অন্যবিধ পসারিনী-বর্ণনাচিত্র মিশ্রিত থাকা সম্ভব। এই কবিতাটির অর্থ আবিষ্কার করতে গিয়ে বহু পূর্বে কোনো মর্মব্যাখ্যাতা জীবাত্মা-পরমাত্মার তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন। মনে পড়ে, "সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদক এরকম তত্ত্বারোপের উপর কটাক্ষও করেছিলেন। 'প্রকাশ' কবিতাটিতে সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত প্রকৃতির প্রণয়লীলা আধুনিক প্রকৃতির কবিকে একটি রোম্যান্টিক কল্পনায় প্রবৃত্ত করেছে। সংস্কৃত কবিদের বর্ণনায় এই জড় প্রকৃতির—তৃণ-

তরুলতা-পশুপক্ষীর—মিলন-বিরহ এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে আধুনিক কবি তা থেকে উৎপ্রেক্ষা করছেন—প্রকৃতির মধ্যে প্রণয়লীলা একদিন বাস্তব আকারেই বিদ্যমান ছিল; সহসা কোনো প্রগল্‌ভবাক্‌ কবি প্রকাশ ক'রে দিতেই প্রকৃতি আবরণ দিয়ে ঐ লীলা গোপন ক'রে ফেলেছে। কিন্তু গোপন করলেও একালের কবির কাছে তা ঠিক ধরা পড়েছে দেখা যায়—

শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে,
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে;

কল্পনার 'হতভাগ্যের গান'-এর 'হে অলক্ষ্মী রুক্ষকেশী তুমি দেবী অচঞ্চলা' প্রভৃতি ছড়ার ছন্দে চিত্রিত অলক্ষ্মীর কল্পনাতেও লৌকিক 'অলক্ষ্মী'র সঙ্গে বহুবর্ণিত চঞ্চলা লক্ষ্মীর চিত্রও বিপরীতভাবে কাজ করেছে। অবশ্য কবিতাটিতে গূঢ় প্রেরণারূপে কাজ করেছে হতভাগ্য স্বদেশ ও সমাজ। চিত্রাকাব্যের আবেদন কবিতার 'মহারানী', ক্ষণিকার 'কল্যাণী' বা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকার 'রানী'রই একটি ভিন্নরীতির প্রতিচ্ছবি। 'কল্পনা'র এই সকল কবিতা ছাড়া কয়েকটি গানের মধ্যেও ('কেন যামিনী না যেতে জাগালে না নাথ'* 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন' প্রভৃতি) সংস্কৃত-সাহিত্যের চিত্রকল্প ও ভঙ্গির অনুসরণ ও রূপান্তরীকরণের সন্ধান পাওয়া যায়।

'কল্পনা'য় এই প্রাচ্য সৌন্দর্য-স্বপ্ন ছাড়া অন্য জাতের কবিতাও স্বভাবতই স্থান পেয়েছে, যেগুলির প্রেরণা বহুল পরিমাণে কবির স্বকীয়, কিন্তু ভাষা-শিল্পে সংস্কৃতের সুনির্দিষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে বর্ষশেষ, দুঃসময়, বৈশাখ এবং অশেষ এই চারটি কবিতা লক্ষণীয়। 'বর্ষশেষ' কবিতাটি ঠিক সৌন্দর্য-প্রধান নয়, ভাবোবেগ-প্রধান। এর ভাষায় ও চিত্রাঙ্কনে art এবং অভ্যন্তরে ethics-এর প্রেরণা কাজ করেছে। এই ভাবপ্রেরণা সম্পর্কে কবির উক্তি—'এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে।' বলা বাহুল্য, নূতন প্রেরণার প্রয়োজন কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কতদূর তা অনির্ণেয়, কিন্তু বাঙালীর জীবন সম্পর্কে এ বিষয় তৎকালে সম্পূর্ণরূপেই প্রযোজ্য। যে প্রবল জাতীয়তাবোধ এই যুগের বিশেষ লক্ষণ তা-ই কবির অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে একদিকে কবিতাটিকে যেমন সার্বজনীন আবেদনে পূর্ণ ক'রে তুলেছে, অপরদিকে তেমনি কবির ব্যক্তিগত জীবনেও বন্ধন-মুক্তি ও দুঃখবরণের সহায়ক হয়েছে। কবির তৎকালীন জাতীয়তাবোধ 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায়,

*তু° 'প্রিয়ায়াঃ প্রত্যুষে গলিতকবরীবন্ধনবিধৌ' ইত্যাদি (ধোয়ী) এবং 'গতপ্রায়া রাত্রিঃ কৃশতনুশশী শীর্যত ইব, প্রদীপোঽয়ং নিদ্রাবশমুপগতো ঘূর্ণত ইব' ইত্যাদি (অজ্ঞাতনামা)।

'ভারতলক্ষ্মী' ('অয়ি ভুবনমনোমোহিনী') গানে এবং 'উন্নতি-লক্ষণ' নামক ব্যঙ্গ কবিতায়ও সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। বঙ্গলক্ষ্মী কবিতাটি কবির বাস্তব স্বদেশপ্রীতির উল্লেখযোগ্য পরিচয় বহন করছে, যেমন—

*　　*　　রয়েছ মা ভুলি
তোমার শ্রীঅঙ্গ হ'তে একে একে খুলি
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাট-শোভা সীমন্তরতন
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।

জাতীয় ভাব-প্রেরণার ভিত্তিতে বিবিধ বন্ধনমুক্তির আগ্রহ আরও স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হ'ল 'সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে' ('বিদায়') প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে। এর কিছু পূর্বেই 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইংরেজ ও ভারত-বাসী' 'অপমানের প্রতিকার' 'রাজা ও প্রজা' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধের প্রবল জাতীয়তাবোধও এ প্রসঙ্গে তুলনীয়।

বিখ্যাত 'বর্ষশেষ' কবিতাটির প্রেরণার বীজ হ'ল—

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা-স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—

এই সমাজচিত্র ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ হয়ে অচলায়তন ও বলাকার বহু কবিতা এবং পরিচয়, কালান্তর প্রভৃতি পুস্তকের বহু বৈপ্লবিক প্রবন্ধ রচনায় কবিকে নিয়োজিত করেছে, ফলত এই মহাকবির সামাজিক ব্যক্তিত্বও পরিস্ফুট করেছে। এই জাতীয় দুরবস্থার অসহনীয় চিত্রই এখানে কবিকে ভয়ংকর-সুন্দরের আদর্শ-কল্পনায় নিয়োজিত করেছে, এবং বীররসে আপ্লুত করেছে। আলংকারিক ভাষায়, নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে বীররসের অনুভাব ও সঞ্চারী বর্ণিত হয়েছে বলা যেতে পারে—

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার—
উদ্দাম পথিক!

ঝড়ের 'sublime' রূপের বর্ণনা কবিতাটিতে যে নেই তা নয়, কিন্তু তা গৌণ উদ্দীপনবিভাবরূপেই স্থানলাভ করেছে। 'ধূসর পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায়

ঊর্দ্ধমুখে, গোঠে ফিরে চাষী' থেকে 'মত্ত হাহারবে ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য' পর্যন্ত কয়েক পঙ্‌ক্তিতে ঝটিকার ভীষণ-মধুর রূপের অবতারণা ক'রেই কবি 'ঘনগূঢ় ভ্রূকুটি', অথবা 'বিজয়গর্জনস্বন' অথবা 'মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জ্বলদর্চিরেখা' প্রভৃতি sublime-এর বর্ণনার দ্যোতক শব্দচিত্রগুলিকে ভাব-প্রেরণামূলক শিব-রুদ্রমূর্তির বশীভূত ক'রে ফেলেছেন। এইজন্য এই কবিতাটি সৌন্দর্য-প্রধান না হয়ে ভাব-প্রধান হয়ে পড়েছে। অথচ সমধর্মা ইংরেজি-কবি শেলির Ode to the West Wind-এ পাশ্চাত্য-সমাজের নবজন্ম-কামনা প্রকাশ পেলেও ঝড়ের ভীষণ-উদার সৌন্দর্যের ও সুদূরপ্রসারী রূপের অতুলনীয় প্রকাশে কোনো বাধা ঘটেনি।* বস্তুতঃ ঐ কবিতাটিতে কবিমনের ঝটিকা ও বাইরের ঝটিকা যেমন এক হয়ে মিশে গেছে এবং 'উদ্দেশ্য থেকেও উদ্দেশ্য-অভিলাষ-হীন' এক অপূর্ব লিরিক কবিতার জন্ম দিয়েছে—বর্ষশেষে ঠিক তেমন ঘটেনি। 'বর্ষশেষ'-এ কাব্যগুণ অপেক্ষা নৈতিক ভাবচেতনাই প্রবল। বলা বাহুল্য, ঠিক এই সময়ে, এই প্রাচ্যস্বপ্ন-বিলাসের মুহূর্তে শেলির মত তীব্র বিদ্রোহী কবিমানস রবীন্দ্র-নাথের ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথ ও শেলির বিক্ষোভের কারণও বিভিন্ন। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবগত অন্তর্গূঢ় আবেদনের বিভিন্নতার জন্যেই একের মধ্যে ঝড় অভাবনীয়ভাবে আত্মস্থ হয়েছে এবং অপরের মধ্যে বাইরে থেকে আদর্শগত প্রেরণার সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইজন্য বর্ষশেষ ও Ode to the West Wind-এর বৈপরীত্যও কম নয়। বর্ষশেষের উল্লিখিত সর্বজনীন ব্যাপক ভিত্তিভূমি ছাড়া যেখানে কবিআত্মার সঙ্গে একটি ক্ষীণ-সম্পর্কের মিলন ঘটেছে সেখানে কবিতাটিকে 'এবার ফিরাও মোরে'র সগোত্র ব'লেই বিবেচনা করতে হবে। 'এবার ফিরাও মোরে' সমাজবোধ বা বাস্তবজীবনবোধের প্রথম কবিতা। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখাতিক্রমণ সেই প্রথম দেখলাম, তারপর জীবনদেবতা-শ্রেণীর কবিতায় ভিন্নাকারে দেখলাম ঐ জীবনবোধের ব্যক্তিগত প্রকাশ। অবশেষে এখানে জাতির Evil-এর পরিত্রাতা রুদ্রের রূপে কবি যে-কাল্পনিক শক্তিকে আহ্বান করছেন তার পরিচয় পেলাম। এই ধারণা কেমন ভিন্নভাবে অচলায়তন, রাজা প্রভৃতি নাটকে রূপ লাভ করেছে তা পরে দেখব। এই নূতন ভাব সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণের মুহূর্তে কবি বলছেন—

"অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে

* বিদগ্ধেরা মনে করেন, শেলির উক্ত কবিতার প্রথম কয়েক স্তবক বৈদিক রুদ্রের চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত। জার্মানির মধ্যস্থতায় ইংল্যান্ডে প্রাচ্য সাহিত্যকথা সেই প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে।

দেখা দিলো ? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।"

রক্ষণশীল সমাজজীবনের প্রতিবাদরূপে অপ্রত্যাশিত রুদ্রের বা ভাঙনের দেবতার আগমন ও তার বিজয়ঘোষণা কিছু পরে লেখা একালের 'পাগল' প্রবন্ধেরও অন্তর্নিহিত বিষয়। ঐ প্রবন্ধে কবি বলছেন—"যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়ীরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারের একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে ; ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্যের সুর ইঁহার নহে……" (বঙ্গভঙ্গের আভাসে রচিত 'পাগল' প্রঃ)।

সাহিত্যসৃষ্টির ভূমিকায় যেমন যুগপরিবেশ তেমনি স্বাধীন কবিচিত্তেরও ক্রিয়া থাকে। এ দুয়ের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় থেকেই কবির রচনা স্ফূর্ত হয়, কোনো একটির স্বাধীন ক্রিয়াবশে নয়, এ কথা 'বর্ষশেষ' বিশেষভাবে প্রমাণ করেছে।

'অশেষ' কবিতাটি কবির একটি স্বতন্ত্র ভাবুকতার দাবি রাখে। যখনই ব্যক্তিগত জীবনে অতিরিক্ত কর্মের আবেদন এসেছে তখনই (অরূপ উপলব্ধির পূর্বকাল পর্যন্ত) পূর্বোক্ত জীবনদেবতাকে কবি স্মরণ করেছেন। চিত্রা পর্যায়ে এই অহং-এর আকস্মিক উপলব্ধির উচ্ছ্বাসের পর জীবনদেবতার রঙ ফিকে হয়ে এলেও স্মৃতি এখনও লুপ্ত হয়নি। কিন্তু কর্মের উৎসাহ 'অশেষ' কবিতাটির কাব্যার্থ নয়, বরঞ্চ কর্মবিরাগই এখানে আকর্ষকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কর্ম-অনুরাগ এবং কর্ম-বিরাগ উভয়ই একালে রবীন্দ্রকাব্যে পাশা-পাশি রয়েছে। চিত্রাতেও 'এবার ফিরাও মোরে' ও 'জীবনদেবতা'র পাশাপাশি 'দিনশেষে' কবিতার "ভালো নাহি লাগে আর আসা-যাওয়া বার বার বহুদূর দুরাশার প্রবাসে" প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। 'অশেষ' কবিতায় এই বৈরাগ্যের মধুর চিত্র "নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার-আঁচল-খসা ·…এখানো আহ্বান" পর্যন্ত। পরবর্তী 'হোক জয়, হে দেবী, করিনে ভয়' প্রভৃতি অংশের কাব্যা-কর্ষণ নগণ্য।

'বৈশাখ' কবিতাটি একালের চিত্রধর্মী সংযত কাব্য-রচনাপদ্ধতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কবিতাটির সৌন্দর্য নির্ভর করছে বৈশাখের উপর সন্ন্যাসী বা রুদ্রের রূপ ও ব্যবহার আরোপ করায় এবং ঐ রূপের উপযুক্ত পরিবেশ-চিত্রণে। এখানে অভিনব শব্দচয়ন ও শব্দগঠন সংস্কৃতের আশ্রয়েই নিষ্পন্ন হয়েছে। ভারতীয় প্রকৃতির সঙ্গে ভারতীয়ের ত্যাগের কঠোর আদর্শের সামঞ্জস্য এই সময় কবি দেখছিলেন। ভাবের দিক থেকে কবিতাটি 'বর্ষশেষ' ও 'পাগল'-প্রবন্ধের সজাতীয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে যে সন্ন্যাসীর চিত্র

কল্পনা করা হয়েছে, পরবর্তী 'নববর্ষ' প্রবন্ধে কবি তার সাহায্য নিয়েছেন দেখতে পাই—

'ভারতবর্ষ' তাহার তপ্ততাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্কধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজ্জটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ……তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্র-বিকীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন বস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে।…… তখন দেখিব ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে—যখন ঝড়ের গর্জনে অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরেজী বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝংকার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপর শব্দিত হইয়া উঠিবে।"

'কল্পনা' কাব্যের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'দুঃসময়' সংস্কৃত বচনভঙ্গির ও ধ্বনিময়তার সজ্ঞান অনুসরণের বিশেষ প্রয়াস হিসাবেই মূল্যবান্। পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন, প্রতি পঙ্‌ক্তিতে প্রচুর অনুপ্রাসের ব্যবহারে এই কবিতাটিতে অ-পূর্বদৃষ্ট ধ্বনি-সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। এই বহিঃসৌন্দর্যই (যদিও কোথাও অতিরেক ঘটেনি এমন নয়) কবিতাটির একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তু। 'বর্ষামঙ্গল' কবিতা ও ক্ষণিকার 'আবির্ভাব' কবিতাটির মত বর্ণ-বিহ্বলতা ও ধ্বনিবিলাসই এই কবিতাটির স্বভাব, এর মধ্যে কোনো সুসমঞ্জস বাচ্যার্থ আবিষ্কারের প্রয়াস পণ্ডশ্রম মাত্র। দেখা যায়, দুঃসময় কবিতায় বাগ্‌বিলাসের যে আতিশয্য ঘটেছে, 'আবির্ভাব' কবিতায় বাক্‌সিদ্ধ কবি তাকে অতিক্রম করেছেন এবং ভাষাশিল্পের দিক থেকে একটি নিখুঁত কবিতা পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। ভাষাভঙ্গির যে-চমৎকারিতা ও প্রৌঢ়ত্বগুণ রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা বাইরের দিক থেকে কাব্যজগতের উত্তম কলানৈপুণ্যের সাক্ষ্য দেয়—তার প্রাথমিক পরীক্ষামূলক দিকটি কল্পনা-কাব্যের সংস্কৃতানুশীলনের মধ্যেই ধরা পড়ে। দুঃসময় কবিতার পাণ্ডুলিপি রচনাবলীতে তথা সঞ্চয়িতায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দেখা যায়, 'দুঃসময়' ও 'অসময়' নামে প্রকাশিত দুটি বিভিন্ন কবিতা ঐ পাণ্ডুলিপির 'স্বর্গপথে' কবিতারই ভগ্ন ও পরিবর্তিত দুই রূপ মাত্র। আরো দেখা যায়, এক একটি শব্দ বার বার পরিবর্তিত ক'রে কবি অভিপ্রেত ধ্বনিগুণসম্পন্ন শব্দটি বেছে নিয়েছেন এবং পরিশেষে কোথাও কোথাও গোটা বাক্যই বাদ দিয়ে অন্য কথা বসিয়েছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের সমস্ত রচনাই যন্ত্রমুখনির্গত তৈয়ারি বস্তু এমন বালকসুলভ ধারণা অনুচিত হলেও এবং কবিবাঙ্‌নির্মিত

পরিবর্তনসাপেক্ষ ও যৎসামান্য আয়াসসাধ্য একথা মেনে নিলেও এখানে কবি যে-ধরনের পরীক্ষণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন অন্যত্র তা দুর্লভ। সেইজন্য 'দুঃসময়' ও 'অসময়' কবিতা দুটিতে এই শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টের যেটুকু আড়ষ্টতা দেখা যায়, পরবর্তী কোনো রচনায় তা দেখা যায় না। 'কল্পনা' কাব্য কেবল সাহিত্যিক প্রেরণার দিক থেকেই নয়, ভাষা-শিল্প-শিক্ষার নিদর্শন হিসাবেও সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ প্রভাব দাবি করে।

'দুঃসময়' কবিতাটির বাচ্যার্থ অনুসন্ধান না ক'রেই ব্যঙ্গ্যার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা কোনো কোনো আলোচনা-গ্রন্থে দেখা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম দার্শনিক সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তীর মতে কল্পনায় 'বিগত জীবনের স্মৃতিতে কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নূতন জীবনযাত্রায় পক্ষ বিস্তার করিতে যাইতেছেন' এবং দুঃসময় তারই নির্দেশক কবিতা। এই আলোচনা গ্রহণ না ক'রে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার কাব্যজীবনের বাস্তব দিকে রচনার ক্ষেত্রে কিছুকালের উষরতার মধ্যে দুঃসময় নামের সার্থকতা খুঁজেছেন। বলা বাহুল্য, এরকম কোনো অর্থেই আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কবিতাটির এমন কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আছে যাদের মধ্যে অর্থগত বাহ্য সংগতি পাওয়া যায় না। কবিতাটির প্রথমার্ধে কোথাও কোথাও অর্থতঃ যাত্রার উৎসাহ সূচনা মনে হলেও ছন্দ ও ভাষার ব্যঞ্জনা মনের নৈরাশ্যজনক বিমূঢ়তাই প্রকাশ করে। কবিতাটির শেষে—

> ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন,
> ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
> ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন,
> ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির সুরে ও ভাষার কোমলতায় নৈরাশ্যজনক মনোভাবের ব্যঞ্জনাই পাওয়া যাচ্ছে। উৎসাহ-উদ্দীপনায় নয়, এই মনোভাবের মধ্যেই যদি 'দুঃসময়' নামের কোনো সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা এই ধরনের কবিতাকে এই যুগের বৈশিষ্ট্য—সংস্কৃত ভাষার শিল্প-সৌন্দর্য ও সংস্কৃত কাব্যের রস স্বীকরণ-প্রয়াসের ফল ব'লেই মনে করি। 'দুঃসময়' ও 'অসময়' কবিতায় স্থানবিশেষে উত্তম ধ্বনি, কোথাও ব্যঙ্গ্যার্থের অপ্রাধান্য, এবং শব্দ-চিত্রের অদ্ভুত সংযোগ দেখতে পাই।*

বিশুদ্ধ কবিত্বে অতুলনীয় 'ক্ষণিকা' কাব্য 'কল্পনা'র সমসাময়িক। এতে

* পরে দেখছি, তৎকালীন "সাহিত্য" পত্রের সম্পাদকও কবিতাটির আন্তরিক কবিত্বগুণ সম্পর্কে প্রশংসা করতে পারেননি, যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি কবির প্রশংসায় বেশ অকৃপণ।

বিশ্বাত্মবোধের গভীর তত্ত্ব বা সৌন্দর্য-ধ্যানরহস্য প্রভৃতি কবি-আত্মার কোনো নিগূঢ় সঞ্চরণের ইতিহাস নেই, আছে যাবতীয় দ্বন্দ্বের অতীত একটি নির্মল কেবল-কবিস্বভাবের পরিচয়। সুখদুঃখ ভাবনা-চিন্তার অতীত নির্লিপ্ত কবিমানস কৌতুক-রসাস্বাদ করতে চায়, কেবল স্বপ্নময় চিত্র দেখতে চায়। বাইরের দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে একে রবীন্দ্র-প্রতিভার কাল্পনিক সুদূর-সঞ্চরণের উৎস থেকে পৃথক্‌ভাবে উৎসারিত ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে লঘুকল্পনার সুখ-বাসনাকে পরিত্যাগ করেন না তার পরিচয়ও পূর্বাপর পরিস্ফুট হয়েছে। কবির ঐ স্বভাবই এখানে বিশেষত্বের যোগে প্রবল হয়েছে বলা যেতে পারে। ক্ষণিকায় বাহ্যরূপে খাঁটি বাঙ্‌লার প্রকৃতি (ভঙ্গিতে ও বস্তুতে), কিন্তু নিগূঢ় অন্তরে গোপনে সংস্কৃত কাব্যের আদর্শও বিরাজ করছে। কবির উক্তির পুনরুল্লেখ ক'রে বলা যেতে পারে—এখানেও বিচার্য কবির মনস্তত্ত্ব। এই যে খেয়ালি মনের ক্ষণিক সুখ-বাসনা, কোনো তত্ত্বের মধ্যে অবতরণ নয়, দার্শনিকতা নয়, জীবনসমস্যা নয়, অবিমিশ্র আনন্দ-স্বরূপের বশীভূত হ'য়ে সেই স্বভাবেরই চরমতা-খ্যাপন, এ প্রবৃত্তি সংস্কৃত সাহিত্যের। সংস্কৃত সাহিত্য কাব্যজগতে শুদ্ধ-রসসৃষ্টির চূড়ান্ত উদাহরণ। আধুনিক কবি সংস্কৃত সাহিত্যের এই রসপ্রীতির ভাবটিকে একেবারে আত্মস্থ ক'রে ফেলেছেন। দেখা যাবে, কবির পূর্বোপলব্ধ অপূর্ব নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্য-প্রীতির আগ্রহও কবির কাছে বর্তমানে অশ্রদ্ধেয় হয়ে পড়েছে। 'যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ ফুরাইলে দিস ফুরাতে'—এই তাত্ত্বিকতা-বিরল রসবাসনাই কবিকে ক্ষণিকায় একান্ত পরিতৃপ্ত ক'রে তুলেছে। মুক্ত ও বিশুদ্ধ মানসের পরিচয় বহন করার জন্যই এর লিরিকগুণ অসামান্য, এবং একেবারে খাঁটি। 'ক্ষণিকা' পড়লে বোঝা যায়, অতঃপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রয়োজন-সম্পর্কহীন ক্ষণিকতাবিলাস কবির প্রতিভার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ল, সৌন্দর্যাভিলাষের পোষকমাত্র হয়ে রইল না।

ক্ষণিকাকে একালের সংস্কৃতানুশীলনের পটভূমিতে স্থাপন ক'রে দেখতে হবে। দেখতে হবে খাঁটি বাঙ্‌লায় ছড়ার ছন্দে (সর্বত্র নয়) যে-কবিমানস প্রতিফলিত হয়েছে তা রস আকর্ষণ করেছে সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যচেতনা-সর্বস্ব ক্ষণিকতাবাদ থেকে—যেখানে যৌবন, বসন্ত, লঘুহাস্য ও প্রেমই সত্য; সুগভীর তত্ত্বকথা অগ্রাহ্য। এর ফলেই কবি জোর করে বলতে পেরেছেন—

আজকে শুধু একবেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।

অথবা—

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,

আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

অথবা—

চিত্ত-দুয়ার মুক্ত ক'রে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই বলব নাক সত্যকথা।

ক্ষণিকার 'আবির্ভাব' ও 'নববর্ষা' কবিতা দুটির বিষয় ইতিপূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা গেছে। এই অর্থহীন ধ্বনিসৌন্দর্যময় 'আবির্ভাব' কবিতাটির উৎসরূপে বিবেচিত হতে পারে অমরুশতকে এমন একটি শ্লোক আমরা দেখেছি। শ্লোকটি হ'ল এই—

মলয়মরুতাং ব্রাতা যাতা বিকাসিতমল্লিকাঃ
পরিমলভরো ভগ্নো গ্রীষ্মস্ত্বমুৎসহসে যদি।
ঘন ঘটয়িতুং তং নিঃস্নেহং য এব নিবর্তনে
প্রভবতি গবাং—স এব ধনঞ্জয়ঃ ॥*

অর্থাৎ—মল্লিকাসুগন্ধ মলয়বাতাস চলে গেল, পরিমলময় গ্রীষ্মও শেষ হতে চলেছে। এখন, হে মেঘ, তুমি যদি হৃদয়হীন ব্যক্তিকে আমার সঙ্গে মিলিত করতে পার, ইত্যাদি। কবি আরম্ভ করলেন,—

বহুদিন হ'ল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায় ;
এলে তুমি ঘন বরষায়।

কোনো একটি শ্লোকের ক্ষীণ প্রেরণা মাত্র লাভ ক'রে কবি নিজস্ব কাব্যজগৎ গড়ে তুলেছেন, এমন ঘটনা হয়ত তাঁর একালের রচনায় অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কালিদাস-বাণভট্ট-জয়দেবকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতে এমন অনেক কবি রয়েছেন যাঁরা এক একটি শ্লোকে এক একটি উত্তম কাব্য রচনা করেছেন। ভর্তৃহরি, ঘটকর্পর, অমরু, রাজশেখর, ধোয়ী, শরণ, গোবর্ধন, বিল্হণ এবং আরও জ্ঞাতনাম অজ্ঞাতনাম অনেকে পরে-সম্পাদিত বিভিন্ন কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থে স্থান পেয়েছেন। এরকম নানা কবির চাতুর্যপূর্ণ কয়েকটি শ্লোক কবি প্রজাপতির নির্বন্ধ বা চিরকুমার-সভা উপন্যাসে ও নাটকে সংস্কৃত-রসিক 'রসিক'-এর মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। গীতগোবিন্দের মত অমরুশতক, উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, পবনদূত বা চৌরপঞ্চাশিকা তাঁর অবশ্যই পড়া ছিল। অমরু

* দীর্ঘ ড্যাস-চিহ্নিত শ্লোকাংশে "কিং নশ্ছিন্নং" এই বাক্য মুদ্রিত দেখা যায়। এরকম উক্তি শুধু গ্রাম্যই নয়, অনর্থবহ। আমাদের অনুমান অমরুর মূল পুঁথিতে বা অনুলিপিতে প্রমাদবশতঃ 'কপি-ছাড়' হয়েছিল, পরে কোনো মজা-রসিক তরুণ পাঠক ঐভাবে পাঠ সেরে দেয়।

সম্পর্কে কবি লিখেছেন—"সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাত-গম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে" (জীবন-স্মৃতি)। হেবরলিন্ সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থও (১৮৪৭) কবি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন।*

অতঃপর রবীন্দ্রকাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের ক্রমপ্রবেশ ও তার প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। 'কল্পনা' কাব্যের এই একান্ত সংস্কৃতানুগ সাহিত্যাদর্শ রবীন্দ্রকাব্যজীবনে নূতন হ'লেও এর পূর্বে নানান্ আকারে সংস্কৃত সাহিত্য (মূলত কালিদাস) তাঁর কাব্যের বিষয়ীভূত হচ্ছিল। কালিদাস সংস্কৃত কবিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীন ভারতের কবি-প্রতিনিধি, সুতরাং পরবর্তী অন্য এক ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক না থাকলেই বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক হ'ত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যেমন সম্পর্ক, কালক্রমে পরিবর্তিত ভারতেরও তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একথা প্রস্তাবনায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। কালিদাস ও বাণভট্ট ছাড়া জয়দেবাদি অর্বাচীন বহু কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যদিচ যে-কোনো বাঙালী কাব্যরসিকের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর, তথাপি কালিদাসই মুখ্যভাবে কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে একথা বলা যেতে পারে। কালিদাসের রোম্যানটিক প্রকৃতি-অনুরাগ, জন্মান্তরীণ ব্যাকুলতার অনুভূতি ও সহজ মানবীয়তা এই তিনটি গুণ রবীন্দ্রনাথেও প্রধানভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষের অধ্যায়ে কবির অতুলনীয় সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক কল্পনাপ্রবণতার কথা উল্লেখ করেছি এবং এই ধর্ম পাশ্চাত্য ভাববন্যার উচ্ছলিত প্রবাহ হলেও কালিদাসের কাছ থেকে সংক্রামিত হতে পারে এমন ধারণা ব্যক্ত করেছি। স্বয়ং কবি মনে করেন যে উনিশ শতকের ইংরেজি কাব্যে কবিদের মনোভাবের যে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা যায় তা পূর্ববর্তী জার্মান দর্শনের প্রতিক্রিয়া, এবং জার্মান দার্শনিকেরা ভারতীয় রহস্যবাদ থেকেই তাঁদের মতামতের প্রেরণা পেয়েছিলেন।† অর্থাৎ উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের প্রকৃতি-ব্যাকুলতা ও বহির্বস্তুর অন্তরালে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন শক্তির লীলার ধারণা—আঠারো-উনিশ শতকের জার্মানির নূতন দার্শনিক-দলের ভাববাদ, যথা ফিক্‌টের Ego-তত্ত্ব, শেলিং-এর প্রকৃতি-অধ্যাত্মের একত্ব এবং হেগেল্-এর সক্রিয় Absolute-এর প্রকাশ-লীলা থেকেই

* এবিষয়ে লেখকের "রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য" প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩-৪)

† The Message of the Forest প্রবন্ধ, বা Creative Unity—The Religion of the Forest দ্রঃ।

অনুপ্রাণিত—এবং এই অভিনব দার্শনিক মতবাদগুলি ভারতের ভাববাদী দার্শনিক মতবাদের ও সাহিত্যধর্মের দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়েছিল।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের অভিনব নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্য-কল্পনার প্রথম পূর্ণপ্রকাশ 'মেঘদূত' কাব্যের আধারেই সংঘটিত হয়েছিল। তারপর উল্লেখ-যোগ্য 'উর্বশী' এবং 'বিজয়িনী' কবিতা। এ দুয়ের সৌন্দর্য-প্রেরণা বা সৌন্দর্য সম্পর্কে বিশিষ্ট ধারণা কবির স্বকীয় হলেও কালিদাস ও বাণভট্ট ঐ প্রেরণার রূপ-নির্মাণে সাহায্য করেছে দেখা যায়।

'বিজয়িনী' এবং 'আবেদন' প্রভৃতি কবিতার বাসনাসম্পর্কশূন্য নারী-মূর্তির কল্পনা বিষয়ে আমরা আরও একটু অগ্রসর হতে পারি। আমাদের মনে হয় এরকম নারীমূর্তি ও তার সঙ্গে আচরণ-সম্পর্কটি বাণভট্টের মহাশ্বেতা ও তার সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের আচরণ থেকে কল্পিত। 'কাদম্বরী'-কথায় চন্দ্রা-পীড়ের মহাশ্বেতা-দর্শনের মধ্যে কবিকৃত মহাশ্বেতা ও তার পারিপার্শ্বিক বর্ণনায় একটি নিষ্কাম-বিশুদ্ধ সৌন্দর্যলোকই চিত্রিত হয়েছে। মহাশ্বেতার অলোকসামান্য নারীরূপের সঙ্গে তপঃ-সাধয়িত্রীর ভাব মিশ্রিত হয়ে আধুনিক কবির অভিপ্রেত প্রয়োজন-সম্পর্করহিত সৌন্দর্যচিত্রের প্রেরণা দিয়েছে। মহাশ্বেতার রূপবর্ণনার মধ্যে বাণভট্টের মূল কথাটি লক্ষ্য করতে হবে—'যৌবনেন নির্বিকারবিনীতেন শিষ্যেণেব উপাস্যমানা'—যৌবন (বা লক্ষণাক্রমে 'মদন') বিকারহীন বিনীত শিষ্যের মত তাঁর উপাসনায় রত। এই সঙ্গে স্মরণ করতে হবে 'বিজয়িনী' কবিতার মদনের চিত্র—

> পরক্ষণে ভূমি-'পরে
> জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে,
> নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
> সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
> তূণ শূন্য করি।

'আবেদন' কবিতার 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে 'ভক্ত' 'সর্বাধম দাস' 'দীন ভৃত্যে'র যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে তৎকালীন চন্দ্রা-পীড়ের চারিত্র তুলনার যোগ্য—"এবমুক্তস্তু তয়া সম্ভাষণমাত্রেণৈবানুগৃহীত-মাত্মানং মন্যমান উত্থায় ভক্ত্যা কৃতপ্রণামঃ 'ভগবতি যথাজ্ঞাপয়সি' ইত্যভিধায় দর্শিতবিনয়ঃ শিষ্য ইব তাং ব্রজন্তীমনুবব্রাজ।"—মহাশ্বেতা অতিথিকে স্বাগত-সম্ভাষণপূর্বক ঐ সকল কথা বললে পর চন্দ্রাপীড় তাঁর সম্ভাষণাদিতেই নিজেকে অনুগৃহীত মনে ক'রে উঠে ভক্তিসহকারে প্রণাম করলেন এবং দেবী, আপনি যা আদেশ করেন, এই কথা ব'লে বিনীত শিষ্যের মত চলমানা মহাশ্বেতার অনুসরণ করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, আবেদন ও বিজয়িনী কবিতায় প্রাকৃতিক চিত্রের মধ্যেও এই বনভূমির ও কালিদাসের বসন্ত-বর্ণনার

ছায়াপাত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অচ্ছোদসরসীনীরে যে-রমণী স্নানের জন্যে অবতরণ করছেন তিনি যে মূলে এই মহাশ্বেতাই তারও প্রমাণ রয়েছে। কাদম্বরীতে রয়েছে, একদা বসন্তে তরুণী মহাশ্বেতা (তখন তপস্বিনী নন) 'অচ্ছোদ' সরসীতে স্নানের জন্য অবতরণ করেছিলেন,—'মধুমাসাদিবসেষ্বেকদাহম্ অম্বয়া সহ মধুমাসবিস্তারিতশোভং প্রোৎফুল্লনবনলিনকুমুদকুবলয়কহ্লারম্ ইদমচ্ছোদং সরঃ স্নাতুমভ্যাগমম্।' মহাশ্বেতার পবিত্র অলৌকিক সৌন্দর্যবর্ণনায় নারীরূপাত্মক আদিরসের যে আভাস বর্ণনাটিকে মাধুর্যময় করেছে তা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সুলভ ; রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত সৌন্দর্য-কল্পনা নারীরূপের আশ্রয়েই গ'ড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথে পরাভূত মদনের চিত্রে কুমারসম্ভবের মদনের চরিত্র যে অল্পবিস্তর প্রেরণা দেয়নি এমন নয়, কারণ সেখানে কালিদাস মদনকে কিঞ্চিৎ বাচালরূপেই এঁকেছেন। আবেদন কবিতার 'স্ফটিক প্রাঙ্গণে জলযন্ত্রে উৎসধারা' প্রভৃতি বর্ণনে মালাবিকাগ্নিমিত্রের মধ্যাহ্নবর্ণনের আভাস স্পষ্ট।

চিত্রাঙ্গদা নাট্যে সংস্কৃত সাহিত্যের বহিঃরূপের অনুসরণ আরো প্রকট। এতে আলংকারিক বচনচাতুর্য এবং সংস্কৃতনাট্যের প্রয়োগ-শিল্পের অনুকরণ সহজেই চোখে পড়ে—

শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।
… অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে ?
… … ধনুর্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রান্ত।—

ইত্যাদি বহু উক্তির মধ্যে বাঙলার আবরণে সংস্কৃত ভাষাই লক্ষ্য করা যায়। আলংকারিক উক্তির এমন প্রচুর সমাবেশ এর পূর্বেকার কোনো রচনাতেই দেখা যায় না। এছাড়া অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার কথোপকথনের মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তলের আক্ষরিক অনুসরণও রয়েছে, এখানে যার কয়েকটি উল্লেখ না ক'রে পারছি না—

সে কি সত্য, কিম্বা মায়া ?	স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ওই মনোহর রূপ পুণ্যফল মোর	অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব
	তদ্রূপমনঘম্।
শান্ত হও হে হৃদয়	হিঅঅ মা উত্তম।

কোনো ভয় নাই মোরে, বরাননে, আমি
ক্ষত্রকুলজাত ; ভয়ভীত দুর্বলের
ভয়হারী।

কঃ পৌরবে বসুমতীং
শাসতি শাসিতরি দুর্বিনীতানাম্…
—ইত্যাদি

অতিথি-সৎকার
তব দরশনে, হে সুন্দরী, শিষ্টবাক্য
সমূহ সৌভাগ্য মোর। যদি নাহি লহ
অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি,
চিত্ত কুতূহলী মোর।

ভবতীনাং সূনৃতয়ৈব গিরা কৃতমা-
তিথ্যম্।
(অনসূয়া) সহি মম বি অত্থি
কোদূহলং। পুচ্ছিস্সং দাব ণং—
ইত্যাদি
(রাজা) বয়মপি তাবদ্ভবত্যোঃ
সখীগতং পৃচ্ছামঃ।

শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি
জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি
হেলায় দিতেছ বিসর্জন ?

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপু-
স্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।…
বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাৎ
ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্।

হায়, কারে করিছ কামনা
জগতের কামনার ধন।

প্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ।
…ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ
—(কুমারসম্ভব)

হেমন্তের হিমশীর্ণ লতা

পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা
লতা মাধবী।

নিম্নে উদ্ধৃত চাতুর্যময় সংলাপটি আমাদের কয়েকটি সংস্কৃত নাটকেরই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—

অর্জুন। হেন
নর কে আছে ধরায়। কার যশোরাশি
অমরকাঙ্ক্ষিত তব মনোরাজ্যমাঝে
করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন।

চিত্রাঙ্গদা। জন্ম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

অর্জুন। কহ, শুনি, সর্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর, সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে।

চিত্রাঙ্গদা। …কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবন-মাঝে
রাজবংশ-চূড়া।

অর্জুন। কুরুবংশ !

চিত্রাঙ্গদা। সে বংশে
কে আছে অক্ষয়-যশ বীরেন্দ্র-কেশরী
নাম শুনিয়াছ ?

কিন্তু কেবল বিক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যেই নয়, চিত্রাঙ্গদার সমস্ত অঙ্গ ব্যাপ্ত ক'রে আছে প্রাচীন সাহিত্যের নিটোল পরিপূর্ণতা—রূপে, রসে, ভঙ্গিতে, বচনে। নিখুঁত প্রাচীনধর্মাশ্রয়ণের জন্যই আধুনিক পাঠকের রুচির দাবি এতে রক্ষিত হয়নি। এই দিকটি লক্ষ্যে না রেখেই কোনো কোনো সমালোচক এতে রুচি-বিকার-দোষ অর্পণ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যরসিক সে স্থলে এই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসাই করবেন। 'বিজয়িনী' কবিতায় কবি যে নারীরূপ ও পারিপার্শ্বিক অঙ্কন করেছেন, সেই চিত্রের সঙ্গে অর্জুনের নবতনু-চিত্রাঙ্গদা দর্শনের বিস্ময় পাঠক তুলনা ক'রে দেখবেন—বর্ণনা একবারে এক।

কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য, কিম্বা মায়া?
নিবিড় নির্জন বনে নির্মল সরসী—……
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল
সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাতটে।
কী অপূর্ব রূপ! কোমল চরণতলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল?
……নামি ধীরে সরোবরতীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া;
উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মৃদু হাসি
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিল কেশপাশ; মুক্ত কেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে
কোমল কাতর, প্রেমের করুণামাখা।
নিরখিল নত করি শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।…
ভাবিলাম মনে, ধরণী খুলিয়া দিল
ঐশ্বর্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
চমকিয়া মিলাইয়া গেল। ভাবিলাম,
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ-গৌরব, বীরত্বের
নিত্যকীর্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
প'ড়ে ভূমে, ঐ পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে।…ইত্যাদি।

উদ্ধৃতির শেষাংশের সঙ্গে কেবল 'বিজয়িনী'র মদনের ছবিই নয়, আবেদনের দীনভৃত্য 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকারের' চারিত্র্যও স্মরণীয়। শেষ

কয় ছত্রে ইংরেজি কাব্যকাহিনীর অনুস্মৃতিও হয়ত বা ঘটেছে। কিন্তু সংস্কৃতানুসারীতা কেবল ঐ ধরনের বর্ণনার বহিঃরূপেই আবদ্ধ, ভাববস্তুতে নয়, এমন কথা বলাও হয়ত স্পর্ধার বিষয়। কারণ, রূপমোহের অতীত যে ভাবসৌন্দর্যের মহিমাকীর্তন এখানে কবির কাব্যবস্তু তা পরবর্তী কালে কবিকৃত কালিদাস-ব্যাখ্যারও মর্মকথা। কালিদাসের কাব্য সম্পর্কে প্রকাশিত ঐ তত্ত্ব হয়ত পূর্বেই অতি ক্ষীণভাবে কবিমানসে ছিল, নৈবেদ্য প্রভৃতি রচনার সময় প্রাচীন ভাবাদর্শের প্রেরণার মধ্যে ঐ উপলব্ধিটি বিস্তৃতির সঙ্গে কবি বিবৃত করলেন। পরবর্তী কালে রচিত 'তপতী' নাটকে রূপলালসাকে অনুতাপদগ্ধ ক'রে যে ত্যাগময় প্রেমের জয় ঘোষণা করা হ'ল তা-ও কবির এই আদর্শ-দৃষ্টি-প্রসূত, এবং সন্দেহ হয়, প্রথম যৌবনের রচনা 'রাজা ও রানী'তে এই ভাবেরই ক্ষীণ সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই প্রাচীনসাহিত্যে ভাবধর্মের আবিষ্কর্তা।

স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে সংস্কৃত কাব্য 'আদৌ' কবির ভাব-ব্যাকুলতার আধারভূত হয়ে ধীরে ধীরে রূপবাণীর মধ্যে নিজেকে বিস্তৃত করেছে এবং পরিশেষে প্রাচ্য-সাহিত্য-রসিকতায় পরিণামপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এইখানেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের শেষ নয়। পরবর্তী কালে লেখা ঋতুনাট্য ও অরূপ-নাট্যগুলির সংস্কৃত আঙ্গিক ও কালিদাসের ঋতু-উৎসবাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা বাদ দিলে এই পর্যায়ে নৈবেদ্য রচনার সমকালে প্রাচীন জীবনাদর্শের কাব্যিক প্রভাব অবিস্মরণীয়, এবং এই মহাকবির অরূপলীলানুভূতি প্রকৃতি-ব্যাকুলতা থেকে স্বকীয়ভাবে উৎপন্ন হলেও এরূপ ধারণায় বাধা নেই যে, ভারতীয় জীবনাদর্শ ও ধর্মাদর্শের স্মৃতি কবিকে অরূপানুপ্রাণিত বিশ্বোপলব্ধিতে অতি দ্রুত নিয়ে যাওয়ায় সহায়তা করেছে।

কবি 'প্রাচীন সাহিত্য' নামক বিখ্যাত আলোচনায় ভারতীয় জীবনাদর্শ বা ধর্মাদর্শের ভিত্তিতেই কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার সৌন্দর্য-বিচার করেছেন। কালিদাসের ঐ দু'টি সৃষ্টির কেন্দ্রে যে ধর্মাদর্শের প্রেরণা রয়েছে তা কবি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন—"একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধন-মোচন, এই দুই-ই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসার-মধ্যে ভারতবর্ষ বহুলোকের সহিত বহুসম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না—তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুইয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই, দুইয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ—আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার তপোবনে যেমন সিংহশাবকে নরশিশুতে খেলা করিতেছে, তেমনি, তাঁহার কাব্যতপোবনে যোগীর ভাব গৃহীর ভাব বিজড়িত হইয়াছে। মদন আসিয়া সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া

কবি তাহার উপর বজ্রনিপাত করিয়া, তপস্যার দ্বারা কল্যাণময় গৃহের সহিত অনাসক্ত তপোবনের সুপবিত্র সম্বন্ধ পুনর্বার স্থাপন করিয়াছেন। ঋষির আশ্রমভিত্তিতে তিনি গৃহের পত্তন করিয়াছেন এবং নরনারীর সম্বন্ধকে কামের হঠাৎ আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপূত নির্মল যোগাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত।"

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে যে ধর্ম রয়েছে (শাস্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান নয়, পরিবর্তমান বৃহৎ মানবধর্ম) তা রবীন্দ্রনাথ এই যুগে এত বিচিত্রভাবে বলেছেন যে, তার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র হবে। স্থিরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কবি-রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ-উদ্বোধনের মূলে রয়েছে কালিদাসের কাব্য এবং বিশেষভাবে তাঁর তপোবনাদর্শ। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনাকালে কবি এত অধিক পরিমাণে এই আদর্শের বশীভূত হয়ে পড়েছেন যে, সাধারণ সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে যিনি সৌন্দর্য বা রসকেই চরমতত্ত্ব ব'লে অভিহিত করেছেন ('সাহিত্যের পথে' দ্রঃ) এবং যিনি বিশ্বের সুখদুঃখময় আনন্দলীলার অতিরিক্ত কোনো তত্ত্বরূপে ঈশ্বরের নির্দেশ দেননি, তিনি একান্ত শ্রেয়োবোধের দিক থেকেই কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার বিচার করেছেন। এই কারণেই এযাবৎ কালিদাস-রসিক সাধারণ পাঠক ও আলংকারিকদের বিচার থেকে আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথের বিচার স্বতন্ত্রও হয়ে পড়েছে। প্রাচীন ধারণায় কুমারসম্ভব আদিরসের অপূর্ব কাব্য এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তল বিরহ-মিলনময় ভারতীয় দাম্পত্যজীবনের শ্রেষ্ঠ চিত্র। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার (তথা পার্বতীর) বিচ্ছেদ কাব্যকৌশলের জন্যেই অতীব প্রয়োজন, বিরহ না থাকলে মিলন পরিপুষ্ট হয় না। আবার দুষ্যন্ত উত্তম ধীরোদাত্ত নায়ক, শকুন্তলাও অভিপ্রেত মুগ্ধা ও মধ্যা নায়িকা। কালিদাস মহাভারতের দুষ্যন্ত-শকুন্তলার স্বার্থপ্রণোদিত ও রূঢ় বাসনাময় কাহিনীকে অসামান্য দক্ষতা সহকারে নানাভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ক'রে উপাদেয় আদিরসাত্মক কাব্যে পরিণত করেছেন, দুর্বাসার শাপ যে-কৌশলের অন্যতম পরিচয় বহন করে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অভ্যন্তর থেকে দুষ্যন্তের স্বার্থ-পরতার ও কামুকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এমন বিচার তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বস্তুত এঁদের আলোচনা অনুসারে, প্রাচীনের কবিরা প্রেমকে দেহের আধারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যথার্থ বাস্তবরূপে দেখেছিলেন, অশরীরী আদর্শ-চেতনারূপে প্রত্যক্ষ করেননি। অথচ স্বপ্নদ্রষ্টা আধুনিক কবি-সমালোচক কল্পনায় যেন কালিদাসের কবি-মানসের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে বললেন—"সৌন্দর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, পাপ একেবারে

চিত্তের ভিতর হইতে বিলুপ্ত, বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সংসারে তাহার সহস্র বাধা-ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ্য একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্য-সাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। সে ভালকে সুন্দর, সে শ্রেয়কে প্রিয়, সে পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে……কালিদাসও তাঁহার নাটকে দুরন্ত প্রবৃত্তির দাবদাহকে অনুতপ্ত চিত্তের অশ্রুবর্ষণে নির্বাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাধিকে লইয়া অতিমাত্রায় আলোচনা করেন নাই—তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন এবং দিয়া তাহার উপরে একটি আচ্ছাদন টানিয়াছেন। সংসারে এরূপস্থলে যাহা স্বভাবত হইতে পারিত তাহাকে তিনি দুর্বাসার শাপের দ্বারা ঘটাইয়াছেন।………দুঃখবেদনাকে তিনি সামান্যই রাখিয়াছেন, কেবল বীভৎস কদর্যতাকে কবি আবৃত করিয়াছেন।…পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে, স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল।" এরূপ রসসমীক্ষায় পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির নীতিমূলক আলোচনার ধারাও অনুসৃত হয়েছে।

কল্যাণময় ধর্মাদর্শের ভিত্তিতেই প্রেম সার্থক, এই কথা বোঝাতে গিয়ে মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলাকে একটি ঐক্যমূলক তাৎপর্যের দৃষ্টিতে কবি দেখলেন—"যে-প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের ভগ্নপ্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে-অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তাহা ভর্তৃ-শাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে……দুর্বাসার শাপ কবির রূপক মাত্র। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বন্ধনহীন গোপন মিলন চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত।"

রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা গতানুগতিকের বিরোধী এবং তাঁর অপরিসীম শক্তিমত্তার পরিচায়ক। অপর এক মহাকবির প্রতিভার মধ্যে প্রবেশ ক'রে যে-গোপনরহস্য তিনি আবিষ্কার করলেন, এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি-অবয়বের সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য উদ্ঘাটন ক'রে যে অননুকরণীয় ভাষায় সুদুর্লভ অনুরাগের সঙ্গে নানাপ্রকারে তাঁর অভিমত প্রমাণ করলেন, তার তুলনা কোনো সমালোচনার ইতিহাসে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।* কিন্তু আমাদের বক্তব্য

*তু°—কবিতারসমাধুর্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ।
ভবানীভ্রূকুটিভঙ্গিং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ॥

ঠিক তা নিয়ে নয়। আমরা সমালোচক-কবির এই নব্য দৃষ্টিভঙ্গি ও তার কারণ সম্বন্ধে যেন অবহিত হই। একালে শুধু কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার সমালোচনেই কবির এই আদর্শপ্রবণতা সীমাবদ্ধ থাকেনি, সাধারণ সাহিত্য-বিচারেও কবি 'সুন্দরে'র সঙ্গে 'শিব'কে মিলিয়ে তবেই পরিতৃপ্ত হয়েছেন, তার উদাহরণ 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধ (১৩১২)। সেখানেও কবি কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার কথা উত্থাপন ক'রে নিম্নলিখিত উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন—"সে (মদন) যখন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাধাইতে চায়, তখনি বিপ্লব উপস্থিত হয় ; তখনি প্রেমের মধ্যে ধ্রুবত্ব এবং সৌন্দর্যের মধ্যে শান্তি থাকে না……কারণ, ধর্মের অর্থই সামঞ্জস্য ; এই সামঞ্জস্য সৌন্দর্যকেও রক্ষা করে, মঙ্গলকেও রক্ষা করে এবং সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে অভেদ করিয়া উভয়কে একটি আনন্দময় সম্পূর্ণতা দান করে।"
(প্রাচীন সাহিত্য)

সাহিত্যাদর্শেও এই ধর্মপ্রেরণা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় হাওয়া কোন্ দিকে বইছে।* 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক রচনা। তার পূর্ব থেকেই নৈবেদ্য রচনা চলছে ও উপনিষদের মধ্যে কবি প্রবেশ করেছেন ('ব্রহ্মমন্ত্র' রচনা দ্রঃ)। উপনিষদের উপর কবির স্বকীয় অনুরাগ এই সময় থেকেই জন্মলাভ করে, এর পূর্বে নয়।† বস্তুত প্রাচীন সাহিত্যাদর্শের ও ধর্মাদর্শের প্রতি অনুরাগ একরকম ১৩০৩ থেকেই কবির চিত্তকে আবিষ্ট ক'রে রেখেছিল, যার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ নৈবেদ্য কাব্যে কবি পরকীয়ভাবে হ'লেও ঈশ্বরোপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করলেন। এর পূর্বে কবি যখন-তখন ব্রহ্মসংগীত রচনা করলেও ফরমায়েশের বশবর্তী হয়েই করেছেন, তাঁর উপলব্ধিতে ব্রহ্ম তখনও স্বাঙ্গীকৃত হয়নি। নৈবেদ্যের ব্রহ্মসংগীতগুলি এদিক থেকে অনেক পরিমাণে স্বতঃ-উৎসারিত বলা যেতে পারে। যাই হোক, কবিপ্রতিভার অরূপলোকে সঞ্চরণ সম্বন্ধে এই কথাটুকু আমাদের জানতে হবে যে পূর্বতন সোনারতরী-চিত্রা কাব্যে দৃষ্ট প্রকৃতিভাবব্যাকুলতা কবিকে

* পরবর্তী সাহিত্য-সমালোচনা 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে কবি প্রায় বিপরীত মন্তব্য করেছেন। সেখানে তাঁর ভাষণে ও চিঠিপত্রে এই কথাটিই পুনঃপুনঃ প্রকাশিত হয়েছে যে—'বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়'। এই মন্তব্য নির্বিচারে good art এবং great art সম্বন্ধে। এবং সাহিত্য বা art-এর চরমতাও কবি এই দুই পুস্তকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবির এই প্রৌঢ় অভিমতই পরে তাঁর সম্পর্কে সাধারণভাবে আমাদের গ্রহণীয় হয়েছে।

† হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় লিখিত 'উপাধ্যায় ব্রহ্ম-বান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ধীরে ধীরে অসীমের রহস্যলীলায় প্রবেশ করিয়েছে, কিন্তু মাঝখানে কালিদাসের তপোবনাদর্শ তথা প্রাচীন ভারতীয় ধর্মাদর্শ ঈশ্বরলীলার প্রতি আগ্রহে প্রবল উদ্দীপনের কাজ করেছে। নৈবেদ্যে এই উদ্দীপনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ রয়েছে। মোটামুটি নৈবেদ্য থেকে এই যে নতুন অধ্যায়ে কবি প্রবেশ করতে যাচ্ছেন তাঁর কাব্যজীবনে তার মূল্য অপরিসীম। উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, রাজা, ডাকঘর প্রভৃতি রচনা বা অরূপ-লীলারসের এই বিস্তৃত অধ্যায়টি তাঁর মূল কাব্যপ্রেরণার সঙ্গে যুক্ত নয়, কোন কোন পূর্ব-সূরীর এমন অভিমত বালকোচিত, বরঞ্চ মর্তপ্রীতিমূলক জীবনরসকে কবির অরূপ-সাধনাই গভীরতর ও যথার্থতর করেছে, এবং বিশিষ্ট জীবন-দর্শনের মধ্যে স্থাপিত করেছে—রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের পৌর্বাপর্য লক্ষ্য ক'রে এমন যৌক্তিক ধারণা পোষণ করাই সংগত।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের উপর রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা তাঁর গদ্যে পদ্যে বার বার প্রকাশ পেয়েছে। 'কথা'র কবিতা ও 'কাহিনী'র নাট্যকল্প খণ্ডকাব্য-গুলি প্রাচীন ভারতের উপর তাঁর বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ থেকে সমুৎপন্ন। অতীতসঞ্চারী রবীন্দ্রকবিপুরুষের এক বিশেষ পরিচয় এগুলির মধ্যে রয়েছে, যদিও কালোচিত জীবনরসসঞ্চারে ও রচনাকৌশলে অতীত রমণীয় নূতন ভাবেই দেখা দিয়েছে। অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে আধুনিক মহাকবির ব্যুৎপত্তি কম ছিল না। মহাকাব্যের যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত পরিবর্তিত ভারতের ইতিবৃত্ত ও জীবনধারার সঙ্গে কবির পরিচয় যেমন বিস্ময়াবহ, তেমনি চমৎকৃতি-জনক তাঁর রামায়ণ-মহাভারতের এবং বৌদ্ধভারতের এবং শিখ, মারাঠা ও রাজপুত জাতির স্মরণীয় ঘটনা ও চরিত্রগুলির কাব্যাকারে পরিবেশন। এগুলির কাব্যমূল্য সম্পর্কে পূর্বেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এগুলির ভাব-মূল্যও বাঙালী সমাজে অপরিসীম। ধর্ম এবং চরিত্র-মহিমা, বিশেষে শিভ্যালুরির পরিস্ফুটনে ও আমাদের জাতীয়তা ও ভারতীয়তাবোধের উদ্দীপনে 'কথা'র আখ্যানধর্মী গীতিকবিতাগুলি এককালে প্রবলভাবে সহায়তা করেছে। আজকের ভারতে আন্তঃপ্রাদেশিক ভাববন্ধন গঠনে এগুলির মূল্য নিশ্চয় স্বীকৃত হবে। কতকগুলি বিশেষ মানসিক ও কাব্যিক লক্ষণে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী, কতকগুলি সাধারণ ভাবলক্ষণে তিনি ভারতীয়, যেমন আমরা বাঙালী হয়েও ভারতীয়।

বর্তমান অবকাশে কবির মহাভারতের কথাকে গ্রহণ ও নবকাব্য নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। আর্ষ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী ও আশ্চর্য চরিত্রগুলি পরবর্তী কবিসম্প্রদায়কে বিভিন্ন ভাব ও রীতির কাব্য-রচনায় উৎসাহিত করেছে। বিদেশী ভাবের সংঘাতে বিক্ষুব্ধ আধুনিককালেও

কবিকুল রামায়ণ ও ভারতকথাকে নানাভাবে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা ক'রে চলেছেন। মহাকাব্যের ধর্মই এই, তার প্রভাব তার রচনাকালের মধ্যে সীমিত থাকে না।

রামায়ণ অবলম্বনে কবির গীতিনাট্যের স্ফুরণ হয়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' তাঁর কৈশোর-শেষ সময়কার রচনা। মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে তাঁর প্রথম রচনা হ'ল 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্য। এর স্বল্প পরে 'বিদায়-অভিশাপ' এবং আরও পরে 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' এবং 'নরকবাস'। এদের মধ্যে কচ ও দেবযানীর কথা নিয়ে লেখা 'বিদায়-অভিশাপ' এবং সোমক-রাজার কাহিনী নিয়ে লেখা 'নরকবাস' মহাভারতের মূল আখ্যায়িকার সংলগ্ন উপাখ্যান থেকে। অন্য দু'টি, মূল আখ্যানের প্রসিদ্ধ চরিত্র ও ঘটনার সংঘর্ষরূপ। এগুলির অভ্যন্তরে রয়েছে উচ্চশ্রেণীর নাট্যসুলভ চারিত্রিক দ্বন্দ্ব আর বহিরঙ্গে রয়েছে অপরূপ বচনচাতুর্য। এগুলির মধ্যে গীতিকবির কাব্যোচ্ছ্বাস প্রশ্রয় পেয়ে নাট্যগুণ ব্যাহত করেছে কি না সে তর্ক নিষ্ফল। আধুনিক কাব্যের পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে। কবি তাঁর স্বভাব এবং যুগ-পরিবেশের প্রয়োজনবশে ভারতকথার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে প্রসারিত করেছেন, অব্যক্ত ও আভাষে-ব্যক্ত অংশকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন, কোথাও নূতন বর্ণনা যোজনা করেছেন, কোথাও বা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত অংশকে গ্রথিত ক'রে সংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ সবই প্রাচীনানুসারী পরবর্তী যুগের কবিদের অবশ্য করণীয়, অনুকরণ তাঁদের কবিপ্রকৃতির বাইরে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রপক্ষে লক্ষণীয় এই যে, কবি তাঁর স্বভাবসুলভ ভাবাদর্শ নিয়ে মহাভারতের কয়েকটি বিশেষ চরিত্রকেই গ্রহণ করেছেন এবং বিশেষ ঘটনাই বেছে নিয়েছেন। ধর্ম হোক, সমাজ হোক, ব্যক্তিজীবনই হোক, সবকিছু সম্বন্ধে আধুনিক মনঃপ্রধান গীতিকবিদের একটা স্বকীয় আদর্শ-কল্পনা থাকবেই এবং তার অনুরঞ্জনও কাব্যের মধ্যে বিরল-গোচর হবে না। যেমন বলা যেতে পারে চিত্রাঙ্গদায় নারীত্ব সম্বন্ধে, বিদায়-অভিশাপে প্রণয়মহিমা সম্বন্ধে, এবং গান্ধারীর আবেদন ও নরকবাসে মানবধর্ম সম্বন্ধে কবির একটি বিশেষ ভাবুকতাই এদের কবিহৃদয়ে স্বীকরণকে নিরূপিত করেছে। চিত্রাঙ্গদায় কাব্যের অতিরিক্ত কবির যে সূক্ষ্ম আদর্শবোধ প্রকাশিত হয়েছে তা বোধ হয় এই যে, পুরুষের যৌন আকর্ষণে নারীর রূপ অনেকাংশে কাজ করলেও নারীকে ভোগের বস্তুরূপে দেখলে অকৃতার্থ হয় পুরুষ নিজেই। 'বিদায়-অভিশাপ' খণ্ডকাব্যে করুণরসের মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করা হয়েছে কর্তব্য থেকে প্রেমের মর্যাদাই গুরুতর। কর্ণকুন্তী-সংবাদে মাতৃধর্মের নিষ্ঠুর অবহেলা দেখানো হয়েছে, গান্ধারীর আবেদনে রাজনীতি ও রাজধর্মের নৃশংস কর্তব্যকে পাপ ও অধর্ম ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে, আর নরকবাসে শাস্ত্র ও প্রথার আনুগত্যের নিষ্ঠুর দিক উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। কবি নিশ্চয়

কাব্যরসের উপরে তাঁর আদর্শবোধকে স্থান দিতে চাননি, তবু তত্ত্বানুরাগী পাঠক হয়ত বা এগুলির পশ্চাতে সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল কবিমানসের আদর্শ-প্রবণতা লক্ষ্য করতে পারেন। যাই হোক, বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় ঐসব কাব্যের বা নাট্যকাব্যের গুণদোষ নয়। মূল মহাভারতকে রবীন্দ্রনাথ কতদূর গ্রহণ করেছেন আর কতদূরই বা তার পরিবর্তন সাধন করেছেন তা-ই আমাদের প্রদর্শনীয়।

মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা আখ্যানকে রবীন্দ্রনাথ মাত্র স্পর্শ করেছেন। এর প্লট, কাহিনী, চরিত্র, পরিণাম সবই তাঁর উদ্ভাবিত। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের অরণ্যে সাক্ষাৎকার, এই সাক্ষাৎকারে চিত্রাঙ্গদার পূর্বরাগ, মদন ও বসন্তের কাছে চিত্রাঙ্গদার রূপযৌবন প্রাপ্তির জন্য আবেদন, অর্জুনের মোহ এবং মোহভঙ্গ প্রভৃতি ঘটনা মূলে নেই। মূলে রয়েছে মণিপুররাজ চিত্রবাহন তাঁর এই কন্যাটিকে পুত্রভাবে দেখতেন, কারণ তাঁর পুত্র ছিল না। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা কতকটা স্বচ্ছন্দ বিচরণের অনুমতি পেয়েছিলেন। এরই উপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাকে বিস্তৃত ক'রে দিয়েছেন। মূলে রয়েছে মণিপুররাজ চিত্রবাহনের পুরীতে অর্জুন স্বচ্ছন্দচারিণী চিত্রাঙ্গদাকে দেখলেন এবং দেখেই মুগ্ধ হলেন—

তাং দদর্শ পুরে তস্মিন্ বিচরন্তীং যদৃচ্ছয়া।
দৃষ্টবা চ তাং বরারোহাং চকমে চৈত্রবাহনীম্॥

তারপর তিনি মণিপুররাজের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে কন্যাটি প্রার্থনা করলেন—

অভিগম্য চ রাজানমবদৎ স্বং প্রয়োজনম্।
দেহি মে খল্বিমাং রাজন্ ক্ষত্রিয়ায় মহাত্মনে॥

মূলে চিত্রাঙ্গদা কুরূপা ছিলেন না, বরং অতিসুন্দরী ছিলেন। চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ ক'রে অর্জুন তিনবৎসর মণিপুর রাজ্যে অবস্থিতির পর পুনরায় তীর্থদর্শনে গেলেন এবং ফিরে এসে পুত্র বভ্রুবাহনকে দেখলেন। তিনি চিত্রাঙ্গদাকে বললেন, পুত্রকে পালন কোরো, রাজসূয় যজ্ঞের সময় পিতার সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে যেয়ো। নাট্যে রবীন্দ্রনাথের অভিনব কাব্যনির্মাণচাতুর্য প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি—"এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেকদিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল।"

কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান মহাভারত আদিপর্বে ৬৪-৬৫ অধ্যায়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যোদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যে উপাখ্যানের বিষয়বস্তুর আংশিক হ'লেও গুরুতর পরিবর্তন সাধন করেছেন। তা হ'ল এই যে, মূলে কচের প্রতি দেবযানীর প্রবল অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু দেবযানীর প্রতি কচের অনুরাগ তো নেই-ই বরং প্রণয় ও বিবাহ প্রার্থিনী

দেবযানীকে উপদেশ ও নীতিকথার ছলে নিরস্ত করার বিষয় রয়েছে, অথচ 'বিদায়-অভিশাপে' রবীন্দ্রনাথ কচের অনুরাগের চিত্র দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য মহাভারতকার থেকে ভিন্ন, তাই প্রয়োজন-বশেই রবীন্দ্রনাথকে কচের চিত্তে দেবযানীর প্রতি অনুরাগের কথা উল্লেখ করতে হয়েছে। এ ছাড়া উপাখ্যানের শেষে বর্ণিত দেবযানীর প্রতি কচের প্রত্যভিশাপের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ একেবারে ব'দ্‌লে নিয়েছেন। না হ'লে অর্থাৎ দেবযানীর অভিশাপের পর কচের প্রত্যভিশাপ থাকলে, তা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতিহীন হয়ে পড়ে। এই দু'টি গুরুতর ব্যতিক্রম ছাড়া কাহিনীর চমৎকৃতিজনক বিস্তারকল্পে রবীন্দ্রনাথ যে-সব ছোটখাটো নতুন কথা কচ ও দেবযানীর মুখ দিয়ে বিবৃত করেছেন তা মূলকেই পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল করেছে। মূলে কচ ও দেবযানীর মনোভাব কী রয়েছে দেখা যাক। বিদ্যালাভের আশায় কচ কখনও নৃত্যগীতবাদ্যের দ্বারা, কখনও পুষ্প ফল উপহার দিয়ে কখনও বা লোক পাঠিয়ে সংবাদ নিয়ে প্রাপ্তযৌবনা দেবযানীর সন্তোষবিধান করতে লাগলেন। আর দেবযানীও সেই নিয়মব্রতধারী বিপ্রকে কামনাপূর্বক গান শোনাতে লাগলেন আর গোপনে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন—

নিত্যমারাধয়িষ্যংস্তাং যুবা যৌবনগাং মুনিঃ।
গায়ন্ নৃত্যন্ বাদয়ংশ্চ দেবযানীমতোষয়ৎ ॥
স শীলয়ন্ দেবযানীং কন্যাং সম্প্রাপ্তযৌবনাম্।
পুষ্পৈঃ ফলৈঃ প্রেষণৈশ্চ তোষয়ামাস ভারত ॥
দেবযান্যপি তং বিপ্রং নিয়মব্রতধারিণং।
গায়ন্তী চ ললন্তী চ রহঃ পর্যচরত্তথা ॥

এই অংশটি অনুধাবন করলে স্পষ্ট বোঝা যায় কচ কার্যসিদ্ধির জন্যে দেবযানীকে তুষ্ট করে চলেছিলেন, আর দেবযানী কচের উপর আসক্ত হয়েছিলেন।

মহাভারত-বর্ণিত কচ স্বকার্যসাধনপটু এবং ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন। সহস্র বৎসর অন্তে কচ বিদ্যালাভ ক'রে স্বর্গলোকে ফিরে যাবার উপক্রম করলে দেবযানী বলছেন—

ব্রতস্থে নিয়মোপেতে যথা বর্তাম্যহং ত্বয়ি ॥
স সমাবৃত্তবিদ্যো মাং ভক্তাং ভজিতুমর্হসি।
গৃহাণ পাণিং বিধিবৎ মম মন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥

"ব্রতনিয়ম পালন ক'রে যখন তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে তখন যে ভাবে আমি তোমার পরিচর্যা করেছি সেইসব স্মরণ ক'রে আজ সমাবর্তনান্তে

অনুরাগিণী আমার উপর তোমার অনুরক্ত হওয়া উচিত। এস, মন্ত্রপুরঃসর আমার পাণিগ্রহণ কর।" এর উত্তরে কচ বলছেন—

পূজ্যো মান্যশ্চ ভগবান্ যথা তব পিতা মম।
তথা ত্বমনবদ্যাঙ্গি পূজনীয়তরা মম ॥
প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
ত্বং ভদ্রে ধর্মতঃ পূজ্যা গুরুপুত্রী সদা মম ॥
যথা মম গুরুর্নিত্যং মান্যঃ শুক্রঃ পিতা তব।
দেবযানি তথৈব ত্বং, নৈবং মাং বক্তুমর্হসি ॥

"তোমার পিতা আমারও পিতা। সেইমতই পূজ্য এবং মান্য, আর তুমি আমার পূজনীয়তরা, কারণ তুমি গুরুপুত্রী এবং গুরুর প্রাণের চেয়েও প্রিয়তরা। সুতরাং আমাকে এমন অনুচিত কথা বোলো না।' দেবযানী কচের এই যুক্তি খণ্ডন করবার জন্য বলছেন—'তুমি আমার পিতার পুত্র তো নও, তুমি পিতার গুরুপুত্রের পুত্র। তাহলে তো তুমিই আমার পূজ্য এবং মান্য হ'লে। তা ছাড়া তুমি অসুরদের দ্বারা নিহত হ'লে পর তখন থেকে তোমার উপর আমার অনুরাগ জন্মে গেছে। আমার বন্ধুত্ব এবং অনুরাগের কথা স্মরণ ক'রে আমাকে কোন্ ধর্ম অনুসারেই বা তুমি ত্যাগ করবে?' তখন কচ যে যুক্তি দিয়ে দেবযানীকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন তা যেমন অসার তেমনি কচের তীব্র বিরাগের নির্দেশক। কচ বলছেন—"তুমি আমার গুরুর থেকেও গুরুতরা, আমার সহোদরা ভগিনী। কারণ, অসুরেরা আমাকে নিহত ক'রে ভস্ম ক'রে সুরার সঙ্গে মিশিয়ে যখন তোমার পিতাকে পান করিয়েছিল তখন তো আমি তাঁর উদরেই ছিলাম। আর সেই ক্রোড়দেশ থেকে যখন তুমিও নির্গত হয়েছ তখন তুমি আমার সহোদরা ভগিনী নও তো কী? অতএব অনুচিত বিষয়ে আমাকে নিযুক্ত করার চেষ্টা কোরো না।" অনুরাগিণী বালিকার উপর কচের এই ব্যবহার আমাদের পীড়িত করে। পরিশেষে কচ বলছেন—

সুখমস্ম্যুষিতো ভদ্রে ন মন্যুর্বিদ্যতে মম।
আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি শিবমাশংস মে পথি ॥
অবিরোধেন ধর্মস্য স্মর্তব্যোঽস্মি কথান্তরে।
অপ্রমত্তোত্থিতা নিত্যমারাধয় গুরুং মম ॥

অর্থাৎ "আমি এখানে সুখেই ছিলাম, আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। আমাকে যাত্রার অনুমতি দাও আর পথের শুভ কামনা কর। যদি আমার কথা তোমার মনে আসে তাহলে ধর্মবিরোধ না ঘটে এইভাবে স্মরণ কোরো, আর অপ্রমত্তা হয়ে আমার গুরুদেবের সেবা করতে থাক, কেমন?" দেবযানী এইভাবে নিতান্ত প্রত্যাখ্যাতা হয়ে ক্ষুব্ধহৃদয়ে অভিশাপ দিলেন—'ন তে বিদ্যা

সিদ্ধিমেষা গমিষ্যতি।' তার জবাবে কচ পাল্টা অভিশাপ দিলেন এই ব'লে— 'তুমি ধর্ম বিবেচনা না ক'রে কামাচ্ছন্ন হয়ে এই যে শাপ দিলে তাতে তুমি বাসনার অনুরূপ পতি লাভ করবে না, কোনো ঋষিকুমার তোমার পাণিগ্রহণ করবেন না'।

মহাভারতের কচ নিষ্ঠুর। হয়তো বা অসুর থেকে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে ভারতকারকে এইভাবে চরিত্র আঁকতে হয়েছে। অথবা সমাজে যা স্বাভাবিক তারই একটি ছবি তুলে ধরেছেন প্রাচীনের মহাকবি। হয়তো বা এই উপাখ্যান মূলের উপর প্রক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন যে, কাব্যগত চমৎকার সৃষ্টি করতে হলে উভয়পক্ষে অনুরাগের চিত্র যখন উপস্থাপিত করতেই হয় তখন কচের রূঢ় প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে প্রত্যভিশাপ নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য আনবে। দেবযানীর অভিশাপ বরং স্বাভাবিক ও যৌক্তিক। তাই কচের ক্ষেত্রে অভিশাপ ব'দলে তিনি বরদান বর্ণনা করলেন। কচের চিত্তে ভারতকথার বিরোধী প্রণয়ের অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ এইভাবে প্রকাশ করেছেন—

আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখী! বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব? * *
* * * * ছিল মনে
কব না সে কথা। বলো, কী হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালোবাসি কিনা আজ
সে তর্কে কী ফল? আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম
চির-তৃষ্ণা জেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্বকার্য-মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ কচের চিত্তে প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বের দিকটি তুলে ধ'রে, অনিচ্ছায় কর্তব্যের কাছে আত্মসমর্পণ দেখিয়ে ভিন্নতর কাব্য রচনা করেছেন। মহর্ষি ব্যাস তখনকার দৃষ্টি নিয়ে আখ্যানের ভঙ্গিতে মোটামুটি ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেছেন।

'গান্ধারীর আবেদন' কাহিনী-গ্রন্থের নাট্যকল্প রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। এই উত্তম নাট্যকাব্যটিতে রবীন্দ্রনাথ মূলের চরিত্রগুলির ভাব প্রায়

অবিকৃত রেখে সে-গুলিকে সংক্ষিপ্ত এবং উজ্জ্বল করতে চেষ্টা করেছেন, অথচ ঘটনাসংস্থান ও সংলাপ বিষয়ে অনেকটা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করেছেন। তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণের কিছু কিছু উক্তি ধৃতরাষ্ট্রের মুখে বসিয়েছেন, কর্ণের কোনো কোনো কথা দুর্যোধনের মুখে দিয়েছেন এবং গান্ধারীর মুখে বিদুর-কথিত বাক্যও প্রয়োগ করেছেন। এ রকম সংলাপের পাত্রান্তরীকরণ কিছুমাত্র অসংগত ও অস্বাভাবিক হয়নি, বরং অধিকতর সংগতিপূর্ণ হয়েছে, এ নাট্য পড়বামাত্র উপলব্ধি করা যায়। ঘটনাবিন্যাসের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ বহুল পরিমাণে স্বকীয়তা রক্ষা করেছেন। গান্ধারীর আবেদন বা ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশদান মহাভারতে রয়েছে প্রথম পাশাখেলার পর, দ্বিতীয় খেলা আরম্ভ হবার আগে। এর পূর্বে সভাস্থলে দ্রৌপদীর অবমাননার মত হীন কার্য সংঘটিত হয়ে গেছে। মহাপ্রাজ্ঞা গান্ধারী যখন দেখলেন, অন্যায়কারী পুত্র দ্বিধাগ্রস্ত পিতাকে বশীভূত ক'রে পুনরায় পাশাখেলার আয়োজন করছে তখন তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিলেন দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে। এর পূর্বে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময়েই অবশ্য নানা দুর্লক্ষণ দেখে গান্ধারী ও বিদুর খুব ভীত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ঐ সব দুর্নিমিত্ত জ্ঞাপন করেছিলেন এবং সেই সময় ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে তিরস্কারও করেছিলেন। এ ছাড়া দেখা যায়, দ্রৌপদীকে সভায় আকর্ষিত করার সময় কুরুবংশীয় ভার্যারা গান্ধারীর সঙ্গে মিলে ভয়ংকর আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নানাদিক বিবেচনা ক'রে দ্বিতীয় দ্যূতের পর পাণ্ডবদের বনগমনের সময় গান্ধারীর আবেদন স্থাপন করেছেন। এর স্বল্পকাল পরেই গান্ধারী পুনশ্চ এসেছেন উদ্‌যোগপর্বে। কৃষ্ণের শান্তিদৌত্য ব্যর্থ হ'লে পর, গান্ধারীর কথায় দুর্যোধন যুদ্ধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হতে পারে এই আশায় ধৃতরাষ্ট্র ধর্মদর্শিনী গান্ধারীকে আহ্বান করেছিলেন দুর্যোধনকে উপদেশ দেওয়ার জন্য। রবীন্দ্র-নাথের গান্ধারীর উক্তির মধ্যে এই অংশটির ভাবও বিবেচিত হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দুর্যোধন কর্তৃক পাণ্ডবদের বিনাশ ও যুদ্ধের মন্ত্রণা আদিপর্ব থেকে উদ্‌যোগপর্ব পর্যন্ত কয়েক স্থানেই ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে যে অংশটির উপর রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছেন তা হ'ল সভাপর্বের ৪৮।৫২।৫৩ প্রভৃতি অধ্যায়। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিবাক্যও মোটা-মুটি ঐ অংশ অবলম্বন ক'রে লেখা। রবীন্দ্রনাথ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন উপাদান সমাহরণ ক'রে এবং ভারতের মূল ভাবটি পরিস্ফুট ক'রে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে দুর্যোধনের ও ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র ও উক্তি-প্রত্যুক্তি নির্মাণ করেছেন।

রবীন্দ্র-রচিত গান্ধারীর সঙ্গে ভানুমতী ও দ্রৌপদীর কথোপকথন অংশ মূলে নেই, বনগমনে উদ্যত যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সান্ত্বনাবাক্যও নেই। মূলে বনগমনোদ্যত পাণ্ডবদের প্রতি বিদুরের আশ্বাস ও আশীর্বাদ রয়েছে, আর

দ্রৌপদী বিদায় নিয়েছেন কুন্তীর কাছ থেকে। এই অংশে ভানুমতীর উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যনির্মাণের অভিনবত্বের দ্যোতক। এখন আর একটু অগ্রসর হয়ে দেখা যাক, মূল মহাভারত রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কিভাবে গৃহীত ও পরিবর্ধিত হয়েছে।

নাট্যের প্রারম্ভে দেখা যাচ্ছে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁর জয়েচ্ছার ও জয়ের গৌরব ঘোষণা করছেন, রাজধর্মের মূলনীতি ব্যাখ্যা করছেন, লোক-ধর্মের সঙ্গে রাজধর্মের পার্থক্য প্রতিপন্ন করছেন। এই অংশটি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে দুর্যোধনকথিত বার্হস্পত্য নীতিবাক্যের প্রতিরূপ—

লোকবৃত্তাদ্ রাজবৃত্তমন্যদাহ বৃহস্পতিঃ।
তস্মাদ্ রাজ্ঞা প্রযত্নেন স্বার্থশ্চিন্ত্যঃ সদৈব হি॥
ক্ষত্রিয়স্য মহারাজ জয়ে বৃত্তিঃ সমাহিতা।
স বৈ ধর্মস্ত্বধর্মো বা স্ববৃত্তৌ কা পরীক্ষণা॥

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের পাণ্ডববিদ্বেষের নিন্দা করছেন এবং বলছেন—

ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ।
পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ
সে কি ভুলে গেলি?

অথবা প্রারম্ভে—

অখণ্ড রাজত্ব জিনি
সুখ তোর কই রে দুর্মতি?

এ রকম উক্তি মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রবাক্য থেকে সম্পূর্ণ গৃহীত—

ত্বং বৈ জ্যেষ্ঠো জ্যৈষ্ঠিনেয়ঃ পুত্র মা পাণ্ডবান্ দ্বিষ।
দ্বেষ্টা হ্যসুখমাদত্তে যথৈব নিধনং তথা॥
পাণ্ডোঃ সুতান্ মা দ্বিষস্বেহ রাজন্
তথৈব তে ভ্রাতৃধনং সমগ্রম্।
মিত্রদ্রোহে তাত মহানধর্মঃ
পিতামহা যে তব তেঽপি তেষাম্॥

* * *

দুর্যোধনের "ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা", "ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী" প্রভৃতি উক্তির মূল হ'ল—

অশ্নাম্যাচ্ছাদয়ামীতি প্রপশ্যন্ পাপপূরুষঃ।
নামর্ষং কুরুতে যস্তু পুরুষঃ সোঽধমঃ স্মৃতঃ॥
ন মাং প্রীণাতি রাজেন্দ্র লক্ষ্মীঃ সাধারণী বিভো।
জ্বলিতামিব কৌন্তেয়ে শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা চ বিব্যথে॥

রবীন্দ্রনাথের দুর্যোধন ভ্রাতৃদ্রোহ অভিযোগের নিম্নলিখিত উত্তর দিচ্ছেন—

ভুলিতে পারি নে সে যে—
এক পিতামহ, তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি। যদি হ'ত দূরবর্তী পর
নাহি ছিল ক্ষোভ। —ইত্যাদি

মূলে দুর্যোধনের উত্তর এই রয়েছে—

শত্রুশ্চৈব হি মিত্রঞ্চ ন লেখ্যং ন চ মাতৃকা।
যো যং সন্তাপয়তি চ স শত্রুর্নেতরো জনঃ॥

* * *

নাস্তি বৈ জাতিতঃ শত্রুঃ পুরুষস্য বিশাংপতে।
যেন সাধারণীবৃত্তিঃ স শত্রুর্নেতরো জনঃ॥

"কে কার শত্রু কে কার মিত্র তা নিয়ে স্থির শাস্ত্রও নেই, প্রবাদ-প্রবচনও নেই। যে যাকে পীড়া দেয় সেই তার শত্রু। জাতিবর্ণ-পার্থক্যে শত্রু হয় না। সমবৃত্তির মানুষই একে অন্যের শত্রু হয়ে থাকে।" অবশ্য মূলে দুর্যোধন শত্রু ও মিত্র কাকে বলে তা রাজনীতি অনুসারে লক্ষণ নির্দেশক্রমে বোঝাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ একটু ঘুরিয়ে প্রায় একই কথা বলতে চেয়েছেন। 'গান্ধারীর আবেদন'-এ দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্র-আনীত কপটদ্যূতের অভিযোগ এইভাবে খণ্ডন করতে চেয়েছেন—

যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র পিতঃ যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্র সনে নখে দন্তে নহেক সমান,
তাই বলে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়?

এই অংশটি রাজনীতির মহিমাজ্ঞাপক দুর্যোধনোক্তির প্রতিধ্বনি—

প্রচ্ছন্নো বা প্রকাশো বা যোগো যোঽরিং প্রবাধতে।
তদ্বৈ শস্ত্রং শস্ত্রবিদাং ন শস্ত্রং ছেদনং স্মৃতম্॥

গান্ধারী মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রমুখেই মহাপ্রাজ্ঞা, ধর্মদেশিনী প্রভৃতি বিশেষণে কীর্তিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ-রচিত গান্ধারীর উক্তি-প্রত্যুক্তি মহাভারতের দু-একটি স্থানের ভাব অবলম্বনে স্বকীয়ভাবে বিস্তৃত। 'গান্ধারীর আবেদনে' ধর্মসম্পর্কে গান্ধারীর যে উল্লেখযোগ্য ভাষণ রয়েছে মূলে ঠিক তা নেই। মূলে ধৃতরাষ্ট্রসমীপে গান্ধারী যা বলছেন তাতে রয়েছে কুলক্ষয়ের আশঙ্কার কথা, দুর্যোধনের পাপাচরণ ও দুর্বুদ্ধিতার কথা। ধৃতরাষ্ট্রকে গান্ধারীর সংক্ষিপ্ত উক্তি এইরকম—

অথাব্রবীন্মহাপ্রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রং নরেশ্বরম্ ।
পুত্রস্নেহাদ্ধর্মপূর্বং গান্ধারী শোককর্ষিতা ॥
জাতে দুর্যোধনে ক্ষত্তা মহামতিরভাষত ।
নীয়তাং পরলোকায় সাধ্বয়ং কুলপাংসনঃ ॥
মা নিমজ্জীঃ স্বদোষেণ মহাপ্সু ত্বং হি ভারত ।
মা বালানামশিষ্টানামনুমংস্থা মতিং প্রভো ॥
মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি ।
বদ্ধং সেতুং কো নু ভিন্দ্যাদ্ধমেচ্ছান্তং চ পাবকম্ ॥
শমে স্থিতান্ কো নু পার্থান্ কোপয়েদ্ ভরতর্ষভ ।
স্মরন্তং ত্বামাজমীঢ়ং স্মারয়িষ্যাম্যহং পুনঃ ॥
শাস্ত্রং ন শাস্তি দুর্বুদ্ধিং শ্রেয়সে চেতরায় চ ।
ন বৈ বৃদ্ধো বালমতির্ভবেদ্ রাজন্ কথঞ্চন ॥
ত্বন্নেত্রাঃ সন্তু তে পুত্রাঃ মা ত্বাং দীর্ণাঃ প্রহাসিষুঃ ।
তস্মাদয়ং মদ্বচনাত্ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ ॥
তথা ন তে কৃতং রাজন্ পুত্রস্নেহান্ মহামতে ।
তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণায় হ ॥

"শোককর্ষিতা মনস্বিনী গান্ধারী তাঁর পুত্রগণের বিপদ আশঙ্কা ক'রে ধর্মপূর্ণ এই কথা বললেন। দুর্যোধন জন্মাবার পর শৃগালের মত বিকৃত স্বরে চিৎকার করেছিল। বিদুর বলেছিলেন, এর থেকে বংশনাশ হবে। একে মেরে ফেলুন। আপনি নিজের দোষে ডুববেন না, অশিষ্ট মূর্খের মতে সায় দিয়ে বংশনাশের কারণও হবেন না। মৈত্রে স্থিত পাণ্ডবদের চটানোও যা, আর বদ্ধ সেতুকে ভেঙে ফেলাও তা। কোন্ মূঢ় নির্বাপিত অগ্নিকে জ্বালিয়ে তোলার চেষ্টা করে? অতএব বংশনাশকারী দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন। পুত্রস্নেহবশত পূর্বেই আপনি তা করেননি। এখন তার ফল বংশক্ষয় আপনি স্বচক্ষে দেখতে থাকুন।"

দুর্যোধনের জন্য সমস্ত পুত্রের বিনাশ ঘটবে এ গান্ধারী সহ্য করতে পারেননি। গান্ধারীর পুত্রস্নেহের এই দিকটি মহাভারতের স্ত্রীপর্বেও দেখা যায়। অবশ্য পুত্রদের কল্যাণকামনা ছাড়া অন্য কথাও এই আবেদনের মধ্যে রয়েছে যা রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছে। আর পুত্রস্নেহাতুর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কুলক্ষয়ের দিকটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার সংগত কারণও বোধ হয় রয়েছে। স্ত্রীপর্বের একটি উল্লেখ থেকেও গান্ধারীর চরিত্রের প্রবল ধর্মভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধ শেষ হ'লে কৌরবপক্ষের একটি সন্তানও যখন জীবিত রইল না, তখন গান্ধারী শোকে বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ব্যাস গান্ধারীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে যেসব কথা

বলেছিলেন তা থেকে জানা যাচ্ছে যে, আঠারো দিন যুদ্ধের প্রত্যেক দিন যখন দুর্যোধন গান্ধারীর কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে আসতেন তখন গান্ধারী আশীর্বাদ করতেন—'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' এই বলে। সুতরাং কেবল ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গান্ধারীর নিবেদন অংশই নয়, সমস্ত মহাভারতে গান্ধারী-চরিত্রের যেসব পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে তার সারাংশ গ্রহণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ স্বল্প পরিসরে গান্ধারীকে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করেছেন।

তথাপি নাট্যকাব্যের গান্ধারীর উক্তির কয়েকটি অংশে মহাভারতের কয়েকটি স্থানের স্পষ্ট অনুসরণ রয়েছে। যেমন, "ধর্মকথা তোমারে কী বুঝাইব স্বামী" প্রভৃতি "স্মরন্তং ত্বামাজমীঢ়ং" প্রভৃতি উক্তির, "ত্যাগ করো এইবার" প্রভৃতি "ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ" প্রভৃতির প্রতিধ্বনি। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর আবেদন গ্রহণ করতে অসামর্থ্য জানালে পর গান্ধারী দারুণ দুর্বিপাক উপলব্ধি ক'রে কালের কার্য প্রত্যক্ষ করলেন—'সেইমত কাল যবে জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে' ইত্যাদি। মহাভারতে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ভবিতব্য সম্পর্কে সচেতন করতে গিয়ে এই কালের কথা নিম্নলিখিতভাবে বলেছেন—

> ন কালো দণ্ডমুদ্যম্য শিরঃ কৃন্তিতি কস্যচিৎ।
> কালস্য বলমেতাবদ্ বিপরীতার্থদর্শনম্ ॥

অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে হাতে অসি নিয়ে মহাকাল কারো মাথা কাটে না। বিনাশ উপস্থিত হলে মানুষের বুদ্ধি মলিন হয়। তখন অন্যায়কেই ন্যায় ব'লে মনে হয়, এই হ'ল কালের ক্ষমতা—বিপরীতার্থদর্শন করানো। দ্রৌপদীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত কালের শাস্তি ও শান্তিময় নিবৃত্তির কথা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ও অতিপ্রিয় গভীর জীবন-দর্শনের কথা, যা তাঁর নানা রচনায় লক্ষ্য করা যায়। যুধিষ্ঠিরের প্রতি গান্ধারীর আশীর্বাদ অংশটি মূলে বিদুরের আশীর্বাণীরূপে উচ্চারিত রয়েছে। গান্ধারীর—

> সৌভাগ্যের দিনমণি
> দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল
> উদিবে হে বৎসগণ। বায়ু হতে বল,
> সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্য ক্ষমা
> করো লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর।—

এই উক্তি নিম্নলিখিত বিদুরবাক্য থেকে আহৃত—

> যুধিষ্ঠির বিজানীহি মমেদং ভরতর্ষভ।
> নাধর্মবিজিতঃ কশ্চিদ্ব্যথতে বৈ পরাজয়াৎ।
> * * *
> সোমাদাহ্লাকত্বং ত্বমম্ভ্যশ্চৈবোপজীবনম্।

ভূমেঃ ক্ষমাঞ্চ তেজশ্চ সমগ্রং সূর্যমণ্ডলাৎ।
বায়োর্বলঞ্চাপ্নুহি ত্বং ভূতেভ্যশ্চাত্মসম্পদঃ॥

বিদায়গ্রহণকালে দ্রৌপদীর প্রতি কুন্তীর বাক্য এখানে দ্রৌপদীর প্রতি গান্ধারী-বাক্যের কিয়দংশে প্রতিফলিত হয়েছে—

কুন্তী—

ন ত্বাং সন্দেষ্টুমর্হামি ভর্ত্তৄন প্রতি শুচিস্মিতে।
সর্বৈর্গুণসমাধানৈর্ভূষিতং তে কুলদ্বয়ম্॥
সভাগ্যাঃ কুরবশ্চেমে যে ন দগ্ধাস্ত্বয়াঽনঘে।
অরিষ্টং ব্রজ পন্থানং মদনুধ্যানবৃংহিতা॥
ভাবিন্যর্থে হি সৎস্ত্রীণাং বৈক্লব্যং নোপপদ্যতে।
গুরুধর্মাভিগুপ্তা চ শ্রেয়ঃ ক্ষিপ্রমবাপ্স্যসি॥

গান্ধারী—

যাও বৎসে, পতি সাথে অমলিনমুখ,
অরণ্যেরে করো স্বর্গ, দুঃখ করো সুখ।
বধূ মোর, সুদুঃসহ পতিদুঃখব্যথা
বক্ষে ধরি সতীত্বের লভ সার্থকতা। —ইত্যাদি।

'শ্রেয়ঃ ক্ষিপ্রমবাপ্স্যসি' এই কুন্তীবাক্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে গান্ধারীর 'গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক মন্থন' ইত্যাদি উক্তিতে।

মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র ধর্মবেত্তা অথচ পুত্রস্নেহাতুর এবং দৈবনির্ভর চিত্রিত হয়েছেন। প্রথম দ্যূতক্রীড়ার প্রস্তাবে ধৃতরাষ্ট্র নানা যুক্তিতে দুর্যোধনকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্যোধন অভিমানভরে মৃত্যু ইচ্ছা করলে পর স্নেহান্ধ হয়ে মত দিয়েছেন—

আর্তবাক্যন্তু তৎ তস্য প্রণয়োক্তং নিশম্য সঃ।
ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীৎ প্রেষ্যান্ দুর্যোধনমতে স্থিতঃ॥

ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন আরও বলেছেন—"দ্যূতে দোষাংশ্চ জানন্ স পুত্র-স্নেহাদকৃষ্যত।" দ্যূতের দোষ জেনেও তিনি পুত্রস্নেহবশতঃ এই কাজ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র বুদ্ধি-বিবেচনার দিক থেকে ধর্ম অথচ অন্তঃকরণের দিক থেকে পুত্রকে অবলম্বন করতে চান। রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত অংশে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের এই দ্বৈধ বর্ণনা করেছেন। সভাপর্বে রয়েছে, দ্যূতক্রীড়ার সময় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখলে পর ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদির স্বেদ নির্গত হতে থাকল এবং বিদুর মাথায় হাত দিয়ে প্রাণহীনের মত বসে রইলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব হ'ল ভিন্ন। তিনি এতে নিজের আনন্দ গোপন করতে না পেরে বলে উঠলেন—'এবার কী জয় করলে! কী জিতলে এবার?'

ধৃতরাষ্ট্রস্তু সংহৃষ্টঃ পর্যপৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ।
কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত ॥

আবার তিনিই সভাস্থলে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার পর বিদুর ও গান্ধারীর কাছ থেকে দুর্লক্ষণের সংবাদ শুনে দুর্যোধনকে তিরস্কার করছেন—

হতোঽসি দুর্যোধন মন্দবুদ্ধে যস্ত্বং সভায়াং কুরুপুঙ্গবানাম্।
স্ত্রিয়ং সমাভাষসি দুর্বিনীতো বিশেষতো দ্রৌপদীং ধর্মপত্নীম্ ॥

মহাভারতে গান্ধারীর আবেদনের প্রত্যুত্তর ধৃতরাষ্ট্র খুব সংক্ষেপে দিলেন, তিনি অক্ষম, পুত্রকে নিবৃত্ত করার সাধ্য তাঁর নেই, সুতরাং বংশের বিনাশ হয় হোক, তিনি আর কী করবেন ?

অথাব্রবীন্মহারাজো গান্ধারীং ধর্মদর্শিনীম্।
অন্তং কামং কুলস্যাস্য ন শক্নোমি নিবারিতুম্।

ধৃতরাষ্ট্রের এই অক্ষমতার দিকটি রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—মূলানুসারে ধৃতরাষ্ট্রের দৈবনির্ভরতাও চমৎকার দেখিয়েছেন—

ধর্মবিধি বিধাতার—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্মদণ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য ; অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা—

* * *

প্রিয়ে, সংহর সংহর
তব বাণী। ছিঁড়িতে পারিনে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি * *
* * এখন তো আর
বিচারের কাল নাই, নাই প্রতিকার,
নাই পথ,—ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

পাণ্ডবদের বনগমনকালে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম ও ভবিতব্যের দিকটি সম্বন্ধে নিবেদন জানিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন সঞ্জয়কে বলেছিলেন—বিদুর এরকম ধর্ম ও ন্যায়সংগত কথা বললেও পুত্রগণের হিতেচ্ছু হয়ে আমি তা শুনিনি—

উক্তবান্ ন গৃহীতঞ্চ ময়া পুত্রহিতেপ্সুনা।

মোটের উপর রবীন্দ্রনাথের ধৃতরাষ্ট্র মূলের উজ্জ্বল প্রতিরূপ হয়েছে।

কর্ণ ও কুন্তীর সংলাপ ও চরিত্র নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ মূল থেকে নানা

ক্ষেত্রে নূতনত্ব দেখিয়েছেন, আবার স্থানবিশেষে মূলের যথাযোগ্য অনুসরণও করেছেন। কর্ণচরিত্রের মাতৃস্নেহব্যাকুলতা, সুদূর ও অজ্ঞাতের জন্য রহস্যময় আকর্ষণ মূলের উপর আধুনিক রোম্যান্টিক গীতিকবির অনুরঞ্জন। কর্ণের স্নেহলোভাতুর হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে কবি সম্ভবত কুন্তীর মাতৃধর্ম পালন না করার নিষ্ঠুরতার দিকটি ব্যঞ্জনা সহকারে জানাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ তাঁর পরিত্যাগ সম্পর্কে অভিমান প্রকাশ করেছেন, কিন্তু মহাভারতের কর্ণ কুন্তীর কাছে দৃঢ় অভিযোগ এনেছেন এবং পরিশেষে বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন পাণ্ডবপক্ষে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। উভয়ত্রই কর্ণ বীর, বিবেচক, উদার এবং নিজধর্মরক্ষায় যত্নবান্। মহাভারতের কর্ণের মমতা রাধার উপর। কুন্তীর উপর কর্ণের মাতৃভক্তির সংস্কার নেই, থাকার কথাও নয়, যদিও কুন্তীর দিক থেকে বাৎসল্য-সংস্কার যৎকিঞ্চিৎ হয়তো বা ছিল। রবীন্দ্রনাথ কর্ণের চিত্তে মাতৃস্নেহতৃষার পরিচয় দিয়ে কাব্যগত চমৎকারীত্বের সৃষ্টি করেছেন। মহাভারতের কর্ণ কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বেই তাঁর নিজ পরিচয় জেনে ফেলেছেন। এমনকি কয়েক দিন আগে কৃষ্ণ যখন শান্তিস্থাপন করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন তখন পথে তিনি কর্ণকে ডেকে তাঁর রথের উপর তুলে নিলেন এবং তখন কর্ণের জন্ম-পরিচয় বিবৃত করলে কর্ণ বললেন, 'একথা আমি পূর্বেই জেনেছি।' এরকম ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কর্ণের মুখ দিয়ে আত্মপরিচয় সম্বন্ধে তাঁর সম্যক্ জ্ঞানের অভাবের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন—"শুনিয়াছি লোকমুখে জননীর পরিত্যক্ত আমি।" কুন্তী কর্ণের পরিচয় জ্ঞাপন করলে সংশয় ও বিশ্বাসের মধ্যবর্তী বিস্মিত কর্ণ বলেছেন—"শুনি স্বপ্নময়, হে দেবী, তোমার বাণী।" কর্ণ-চরিত্রের বাকী অংশ মূলের একান্ত অনুগত।

মহাভারতের কুন্তী হস্তিনাপুরে অস্ত্রপরীক্ষায় কর্ণ ও অর্জুনকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্য প্রস্তুত দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। সেখানে মহর্ষি ঠিক কুন্তীর স্নেহব্যাকুলতার কোনো পরিচয় দেননি। আর যুদ্ধের পূর্বাহ্ণে কুন্তী যখন কর্ণের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন তখন কুন্তী বহুল-পরিমাণে স্বার্থ-প্রণোদিত হয়েই গিয়েছিলেন। কর্ণের বীরত্ব এবং কর্ণের পাণ্ডববিদ্বেষ বিশেষত অর্জুনের উপর অসূয়া ও ক্রোধের বিষয় আর দুর্যোধনের উপর পক্ষপাতীত্ব কুন্তীর জানাই ছিল। সুতরাং কর্ণকে যদি পাণ্ডবপক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব হয় তাহলে পাণ্ডবদের জয় যেমন সুনিশ্চিত হয়, তেমনি ভ্রাতৃবিরোধেরও সমাপ্তি ঘটে—কর্ণের কাছে যাওয়ার মূলে কুন্তীর এইরকম ভাবনা কাজ করেছিল। মহাভারতকার বলছেন—'দুর্যোধন-পরিচালিত কর্ণই আমার উদ্বেগ জন্মাচ্ছে, কর্ণ তার নিজের ও ভ্রাতাদের হিতকর কথায় কান দিতেও পারে এই মনে ক'রে ও দৃঢ়ভাবে কর্তব্য স্থির ক'রে কুন্তী

গঙ্গার অভিমুখে গমন করতে লাগলেন।' মহাভারতে কুন্তীর বক্তব্যের মধ্যে স্নেহের আতিশয্য প্রকাশিত হয় এমন কথা নেই বললেই চলে। হয়ত মহাভারতের কুন্তী ভেবেছিলেন যে, এ সময় স্নেহাতিশয্য প্রকাশ করলে তা অসংগত এবং অশোভন হবে। যাই হোক, কুন্তী জানতেন না যে কর্ণ তাঁর জন্মকথা পূর্বাহ্নেই জানেন, আর এ বিষয়ে কর্তব্য-অকর্তব্যও ঠিক ক'রে ফেলেছেন। এইভাবে মূল মহাভারত থেকে কুন্তীর চরিত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য যোজনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের রূঢ় অথচ বাস্তব পরিবেশ থেকে যেমন তাঁর কাব্যকে মুক্ত করতে চেয়েছেন তেমনি মাতৃত্বের দিকটি প্রকাশ ক'রে বাঙালী-মনের উপযোগী করতেও চেষ্টা করেছেন।

ঘটনাসংস্থানের দিক থেকেও রবীন্দ্রকাব্যে স্বল্প নূতনত্ব রয়েছে। মহাভারতের কুন্তী কর্ণের কাছে গিয়েছিলেন দিবা দ্বিপ্রহরের সময়। রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে সন্ধ্যার ভূমিকা দিয়ে কর্ণের আবিষ্ট-বিহ্বল মনের উপযোগী পরিবেশ রচনা করতে চেয়েছেন।

মহাভারতকার উদ্‌যোগপর্বে কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর সাক্ষাৎকার এইভাবে বর্ণনা করেছেন,—কুন্তী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন কর্ণ সূর্যের ধ্যানে নিরত রয়েছেন। কর্ণের নিয়ম এই ছিল যে, পূর্বমুখ হয়ে জপ করার সময় সূর্য যতক্ষণ না তাঁর পৃষ্ঠদেশে কিরণ বিস্তার করত সে পর্যন্ত তিনি জপ থেকে বিরত হতেন না। জপ তখনও শেষ হয়নি এমন সময় কুন্তী উপস্থিত হলেন। তখন—

> প্রাঙ্মুখস্যোর্ধ্ববাহোঃ সা পর্যতিষ্ঠত পৃষ্ঠতঃ।
> জপ্যাবসানং কার্যার্থং প্রতীক্ষ্য কুন্তী তপস্বিনী॥
> আতিষ্ঠৎ সূর্যতাপার্তা কর্ণস্যোত্তরবাসসি।
> কৌরব্যপত্নী বার্ষ্ণেয়ী পদ্মমালেব শুষ্যতী॥
> আপৃষ্ঠতাপাজ্জপ্ত্বা স পরিবৃত্য যতব্রতঃ।
> দৃষ্ট্বা কুন্তীমুপাতিষ্ঠদভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ॥

'পূর্বমুখ, ঊর্ধ্ববাহু কর্ণের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনসাধনেচ্ছু কুন্তী জপের অবসান প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কৌরবপত্নী বৃষ্ণিবংশোদ্ভবা সেই কুন্তী সূর্যতাপপরিক্লিষ্টা হয়ে কর্ণের উত্তরীয়বাসের নিম্নে গিয়ে দাঁড়ালেন। রবি-তাপ পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করলে পর কর্ণ জপ সাঙ্গ ক'রে ফিরলেন আর কুন্তীকে দেখে অভিবাদন ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কথার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।' এরপর কুন্তী যা যা উত্তর দিলেন রবীন্দ্রনাথের রচনায় তা যথাসম্ভব প্রতি-ফলিত হয়েছে। কর্ণের উক্তি—

> রাধেয়োঽহমাধিরথিঃ কর্ণস্ত্বামভিবাদয়ে।
> প্রাপ্তা কিমর্থং ভবতী ব্রূহি কিং করবাণি তে॥

"কর্ণ নাম যার,
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত
সেই আমি—কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ !"

কুন্তীর উক্তি—

কৌন্তেয়স্ত্বং ন রাধেয়ো ন তবাধিরথঃ পিতা।
নাসি সূতকুলে জাতঃ কর্ণ ! তদ্বিদ্ধি মে বচঃ ॥
…স ত্বং ভ্রাতৃনসংবুধ্য মোহাদ্ যদুপসেবসে।
ধার্তরাষ্ট্রান্ ন তদ্‌যুক্তং ত্বয়ি পুত্র বিশেষতঃ ॥

"ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে।
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান—
দূর করি দিয়া বৎস সর্ব অপমান
এসো চলি যেথা আছে তব পঞ্চভ্রাতা।"

তারপর কুন্তী বোঝালেন,—

এতদ্ধর্মফলং পুত্র নরাণাং ধর্মনিশ্চয়ে।
যত্তুষ্যন্ত্যস্য পিতরো মাতা চাপ্যেকদর্শিনী ॥
অর্জুনেনার্জিতাং পূর্বং হৃতাং লোভাদসাধুভিঃ।
আচ্ছিদ্য ধার্তরাষ্ট্রেভ্যো ভুঙ্ক্ষ্ব যৌধিষ্ঠিরীং শ্রিয়ম্ ॥

"পিতৃপুরুষেরা এবং মাতা তুষ্ট হন এই তো মানুষের ধর্ম। সুতরাং অর্জুন যে রাজ্যশ্রী জয় করেছে, আর অসাধু ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ যা কেড়ে নিয়ে ভোগ করছে তা ছিনিয়ে নাও,-আর যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য সেই রাজ্যশ্রী তুমি ভোগ কর।"

কুন্তীর এইসব হিতবাক্য শ্রবণ করেও কিন্তু—"চচাল নৈব কর্ণস্য মতিঃ সত্যধৃতেস্তদা।" সত্যাশ্রয়ী কর্ণের মন এতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'ল না। কর্ণ বললেন—

নচৈতচ্ছ্রদ্দধে বাক্যং ক্ষত্রিয়ে ভাষিতং ত্বয়া।
ধর্মদ্বারং মমৈতৎ স্যান্নিয়োগকরণং তব ॥

"তোমার বাক্যের সমাদর করতে পাচ্ছি না, আর আমি এও মনে করি না যে তোমার আজ্ঞাপালনে আমার ধর্মাচরণ হবে।"

অকরোন্ময়ি যৎ পাপং ভবতী সুমহাত্যয়ম্।
অপাকীর্ণোঽস্মি যন্মাতঃ তদ্ যশঃকীর্তিনাশনম্ ॥
অহঞ্চেৎ ক্ষত্রিয়ো জাতো ন প্রাপ্তঃ ক্ষত্রসৎক্রিয়াম্।
ত্বৎকৃতে কিং নু পাপীয়ঃ শত্রুঃ কুর্যান্মমাহিতম্ ॥

ক্রিয়াকালে ত্বনুক্রোশম্ অকৃত্বা ত্বমিমং মম ।
হীনসংস্কারসময়মদ্য মাং সমচূচুদঃ ॥

"আমাকে ঘোরতর অন্যায় সহকারে ত্যাগ ক'রে আপনি আমার যশ ও কীর্তি বিনাশ করেননি ? আমি ক্ষত্রিয়রূপে জন্মলাভ ক'রে ক্ষত্রিয়ের সংস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছি, ঘোর শত্রুও এর চেয়ে কী বেশি অকল্যাণ আমার করতে পারত ? আর যে সময় প্রয়োজন ছিল সে সময়ে না ব'লে, সংস্কারের সময় অতীত হ'লে, আজ আমাকে ক্ষত্রিয়ত্বে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য আপনি এসেছেন !"

ন বৈ মম হিতং পূর্বং মাতৃবৎ চেষ্টিতং ত্বয়া ।
সা মাং সংবোধয়স্যদ্য কেবলাত্মহিতৈষিণী ॥

"অতএব আমার হিতের চেষ্টা পূর্ব থেকে না ক'রে এখন যে আমাকে বোঝাতে এসেছেন সে কেবল নিজের মঙ্গল লক্ষ্য ক'রেই।" কর্ণের এই ভর্ৎসনাসূচক কথা মনে রেখেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (যদিও ঐরকম তীব্র ভর্ৎসনা রবীন্দ্র-নির্মিতিতে নেই)—

হে বৎস, ভর্ৎসনা তোর শতবজ্রসম
বিদীর্ণ করিয়া দিক্ এ হৃদয় মম
শতখণ্ড করি ।

সুতরাং এখানে রবীন্দ্রনাথ কর্ণের বাক্যের মূলভাবটির প্রতিধ্বনি মাত্র করেছেন—

সিংহাসন ! যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস !
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত ।
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই মাতঃ করেছ নির্মূলে
মোর জন্মক্ষণে ।

এর পর মহাভারতের কর্ণ তাঁর বীরহৃদয়ের উপযোগী উত্তর দিচ্ছেন এবং যুক্তি দিয়ে মাতাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন—

অভ্রাতা বিদিতঃ পূর্বং যুদ্ধকালে প্রকাশিতঃ ।
পাণ্ডবান্ যদি গচ্ছামি কিং মাং ক্ষত্রং বদিষ্যতি ॥
সর্বকামৈঃ সংবিভক্তঃ পূজিতশ্চ যথাসুখম্ ।
অহং বৈ ধার্তরাষ্ট্রাণাং কুর্যাং তদফলং কথম্ ॥

*　　　*　　　*

মম প্রাণেন যে শত্রূন্ শক্তাঃ প্রতি সমাসিতুম্ ।
মন্যন্তে তে কথং তেষামহং ছিন্দ্যাং মনোরথম্ ॥

ময়া প্লবেন সংগ্রামং তিতীর্ষন্তো দুরাত্যয়ম্ ।
অপারে পারকামা যে ত্যজেয়ং তানহং কথম্ ॥

"আমি পাণ্ডবদের ভ্রাতা ব'লে আগে কেউ জানে না, আজ যদি হঠাৎ যুদ্ধকালে একথা প্রকাশ পায়, আর আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দি' তাহলে আমাকে কেউ ক্ষত্রিয় বলবে ? দুর্যোধনেরা আমার সর্ববিধ অভিলাষ পূরণ করছে, আমাকে সর্বপ্রকারে পূজা করছে, তাদের এই প্রীতিকে কি আমি ব্যর্থ করতে পারি ? আমি পক্ষে থাকলে যে-কোনও শত্রুর সম্মুখীন হওয়া যায় এ যারা মনে করে, তাদের অভিলাষ আমি পূরণ না করি কী করে ? আমাকে তরণী ক'রে যারা সমাগত ভীষণ রণনদী উত্তীর্ণ হবে ঠিক ক'রে রেখেছে আজ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাদের কোনমতেই ত্যাগ করতে পারছি না।"

রবীন্দ্রনাথ এই অংশের ভাব সংক্ষেপে নিবন্ধ করেছেন—

সূতজননীরে ছলি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি,
কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে,
ছিন্ন ক'রে ধাই যদি রাজসিংহাসনে
তবে ধিক্ মোরে। * *
* * যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।

কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের আলাপের কোনো কোনো অংশ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্ণকুন্তী-সংবাদে ব্যবহার করেছেন। কর্ণচরিত্রের ক্ষাত্রমহিমার ভাবটি ফুটিয়ে তুলতেও রবীন্দ্রনাথ ঐ অংশের সাহায্য নিয়েছেন। কৃষ্ণ যখন কর্ণকে অতুল রাজ্যশ্রী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার সেবাসৌভাগ্যলাভের বিষয় উল্লেখ ক'রে তাঁকে পাণ্ডবপক্ষে ফেরাবার প্রয়াস করলেন তখন কর্ণ যেসব কথা ব'লে কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা তাঁর চরিত্রের মহিমা আরও পরিস্ফুট করেছে। কর্ণ বলেছিলেন—দেখ, যাতে আমার কোনো মঙ্গলই না হয় এমনভাবে কুন্তী আমাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এদিকে আমার প্রতি স্নেহবশতঃ রাধার স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হয়েছিল। তিনি আমার মলমূত্র ধারণ করেছিলেন। আমি ধর্মজ্ঞ হয়ে তাঁর পিণ্ড লোপ করি কী ক'রে ? আর অধিরথ আমাকেই তাঁর পুত্র ব'লে জানেন, আমিও তাঁকেই পিতা বলে জানি। তিনি আমার জাতসংস্কার করিয়েছেন ও 'বসুষেণ' নামকরণ করিয়েছেন। তা ছাড়া সূতকুলে আমি বিবাহ করেছি, আমার সন্তানাদিও হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত সুবর্ণরাশির বিনিময়ে অথবা কি-আনন্দে কি-ভয়ে কোনোভাবেই এই

সম্পর্ক মিথ্যা করা যায় না। তারপর দেখ, দুর্যোধনকেই বা আমি ত্যাগ করি কী করে? তাঁরই আশ্রয়ে আজ তের বছর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করছি। দুর্যোধন আমার আশাতেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে, দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জুনের প্রতিপক্ষ হিসাবে আমাকেই বরণ করেছে। বধ অথবা বন্ধন অথবা অন্য যে-কোনো প্রকার ভয়ে, কি লোভের বশবর্তী হয়ে তার সে আশা তো ব্যর্থ করতে পারি না—ইত্যাদি।

কর্ণকুন্তী-সংবাদের নিম্নলিখিত দু'টি অংশ কৃষ্ণ-কর্ণ সংলাপ থেকে নেওয়া। কুন্তী কর্ণের স্বরাজ্যসুখ বর্ণনা করছেন –

দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রথে, ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র।

মূলে কৃষ্ণকর্তৃক উত্থাপিত প্রলোভন—'এস আজই তোমার অভিষেকের আয়োজন করি'—

অগ্নিং জুহোতু বৈ ধৌম্যঃ শংসিতাত্মা দ্বিজোত্তমঃ।
যুবরাজোঽস্তু তে রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
গৃহীত্বা ব্যজনং শ্বেতং ধর্মাত্মা সংশ্রিতব্রতঃ॥

* * *

ছত্রঞ্চ তে মহাশ্বেতং ভীমসেনো মহাবলঃ।
অভিষিক্তস্য কৌন্তেয়ো ধারয়িষ্যতি মূর্ধনি॥
কিঙ্কিণীশতনির্ঘোষং বৈয়াঘ্রপরিবারণম্।
রথং শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তমর্জুনো বাহয়িষ্যতি।
অভিমন্যুশ্চ তে নিত্যং প্রত্যাসন্নো ভবিষ্যতি॥

নাট্যকাব্যের উপসংহারের দিকে কর্ণ কুন্তীকে সান্ত্বনাদান-প্রসঙ্গে যে ভাবী পরিণামের কথা বলেছেন তা বস্তুত কৃষ্ণ-কর্ণ সংলাপের মধ্যেকার কর্ণের ভবিষ্যদ্বাণী—

কহিলাম পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল।

মূলে রয়েছে—

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ দুর্যোধনবশানুগাঃ।
রণে শস্ত্রাগ্নিনা দগ্ধাঃ প্রাপ্স্যন্তি যমসাদনম্॥

* * *

পরাজয়ং ধার্তরাষ্ট্রে বিজয়ঞ্চ যুধিষ্ঠিরে।
শংসন্তু ইব বার্ষ্ণেয় বিবিধা রোমহর্ষণাঃ ॥
প্রাজাপত্যং হি নক্ষত্রং গ্রহস্তীক্ষ্ণোমহাদ্যুতিঃ।
শনৈশ্চরঃ পীড়য়তি পীড়য়ন্ প্রাণিনোঽধিকম্ ॥
কৃত্বা চাঙ্গারকো বক্রং জ্যেষ্ঠায়াং মধুসূদন।
অনুরাধাং প্রার্থয়তে মৈত্রং সঙ্গময়ন্নিব ॥
নূনং মহদ্ভয়ং কৃষ্ণ কুরূণাং সমুপস্থিতম্।

অর্থাৎ—'দুর্যোধনপক্ষের রাজগণ ও রাজপুত্রগণ যুদ্ধে নিহত হবে। নানা রোমহর্ষক দুর্নিমিত্ত কৌরবপক্ষের পরাজয় এবং পাণ্ডবপক্ষের জয় সূচিত করছে। মহাদ্যুতি পাপগ্রহ শনি প্রাজাপত্য অর্থাৎ রোহিণী নক্ষত্রকে পীড়ন করছে। মঙ্গলগ্রহ বক্রী হয়ে সূর্যের সঙ্গে অনুরাধা নক্ষত্রে মিলতে যাচ্ছে।' এই হ'ল রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত কর্ণের নক্ষত্রালোকে যুদ্ধফল পাঠ করার মূল।

হস্তিনায় অস্ত্রপরীক্ষার দিনের ঘটনা রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব মূলানুসরণে বিবৃত করেছেন। কুন্তীর মাতৃস্নেহের অভিব্যক্তি আধুনিক কবির কাব্য-কুশলতাময় অনুরঞ্জন। মূলে রয়েছে অর্জুনের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শনে যখন রঙ্গস্থলে কেউ বা চমৎকৃত কেউ বা বিষণ্ণ, তখন প্রবল বাহ্বাস্ফোট করতে করতে কর্ণ প্রবেশ করলেন এবং বললেন, 'অর্জুন যে-যে কৌশল প্রদর্শন করেছেন সে সবই আমি দেখাতে পারি' এবং তিনি অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। কথা-কাটাকাটির পর কর্ণার্জুন দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার উপক্রম করলে—

দ্বিধা রঙ্গঃ সমভবৎ স্ত্রীণাং দ্বৈধমজায়ত।
কুন্তিভোজসুতা মোহং বিজ্ঞাতার্থা জগাম হ ॥

কুন্তীর বিক্রিয়ার এইটুকু বর্ণনামাত্র মহাভারতে রয়েছে। সন্তান পরিত্যাগের পর এই কুন্তী তাকে প্রথম দেখছেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধনিয়ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও সচতুর কৃপ তখন কর্ণকে প্রশ্ন করলেন—

অয়ং পৃথায়াস্তনয়ঃ কনীয়ান্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
কৌরবো ভবতা সার্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধং করিষ্যতি ॥
ত্বমপ্যেবং মহাবাহো মাতরং পিতরং কুলম্।
কথয়স্ব নরেন্দ্রাণাং যেষাং ত্বং কুলভূষণম্ ॥
ততো বিদিত্বা পার্থস্ত্বাং প্রতিযোৎস্যতি বা ন বা।
বৃথাকুলসমাচারৈর্ন যুধ্যন্তে নৃপাত্মজাঃ ॥

'যবে কৃপ আসি' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এর সংক্ষেপ করেছেন। কর্ণের অবমানিত ও লজ্জিত অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী, দাঁড়ায়ে রহিলে।' মূলে রয়েছে—

এবমুক্তস্য কর্ণস্য ব্রীড়াবনতমাননম্।
বভৌ বর্ষাম্বুবিক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা ॥

অর্থাৎ 'বর্ষাবারিবিমলিন অবনত পদ্মের মত কর্ণের মুখ লজ্জায় আনত হ'ল।' অঙ্গরাজ্যে অভিষেক সমাপ্ত হ'লে অধিরথ রঙ্গশালায় প্রবেশ করছেন, তার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিতভাবে দিচ্ছেন—

হেন কালে করি পথ
রঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথ
আনন্দবিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে
চারিদিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে
সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃসম্ভাষণে।

মূলে রয়েছে—

ততঃ স্রস্তোত্তরপটঃ সপ্রস্বেদঃ সবেপথুঃ।
বিবেশাধিরথো রঙ্গং যষ্টিপ্রাণো হ্বয়ন্নিব ॥
তমালোক্য ধনুস্ত্যক্ত্বা পিতৃগৌরবযন্ত্রিতঃ।
কর্ণোভিষেকার্দ্রশিরঃ শিরসা সমবন্দত ॥

"তখন লাঠিতে ভর দিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে অধিরথ ঘর্মাক্ত কলেবরে ও কম্পিত-দেহে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে স্বাভাবিক পিতৃসম্মান-প্রবণতাবশে কর্ণ ধনু ত্যাগ ক'রে অভিষেকসিক্তশিরে প্রণাম করলেন।"

মূলে কর্ণের প্রতি ভীমের পরিহাসবাক্য রয়েছে—

ন ত্বমর্হসি পার্থেন সূতপুত্র রণে বধম্।
কুলস্য সদৃশস্তূর্ণং প্রতোদো গৃহ্যতাং ত্বয়া ॥

রবীন্দ্রনাথ এর ভাব অবলম্বন ক'রে লিখেছেন—'ক্রুরহাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে ধিক্কারিল।' এ বর্ণনায় রঙ্গভূমির ছবিটি অবশ্য উজ্জ্বলতর হয়েছে।

'নরকবাস' নাট্যকবিতার মূল বনপর্বে কথিত সোমক রাজার উপাখ্যান। সোমক স্বর্গভোগ ত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছায় নরক বরণ করেছিলেন ব'লে ঐ আখ্যানে তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। 'নরকবাসে' সোমক উপাখ্যানের অভ্যন্তরীণ ভাবে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, মানবীয় স্নেহধর্মের দিকটির উপর জোর দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। প্রেতগণের চরিত্র রবীন্দ্রনাথের নূতন যোজনা, কাহিনীটিকে নাট্যকলার উপযোগী করার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। তবুও ঘটনার মধ্যে যে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে তা উল্লেখ না করলে নয়। মূলে নরকভোগকারী ঋত্বিক্ রাজাকে তাঁর কাছে থাকবার জন্যে বলছেন না। রাজা তাঁর নিজের ন্যায়বিচার আশ্রয় ক'রে ঋত্বিকের

স্থানে তাঁর নরকভোগ হওয়া উচিত এই প্রার্থনা ধর্মরাজের কাছে করছেন। রাজা বলছেন—

অহমত্র প্রবেক্ষ্যামি মুচ্যতাং মম যাজকঃ।
মৎকৃতে হি মহাভাগঃ পচ্যতে নরকাগ্নিনা ॥

'ইনি আমার জন্যেই নরকভোগ করছেন, সুতরাং এঁকে ছেড়ে দিন। এঁর স্থানে বরং আমি নরকে প্রবেশ করছি।' ধর্মরাজ বললেন—'একের কর্মফল অন্যে ভোগ করতে পারে না।' তার উত্তরে রাজা বললেন—

পুণ্যান্ ন কাময়ে লোকান্ ঋতেঽহং ব্রহ্মবাদিনম্।
ইচ্ছাম্যহমনেনৈব সহ বস্তুং সুরালয়ে ॥
নরকে বা ধর্মরাজ কর্মণাস্য সমোহ্যহম্।
পুণ্যাপুণ্যফলং দেব সমমস্ত্বাবয়োরিদম্ ॥

'এই যাজককে ত্যাগ ক'রে আমি পুণ্য কামনা করি না। স্বর্গেই হোক আর নরকেই হোক এরই সঙ্গে থাকব, কারণ উনি যে কাজ করেছেন, আমিও সেই কাজ করেছি। পাপপুণ্যের ফল আমাদের সমান সমান হোক।' মূল কাহিনীটি প্রায় যথাযথ রেখে রবীন্দ্রনাথ চমৎকারীত্বের সঙ্গে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন। সন্তানবাৎসল্য এবং পৃথিবীপ্রীতির ভাব ও চিত্র আধুনিক কবির দান। ঋত্বিকের মিনতি অংশও নাট্যসৌন্দর্যবর্ধনের জন্য তাঁর কল্পিত।*

'নৈবেদ্য' কাব্যে প্রবেশ করার পূর্বে আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি অতি প্রয়োজনীয় আলোচ্য দিক সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। তা হ'ল তাঁর কাব্যে বাঙ্‌নির্মাণের কৌশল, ভাষাশিল্পের উদ্‌যোগ ও পরিণাম। বলা বাহুল্য, শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভার এই দিকটি এযাবৎ আলোচনায় উপেক্ষিতই হয়ে এসেছে। অথচ একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, কোনো কবি কাব্যারম্ভ থেকেই বচনভঙ্গির সুপরিণামের অধিকারী হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথও হননি। বাঙ্‌নির্মাণের নৈপুণ্য কখনো কবির ও সাধারণের অগোচরে তাঁর অন্তরে আপনা হতেই সৃষ্ট হতে থাকে, কখনো তাঁর সজ্ঞান প্রচেষ্টা বাইরেও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। যদিও কাব্যের অভ্যন্তরীণ রস ও বাহ্যরূপ মহাকবির এক প্রযত্নেই সিদ্ধ হয়, আচার্য আনন্দবর্ধন এই মূল্যবান্ নির্দেশে অলংকারাদিময় কাব্যদেহ গঠনে কবির পৃথক্ প্রয়াস বিষয়ে অজ্ঞধারণা রোধ করেছেন, তথাপি প্রকাশধর্মী নিগূঢ় কবি-প্রতিভার স্ববশে গৃহীত পদার্থ-নিচয়ের

* ভারতকথার রূপান্তরের এই অধ্যায়টি গ্রন্থভুক্ত করার অনুমতি বিষয়ে আমি 'যুগবাণী' সম্পাদকের কাছে কৃতজ্ঞ।

স্বরূপ অনুসন্ধানে উৎসাহই দিয়েছেন; এবং ঐ নির্দেশ পরিণত প্রতিভা-সম্পন্ন মহাকবিদের প্রৌঢ় রচনা সম্পর্কে প্রযোজ্য এই কথা ব'লে, যেসব সাধারণ সমালোচক কোনো কাব্যের বহিরঙ্গ রীতি-অলংকারাদির দোষগুণ বিচার ক'রেই কবির স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হন, তাঁদের পন্থার অযৌক্তিকতা দেখিয়েছেন।* বস্তুই হোক আর রূপই হোক রবীন্দ্রনাথ যা বাইরে থেকে গ্রহণ করেছেন তা তাঁর প্রতিভার স্ববশেই গ্রহণ করেছেন, এবং আমরা মনে করি ঐরূপ গ্রহণের প্রকার ও পরিমাণের আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব, নিঃশেষ বিচার অসম্ভব। এই ভাবেই তাঁর রূপসৃষ্টি-কৌশলের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা আমরা করছি।

বাঙ্‌লা কাব্যরীতিতে অনায়াসলব্ধ শিল্পসৌন্দর্যে পূর্ণ ভাষার যে-দান তাও রবীন্দ্রনাথের আলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয়। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, খাঁটি প্রাকৃত বাঙ্‌লার এমন কোনো রূপ নেই যা রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। গ্রাম ও নগরের, নর ও নারীর বাস্তব সুখদুঃখের প্রায় যাবতীয় উক্তি, গ্রাম্য শব্দ ও ইডিয়ম, এমনকি দেশীয় পরিহাসকুশলতাও কোনো-না-কোনো আকারে তাঁর গদ্যে-পদ্যে স্থান পেয়েছে, এবং বাঙ্‌লা ভাষার অতীত সম্ভাব্য যা কিছু রূপ সব যেন রবীন্দ্র-প্রতিভায় আপনা থেকে এসে যোগ দিয়ে নিজেক গৌরবান্বিত করেছে। আবার সংস্কৃত বচনবিন্যাসের যে ধ্বনিময় রমণীয়তা ও বাগর্থের হরগৌরী মিলন-সম্পর্ক তাও রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্যক্‌-রূপে আত্মসাৎ করেছে। বঙ্গবাণী ও সংস্কৃতবাক্‌ সমান অনুরাগ সহকারে কবিকে বরণ করেছে। এককথায় প্রাচ্যভাষাজগতের প্রায় সমস্ত কিছুই রবীন্দ্র-নাথ কর্তৃক উচ্ছিষ্ট হয়েছে। এই কারণেই এদেশীয় মানুষের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অতি অনায়াসেই রূপলাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, মহতী বাক্‌শক্তিই মহৎ ভাবের বাহন। এদিক থেকেও রবীন্দ্রনাথকে মহাকবি বলা যুক্তিসংগত! কারণ, যাঁদের উপযুক্তভাবে আমরা মহাকবি আখ্যা দিয়েছি সেই বাল্মীকি, কালিদাস, দান্তে, শেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতির অত্যাশ্চর্য প্রকাশ-নৈপুণ্য—যা তৎকালীন এক একটি জাতির সমুদয় মনোভাবের সম্যক্‌ বহন-ক্ষমতা লাভ করেছে তা-ই তাঁদের অননুকরণীয়

* তুং—রসবন্তি হি বস্তূনি সালংকারাণি কানিচিৎ।
একেনৈব প্রযত্নেন নির্বর্ত্যন্তে মহাকবেঃ॥

অপিচ—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ॥

(ধ্বন্যালোক)

বৈশিষ্ট্য এবং মহাকাব্য মহৎ কবি-কর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।* মনে পড়ে আধুনিক কবি-সমালোচক এলিঅট্ ক্লাসিক নামধেয় উল্লেখযোগ্য প্রাচীন রচনার লক্ষণ-নির্ণয়ে প্রকাশ-ক্ষমতার এই অনন্যসাধারণ দিকটির উপরেই লক্ষ্য নিবদ্ধ করেছেন।† প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে প্রয়োজনমত ইংরেজি বাক্‌রীতিও রবীন্দ্রনাথকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে হয়েছে। বিশেষ ক'রে গদ্যরচনায় প্রখ্যাত অপ্রখ্যাত বহু ইংরেজ লেখকের বাচনভঙ্গি আংশিকভাবে তিনি গ্রহণ করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক অধ্যয়নের দ্বারা তা আবিষ্কার করতে পারবেন। শিক্ষিত বাঙালীর আধুনিক বাগ্‌ভঙ্গি—যে-ভাষায় আমরা লিখছি—তার কৌশল যে আংশিকভাবে ইংরেজিই তা অস্বীকার করা যায় না; এবং বিদেশীয় বহুভাবও যে-কবিকে প্রকাশ করতে হয়েছিল, তিনি, উন্নত সাহিত্যের অধিকারিণী আমাদের তৎকালীন দ্বিতীয় মাতৃভাষা থেকে যে সুবিধামত উপাদান সংগ্রহ করবেন তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে অবান্তর বর্জন ক'রে আমরা যথাসম্ভব রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার বিকাশের মুখ্য সূত্রটিরই অনুসন্ধান করব।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত গীতিকাব্যের ভাষা বলতে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষাই বোঝাত। পদরচয়িতারা বিচিত্র সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রাকৃত বাঙ্‌লাকে অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের সঙ্গে যেরকম দশদিকে চালিত করেছেন এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতকেই তার মধ্যে যেভাবে বিপুল শক্তি ও সৃষ্টির সম্ভাবনা এনে দিয়েছেন, তাতে বিস্ময়ান্বিত হতে হয়। অষ্টাদশ শতকে কবি ভারতচন্দ্র ঐ ভাষাকে পরিমার্জিত ক'রে যে অভিনব কাব্য-রচনারীতি গড়ে তুললেন মোটামুটি তা-ই হ'ল আমাদের কাব্যে মনোভাব প্রকাশ করার তৎকালীন সম্পূর্ণ ভাষা। আধুনিক সাহিত্যের প্রবর্তনা না এলে ঠিক ঐ ভাষাতেই আমাদের বহুদিন চলে যেত। কিন্তু প্রথম অসন্তোষ জানালেন মধুসূদন। মহাকাব্য-রচনার প্রেরণায় তাঁর কবিমানস ক্রিয়াগত বাক্যাংশে খাঁটি বাঙ্‌লা ব্যবহার ক'রে বিশেষণাদিতে ইংরেজি ও সংস্কৃতের অনুসরণই যুক্তিযুক্ত ব'লে মেনে নিলে। এই ভাষাই যে বাঙ্‌লা মহাকাব্যের তথা কাহিনী-কাব্যের তৎকালীন শ্রেষ্ঠভাষা তার প্রমাণ পাই ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য কবির কাহিনীকাব্য রচনায় এই ভাষার অনুসরণে। কিন্তু নবতর সৌন্দর্যবেদনামূলক নির্বিষয় গীতিকাব্যের মধ্যে ব্যবহারে ঐ পয়ারমূলক কাহিনীর ভাষা যখন অচল হয়ে পড়ল, তখনও নবতর ভাষাসৃষ্টির প্রয়োজন উপলব্ধ হ'ল না,

---

*তু°—ভামহ—'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে।'
বক্রোক্তিজীবিতকার—'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্'।

† What is Classic?

অথবা, ক্ষমতা-সম্পন্ন কবির আবির্ভাব ঘটল না। আমি আধুনিক বাঙলার প্রথম খাঁটি লিরিক কবি বিহারীলালের কথা বলছি, যিনি কবি অপেক্ষা সাধক ছিলেন বেশি এবং ভাবতন্ময়তার আতিশয্যে যিনি বক্তব্যের একটানা যৌক্তিকতা এবং শিল্পের প্রতি স্বভাবতই অমনোযোগী ছিলেন।

পয়ার-ছন্দে রচিত শিল্পসুষমাশূন্য ঘরোয়া গদ্যের বিহারী-ভঙ্গীতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোরের 'পদ্যপ্রলাপ' শুরু করেন। 'মানসী' বা 'কড়ি ও কোমল' রচনার পূর্ব পর্যন্ত কবির অন্তরে যেমন তাঁর নিজের সত্যমূর্তি গঠিত হয়নি, ভাবে ইংরেজির কবিদের ও বিহারীলালের অনুকরণ চলছিল, ভাষাতেও তেমনি পয়ার ছন্দে বিহারীলালের থেকে অধিক অগ্রসর কবি হতে পারেন নি। এমনকি ছন্দঃকুশলতা অপেক্ষা ভাবের বহনের দিকে দৃষ্টি অধিক ছিল ব'লে কড়ি ও কোমলেও দু'-এক জায়গায় ছন্দঃপতন থেকে কবি অব্যাহতি পাননি। যেমন—

থাক্ থাক্ চুপ কর তোরা,
ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে.
আবার যদি জেগে ওঠে বাছা
কান্না দেখে কান্না পাবে যে।

অথচ 'মানসী'র কাল থেকেই কবির ছন্দঃকুশলতা ও ভাষানৈপুণ্য কাব্যের দুইকূল প্লাবিত ক'রে নিয়ে চলল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মাত্রাবৃত্ত (=যৌগিক-দ্বিমাত্রিক) ছন্দের শক্তি আবিষ্কার এবং পদাবলীর ভাষাচাতুর্য আয়ত্ত করার ফলেই মানসীতে একজন শক্তিমান্ কবির লেখনীর পরিচয় প্রকটিত হ'ল। অথচ যে-ভাষায় ও যে-ছন্দে বাঙালীর হৃদয়-বীণা অনুরণন-যোগ্যতা লাভ করেছে, পদাবলীর সে-ভাষার দিকে লিরিক কবি বিহারীলালের দৃষ্টি স্বতই পড়া উচিত ছিল ; তা যে ঘটেনি তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম মাত্র। বিহারীলাল যাকে অস্বীকার করলেন, প্রতিভাসম্পন্ন কবি তাকে সহজেই বরণ করলেন, কারণ, তাঁর অন্তর জানে, এ ছাড়া উপায় নেই। 'মানসী' থেকে রোম্যান্টিক ব্যাকুলতার প্রথম প্লাবনে পদাবলীর ভাষাই হ'ল কবির গীতিময়তার মুখ্য অবলম্বন। ভুলে, ভুল-ভাঙা, বিরহানন্দ, ভালো ক'রে বলে যাও, ভৈরবী গান প্রভৃতি মানসীর মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মধ্যেই পদাবলী স্টাইলের যদিচ অধিকতর প্রকাশ,—নিষ্ফল কামনা, ব্যক্তপ্রেম প্রভৃতির মধ্যেও এর অবস্থিতি খুব বিরল নয়। তবে পয়ারজাতীয় ছন্দে অপেক্ষাকৃত কম এটুকু বলা যায় এবং অমিত্রাক্ষরের আদর্শে রচিত 'মিত্রাক্ষর-অমিত্রাক্ষর'-এ মোটামুটি মধুসূদনীয় ভাষাভঙ্গিই প্রযুক্ত হয়েছে। মানসী এবং সোনার-তরীতে এই উভয়মুখী ধারাতেই কবি ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ করেছেন ; ঐ দুই কাব্যের পদাবলী-অনুগ ভাষার কয়েকটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় অত্যুক্তি ঘটবে

না, যদিও ভাষাভঙ্গি কবিতার মধ্যে এমন অনুপ্রবিষ্ট যে তা অনুভবগম্য, দৃষ্টান্তযোগ্য নয় ব'লেই আমরা মনে করি ঃ

মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস নয়ন-কূলে ; এমন করিয়া কেমনে কাটিবে মাধবী রাতি ; আকুল বাতাসে মদির সুবাসে বিকচ ফুলে ; চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে প্রেমের ঘোর ; গান শুনে আর ভাসে না নয়নে নয়ন-লোর ; কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ ভরি আঁচোর ; কখনো সারারাত ধরি হাত দুখানি, রহি গো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া ; তোমার আঁখির মাঝে হাসির আড়ালে ; মনে কি করেছ বঁধু ও-হাসি এতই মধু, প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে ; বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল...কোথা সে ছায়া সখি কোথা সে জল ; লাজে ভয়ে থরথর ভালোবাসা-সকাতর তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয় ; পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে রূপ না দিলে যদি বিধি হে ; কাঁচল 'পরে আঁচল টানি ; উরসে পরি যূথীর হার বসনে মাথা ঢাকি ; তোমার লাগিয়া তিয়াস যাহার সে আঁখি তোমারি হোক ; শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া চিরজীবনের তিয়াসে ; ঘরে যারা আছে পাষাণে পরান বাঁধিয়া ; কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব ; ইত্যাদি— (মানসী)

যাহা লয়ে ছিনু ভুলে সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে ; ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী ; বাদর ঝর ঝর গরজে মেঘ, পবন করে মাতামাতি, শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ, স্বপনে কেটে যায় রাতি ; আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে ; আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম ; কলসে লয়ে বারি—কাঁকন বাজে নূপুর বাজে চলিছে পুরনারী ; পারশে যেন বসিয়াছিল ধরিয়াছিল কর, এখনো তার পরশে যেন সরস কলেবর ; মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত ; এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে তবুও কাছে নাহি যায়, খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে নীরবে চোখে চোখে চায় ; কবরী কেমনে বাঁধিবে নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে ; পরশে পরশে দোঁহে করি বিনিময়, মরিব মধুর মোহে দেহের দুয়ারে ; কমল-ফুল-বিমল সেজখানি, নিলীন তাহে কোমল তনুলতা ; জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার বসিয়া আছে, বুকের কাছে ; ব্যথা পাছে লাগে দুখ পাছে জাগে নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে বাসর-শয়ন করেছি রচন কুসুমথরে ; উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল, উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল, বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী মত্ত বোল ; চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয়লাজ, বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে ভাবে বিভোল ; যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এস ওগো এস মোর

হৃদয়-নীরে : ওই যে শবদ চিনি নূপুর রিনিকি ঝিনি, কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ঘিরে ; যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে ; আমারি এই আঙিনা দিয়ে যেয়ো না, অমন দীন নয়নে তুমি চেয়ো না ; রয়েছে সাধ, না জানি তার সাধনা ; বিকল-হৃদয় বিবশ-শরীর ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর, কোথা আছ ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি ; ইত্যাদি। (সোনার তরী)

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি সম্পর্কে আলোচনা, মানসীর দু'-একটি কবিতায় বর্ণিত পদাবলীর বিষয়বস্তু এবং রোম্যান্টিক বিরহভাবনা প্রভৃতি থেকে এই যুগে কবির পদাবলী-প্রীতি সম্পর্কে অনুমানও করা যায়। আসলে ভানুসিংহ পদাবলীতে কবি অনুকরণাত্মক যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, ছন্দ মাত্রা ও শব্দ নিয়ে, কড়ি ও কোমলের শেষ এবং মানসীর প্রারম্ভ থেকে তারই প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া গেল। পদাবলীর অদ্ভুত হৃদয়ভাব-প্রকাশের উপযোগী ভাষার প্রভাব গ্রহণ ক'রে আধুনিক মহাকবি একে ধীরে ধীরে আত্মস্থ ক'রে তুলেছেন। চিত্রা-পর্যায়ে তাই পদাবলীর বাহ্য পরিচয় দুর্নিরীক্ষ্য ('শুধু আমার নূপুর আমারি চরণে বিমরি বিমরি বাজে' ইত্যাদি দুএকটি দৃষ্টান্ত ছাড়া)। একালে একমাত্র 'জীবনদেবতা'য় এবং পরবর্তীকালে নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি-রাজা প্রভৃতি অরূপভাবুকতাময় রচনায় বৈষ্ণব-পদাবলীর ভঙ্গিমা প্রয়োজনবশেই কবিকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

একদিকে পদানুসারী গীতিময় ভাষা, আর একদিকে মধুসূদন-নবীনচন্দ্র প্রদর্শিত পয়ার-জাতীয় ছন্দের কোমল ও পরুষ অক্ষরের মিলনাত্মক সংস্কৃত-বহুল সাধুভাষা, বঙ্কিমী আমলের সাধু ও চলিত গদ্যের মতই রবীন্দ্র-রচনায় পাশাপাশি প্রযুক্ত দেখা যায়। একটি মোটামুটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে, অপরটি বিশেষত পয়ার-জাতীয় ছন্দে ব্যবহৃত হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যে-উপমানৈপুণ্যে ও অনুপ্রাসের যথোপযুক্ত ব্যবহারে কবিগুরু প্রসিদ্ধ এবং সমাসোক্তি ও উৎপ্রেক্ষায় সিদ্ধহস্ত, সেই সব সংস্কৃত অলংকারে ও মোটামুটি আলংকারিক বাক্য গঠনে এখনও রবীন্দ্র-প্রতিভা হস্তক্ষেপ করেনি। দু-একটি উপমাশ্রেণীর অলংকার ও Personification কবি স্বকীয় সহজ কাব্য-নৈপুণ্যবশে স্বতই প্রয়োগ করেছেন, সার্থক অনুপ্রাসাদির ব্যবহারে এখনও তাঁর প্রতিভা মনোযোগী হয়নি ; পূর্ণ আলংকারিক বাগ্‌বিন্যাসের অধিকার যেন এখনও আসেনি। সোনার তরী রচনাকালে তাঁর সহজনৈপুণ্যের মধ্যে ভবিষ্যতের এই অসাধারণ সম্ভাবনার চিহ্ন পাওয়া যায়। পয়ার-জাতীয় ছন্দে লেখা নিম্নলিখিত অংশটিকে উদীয়মান কবির সহজ প্রকাশশক্তি ও সম্ভাব্য পরিপূর্ণতার বহু নিদর্শনের অন্যতম ব'লে গণ্য করা যেতে পারে—

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নতশস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

('যেতে নাহি দিব')

সংস্কৃত বক্রোক্তিময় বাগ্‌ভঙ্গির অবিকল অনুসরণ এই সময়কার চিত্রাঙ্গদা নাট্যরচনাতেই প্রথম দৃষ্ট হয়, এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। 'চিত্রাঙ্গদা' সোনার তরীর সমকালীন হ'লেও ওর অভিনব বাক্‌কুশলতা ঐ নাট্যেই আবদ্ধ ছিল, গীতিকাব্যে তেমন সঞ্চারিত হয়নি বললেও চলে। তথাপি মানসীতে যা লক্ষ্য করা যায় না এমন আলংকারিক বাগ্‌বিন্যাস সোনার তরীতে আছে,—সমুদ্রের প্রতি, প্রতীক্ষা, হৃদয়-যমুনা এই তিনটি কবিতা লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। এমনকি নিরুদ্দেশ-যাত্রার 'ঝলিতেছে জল তরল অনল, গলিয়া পড়িছে অম্বরতল' ইত্যাদির উৎপ্রেক্ষায় কুমারসম্ভব অষ্টম সর্গের বা কাদম্বরীর সন্ধ্যাবর্ণনার ছায়াপাত বিচিত্র হয়নি। কিন্তু কেবল দু-একটি অলংকারেই সংস্কৃতানুসারীতার বা অন্যথার বিচার হয় না। কবির বচন-ভঙ্গিকে কবির অভিলাষ অনুসারেই অনুধাবন করতে হবে। সংস্কৃত শব্দের ধ্বনির বক্রতা তার অন্যতম গুণ। এখনো কবি অভিপ্রেত ধ্বনিগুণের জন্য, ওজস্বীতা-কোমলতার প্রয়োজনে সংস্কৃত শব্দের চয়নে বা ঐ আদর্শে শব্দ-গঠনে সচেষ্ট হয়নি। নতুবা 'পরশ-পাথর'-এর মত ভাবের ও চিত্রের দিক থেকে চলনসই কবিতাতেও একস্থানে নীরস গদ্যভাষা প্রয়োগে কবির বাধেনি। যেমন—

বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা না পায় অভাগা।
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।

মোট কথা, সোনার তরীতে কবির রূপনির্মাণ-প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না, কবি-প্রতিভা কাব্যদেহের উৎকর্ষসাধনে এখনও মনোযোগী হয়নি।

চিত্রা-পর্যায়ে সৌন্দর্য-সাধনায় ব্রতী ও জীবনবোধে উদ্দীপ্ত কবি শব্দালংকারে অল্পবিস্তর মনোনিবেশ করেছেন দেখতে পাই। উর্বশী কবিতার 'যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা' অথবা 'শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে' অথবা 'কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী' প্রভৃতির মধ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহারে যথাযোগ্যতার দিকে কবিকে দৃষ্টি দিতে দেখি। তেমনি 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার 'কল্যাণকঙ্কণ করে, সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুর-বিন্দু' প্রভৃতির মধ্যেও উপযুক্ত শব্দালংকারময় নির্বাচিত শব্দের উপর কবির আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। আবার 'অন্তর্যামী'তে—

কভু বা পন্থ গহন জটিল,
কভু পিচ্ছল ঘনপঙ্কিল,
কভু সংকটছায়া-শঙ্কিল,
বঙ্কিম দুরগম।

প্রভৃতির মধ্যেও কাব্যদেহের ধ্বনি-সৌকর্য-সাধনে ব্রতী হতে দেখি। কিন্তু কল্পনা কাব্যে অনুপ্রাসবহুল ও ব্যঞ্জনাময় শব্দের প্রয়োগে কবিকে যে-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায় তা এর পূর্বে দেখা যায় না। বস্তুত 'কল্পনা'র কয়েকটি কবিতাই ভাষাশিল্পীর সুন্দর কাব্যদেহ নির্মাণের সজ্ঞান প্রয়াসের উদাহরণ, ফলে কোথাও একটু বাগ্-বিকল্পযুক্ত সুতরাং কৃত্রিম, এমন অভিমত প্রকাশ করলে বোধহয় নিতান্ত অসংগত হয় না। আমরা 'দুঃসময়' কবিতাটি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। মহাকবির কেবল বাহ্যরূপ বা আর্ট নিয়ে বিলাসও অনেক সময় পাঠকের কাছে গুরুতর ব'লে মনে হতে পারে এবং কবি খেলাচ্ছলে যা সৃষ্টি করেন তা কোনো-না-কোনো অর্থের সূত্রে গৃহীত হয়ে গভীর কাব্যপ্রেরণার উত্তম উদাহরণ ব'লে পরিগণিত হতে পারে। 'বর্ষামঙ্গল' এবং 'আবির্ভাব'ও এই শ্রেণীর সৃষ্টি, যদিও রূপের দিক থেকে এরা 'দুঃসময়' থেকে অধিকতর উন্নত।

কিন্তু কেবল অনতিবিলম্বিতযতি ধ্বনিময় মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই নয়, বিলম্বিতযতি পয়ারশ্রেণীর ছন্দেও কবি ভাবানুযায়ী শব্দচয়নশক্তির সার্থক প্রয়াস দেখিয়েছেন। 'বর্ষশেষ' এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে 'ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কাল-বৈশাখীর নৃত্য', 'নিশি নিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা-স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি', 'উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জ্বলদর্চিরেখা' এবং 'খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা উৎসর্জন করি' প্রভৃতি কাব্যাংশে নূতনতর শব্দযোজনার দ্বারা কবি যে দীপ্ত গম্ভীর ভাব ব্যঞ্জিত করতে চাইছেন তা অতি স্পষ্ট। এমন ঘটনা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। এইজন্য আমরা কল্পনা-কাব্যকে কবির ভাষা নিয়ে পরীক্ষামূলকতার একটি বিশিষ্ট অধ্যায় ব'লে মনে করি। ইতিপূর্বে আমরা দুঃসময়-অসময় কবিতার

'স্বর্গপথে' নামক পান্ডুলিপির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। গ্রন্থন-কর্তৃপক্ষ এই পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ ক'রে রবীন্দ্র-রসিকদের মহা উপকার করেছেন। পরবর্তী 'ক্ষণিকা'য় কবির স্বভাব এত সহজ স্পষ্ট ও কৃত্রিমতা-বা আতিশয্য-হীন যে, মনে হয়, কবি যেন লিরিক কাব্যের ক্ষণিক মুহূর্তের উপযোগী স্বকীয় ভাষা অকস্মাৎ এতদিনে খুঁজে পেয়েছেন। আমরা কল্পনা-কাব্য থেকে কবির পরীক্ষামূলক অনুপ্রাসশিল্পের কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি, এদের কতকগুলি সার্থক ও তুলনারহিত, আবার কতকগুলি অল্প-বিস্তর আতিশয্যযুক্ত। কল্পনার পূর্বেকার কোনো রচনার মধ্যে এরকম বচনভঙ্গির তুলনা মিলবে না ঃ

'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ-মন্থরে, সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া।'
'এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত, ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে'
'অতি ভৈরব হরষে, জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে'
'উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে'
'কেতকী-কেশরে কেশপাশ করো সুরভি'
'তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া'
'বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন'
'কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধুপবনে'
'বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি কামিনী মলয়ানিল-শিথিল দুকূলে।'
'গোপন-ব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি সখীরে'
'ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে'
'নবীন নবনী-নিন্দিত করে দোহন করিছ দুগ্ধ'
'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে'
'ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ'
'আলোক-পরশে মরমে মরিয়া' —ইত্যাদি

সুনির্বাচিত অনুপ্রাস প্রয়োগের এই ঘটা ইতিপূর্বে ঘটেনি। কবির এই সময়কার ধ্বনিপ্রিয়তার জন্য মেঘদূত ও বিশেষভাবে জয়দেবের গীত-গোবিন্দই দায়ী ব'লে আমাদের মনে হয়। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস-রায়শেখরও কবিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকবেন। অর্বাচীন সংস্কৃত কাব্যেও রসগভীরতা অপেক্ষা কলাকুশলতার দিকটি প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে, জয়দেবে যার চরম প্রকাশ, এবং 'রমণী-কমনীয়কপোলতলে পরিপীতপটীররসৈরলসঃ। অয়মঞ্চতি পঞ্চশরানুচরো নবনীপবনীধুবনঃ পবনঃ' প্রভৃতির মত বিক্ষিপ্ত শ্লোকেও যা লক্ষিতব্য। কাব্যের শিল্পগুণের দিকে কবি-প্রতিভার সতর্ক দৃষ্টির কারণ, কবি মনে করতেন—প্রকাশই কবিত্ব, রূপনির্মাণই আসল

কবিকর্ম, বচনের মধ্য দিয়েই অনির্বচনীয়তা রক্ষা করতে হয় (দ্রঃ সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যধর্ম প্রভৃতি প্রবন্ধ) এবং আধুনিক কবি এলিঅটের মতো 'Genuine poetry can communicate before it is understood'* এমনকি অতিরিক্ত কলাকৌশলবাদী সংস্কৃত আলংকারিকদের মতো (অন্তত 'কল্পনা' রচনার যুগে) তাঁর নিম্নলিখিতরূপ মনোভাব হওয়াও বিচিত্র নয়—

তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়াপি বা।
পাদবিন্যাসমাত্রেণ যয়া ন হ্রিয়তে মনঃ॥

বস্তুতঃ কল্পনায় কোথাও কোথাও যে ধ্বনিবিন্যাসের অতিরেক ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ক্ষণিকের। অতি শীঘ্রই কবি তা কাটিয়ে উঠেছেন, 'কথা' ও 'ক্ষণিকা'র সংযত, যথোপযুক্ত ও সার্থক অনুপ্রাস-প্রয়োগ এবং শব্দযোজনশক্তিই তার প্রমাণ দেয়। অতঃপর কবি সংস্কৃতের ধ্বনিমন্ত্রকে তাঁর প্রতিভার এমনি অঙ্গীভূত ক'রে ফেলেছেন যে, এ তাঁর কবি-কল্পলোক-নির্মাণের স্বতউৎসারিত প্রয়াস ব'লে কোনো সন্দেহ থাকে না। কল্পনা কাব্যের মধ্যেই এমন কয়েকটি রচনা রয়েছে যাতে অনুপ্রাসবাহুল্য দোষ নেই, শব্দ-প্রয়োগের মধ্যেও আয়াসের কোনো চিহ্ন লক্ষিত হয় না, পরীক্ষামূলকতার কোনো লক্ষণই নেই। রূপে ও রসে সামঞ্জস্যময় অনবদ্য প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি এদের বলা যেতে পারে। আমরা উদাহরণ-স্বরূপ 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুদূর, আমার সাধের সাধনা, মম শূন্যগগনবিহারী' এই গানটি এবং 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ' এই কবিতাটির কথা বলছি। 'বৈশাখ' কবিতাটির চিত্রনির্মাণগত যে চারুত্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তার কতখানি সার্থক শব্দযোজনার ফল, কবিতাটির রূপবিচারেই তা উপলব্ধ হবে। 'ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল', 'তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু', দগ্ধতাম্র দিগন্তের', 'শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠ', 'রহি রহি দহি দহি', 'আবর্তিয়া তৃণপর্ণ ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া' প্রভৃতির বচন-বিন্যাস ও অনুপ্রাস-প্রয়োগ রুদ্রমূর্তি বৈশাখের একটি পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক চিত্র আমাদের নয়নগোচর করতে সহায়তা করেছে।

কল্পনার এই পরীক্ষামূলকতার পরেই কবির সিদ্ধহস্তে কথা ও ক্ষণিকার চিত্র ও সংগীতে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী অপূর্ব কবিতাগুলি রচিত হয়। 'অভিসারে'র 'নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা, অঙ্গে আঁচল সুনীলবরণ, রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ' চিত্রটিই 'কথা'র কলানৈপুণ্যের

*তু° বক্রোক্তিজীবিতকারের বচন—
অপর্যালোচিতেঽপ্যর্থে বন্ধসৌন্দর্যসম্পদা।
গীতবৎ হৃদয়াহ্লাদং তদ্বিদাং বিদধাতি যৎ॥

সর্বোত্তম সৃষ্টি। এ ছাড়া 'সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ, বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান, মন্ত্রণাসভা হ'ল সমাধান, দ্বারী ফুকারিয়া বলে' কিংবা 'দিবসের শেষ আলোক মিলাল নগরসৌধ-'পরে' প্রভৃতির রূপনির্মাণও অপূর্ব। ক্ষণিকার লৌকিক বাঙলা ছড়ার ছন্দের মধ্যেও কবির যথোপযুক্ত সুন্দর অনুপ্রাসের অভাব নেই, তাঁর নৈপুণ্যগুণে এ-চাতুর্য সৃষ্টির অঙ্গীভূত হয়েছে, স্বকীয় প্রকট অস্তিত্বে বাইরে অবস্থিত নেই। যেমন—

বন্ধু ফিরে বন্দী করে বুকে,
সন্ধি করে অন্ধ অরিদল,
অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,
কাজল-চোখে করুণ আঁখিজল।

অথবা,

'চিত্তদুয়ার মুক্ত ক'রে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা'

অথবা,

'পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ-'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত'

'আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়'

অথবা,

ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-কিঙ্কিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।

অথবা,

কোনো নামটি মন্দালিকা,
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী
ঝংকারিত কত।

অথবা,

'শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা'।

ক্ষণিকায় ছড়ার ছন্দে মধ্য- ও অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার খুবই বেশি, কিন্তু তা এমনি সুপ্রযুক্ত যে কর্ণপীড়ার তো প্রশ্নই নেই, কাব্যের অবর্ণনীয় মাধুর্যের আস্পদ হয়েছে। অপরপক্ষে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত নববর্ষা, আষাঢ়, অবিনয় প্রভৃতি কবিতাতেও—

বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন-'পরে,
নবকদম্ব মদির গন্ধে আকুল করে।

প্রভৃতির শাণোল্লিখিত মণিখণ্ডের মত শব্দে গ্রথিত অংশ সহজেই মেঘদূতের

মত শ্রেষ্ঠ রচনার সমধর্মীতা দাবি করতে পারে। দেখতে হবে যে, কল্পনার 'বর্ষামঙ্গলে'র অথবা ক্ষণিকার 'নববর্ষা' কবিতার প্রাচীনধর্মী চিত্রবর্ণনার মধ্যেই কবির ভাষাকৌশল সীমাবদ্ধ নেই, বাঙলার পল্লীপ্রকৃতির বাস্তব-চিত্র যেখানে উন্মোচিত হয়েছে এমন 'আষাঢ়' বা 'মেঘমুক্ত' কবিতাতেও ধ্বনিময় ছন্দ ও ভাষাভঙ্গিই প্রত্যক্ষতাকে অধিকতর উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। 'আষাঢ়' কবিতার—

বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউশের খেত জলে ভরভর
* * ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন পথপাশে দেখ্ চাহি রে।

অথবা 'মেঘমুক্ত' কবিতার—

কথা-বলাবলি নাহি চলে আর
একাকার হ'ল তীরে আর নীরে তালতলায়।

প্রভৃতিতে বর্ণনাকৌশল ও বাস্তবচিত্রনির্মাণ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে। এমনকি 'নববর্ষা' কবিতার কাল্পনিক দোলা-আরোহিণীর বর্ণনায়—

ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক, কবরী খসিয়া খুলিছে।

প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য পঙ্‌ক্তির সঙ্গে একাধারে পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনাতেও ঐ চাতুর্যের সমাবেশ অসংগত হয়নি, যেমন—

ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরি ডাকিছে সঘনে।

অথবা,

ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর কাছে রে।

এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, ভাষার প্রাচীনাদর্শীয় ধ্বনিগুণ কবি লৌকিক বাঙলাতেই নিষ্পন্ন করতে চেয়েছেন। তদ্ভব-রূপে ক্ষয়িত বাঙলা ভাষার এই শক্তি-আবিষ্কার রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কৃতীত্বের পরিচয় বহন করে।

সংস্কৃত ভাষাদর্শ বাঙলায় প্রতিফলিত ক'রে অথবা সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার পরিণয়বন্ধনে কবি যে-সিদ্ধিলাভ করলেন তার ফল হ'ল সুদূর-প্রসারী। বলাকা-পূরবী-মহুয়ার রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিণামের যুগের বিখ্যাত কবিতাগুলিতে ও নটরাজের সংগীতে এই বচন-বিন্যাস-চাতুর্যই কবির অভি-প্রেত জীবন ও অরূপের সমন্বয়ের অন্তর্গূঢ় রসটি প্রকাশ করতে সাহায্য

করেছে। ঐ যুগের 'ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত' বলাকার পাখার ধ্বনি, পূরবীর 'কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল' ও 'বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে' থেকে মহুয়ার 'মধুর হল বিধুর হল মাধবী নিশীথিনী' এবং বনবাণীর 'মিলন-মাঙ্গল্য-হোম-প্রজ্বলিত পলাশে পলাশে রক্তিম আগুনে,' এমনকি পত্রপুটের 'নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী'র বর্ণনা পর্যন্ত সংস্কৃত-বাঙ্‌লার মিলন-প্রলাপেই মুখরিত।

কবিতার চেয়ে সংগীতে এই চমৎকারীত্বের দিকটি অধিকতর সহজভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতে সুরের সঙ্গে কথার সমান অধিকারের জন্য কথার মোহ সৃজনের দিকে কবির দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল। সংগীতে কবি অনুপ্রাসের ধ্বনিগুণকে সুরের অতিরিক্ত অলংকাররূপে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। "নীল-অঞ্জনঘনপুঞ্জ-ছায়ায় সম্বৃত অম্বর" এর মেঘমন্দ্রধ্বনির চরম উদাহরণের কথা অথবা 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' এর সংস্কৃত হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের ভঙ্গিতে নিয়মিত ধ্বনিমাত্রিকতার কথা বাদ দিলেও "চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে বাণী-মঞ্জরী সঞ্চলিতা" অথবা "কেশরকীর্ণ-কদম্ববনে মর্মর-মুখরিত মৃদুপবনে, বর্ষণহর্ষভরা ধরণীর বিরহ-বিশঙ্কিত করুণ কথা" কিংবা "নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু; পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র-ভানু" প্রভৃতি সহস্রাধিক স্থানের অসাধারণ ধ্বনিময়তা* অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের সঙ্গে কবির অভিপ্রেত ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছে। অবশ্য, বিশেষ কতকগুলি মর্মমুখী গানে ও কবিতায় বাউলধর্মী কবি ভাষাভঙ্গিতে তদ্ভবও লৌকিক বাঙ্‌লার আন্তরিকতাময় অচতুর সারল্যের পথ বেছে নিয়েছেন এও দেখা যায়। লক্ষণীয় এই যে, পদ্যচ্ছন্দের রচনায় রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা ভাষার প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট রীতিকে (পদবিন্যাস এবং বাক্যাংশের ব্যবহার) কোথাও অতিক্রম করতে যাননি। চণ্ডীদাস-মুকুন্দ-গোবিন্দদাস-ভারতচন্দ্রের বাঙ্‌লাকে ভিত্তি ক'রে তারই উপর তিনি প্রয়োজন মত আলংকারিকতা অর্পণ করেছেন।

ভাষাশিল্প থেকে অনায়াসে ছন্দঃপ্রসঙ্গে আসতে হয়। রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথের ছন্দঃপ্রয়োগসিদ্ধি কম বিস্ময়কর নয়। তিনি উন্নতশ্রেণীর গীতিকবি ব'লেই বাঙলা ছন্দের বিচিত্র বিন্যাসে—পর্ব-পর্বাঙ্গ গঠনে, উচ্চারিত মাত্রা ও ধ্বনির সুষমারক্ষণে, চরণসজ্জায়—তাঁকে পূর্বেকার থেকে পৃথক্ ও বিচিত্র রীতি অবলম্বন করতে হয়েছিল। যদিও একমাত্র গদ্যচ্ছন্দ ছাড়া নূতন পদ্ধতির কোনো ছন্দ তিনি আবিষ্কার করেননি, তবু প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত-

* কুন্তকোক্তিলাখিত ধ্বনিবক্রতা।

মাত্রাবৃত্ত* এবং স্বাসাঘাত রীতিতে যে বৈচিত্র্য এনেছেন তাতে বাঙ্‌লা ছন্দের সূক্ষ্মসৌন্দর্যসমূহ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

আমরা কবি-প্রতিভার 'অপ্রকাশের কাল' অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে পয়ার-জাতীয় ছন্দে দীর্ঘপর্বের বিন্যাসে কবির লেখনী দু-একটি ক্ষেত্রে বাধা পেয়েছে। যে-মাত্রাবৃত্ত ছন্দের শিল্পচাতুর্য কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে বিজড়িত, তার প্রারম্ভ 'কড়ি ও কোমলে'র শেষের দিকে লেখা 'আজি শরত তপনে' সংগীতটিতে। ছ'-মাত্রার পর্বের দুটি ক'রে পর্বান্তে মধ্যানু-প্রাসের যোজনায় গানটি পাঠেও অতিশয় মধুর হয়েছে। ঐ জাতীয় ছন্দে নূতনতর পর্ববিন্যাসের বৈচিত্র্য নিয়ে কবি পর পর পরীক্ষা চালালেন কয়েক বৎসর ধ'রে। 'বিরহানন্দ', 'ক্ষণিক মিলন' প্রভৃতি মানসীর কবিতায় চোদ্দ মাত্রার পয়ারের পঙ্‌ক্তিকে মাত্রাবৃত্তের উচ্চারণে গ্রথিত ক'রে পর্ব ভাগ করলেন (৩+৪)+(৪+৩)। এ বিন্যাস কিন্তু পাঠ্য ছন্দের দিক থেকে কিছুটা সামঞ্জস্য-হীন ও কৃত্রিম হ'ল, যদিও গানের যতিপাতে বা তালরক্ষণে কোনো ক্ষতি হ'ল না। অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ চার মাত্রার পর্ব গণনার নির্দেশ দিয়েছেন (তাঁর নিজস্ব ছন্দের আলোচনায়)। অথচ একমাত্র দ্রুতলয়ের স্বাসাঘাত ছাড়া চার মাত্রার পর যতিপাত আমাদের শ্রুতিযন্ত্রের প্রত্যাশার বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ যে এই বিভাগ সমর্থন করেছেন অর্থাৎ আটমাত্রার পর্বকে ৪+৪ এবং সাতমাত্রার পর্বকে ৪+৩-এ ভেঙে দেখতে চেয়েছেন তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের শ্রুতিতে পাঠ্য ছন্দের যতিবোধের চেয়ে সংগীতের লয় ও তালের বোধ অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রভাব তাঁর শেষজীবন পর্যন্ত কার্যকরী হয়েছে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে আমাদের ঐ তিন পৃথক্‌ রীতির ছন্দোভঙ্গি পৃথক্‌ তিন সুরতালেরই বশবর্তী। যাই হোক, কবি ক্রমশ অত্যন্ত অসমান পর্ববিন্যাসের শ্রুতিকটুতা থেকে মুক্তি পেয়েছেন

* পয়ারজাতীয় ছন্দের 'অক্ষরবৃত্ত' নামটিকে উড়িয়ে দেওয়ার তেমন যৌক্তিকতা আমরা দেখি না। সংস্কৃতে তাবৎ ছন্দকে দু'টি প্রধানভাগে ভাগ করা হয়েছে, অক্ষরবৃত্ত' বা অক্ষরগণনার উপর নির্ভরশীল এবং 'মাত্রাবৃত্ত' বা মাত্রা-গণনার উপর নির্ভরশীল। পয়ার-জাতীয় ছন্দে প্রাচীনের মতই মোটামুটি এক-অক্ষর-একমাত্রা রীতি। অধুনা এই জাতীয় ছন্দে কোনো অক্ষরের অনিয়মিত দীর্ঘীকরণ বা সংকোচন এত স্বল্প যে ঐ রকম ব্যতিক্রমস্থলে তাকে ভুল ব'লেই ধরতে হয়। তদ্‌ভব বাংলা যৌগিক অক্ষরের (syllable) উচ্চারণ একদা খুবই অস্থির বা elastic ছিল, ক্রমশঃ আধুনিকে তা স্থির-নির্দিষ্ট হয়ে এসেছে। অবশ্য আমরা এই ছন্দের 'অক্ষরমাত্রিক' নামটিই অধিক পছন্দ করি। লেখকের "বাঙ্‌লা কাব্যের রূপ ও রীতি" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এবং 'মানসী'তেই ছ'মাত্রার মাত্রাবৃত্তের উপর নিজ ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর মুদ্রিত ক'রে দিয়েছেন। মানসী-পূর্ব ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে ছ'মাত্রা এবং আটমাত্রা উভয় রীতির পর্বের ছন্দ যদিচ রয়েছে তা গোবিন্দদাসাদি বৈষ্ণব পদকর্তাদের থেকে অনুকৃত, সুতরাং কৃত্রিম আড়ষ্ট, এখানে স্বকৃত স্বতঃস্ফূর্ত, এই পার্থক্য।

ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে কবির সমানীত সৌন্দর্য হ'ল পর্বমধ্যে দু'মাত্রার অযৌগিক ও যৌগিক অক্ষরের সুসমঞ্জস ব্যবহার। যেমন, 'এ কী কৌতুক নিত্যনূতন', 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ' 'রূপযৌবন উপঢৌকন', 'বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান', 'কেশরকীর্ণ ক দম্ব বনে', 'গুরুগুরু গর্জনে নীপমঞ্জরী'*— ইত্যাদি। এ বিষয়েও অবশ্য তিনি গোবিন্দদাসাদি বৈষ্ণব কবির থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। ষণ্মাত্রিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বের পরিচয় রয়েছে, আটমাত্রার ধ্বনিমাত্রিকে তেমন না হ'লেও এই দীর্ঘপর্বের মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার তাঁর রচনায় খুব কম নয়। মাত্রাবৃত্তে (=যৌগিক-দ্বিমাত্রিক রীতির ছন্দে) অক্ষরধ্বনির দীর্ঘীকরণ-সামর্থ্যের চরমতা দেখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'জনগণ-মন-অধি', 'চীন গগন হতে', 'কেন পান্থ এ চঞ্চল তা' প্রভৃতি রচনা করেছেন। এখানে সংস্কৃত-প্রাকৃত উচ্চারণরীতি অনুযায়ী মৌলিক স্বর আ, ঈ, ঊ, এ প্রভৃতিকেও প্রায়শই দু'মাত্রার মূল্য দেওয়া হয়েছে।†

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গোটাগুটি সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণ কোথাও করতে যাননি, কারণ, এ প্রচেষ্টার হাস্যকর ব্যর্থতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। পার্শ্ববর্তী কবিকনিষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কঠোর প্রয়াস সম্পর্কে তিনি উৎসুক যদিচ ছিলেন, ফলশ্রুতি বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বাঙলার আ, ঈ প্রভৃতি মৌলিক অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণের দ্বারা সংস্কৃত ছন্দোরীতি-অনুসরণের কৃত্রিমতা অনুধাবন ক'রে ব্যঞ্জনান্ত যৌগিক অক্ষরের

* ঐ সামঞ্জস্য রক্ষার্থেই পরিবর্তিত পাঠ।

† এই পর্ববিন্যাসের ছন্দের 'প্রত্নমাত্রাবৃত্ত' ব'লে নামকরণের কোনো যৌক্তিকতা দেখি না। বাঙলা মাত্রাবৃত্তে চারমাত্রার পূর্ণ পর্ব গ্রহণ করাও অবশ্য স্বভাব-সংগত নয়। এ সম্পর্কে মদীয় পরবর্তী গ্রন্থে বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি বিবেচনে বিস্তারিত বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্র সেন চারমাত্রার অর্ধ-পর্বকেও পূর্ণপর্বের মান দিয়েছেন দেখি।

মাত্রাবৃত্ত অর্থাৎ যৌগিক-দ্বিমাত্রিক ছন্দে অর্ধযতি বিন্যাসের সুষম নিয়ম হ'ল—আটমাত্রার ক্ষেত্রে ৪+৪, ছ'মাত্রার ক্ষেত্রে ৩+৩, পাঁচমাত্রার ক্ষেত্রে ৩+২ বা ২+৩, অর্থগত পদস্থাপন যেমনই হোক না কেন।

উপরেই (যৌগিক স্বরান্ত ঐ, ঔ, আই, আউ তো আছেই) দীর্ঘ ভারবহনের সমূহ দায়ীত্ব চাপিয়ে দিলেন। মনে করলেন ব্যঞ্জনান্ত যৌগিক অক্ষরটা বাঙলাতেও গুরু, সংস্কৃতের মত না হোক, কতকটা নিশ্চয়। এইখানেই তাঁর ভুল হ'ল। সাধারণ বাঙলা উচ্চারণে মৌলিক যৌগিক সব একমাত্রার, কেউ কারুর গুরু-শিষ্য নয়। তবে মাত্রাবৃত্তে যে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই দু'মাত্রার সে ঐ ছন্দের মাত্রারীতি ও বিশিষ্ট হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রাচীন উচ্চারণভঙ্গির উপর নির্ভর করছে। ফলত তাঁর 'মালিনী', 'রুচিরা'র ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরবহুল উচ্চারণ এবং পরপর অক্ষরে দীর্ঘতা অত্যন্ত কৃত্রিম হ'ল, আর, মন্দাক্রান্তা-নামধেয় 'পিঙ্গল বিহ্বল' এবং পঞ্চামর নামধেয় 'মহৎ ভয়ের মূরত সাগর' যে কোনক্রমে দাঁড়াল সে ঐ যৌগিক-দ্বিমাত্রিকের পর্ববিভাগ ও উচ্চারণরীতির সজাতীয় হ'ল ব'লে। তাঁর ইংরেজি ছন্দের অনুসরণেরও এই গতি হয়েছে, অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত পদ্ধতির অনুগত হয়েই তা বেঁচে আছে। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের উচ্চ-কাব্যবোধ তাঁকে উৎকট বৈচিত্র্য আনয়নের শ্রম থেকে বাঁচিয়েছে এবং কাব্য-সরস্বতীকেও রক্ষা করেছে।

'অক্ষরমাত্রিক' পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথ ভাবানুযায়ী যে বৈচিত্র্য এনেছিলেন তা হ'ল ঐ পদ্ধতির চরণক্ষেপের এবং মিলযোজনার কৌশল। যেমন ধরা যায় ৮+১০ আঠারো মাত্রার চরণগঠনে লিখিত 'হে আদি-জননী সিন্ধু' 'একথা জানিতে তুমি' প্রভৃতি কবিতা। অবশ্য বহু পূর্বেকার 'কৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থেই পয়ার-জাতীয় ছন্দের দীর্ঘ পর্ব ও মিলগ্রন্থন নিয়ে এ-জাতীয় বিচিত্র পরীক্ষা-কৌশল দেখা গেছে। মধুসূদনীয় অমিত্রচ্ছন্দকে গীতিরসিক রবীন্দ্রনাথ উন্নতদৃষ্টিতে দেখেননি, তাই অমিত্রচ্ছন্দে ছেদের সীমিত-স্বাধীন সঞ্চরণকে তিনি যদ্যপি অভিনন্দিত করেছিলেন, পয়ারের চরণান্ত অনুপ্রয়াস ত্যাগ করেননি। মানসী'তেই ছন্দ সম্বন্ধে পরীক্ষণের কালে তিনি পয়ারের চবণকে ভেঙে এবং মিল না দিয়ে 'নিষ্ফল কামনা' কবিতা লেখেন। অমিত্রচ্ছন্দেরই ছয়-আট পর্বের নবতর রীতিতে ৬, ৮, ৬+৬, ৮+৬, ৬+৮ প্রভৃতি চরণে বিন্যাস। 'বলাকা'য় এই চরণবিন্যাসেরই ভাবানুযায়ী কৌশল অবলম্বিত হয়েছে, যদিও মিল বজায় রাখা হয়েছে। কোথাও কোথাও ৮. ১০ মাত্রার গোটা পর্ব, নয়ত চার, এমনকি দু'মাত্রার পর্বাঙ্গ নিয়েও একটি চরণ স্থাপিত হয়েছে। এই জাতীয় ছন্দকে ৮+১০ এর মহাপয়ারের নিয়মিত চরণ-বিন্যাসের খাতে আবদ্ধ করতে গিয়ে পণ্ডশ্রম করায় লাভ নেই, এর যথাস্থিত রূপের অর্থাৎ পর্ব-পর্বাঙ্গীয় চরণবিন্যাসের স্বাধীনতার দিক থেকেই মূল্যায়ন করতে হবে। তবু বলাকার ছন্দ 'free verse' নয়, গদ্যচ্ছন্দই যথার্থ মুক্তচ্ছন্দ।

ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাত-ছন্দ বহু পূর্বেই বাঙলা কাব্যে পাঙক্তেয় হলেও

(প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বৈঃ পদাবলী, অন্নদা-মঙ্গল এবং দাশুরায়ের পাঁচালি প্রভৃতি দ্রঃ) উন্নততর সাহিত্যিক রচনায় অধুনা রবীন্দ্রনাথই এর প্রবেশ অবারিত করলেন। এই ছন্দের প্রয়োগ বিষয়ে ক্ষণিকা, পলাতকা এবং কতকগুলি সংগীত লক্ষণীয়। 'পলাতকার ছন্দ' ব'লে এই শ্বাসমাত্রিক-ছন্দের নূতন নামকরণের পিছনে কোনো যুক্তি নেই, এ পুরাতন চারমাত্রার শ্বাসাঘাত-ছন্দই, তবে চরণবিন্যাসে পূর্বকথিত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী।

কবির আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁর গদ্যচ্ছন্দে। ইংরেজি cadence-নিয়ন্ত্রিত **Verse Libre** এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লৌকিক বাঙ্‌লা গদ্যের সুরধর্মী ছন্দোগুণ আবিষ্কার ক'রে কবি কিভাবে তার প্রয়োগের দ্বারা কাব্যের পরিসর বাড়িয়ে দিলেন সে আলোচনা আমরা গ্রন্থশেষের গোধূলি-পর্যায়ে করব। অতঃপর রূপালোচনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে আমরা পুনশ্চ কাব্যার্থ আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

'নৈবেদ্য' কাব্যটিকে আমরা ভাব-সন্ধিকালের রচনা ব'লে মনে করেছি। কালিদাসের প্রকৃতি-আত্মীয়তামূলক তপোবনের জীবনাদর্শ ও উপনিষদের কাব্যিক ধর্মদর্শের রাজ্যে বিচরণের ফলরূপে আমরা এই কাব্যটিকে পেয়েছি। নৈবেদ্য যেন এই সময়ের আদর্শলোকে বিচরণশীল কবি-মানসের ঘনীভূত প্রকাশ। তাই কাব্যটির প্রায় সর্বত্র আত্মহারা জাতিকে প্রাচীন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসও লক্ষিত হয়। কিন্তু এই কাব্যটি ঐ ধর্মাদর্শ বা তাত্ত্বিকতা থেকে অরূপ-অনুভূতিতে সংক্রমণের ইতিহাসও বহন করছে। নৈবেদ্যে যে ঈশ্বরভাবুকতা আছে, তা সর্বত্র 'খেয়া' কাব্যের দু'একটি রচনায় দৃষ্ট ও কবিধর্মের স্বকীয় প্রবণতা-জাত অরূপ-ব্যাকুলতা নয়, বহুল পরিমাণে আইডিয়া বা আদর্শের দ্বারা উদ্দীপিত। তথাপি এই কাব্যেই আমরা যেহেতু প্রথম বিশিষ্ট রবীন্দ্র-ঈশ্বরের ধারণা পেলাম, কবি ধীরে ধীরে ভিন্ন রাজ্যে পদক্ষেপ করছেন বুঝলাম এবং যেহেতু এর প্রবল অধ্যাত্মভাবের জাগরণ থেকে পরবর্তী অরূপানুভূতির অধ্যায়ের অনিবার্য সম্ভাবনা সূচিত হ'ল, সেইহেতু, কবির কাব্যজীবনের বিকাশের অভিমুখে এই কাব্যটির বিশেষ মূল্য আছে ব'লেই আমরা মনে করি। প্রকাশরীতির দিক থেকে নৈবেদ্যে প্রসাদ-মাধুর্য-ওজোগুণের সমাবেশে নব্য ক্লাসিক্যাল ধর্ম পূর্ণতা পেয়েছে এবং এ পর্যায়ে ঐ রীতির এখানেই শেষ। এর পর 'উৎসর্গ' ও 'খেয়া'তে কবি ভিন্নপথবর্তী হয়েছেন।

তৃতীয় পর্যায়

অরূপানুভূতির প্রারম্ভ

'নৈবেদ্য' থেকে 'শারদোৎসব'

পূর্বেকার অধ্যায়গুলিতে বর্ণিত কবির রোম্যান্টিক ভাবাবেশ, যা মূলত নিসর্গকে আশ্রয় ক'রে কখনো সৌন্দর্য-দর্শনে কখনো বা মর্ত্য-প্রীতির ব্যাকুলতায় উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল, তা সহজে এবং স্বাভাবিকভাবেই কবিপ্রতিভাকে রসনির্ভর অরূপ-দর্শনে নিয়োজিত করেছে। বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক অনুভূতি-সর্বস্ব কবির এই স্বল্প ভাবান্তরে উত্তরণ বিচিত্র কিছুই নয়। কারণ, ভাববাদী রোম্যান্টিক অনুভূতিপ্রবণ কবিরা যে কিছু পরিমাণে মিস্টিক প্রবণতার অধিকারী হতে পারেন তার প্রমাণ উনিশ শতকের দু'-একজন ইংরেজ কবির মধ্যেই অল্পস্বল্প দেখা গেছে। মিস্টিকদের একমুখী ভাবময় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লীলাসর্বস্ব অরূপের ধারণায় আসা, সম্মুখে আর একপদ মাত্র অগ্রসর হওয়ার অপেক্ষা করে। ইংরেজি সাহিত্যে নব্য রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে, বিশেষত কেল্টিক রহস্যময়তা নিয়ে আবির্ভূত স্বপ্নদ্রষ্টা ইয়েট্স্-এর মধ্যেও উক্ত পরিণাম কতকটা লক্ষ্যগোচর হতে পারে। অন্য কোনো দৃষ্টান্ত থেকে না হোক, রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় রূপময় কাব্য-লোক থেকে রসময় অরূপলোকে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা থেকে, এ অনুমান অসংগত নয় যে ভাবসর্বস্ব মহৎ কাব্যোপলব্ধি ও ধর্মোপলব্ধির মধ্যে দৃঢ় হলেও ক্ষীণ ব্যবধান মাত্র থাকে। আর তুলনার দ্বারা একথা বলা যেতে পারে যে, ওআর্ড্স্ওআর্থ বা শেলি যদ্যপি অধ্যাত্ম-অনুভূতির দ্বারদেশ থেকে ফিরে এসেছেন এবং ইয়েট্স্ প্রবেশ করেছেন মাত্র, প্রাচ্য কবি অতি সহজেই সে রাজ্যে কোথাও কোথাও বিচরণ করতে পেরেছেন। অবশ্য স্বকীয়ভাবে, পুরাতন ধারায় নয়। এইজন্য বিশ্বের যাবতীয় রোম্যান্টিক ভাবপ্রবাহ রবীন্দ্র-সমুদ্রে সার্থক সমাপ্তি লাভ করেছে ব'লেও আমরা মনে করি।*

রবীন্দ্র-কাব্যের এই ক্রমপরিণামের সূক্ষ্মসূত্রটি আমাদের দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন থাকার ফলে কবির অরূপের স্বরূপ, অরূপ-প্রেরণার আরম্ভ, কাব্য-

* আমরা সর্বত্র সাধক-মিস্টিকের সঙ্গে কবি-মিস্টিকের পার্থক্য রক্ষা করতে আগ্রহী।

যৌবনের সৌন্দর্যসত্তা ও জীবন-দেবতার সঙ্গে অরূপের সম্বন্ধ, সমাজ-বিপ্লবে অরূপের ভূমিকা প্রভৃতির ক্ষেত্রে অপরিস্ফুট ও অপরিণত ধারণার অবকাশ ঘটেছে। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে অরূপের আবির্ভাব যেন দ্রুত ঘটেছে বলেই মনে হয় এবং তার কারণের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন হবে না। প্রথমতঃ, জীবনদেবতার উপলব্ধির মধ্যে বিকাশপরায়ণ কবি-আত্মার সাক্ষাৎকারলাভ এবং সেই সূত্রে ক্রমপরিণামের পথে ধাবমান ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ 'পারসোন্যালিটি'র সঙ্গে বিশ্বের যোগ-আবিষ্কারের পরমতম বিস্ময়, এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন প্রাচ্যসাহিত্য—মূলত কালিদাসের সঙ্গে কবির গভীর পরিচয়ের ফলে সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শ, তপোবনাদর্শ ও ক্রমশঃ প্রাচীন ভারতীয় ভাবময় ধর্মাদর্শের প্রতি কবির স্থির অনুরাগ-প্রতিষ্ঠা—এই দু'টি ঘটনা কবির কাব্যজীবনকে দ্রুত পরিবর্তনের পথে নিয়ে গেছে এবং স্বকীয়-ধর্মাভিমুখী করেছে, নৈবেদ্যে যার প্রথম প্রকাশ। মহর্ষিকে উৎসর্গিত 'নৈবেদ্য' কবির পিতৃ-ঋণ-স্মারকও বটে।

অল্পসংখ্যক কয়েকটি গান এবং বহু সংখ্যক চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির কবিতায় 'নৈবেদ্য' পূর্ণ। নামেই প্রকাশ একটি নৈতিক-আধ্যাত্মিক ভাব এর সমস্ত রচনাকে ঘিরে আছে। নৈবেদ্যে বিশুদ্ধ কাব্য যে মুখ্যভাবে নেই, তার কারণ, যে-আদর্শ এতাবৎ কবির অন্তরে সঞ্চিত হচ্ছিল তাকেই কবি এখানে রূপ দিয়েছেন। তপোবনাদর্শ ও উপনিষদের ভাব-প্রেরণা কবিকে এই যুগে কী পরিমাণ মুগ্ধ করেছিল তার একটি পরিপূর্ণ পরিচয় নৈবেদ্যই বহন করছে। চৈতালিতে যে ভাবধারার আরম্ভ, নৈবেদ্যে তার পূর্ণতা। একে প্রাচীনাশ্রয়ী জাতীয়তাও বলা যায়। নৈবেদ্যের চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির কবিতাগুলি কবির এই আদর্শের রূপায়ণ হিসাবেই সাধারণ্যে সুপরিচিত এবং সংহত ও সংযত রীতি-গাম্ভীর্যে মূল্যবান্। ভাবে ও ভঙ্গিতে ক্লাসিক্যাল্‌ধর্মপ্রবণতাই এর বিশিষ্ট কাব্যস্বরূপ।

নৈবেদ্য ভগবদ্‌ভাবময় সত্য, কিন্তু—ভাবাদর্শের বন্ধনই এখানে মুখ্য লক্ষণীয় বিষয়, কবিমানসসৃষ্ট মুক্ত উপলব্ধি তেমন নয়, (অর্থাৎ এখানে কাব্য-উপলব্ধির সূত্রে নৈসর্গিক লীলার মধ্যে প্রকাশমান অসীম কবিচিত্তকে ততদূর ব্যাকুল করছে না—যেমন করেছে উৎসর্গে অথবা গীতাঞ্জলিতে)—এমন তর্ক উত্থাপন করলে তার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়। এমনকি প্রারম্ভের গানগুলিতেও উপলব্ধির বিস্ময় অপেক্ষা উপলব্ধ বস্তুর স্বরূপ এবং অনুরাগীর অন্তরের প্রার্থনার ভাবই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে এমন মন্তব্য করাও অযৌক্তিক হবে না। কারণ, উপলব্ধির বিস্ময়ের মধ্যে কবির স্বকীয় অরূপ কিভাবে আসছে তার পরিচয় আমরা অব্যবহিত পরেই উৎসর্গ ও খেয়ার মধ্যে পাচ্ছি। ইন্দ্রিয়ানুভূতি সহযোগে উদিত প্রজ্ঞান অপেক্ষা প্রত্যয়ই যেন মধ্যযুগের মিস্‌টিক্‌দের মত নৈবেদ্যে কবিকে অধিক অনুপ্রাণিত করেছে—

আঁধারে আবৃত ঘন সংশয় বিশ্ব করিছে গ্রাস,
তারি মাঝখানে সংশয়াতীত প্রত্যয় করে বাস।
বাক্যের ঝড়, তর্কের ধূলি, অন্ধ বুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে, নাই তার কোনো ত্রাস।

জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধির অতীত এই প্রত্যয়ই যে সর্ববিষয়ে ঈশ্বরানুরাগীর অবলম্বন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কবির এই প্রত্যয় তাঁর প্রথম ভগবদুপলব্ধির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ, সুতরাং, বহিরঙ্গ আদর্শপ্রেরণামূলক কিনা সে সংশয় স্বাভাবিক। উপনিষদের সঞ্জীবনরস যে কবির এই প্রাথমিক ভগবৎ-মুখীতার কারণ তাতে হয়ত সন্দেহ নেই। তথাপি, এই অভিপ্রায়ের মূলে কবি-প্রতিভার স্বকীয় কোনো নির্দেশ নেই, উপনিষদের বাহ্যপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে বাহ্যভাবে একজন অতি সাধারণ কবির মতই তিনি এই কবিতাগুলি রচনা করেছেন, এরকম ধারণা তাঁর একালের আদর্শপ্লাবনের মুখেও পোষণ করতে বাধে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কবিধর্মের প্রেরণাবশে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ অরূপমুখী হবেন, বর্তমানে উপনিষদ তাঁর ঐ অভিলাষকে ঐশ্বর্য দিয়ে প্রগল্‌ভ করেছে মাত্র, এমন অনুভবই যথার্থ অনুভব। এই কারণে, কবিতাকে বাদ না দিয়েও তার অন্তর্বর্তী কবিকে দেখতে পেয়েছি ব'লেই, নৈবেদ্যকে আমরা অরূপ-তন্ময়তার প্রবেশদ্বারের সমীপে বর্তমান ব'লে মনে করেছি। আর, প্রকৃত ধর্মাদর্শ নয়, জীবনমুখী ভাবাদর্শই যে নৈবেদ্যে প্রধান তাও অনুভব করেছি।

দেখা যায়, কয়েকটি কবিতাতেই চলমান জীবনের সঙ্গে অন্তরের যোগ যেন কবির কাব্যপ্রেরণার সূত্রেই ঘটেছে। নিম্নলিখিত অংশে কবির বিশিষ্ট পুরাতন প্রকৃতি-ভাবুকতার সঙ্গে বর্তমানে উদিত পরমাণু-বিজ্ঞানভিত্তিক অনন্তের ধারণা যেন অবাধে স্বতই যুক্ত হয়ে পড়েছে, পূর্বসংস্কার বা প্রত্যয়ের দ্বারা চালিত হয়ে নয়—

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে।
জনশূন্য ক্ষেত্রমাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদ্রিত নয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত
নিদ্রায় অলস ক্লান্ত। এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়,

মোর অঙ্গে রোমে রোমে লোক লোকান্তরে,
গ্রহে সূর্যতারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল,
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

অথবা—

…………সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে,—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্রদোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাটায়।

দেখা যাচ্ছে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'-যুগের বিশ্বাত্মবোধের মধ্যে কবির যে বিস্ময়-ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছিল তা-ই এখন অসীম সম্পর্কিত ধারণায় কবিকে চালিত করছে। নিম্নলিখিত অংশেও তাই, বসুন্ধরা তার রূপরসগন্ধ নিয়ে কবিকে কেবল মুগ্ধ করছে না, ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিমিত্তভূত সত্যের দিকেও এখন ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছে—

একি শ্যাম বসুন্ধরা,—সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্বতে কঠিন, তরু-পল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। একি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।
তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন,
অসীম বিচিত্র কান্ত।

এই প্রসঙ্গে পূর্বে-আলোচিত 'সোনার তরী' অধ্যায়ের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার প্রবল রোমান্টিক উপলব্ধির কথা স্মরণ করা যাক,—'মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে, যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে, আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অনুভব তারি' ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে যেন সেই রোম্যান্টিক অনুভূতির আশ্রয়েই কবি বর্তমানে তাকে অতিক্রম করতে চাইছেন ও বিশ্বব্যাপী কোনো এক শক্তির অস্তিত্ব আপনার অন্তরে অনুভব করছেন। সেই পূর্ব-কাব্যজীবনের আত্মবিস্মৃত সৌন্দর্য-উপলব্ধির বা বিশ্বাত্মবোধের মুহূর্তগুলি যে কবি-বর্ণিত অসীম বা অরূপের অপরিস্ফুট আভাস, তা কবি মাত্র এখন জানতে পারলেন। কবির পূর্বেকার কাব্যোপলব্ধি

যে অসীমোপলব্ধিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এখনকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও কিভাবে রূপান্তর ঘটছে তার পরিচয় কবি দেননি, দিতে পারেনও না। কারণ, উপলব্ধির প্রকারমাত্র কবির আয়ত্তগম্য, কার্যকারণপরম্পরা অনুসন্ধিৎসু দার্শনিকের বিচারযোগ্য। কবি বলছেন—

তখন করিনি নাথ, কোনো আয়োজন,
বিশ্বের সবার সাথে, হে বিশ্বরাজন্,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে,
কত শুভদিনে; কত মুহূর্তের 'পরে,
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ। লই তুলি
তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি—

* * *

খেলা-মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণ-ধ্বনি, আজ শুনি তাই বাজে
জগৎসংগীত সাথে চন্দ্রসূর্য-মাঝে।

শেষের কয়টি পঙ্‌ক্তিতে কবি স্পষ্টভাবেই নির্দেশ দিলেন যে পূর্বতন সুদূর-ব্যাকুলতা সৌন্দর্য-অনুভূতি প্রভৃতিকে কেবলমাত্র এখন থেকে বিশ্বসংগীতের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন। অর্থাৎ ঐসকল অনুভূতি শুধু নিজ মনোবিকার নয়, তার মূলে যে বিশ্বব্যাপী অরূপের লীলা রয়েছে, তা সবেমাত্র আজ কবি বুঝতে পারছেন। এর থেকে এই অনুমানও করা যায় যে নৈবেদ্যের পূর্বে রচিত কাব্যের মধ্যে কুত্রাপি এ ধরনের উপলব্ধি নেই। এই হ'ল কবির কল্পিত বিশ্বদেবতা সম্পর্কে প্রথম সচেতন অনুরাগ।

উপনিষদের ভাবাদর্শের সূত্রে কবির বিশিষ্ট অরূপ-উপলব্ধির প্রথম স্পর্শ এখন পাওয়া গেল, যদিও কিভাবে তিনি রোম্যান্টিক ভাব-বিহ্বলতা থেকে অনন্তের মধ্যে এলেন সেই সংক্রমণের প্রকার বা ঐ অনন্তের স্বরূপ বহুল পরিমাণে পাঠকের অগোচরে থেকে গেল। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, উপনিষদের আলোচনা, ব্রহ্মমন্ত্র রচনার কালেই নৈবেদ্য রচিত হয় ব'লে ঈশ্বরের কাব্যময় অনুভূতির দিককে আবৃত ক'রে ভাবাদর্শপ্রবণতাই এতে অধিকমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু এর পরবর্তীকালে রচিত 'উৎসর্গে'র কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবির পার্থিব ইন্দ্রিয়ানুভূতির অ-লোকিকে সহজ সংক্রমণের ইতিহাস মুদ্রিত রয়েছে। এগুলির মধ্যে কবিমানসের যে বিহ্বল রসচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, তা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যস্থতায় আগত হলেও প্রয়োজনের জগতের সঙ্গে একান্তই সম্পর্কবিহীন, আনন্দময় শুদ্ধ স্বপ্নরস উপলব্ধি মাত্র। যেমন—

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে, নিভৃত স্বপনে।
ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশচকিত
কোথা গো স্বপনবিহারী।

এখানে কবি যাকে নানাভাবে সম্বোধন ক'রে আসবার জন্যে অনুনয় জানাচ্ছেন তিনি কে? উত্তরে শুধু এই বলা যায় যে তিনি আর কেউ নন, কবির তৎকালীন রসানুভূতি-মুহূর্তের ব্যক্তিরূপ কল্পনা মাত্র, romantic mysticism, স্বপ্নময়তা এবং চকিতের স্পর্শই এর স্বরূপ, রাজপথে প্রত্যক্ষতার মধ্যে এর আনাগোনা নেই। কবির মানসে ইতিপূর্বে বহুবার এবংবিধ রসচর্বণা ঘটলেও এই রসমুহূর্ত সম্পর্কে ভাববার অবস্থা, এর স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা এবং একে অসীমের অনুভূতি ব'লে সাব্যস্ত করার মানসিক যৌক্তিকতা যেন এযাবৎ উপস্থিত হয়নি। কোনো বিদেশিনীর পদশব্দ ইতিপূর্বে বারবার শ্রুতিগোচর হলেও তাকে সুদূরবর্তী অসীমের রহস্যের আলোকে নোতুন ক'রে দেখার মত মনোভাব তখন কবির ছিল না। উৎসর্গের নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবির রসোপলব্ধির বিস্ময়-ব্যাকুলতা এবং তাকেই একটি সত্তারূপে উপলব্ধি করার আগ্রহ আরো পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে বর্ণিত সুদূর যেন অনির্দেশ্যতা ত্যাগ ক'রে একটি অখণ্ড রসমূর্তি পরিগ্রহ করতে চাইছে। পূর্বেকার নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা ও মর্ত্য-ব্যাকুলতাই যেন এখন একটি পরিবর্তিত অথচ স্পষ্ট আকার লাভ করতে চলেছে—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী।

* * *

সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার,
সে কথা যে যাই পাসরি।

উৎসর্গের এই সুদূরের প্রতি ব্যাকুলতার নিশ্চিত মনোভাবকে কোনো কোনো পূর্বসূরী-নির্দেশিত জীবনদেবতার লীলানুভূতি ব'লে গ্রহণ করলে

ভুল হবে। কারণ, আমরা পূর্বেই দেখেছি যে জীবনদেবতা লীলাচারী অসীম বা অরূপ নন, তার সম্পর্কে কবির এহেন ব্যাকুলতাও নেই এবং চিত্রা-পর্যায়ের কবিসত্তার বিকাশ ও বিস্তারমূলক বিস্ময়বোধের পর জীবনদেবতাবোধের প্রয়োজনও লুপ্ত হয়ে গেছে। রূপমধ্যবর্তী হয়েও যে-অরূপ প্রায় স্থূলাতিশায়ী এই 'সুদূর' তার পূর্বাভাস মাত্র। এখানে কবি ধরা-না-দেওয়া অনন্ত মুহূর্তগুলিকেই ব্যক্তরূপে দেখেছেন এবং ঠিক এর পরবর্তী কালে কার্যকে কারণরূপে দেখার ভ্রান্তি থেকে যেন মুক্ত হয়ে অনায়াসেই এই মুহূর্তগুলিকে কার্য মনে করেছেন ও তার কারণরূপে বিদ্যমান অরূপ বা অসীমের কল্পনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। 'খেয়া'য় কবির নিবিড় নিসর্গতন্ময়তার মুহূর্তগুলিতে এই কার্য্যিক অসীমের মধ্যে স্বাভাবিক উত্তরণের অবস্থা ঘটেছে, ঠিক উৎসর্গে নয়। উৎসর্গে ঐ কার্য থেকে নিশ্চিতরূপ কারণে যাওয়ার সংক্রমণ-অবস্থা সূচিত হয়েছে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশ পরীক্ষা ক'রে দেখলে বোঝা যাবে কবি অরূপকে জানা-না-জানার অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। কবিমানস একে উপলব্ধি করেও ঠিক ধরতে পারছে না। কেবল 'অস্তি' এই ধারণাটুকুর মধ্যে স্থির হয়েছে—

> কতজনে এসে মোরে ডেকে কয়
> "কে গো সে"—শুধায় তব পরিচয়
> "কে গো সে"—
>
> * *
>
> তোমারে জানি না চিনি না একথা
> বল তো কেমনে বলি ?
> খনে খনে তুমি উঁকি মারি যাও
> খনে খনে যাও ছলি।
> জ্যোৎস্নানিশীথে, পূর্ণশশীতে
> দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
> আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
> লখিতে।
> বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
> অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,
> বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
> চকিতে।

এ হ'ল সেই পূর্বেকার নারীরূপাশ্রিত সৌন্দর্যের শুদ্ধ রসানুভবে বা অরূপে সংক্রমণের পরিচয়। সেই অভাবনীয়ের চকিত-স্পর্শ-বিহ্বল রসাপ্লুত কবিচিত্ত এখানে রসরূপ কার্যের পশ্চাতে অসীমরূপ কারণ অনুসন্ধান

করছেন ; আরো পরে, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে, প্রকৃতির লীলার মধ্যদিয়ে ও মানুষী স্নেহ প্রেম প্রভৃতির মধ্যদিয়ে প্রকাশমান অরূপকে কবি যেন নিশ্চিত-রূপে ধরেছেন। রসরূপ মানসিক অবস্থাটিকে অরূপস্পর্শ ব'লে তখন স্পষ্ট-ভাবে অভিহিত করেছেন। বিশ্বের তাবৎ অনুভূতির মধ্যে অরূপই আমাদের কাছে এসে ধরা দিচ্ছেন (তু-'তিনিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, আর কাহারও টানিবার ক্ষমতা নাই'), কবির নিসর্গদর্শনের এই মূল কথাটি তত্ত্ব-আকারে নৈবেদ্যের 'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির মধ্যে বলা হলেও কবিস্বভাবের মধ্যে ঐ তত্ত্বের যথার্থ উপলব্ধির রূপ পরে দেখলাম। পার্থিব রসোপলব্ধিই যে ঈশ্বরোপলব্ধি এই তত্ত্বটি পরিণত জীবনে সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যেও কবি নানাভাবে বিবৃত করেছেন এবং 'রসো বৈ সঃ' 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' প্রভৃতি উপনিষদের উক্তি সমর্থন-সূত্রে উদাহৃত ক'রে কাব্যিক রসানুভূতিকে অনন্তের সঙ্গে বিজড়িত ক'রে দেখেছেন। বিশ্বের সৃষ্টির মধ্যে যেমন, আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে তেমনি একের প্রকাশলীলা চলেছে, কাব্য-আলোচনার ক্ষেত্রেও কবি এই হেগেলীয় ধারণার পরিচয় দিয়েছেন ('সাহিত্যের পথে' আলোচনা-গ্রন্থ দ্রঃ)। আমরা পূরবীর 'আহ্বান' কবিতাটির আলোচনাকালে কবির অন্তর্গত রসবোধের সঙ্গে বিজ্ঞান-নির্ভর ঐক্যানুভূতির এই দিকটি সম্পর্কে পরে আলোকপাত করেছি। 'এক' বলতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুভূতির বাইরের কোনো নির্বিশেষ সত্তাকে লক্ষ্য করেননি। এইখানে রবীন্দ্রনাথের হেগেলীয় মর্ত্য-নিষ্ঠা ও মনোনিষ্ঠা, অথবা, ভাব ও বস্তুর পারস্পরিক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক দর্শন। "সত্য" বলতে কবি মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির বাইরেকার দার্শনিক বা গাণিতিক বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। মানবীয় রসবোধের মধ্যেই যে অসীমের বা অরূপের স্বাদ গ্রহণ করা যায় এই ধারণাটি রবীন্দ্রকাব্যে স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে দেখা দিয়েছে।

উৎসর্গের 'হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে' ইত্যাদি কবিতাটিতে যদিচ আধ্যাত্মিক কোনো আইডিয়ার প্রভাব অনুভব করা যায়, নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে তিনি কবির স্বানুভূতিতেই প্রতিষ্ঠিত এমন মনে করা স্বাভাবিক, যেমন—

> আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
> তোমারেই ভালোবেসেছি।
> জনতা বাহিয়া চিরদিন ধ'রে
> শুধু তুমি আমি এসেছি। —ইত্যাদি

অথবা,

> চিরকাল এ কী লীলা গো অনন্ত কলরোল।
> অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে অদ্ভুত এই দোল।

'প্রবাসী' এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এখানে কবি বিশ্বের অণু-পরমাণুর সঙ্গে কল্পনায় আপনার যোগ উপলব্ধি ক'রে পরমুহূর্তে এই অকারণ যোগের হেতুভূত কল্পিত-অসীমের কথাই দৃঢ়ভাবে জানালেন—

মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
* *
যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে
জনমে জনমে মরণে।

এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে নৈবেদ্যের সদৃশ মনোভাব ব্যক্ত হলেও, রূপান্তরে ঐ সকল কথা আমরা পরবর্তী গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যেও বারংবার পেয়েছি। এইসব কারণেও নৈবেদ্যকে আমরা অরূপানুভূতির প্রবল সহায়ক ব'লে মনে করেছি। উৎসর্গের ৪২ সংখ্যক কবিতাটিতে বিশ্বলীলার দ্বৈতরূপের মধ্যে (সুন্দর ও ভয়ংকর) অরূপের আবির্ভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বৈত-রূপের মধ্যে, বিশেষতঃ দুর্যোগময় দুঃখরূপের মধ্যে অরূপ সম্পর্কিত ব্যাকুলতা কবির বিশিষ্ট উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব যে খানিকটা জীবন-দার্শনিকতায় লীন হয়ে গেছে তার মূলে অরূপ-উপলব্ধির এই বৈশিষ্ট্যটিই কাজ করেছে। উৎসর্গের এই কবিতাটির মধ্যে প্রথম আমরা কবির ঐ অনুভূতির পরিচয় পেলাম। কবিতাটি একটু পরেই আলোচিত হচ্ছে।

উৎসর্গের সব কবিতাই যে অসীমের দ্বারপ্রান্তের বর্ণনা এমন নয়। সাধারণ মানুষের হতাশা ও বেদনা, নারীর মাধুর্য, প্রকৃতি-প্রীতি সম্পর্কে লেখা কবিতাও এতে আছে। নৈবেদ্যের মত উৎসর্গও অরূপ-সাধনায় প্রবেশের প্রস্তুতির বার্তা বহন করে, শুধু উৎসর্গ এক পা অগ্রসর এইজন্য যে, নৈবেদ্যে অধ্যাত্মবোধ প্রাচীনধর্মী ভাবাদর্শের দ্বারা গ্রস্ত, উৎসর্গে তা স্বকীয় অনুভূতির প্রত্যক্ষে জীবন্ত। কিন্তু উৎসর্গের—

'আলো নাই, দিন শেষ হোলো ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ'

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির কবিতার পার্থিব ভাব-বিলাসকে অধ্যাত্মে আরোপিত ক'রে বিশুদ্ধ কাব্যের রূপক ব্যাখ্যায় যেন প্রবৃত্ত না হই।

কবির অরূপ-উপলব্ধি তাঁর প্রকৃতি-ভাবুকতা বা নিসর্গ-সৌন্দর্য-বিহ্বলতা

থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ কবির অধ্যাত্ম একান্তভাবেই কাব্যিক। নিসর্গ-উদ্বোধিত রসোপলব্ধির এই নিবিড় মুহূর্তগুলি কীভাবে কবিকে তাঁর স্বকীয় রোম্যান্টিক অসীমের উপলব্ধিতে নিয়ে গেছে তার আশ্চর্য পরিচয় 'খেয়া' এবং 'শারদোৎসবে' বর্তমান। ধরা যাক খেয়ার দ্বিতীয় কবিতা 'ঘাটের পথে'—যেখানে বেণু-শাখার উপর বারিপতনের ঝরঝর শব্দ, একূলে ওকূলে কালো ছায়া, আঁধার সন্ধ্যায় জোনাকির চমকের সঙ্গে ঝিল্লির ঝংকার—এসব কাব্যিক বর্ণনার পরে নারী বা কবি ঐ পথের জন্যে ব্যাকুলতার কথা জানাচ্ছেন—

ওগো দিনে কতবার ক'রে
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।

এবং কল্পনা করছেন—

আমি বাহির হইব ব'লে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।

ঠিক এই প্রকারের উৎপ্রেক্ষা যদিচ পূর্বেকার কোনো কোনো কবিতায় লক্ষ্য করা যায়, উভয়ের ব্যঞ্জনার মধ্যে যে স্বল্প তফাত রয়েছে তা একটু সহৃদয়তা সহকারে বিচার করলেই ধরা পড়ে। যেমন, ক্ষণিকার বিখ্যাত 'নববর্ষা' কবিতায়—

ওগো নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে বসে অমল বসনে
শ্যামল বসনে।

প্রভৃতিতে প্রকৃতিভাবুক কবির মেঘমল্লারের আলংকারিক একটি চিত্রকল্পনা মাত্র প্রকাশ পেয়েছে। বর্ষার রাগচিত্র। যেমন, একজন আধুনিক কবিও* অতিশয়োক্তি সহকারে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনায় বলছেন—

মাধবীলতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠি ভরি ধরে চন্দ্রালোক!

অথচ 'ঘাটের পথে' কবিতায় কেবল প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির মধ্যে আভাসে প্রকাশিত কোনো সত্তার প্রতি ইঙ্গিতের ভাবই স্পষ্ট। এমনকি উৎসর্গের পূর্বে-উল্লিখিত 'আমি চঞ্চল হে' কবিতার নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতেও কবির বিশিষ্ট অসীমের প্রতি নির্দেশই দেওয়া হয়েছে—

রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়,
তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়,

* করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি।

এই অনুভূতি সম্পর্কে দর্শনশাস্ত্রের অপ্রামাণ্যতায় প্রশ্ন তু'লে কবি একটু আগেই বুঝিয়েছেন যে এই রহস্যময় 'কী' বা 'কে' শাস্ত্র ও তত্ত্বের বাঁধাধরা মতামতের মধ্যে ধরা না পড়লেও তাঁর কাছে সত্য, যেহেতু এ তাঁর উপলব্ধি বিশেষ একটি সত্তা অর্থাৎ কাব্যিক অরূপ ডাকঘর নাটকের মূল ভাব স্মরণীয়—

না জানি কারে দেখিয়াছি, দেখেছি কার মুখ,
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।
পণ্ডিত সে কোথা আছে, শুনেছি নাকি তিনি
পড়িয়া দেন লিখন নানামতো।
যাব না আমি তাঁর কাছে, তাঁহারে নাহি চিনি,
থাকুন লয়ে পুরানো পুঁথি যতো!

(উৎসর্গ)

রসাবেশের এই ক্ষুদ্র নিমেষগুলির মূল্য কী তা 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' এই দু'টি কবিতায় কবি ব্যঞ্জনার দ্বারা জানাতে চেয়েছেন। পার্থিবতা-সম্পর্ক-শূন্য অপ্রয়োজনীয়তা-পরিচ্ছিন্ন এই শুভক্ষণের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতি আবশ্যক এবং প্রয়োজনীয় সর্বস্বই ত্যাগ করতে হয়—

'মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বলো কী মতে।'

রাজপথে বিজয়ী রাজকুমারের প্রয়াণের প্রাচীন চিত্র কবির অভিপ্রায় প্রকাশে সহায়তা করেছে। 'কৃপণ' কবিতাতেও কবির এই উপলব্ধি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, সমস্ত পার্থিব প্রয়োজন-সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারলে তবেই রসরূপ অনন্তের সাক্ষাৎলাভ করা যায়। যে পরিমাণে স্বার্থমুক্তি সেই পরিমাণেই অমূল্য অনন্তের স্বাদ লভ্য। দেখা যাচ্ছে, এই মুহূর্তগুলিই অনন্তস্বরূপ ; কবিবুদ্ধি এর কারণ অনুসন্ধানে ধীরে ধীরে স্বতই অনন্তত্ব ও অসীমত্বগুণযুক্ত ঈশ্বরের তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছেচে। 'খেয়া' কাব্যের বৈশিষ্ট্য —নিসর্গময় অরূপ-সৌন্দর্যে কবির প্রবেশের পথ ও পদচিহ্ন এর মধ্যে স্পষ্ট-ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এবং এর মাহাত্ম্য হ'ল এই যে, কবি-সাধকের অরূপ-সিদ্ধির প্রকারও এখান থেকেই একরকম সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কারণ, অরূপলীলার স্বরূপটি এইখানেই প্রথম পরিস্ফুটভাবে কবিচিত্তের গোচরী-ভূত হয়েছে। আমরা এখান থেকেই একরকম ধারণা ক'রে নিতে পারি যে কবির বিশিষ্ট অরূপ বা অসীম প্রকৃতির লীলার মাধ্যমে রসরূপে কবির অন্তরে প্রবেশ করেছেন, পূর্বনির্দিষ্ট কোনো আইডিয়া বা তত্ত্বরূপে নয়। নৈবেদ্যের মধ্যে যদি বা ভারতীয় আদর্শের প্রভাব লক্ষণীয়, এখানে সহজ উপলব্ধির নির্মল আলোক উপভোগ্য।

এই কাব্যটির প্রবেশমুখে স্থাপিত বিষাদ-করুণ সুরের 'শেষ খেয়া' কবিতাটি কবির রহস্যালোকে প্রবেশের সংকেত দিচ্ছে। কবিতাটি একান্তভাবে বাউলধর্মী রচনা। বাউল-সংগীতের ভাষা ও ভঙ্গি এবং অন্তর্নিহিত জন্ম-মৃত্যু, যাওয়া-আসা প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতনতাই এই কবিতাটির শান্তবিষাদের কারণ। 'সোনার কূলে,' 'চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে', 'সাঁঝের বেলা ভাঁটার স্রোতে', 'আমার ঘাটে', 'ঘরেও নহে, পারেও নহে' প্রভৃতি নানান্ উক্তি প্রিয়-পরিজনের মৃত্যুস্মৃতির (এক্ষেত্রে কবিজায়ার মৃত্যু) সঙ্গে বাউলদের অনুরূপ কল্পনাভঙ্গিরও পরিচয় দেয়। সমস্ত কবিতাটিতে কবির পারগামী বৈরাগী মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। যেমন, অনেক বাউল-সংগীতের সোজা-সুজি ব্যাখ্যা হয় না, একমাত্র মরমীর কাছেই তার অর্থ উপলব্ধির বিষয় হয়, তেমনি, কবির সদৃশ কাব্যিক বৈরাগ্যের অবস্থায়, নির্বিঘ্নচিত্তে পার্থিবতা অপার্থিবতার মাঝখানে থাকার কালে এই কবিতাটির রস উপভোগ্য হতে পারে। 'ঘরেও নহে, পারেও নহে' প্রভৃতিকে সাধনপথে অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তির অবস্থা, বা 'কেমন ক'রে চিনব ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে' প্রভৃতিকে কবির হারিয়ে যাওয়া কোনো নিবিড় উপলব্ধির স্মৃতি ইত্যাদি-রূপে স্থূলভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বটে, কিন্তু এরকম ব্যাখ্যা বেশীদূর টেনে নিয়ে গেলে অর্থাৎ পুরাতন অধ্যায়ে পৌঁছালে 'সোনার তরী' কবিতার মতই রূপকের জালে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। ঘর-ছাড়া কাব্যিক মন নিয়ে প্রবেশ করলে কবিতাটির মর্ম কতকটা অনুধাবন করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না ব'লে আমরা মনে করি। বস্তুতঃ এই কবিতাটি রবীন্দ্রচিত্তে বাউল-সংগীতের অসামান্য প্রভাব নির্দেশ করে ও কবির বিশিষ্ট স্বপ্নলোকে প্রবেশের চিহ্ন বহন করে। এই কবিতার ও পরবর্তী কয়েকটি কবিতার সন্ধ্যার পটভূমি পূর্বেকার 'সোনার তরী' পর্যায়ের নিরুদ্দেশ-যাত্রামূলক কবিতা-নিচয়ের সান্ধ্য-পরিবেশের সঙ্গে তুলনীয়।

খেয়ার কবিতাগুলির প্রকৃতি-অনুরাগ ও সহজ প্রকাশ-ভঙ্গি 'ক্ষণিকা'র বহু কবিতার সঙ্গে তুলনার যোগ্য। আর তার সঙ্গে লক্ষণীয় 'ক্ষণিকা'র মত এখানেও লৌকিক বাঙ্‌লার মধ্যে চকিত অনুপ্রাস-মাধুর্যের বিস্তার, যার স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হ'ল—

> শিহরি শিহরি উঠে পল্লব নির্জন বনমাঝে।
> বাতাস থমকে, জোনাকি চমকে,
> ঝিল্লীর সাথে ঝমকে ঝমকে
> চরণে ভূষণ বাজে।

বিশেষ এই যে, খেয়ার বহু কবিতাই নারীমুখ-ভাষিত সহজতম অনুভবের প্রকাশক, আর এ সবের মধ্যে পার্থিব প্রীতিকে অতিক্রম ক'রে একান্ত নিভৃতে

অনির্বচনীয় রসকে রয়ে-বসে আস্বাদন করার আগ্রহই বেশি। খেয়ায় বেশ কয়েকটি বিশুদ্ধ প্রকৃতি-প্রীতিরসের কবিতাও রয়েছে এবং দু'-একটিতে পার্থিব প্রকৃতিপ্রীতি ও পার্থিবাতিশায়ী প্রায় অতীন্দ্রিয় রসানুভূতি এই দুয়ের মধ্যে কবিচিত্তের একটা দ্বন্দ্বও ফুটে উঠেছে। যেমন 'নীড় ও আকাশ' কবিতায় ওআর্ডস্‌ওআর্থ-এর skylark-এর মত শূন্যে বিহার ও মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনের অবিরাম যাতায়াত কবি বর্ণনা করেছেন। কবির এই দ্বিধা পরবর্তী কাব্য-জীবনেও প্রকাশ পেয়েছে এবং তা লক্ষ্য ক'রে কবি বলেছেন ('পথে ও পথের প্রান্তে' দ্রঃ)—"মনটা দুই বাসার পাখি, একটা কাছের বাসা, আর একটা দূরের।" অবশ্য এই কবিতাটির মধ্যে এ-কথাও রয়েছে যে ইতি-পূর্বে কবি ঠিক এরকম শূন্যে বিহার করেননি—

নীড়ে বসে গেয়েছিলেম আলোছায়ার বিচিত্র গান।
সেই গানেতে মিশেছিল বনভূমির চঞ্চল প্রাণ। * * *
আজ কি আমায় গাইতে হবে নীল আকাশের নির্জন গান,
নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরান ?
আপন মনের পাইনে দিশা, ভুলি শঙ্কা, হারাই তৃষা,
যখন করি বাঁধন-হারা এই আনন্দ-অমৃত পান।
তবু নীড়েই ফিরে আসি, এমনি কাঁদি এমনি হাসি —ইত্যাদি

বোঝা গেল কবির মানব-অনুরাগের সঙ্গে এই আকাশবিহারী শূন্যতায় অরূপ-অনুসন্ধানে যাত্রা অসংগতিপূর্ণ নয়; বিখ্যাত 'প্রবাসী' কবিতাটিতে কবি এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের অপূর্ব সমাধান ও সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন। আবার দেখা যায় 'সমুদ্র' কবিতায়, জানা পৃথিবীকে নয়, অন্তবিহীন অজানাকেই অভিনন্দিত করার আগ্রহ প্রবল। সে অবস্থা যেন পার্থিব উপভোগরত দ্বৈতা-বস্থা নয়, অসীমের সঙ্গে তখন কবি যেন একীভূত, যেমন—

যাক না মুছে তটের রেখা, নাইবা কিছু গেল দেখা,
অতল বারি দিক না সাড়া বাঁধন-হারা হাওয়ার ডাকে।
দোসর-ছাড়া একের দেশে একেবারে এক নিমেষে
লও রে বুকে দু-হাত মেলি অন্তবিহীন অজানাকে।

দু'-একটি কবিতায় আবার প্রকৃতি ও অসীমের সম্পর্ক-বিরহিত শুষ্ক ও ব্যর্থ কর্মপ্রচেষ্টার জীবন অপ্রার্থিত হয়েছে। যেমন 'দিনশেষ' ('হায়রে বিজন দীর্ঘ রাত্রি, হায়রে ক্লান্ত কায়া') অথবা 'সব পেয়েছির দেশ' কবিতা। 'বন্দী' কবিতায় তেমনি লোভ, অহংকার ও প্রতাপের সঙ্গে গড়া শাস্ত্র-প্রথার শৃঙ্খলে আমাদের বন্দীত্ব পরিস্ফুট করা হয়েছে—

ভেবেছিলেম আমার প্রতাপ করবে জগৎ গ্রাস
আমি রব একলা স্বাধীন, সবাই হবে দাস।

তাই গড়েছি রজনীদিন লোহার শিকলখানা—
কত আগুন কত আঘাত নাইকো তার ঠিকানা।
গড়া যখন শেষ হয়েছে কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে আমারি এই ডোর।

বহু পরের 'রক্তকরবী' নাটকে প্রকৃতি-রসসম্পর্কহীন মানুষ-আত্মার এই বন্দীত্ব ও বন্ধনমোচন দেখানো হয়েছে। 'খেয়া'র রচনায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়কার রাষ্ট্রনীতিক বহির্জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ফলে কবির বাস্তবতা থেকে এই উত্তরণ কিছুটা সম্ভব হতে পারে। প্রকৃতিরসে নিবিড় এই মুহূর্তগুলির আনন্দ যে অনাবশ্যক, অহৈতুক অথচ অতি সহজ, তা কবি জানালেন 'অনাবশ্যক' (কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে), 'তোরা কেউ পারবি নে গো পারবি নে ফুল ফোটাতে' ইত্যাদির মধ্যে।

পূর্বে উৎসর্গের একটি কবিতায় প্রকৃতির দ্বৈতরূপ বর্ণনা এবং এর মাধ্যমে অনুভূত অরূপের কথা উল্লেখ করেছি। এতে প্রকৃতিগত আনন্দময়তা সম্পর্কে কবি বলেছেন—

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো,
সে কি তুমি মোর সভাতে?
হাতে ছিল তব বাঁশি,
অধরে অবাক হাসি,
সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
মদ-বিহ্বল শোভাতে।

প্রকৃতির সুন্দররূপের মধ্যে অরূপের এই প্রকাশ কিন্তু সাময়িক। ঋতু-পরিবর্তনে পুনশ্চ যে-নবীনের আবির্ভাব হয় তার মূর্তি দুঃখময়, ভয়ংকর-সুন্দর। এই জন্য—

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব
আজি ঝর ঝর বাদরে।
পথে লোক নাহি আর,
রুদ্ধ করেছি দ্বার,
* *
তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপসমূরতি ধরিয়া।
* *
ললাটে তিলকরেখা
যেন সে বহ্নিলেখা,

হস্তে তোমার লৌহদণ্ড বাজিছে লৌহবলয়ে।
শূন্যে ফিরিয়া যেয়োনা অতিথি সব ধন মোর না লয়ে—

প্রভৃতির মধ্যে অরূপের এই কঠোর প্রকাশের নিকটে সর্বস্ব সমর্পণ কবি-মানসের প্রকৃতিগত রস-উপলব্ধির পরিণামের একটি অবস্থা সূচিত করে। ‘ক্ষণিকা’র আবির্ভাব নামক বিখ্যাত ভঙ্গিকুশলতাময় কবিতাটিতে ‘বহুদিন হোল কোন্ ফাল্গুনে ছিনু আমি তব ভরসায়, এলে তুমি ঘন বরষায়’ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির দুই রূপে কবির মুগ্ধত্ব বর্ণিত হ’লেও সেখানে অরূপের ইঙ্গিত নেই। শিল্পকলা-প্রধান নিসর্গরসবিহ্বলতাই সেখানকার সর্বস্ব। অথচ এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হ’ল এই এর বিশেষত্ব। এই দুই কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থেকেও এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, প্রকৃতি-বিহ্বলতা থেকেই কবির অসীমবিহ্বলতার উদয়।

শব্দস্পর্শাদি পঞ্চসূক্ষ্মের মধ্যস্থতায় কবি এই যে অবর্ণনীয় রসস্বরূপ অসীমকে পেলেন তা যদি কেবল স্থূল সুখানুভূতিরই বশবর্তী হ’ত তাহ’লে অসীমের কল্পনা হ’ত খণ্ডিত। কিন্তু দুঃখানুভূতির মধ্যেও তিনি লভ্য, বরঞ্চ দুঃখের গভীরতায় অরূপের সম্যক্ দর্শন যেমন সম্ভব তেমন সুখে নয়, এই তত্ত্বটিও খেয়ার অরূপ-সাক্ষাৎকারের একটি বৈশিষ্ট্য। বিশ্বসৃষ্টিলীলার দুটো দিক্, একটাতে আনন্দময়তা, আর একটাতে দুঃখবেদনা, ভয়ংকরের অনুভূতি,—এই দুই রূপের মধ্যেই কবি লীলাময়ের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। দুই বিরোধের মধ্যে একের লীলাদর্শনই তাঁর অরূপদর্শনের সার কথা, এবং ‘খেয়া’ থেকে আরম্ভ ক’রে বলাকা-পূরবী-কালের জীবন-অরূপের সমন্বয় পর্যন্ত কবির এই উপলব্ধিটিই কেমন মূলসূত্ররূপে কাজ করেছে তা আমরা পরে বিশেষভাবে দেখব।

আগমন, দুঃখমূর্তি, দান, হার প্রভৃতি খেয়ার কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতায় লীলাময় অরূপ রুদ্র-ভয়ংকরের বা দুঃখের রূপে প্রতীয়মান। ‘আগমন’-এ নিশীথরাত্রে মেঘগর্জন ও বিদ্যুতের ঝিলিকের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যার পদক্ষেপ কবির শ্রুতিগোচর হ’ল তাকে বরণ ক’রে নেওয়ার বা সর্বনাশকেই আনন্দের সঙ্গে আলিঙ্গন করার দুর্বার উৎসাহ নিশ্চয় সাধারণ নয়। ‘আগমন’ কবিতাটি পূর্বকথিত ‘বর্ষশেষ’ এবং ‘পাগল’ প্রবন্ধের সমসূত্রে পাঠ্য। অমানবিক রক্ষণশীলতা পোষণ ক’রে আরামে যারা জীবন কাটায় তারা স্বভাবতই সংঘাত ও দুর্যোগের পথিকের অপ্রত্যাশিত আগমন বিষয়ে সংশয়ী হয়, কিন্তু পরিশেষে প্রবল দুঃখের মধ্যে রুদ্র-বিধাতার কাছে তাদের আত্ম-সমর্পণ করতেই হয়, এই হ’ল কবিতাটির মর্মার্থ। খেয়া-কাব্যের সমকালে লেখা ‘পাগল’ প্রবন্ধেও অ-প্রত্যাশিত ভয়ংকরকে বরণ করার আগ্রহ লক্ষণীয়।

গুরুতর দুঃখকে আনন্দরূপে বরণ করার বৈপ্লবিক মনোভাব 'দান' কবিতায় এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—

এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন, বজ্র হেন ভারি।

*　　*　　*

ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে কী পেলি তুই নারী।
নয় এ মালা, নয় এ থালা, গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি।

তথাপি এর কাছে কবিকে আত্মদান করতেই হবে—

সর্বনাশা তোমার যে ডাক,
যায় যদি যায় সকলি যাক,
শেষ কড়িটি চুকিয়ে দিয়ে খেলা মোদের করব সারা। (হার)

প্রয়োজনের জগতে এ হ'ল হেরে যাওয়ার, ভোগসুখে বঞ্চিত হওয়ার, দারিদ্র্য আদি সর্ববিধ দুর্গতির মধ্যে পতিত হওয়ার কথা। কিন্তু কবি কিসের জোরে একে অতিক্রম ক'রে হেরে গিয়ে জিতবেন তা ভাববার বিষয়। তাই 'হার' কবিতার শেষে অতিরিক্ত পার্থিব-ভোগী দাম্ভিক স্বার্থমূঢ় ব্যক্তিদের যেমন একদিকে নিরস্ত করেছেন, তেমনি হেরে জেতার কথা বা অহং-লোপের আনন্দময়তার জয়ের কথা কবি যুক্তির আকারে উপস্থাপিত করেছেন—

এই হারা তো শেষ হারা নয়, আবার খেলা আছে পরে।
জিতল যে সে জিতল কিনা কে বলবে তা সত্য ক'রে।
হেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন,
শেষ দানেতে তোমার কাছে বিকিয়ে দেব আপনারে।

এখানে প্রশ্ন উঠবে কবি কি তাহ'লে নিবৃত্তিমার্গের সাধনাই গ্রহণ করবেন? এর উত্তরে সংক্ষেপে এই কথাই বলা যাবে যে কখনোই নয়, বাস্তব জীবনকে গ্রহণ ক'রে, অথচ প্রবৃত্তি, লোভ এবং স্বার্থকে পরিস্ফীত হতে না দিয়ে প্রয়োজনমুক্ত জীবনে যে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যায় তা-ই কবির কাম্য হবে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কবির অরূপ-উপলব্ধির সঙ্গে জীবন-দর্শন মিশ্রিত রয়েছে। উক্ত দুই লীলাকে অভিন্নভাবে গ্রহণ ক'রে এর সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিত করাই যে কবির অভিলাষ, তাঁর কাব্যোপলব্ধির নূতন কথা, তা অসংখ্য গানে, কবিতায়, ঋতুনাট্যে, অরূপ-নাট্যে, ঠাকুরদা বা তৎসদৃশ চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির দ্বৈতলীলার অনুভবের মধ্যে দুঃখানুভূতির দিকটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং কী ক'রে এই দুঃখানুভূতির উত্তরণস্বভাব তাঁকে অরূপদর্শনে নিয়োজিত

করলে তাও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-কাব্যের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঠিক পরিচয়লাভের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিছক প্রকৃতি-প্রীতি থেকে মানবপ্রীতি বা সুখদুঃখময় বাস্তব-জীবন-প্রীতিতে পরিবর্তন ('এবার ফিরাও মোরে') এবং তা থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে ধীরে ঘনীভূত দুঃখবোধের মধ্যে অরূপোপলব্ধি কী প্রকারে ঘটল এবং সেই অরূপের স্বরূপই বা কী তা ঐ প্রবন্ধে কতকটা বিস্তৃতভাবেই কবি আলোচনা করেছেন। খেয়ার 'আগমন' ও 'দান' কবিতা সম্পর্কে কবি বলেছেন—

"খেয়াতে আগমন ব'লে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ ক'রে শান্তিতে ঘুমিয়েছিল, কেউ মনে করেনি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

ওরে দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে—
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখরাতের রাজা।

ঐ খেয়াতে 'দান' ব'লে একটি কবিতা আছে।......এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে। শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।"

অরূপ-উপলব্ধির এই বৈশিষ্ট্য বিকাশশীল কবি-প্রতিভার স্বকীয় হ'লেও তখনকার ব্যক্তিগত দুঃখবোধ দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে থাকবে। নিসর্গে দুই পরস্পর বিপরীত রূপের অবস্থান ইতিপূর্বে নিসর্গ-ভাবুক এবং সাধক কবি বিহারীলালের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল, কিন্তু তিনি এর সমাধানে মনোযোগী হননি বা অসমর্থ ছিলেন (সাধের আসন দ্রঃ)। তাঁরও পূর্বে বাঙলা-সাহিত্যে শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতাদের, বিশেষতঃ রামপ্রসাদের প্রজ্ঞাদৃষ্টি স্বতই এর স্বরূপ ব্যাখ্যায় এবং দুঃখের পরিত্রাণের উপায় নির্দেশে নিয়োজিত হয়েছিল, কিন্তু তার প্রকৃতি অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র ব'লে এখানে আলোচনার অবকাশ রইল না।

দুঃখকে আলিঙ্গন করার এবং সেইভাবে বরণের দ্বারা তাকে অতিক্রম করার আগ্রহ রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও নাট্যে যেরূপ চিত্রিত করেছেন, পূর্বেকার

ভারতীয় সাহিত্যে বা দর্শনে ঠিক তেমনভাবে দেখা যায় না। জ্ঞানমার্গে দুঃখ এবং আনন্দ উভয়প্রকার পার্থিব চেতনাকে প্রাতিভাসিক সত্য বা মিথ্যা ব'লে অস্বীকার করা হয়েছে। ভক্তিমার্গে প্রেমময় ও আনন্দময় ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা শুদ্ধ-আনন্দলাভের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধদর্শনে বাস্তব দুঃখের কারণ তৃষ্ণা ও বাসনা সমূলে উৎপাটিত ক'রে সুখদুঃখহীন অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে বলা হয়েছে। যদি বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ আনন্দরূপ ব্রহ্ম এবং বৃহৎ দুঃখ স্বরূপতঃ অভিন্ন ব'লে মনে করেন এবং তদর্থে উপনিষদের বহু মন্ত্র উদ্ধার করেছেন, তাহ'লে তিনি নোতুন কিছু উপলব্ধি করলেন একথা বলা যায় কী ক'রে ? তার উত্তরে এই বলা যায় যে— 'ব্রহ্মই সত্য' যদিচ এর অতিরিক্ত উপলব্ধির আর কিছুই নেই, তথাপি যেহেতু ব্রহ্মস্বরূপ অনির্ণেয়, সেইহেতু, তাঁকে নানাভাবে জানার আগ্রহেই নানা মতবাদ দেখা দিয়েছে দর্শনে ও সাহিত্যে। সুতরাং নবভাবে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধির অবকাশ অবশ্যই আছে। তাছাড়া উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন মনীষীর দ্বারা বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়ছে এবং রবীন্দ্রনাথও স্বীয় কাব্যিক. ধারণার অনুকূল অর্থেই উপনিষদকে গ্রহণ করেছেন (এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। সুতরাং উপনিষদের ও পরবর্তী পরিস্ফুট কোনো দার্শনিক ধারণার মধ্যে দাতা-গ্রহীতারূপ সম্পর্ক স্থাপন যুক্তিযুক্ত নয়। উপনিষদের আলোকে রবীন্দ্রনাথের ধারণার বিচার করতে গেলে অপ্রামাণ্যতারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। রবীন্দ্র-মানসে যে-যে নূতনতর অর্থে উপনিষদের বচনগুলি গৃহীত হয়েছে সেই সেই অর্থে আবার উপনিষদের প্রভাব বিচার করার পাকচক্র থেকে এতাবৎ আমরা অব্যাহতি পাইনি। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-মানসের স্বকীয়তাকে উদ্ধার ক'রে দেখতে হবে। ইন্দ্রিয়গত আনন্দ ও দুঃখের হেতুরূপে প্রতীয়মান দ্বৈত সত্তার বিরোধ-লীলার মধ্য দিয়ে অরূপ প্রকাশিত হচ্ছেন কবির এমন ধারণা বরঞ্চ প্রকাশবাদী হেগেল-এর দর্শনমতে প্রামাণিক ব'লে গণ্য হতে পারে। আর যদি ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব্যাপক ধারণার উপর ভিত্তি ক'রেও কবি একথা বলেন যে—অরূপের লীলাময়ত্ব উপলব্ধির দ্বারাই তাঁকে জানা যায় এবং তখন সুখদুঃখ সমস্তই একাকার হয়ে বিশুদ্ধ আনন্দরূপ প্রতিভাত হয়, যেমন কবি বলেছেন নিচের পঙ্‌ক্তি-গুলিতে—

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।'

এবং এই প্রকারে সর্ববিধ দ্বৈতনির্মুক্ত হওয়ার আদর্শ প্রকটিত হয়, তাহলেও বোধ হয় বিরোধের সমাধান হয়। ঈশ্বরের বা কল্পিত কোনো মৌল সত্তার অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথে কোনো বিরোধ নেই, তাঁকে উপলব্ধি করার

প্রকার নিয়েই ভারতীয় দর্শনের মোটামুটি বিশিষ্টাদ্বৈতের অন্তর্ভুক্ত হয়েও তিনি নোতুন। তিনি মর্ত্যবাদী, তিনি কবি। কিন্তু তাঁর ধারণাকে নিছক কবির ধারণা ব'লে পিছনে ফেলে রাখলেও আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। কারণ, এই সূত্রেই তাঁর অতিপ্রবল জীবন-বাদ, বিজ্ঞান-আশ্রিত মহাকাশ-দর্শন ও সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন বিষয়ে কাব্যিক এবং কার্যকরী উদ্‌যোগ পরিস্ফুট হয়েছে।

সুখদুঃখানুভূতি সম্পর্কে কবি ধর্ম ও শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় পুনঃপুন তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। বাহুল্যভয়ে ঐ সম্পর্কে নানা অংশের উদ্ধার থেকে বিরত হলাম। রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদী গোষ্ঠীর মতই দুঃখকে আত্যন্তিক ব'লে স্বীকার করেননি, সুখকেও অর্থাৎ বিষয়ানন্দকেও নয়। কারণ, তাঁর মতে কেবল সুখরূপ জীবস্বভাব স্বার্থের আবিলতাসমাকীর্ণ, বিষয়তৃষ্ণাজাত, বদ্ধতার কারণ এবং অপরিশুদ্ধ ; দুঃখও জৈব সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতার ধর্ম। অদ্বৈতবাদীদের সঙ্গে কবির পার্থক্য এই যে, কবি ইন্দ্রিয়ানুভূতিগত বাস্তব দুঃখসুখকে পরিত্যাগ করতে চান না, কারণ তিনি মনে করেন এগুলিকে গ্রহণ না ক'রে আনন্দময়তায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, জীবনকে গ্রহণ না ক'রে ত্যাগ করা বা জীবনাতীত হওয়া অসম্ভব। যথাভূত সুখদুঃখ গ্রহণপূর্বক বাসনাতীত কাব্যিক মুক্তির আনন্দময়তা কবির কাম্য,— এই হ'ল রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের বিশেষ কথা। অনেক সময় গভীর দুঃখ আমাদের ঐ অতীত অবস্থায় নিয়ে যায়, এজন্য কাব্যেও সুখানুভূতি অপেক্ষা দুঃখানুভূতির উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন। গভীর বাস্তব দুঃখ কবির মনে উন্নীত (sublimated) হয়ে আনন্দে রূপান্তরিত হতে পারে, যেমন Tragedy-র বেদনা ও শঙ্কা বিশুদ্ধ আনন্দে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু গভীর বাস্তব দুঃখকে অতিক্রম করার মত ভাবময় মানসিক অবস্থারও অধিকারী হওয়া চাই, অর্থাৎ অরূপলীলার সঙ্গে নিজেকে একীভূত করা চাই। এই নিয়েই কবির ধনঞ্জয় বৈরাগী ও ঠাকুরদা চরিত্রের কল্পনা। এঁরা সেই অবস্থায় উঠেছেন যেখানে উপনীত হ'লে দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ হওয়া যায়, আর, বোঝা যায়—যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে। বাস্তব দুঃখের উপরে সাহিত্যের দৃষ্টি আরোপ ক'রে কবি 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত একটি চিঠিতে* বলেছেন—

> দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক। কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট ক'রে তোলে, আপনার

* অমিয়কুমার চক্রবর্তীকে লেখা

কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্রাজেডির
মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্।

বলা বাহুল্য, বাস্তব দুঃখ থেকে, প্রায়-নির্বিশেষ ভূমানন্দসহোদর অবস্থায় উৎক্রমণ রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। আর আমাদের সান্ত্বনা এই যে কবি 'দণ্ডীর দণ্ড' নিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে আমাদের চালিত করার দায়ীত্ব গ্রহণ করেননি!*

পরিশেষে 'খেয়া'র কয়েকটি কবিতায় রোম্যাণ্টিক নিরুদ্দেশ মনোভাবের সহচর পথের প্রতি কবির আকর্ষণের বিষয়টি তুলে ধরতে চাই। নারীমুখ-উচ্চারিত 'ঘাটের পথ' ("দিনে কতবার করে/ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি/ঐ পথ ডাকে মোরে") ঘাটে, পথিক, সমুদ্রে, চাঞ্চল্য এবং সরকারি রচনাবলীতে মুদ্রিত শেষ-কবিতা 'খেয়া' নানাভাবে চলা ও পথের আকর্ষণে ও স্পন্দনে শিহরিত। 'খেয়া' কবিতাটি ('তুমি এপার ওপার করো কে গো') রোম্যান্টিক কবিচিত্তের বাস্তব নিসর্গ ও তরী-যাত্রার প্রতি আকর্ষণের প্রকাশক, এর মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্বের সন্ধান অসংগত। এই রোম্যাণ্টিকতাই জীবনের স্পর্শে ভিন্নতর হয়ে গীতালিতে তরণী-যাত্রার ইমেজ্-এর পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করেছে।

ঋতুচক্রের আবর্তনের মধ্যে যে-অরূপের পদধ্বনি তাঁর শ্রুতির গোচরীভূত হয়েছে ব'লে কবি বারবার উল্লেখ করেছেন তার প্রথম বিস্তৃত পরিচয় 'শারদোৎসবে'র মধ্যে পাওয়া যায়। শারদোৎসবে কবির উপলব্ধি উপসংহারের বিখ্যাত গানটিতে প্রকাশিত—

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!

এই একান্ত রসাস্পদ, রূপের মধ্যে রূপাতীত, পার্থিব প্রকৃতির মধ্যবর্তী রহস্যময় অপার্থিবকে সন্ন্যাসী এবং তাঁর সহচরেরা কিরকম বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করলেন তা নিম্নলিখিত অংশ থেকে বোঝা যায়—

---

* কবির এই দুঃখসত্যবাদ এবং দুঃখকে সর্বনাশকে গ্রহণ করার উৎসাহ ও দুঃখের মূল্যে মানুষের মূল্য ঘোষণা নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্ত্য ভাবদর্শন এবং খ্রীস্টীয় মিস্টিকদের ধারণা থেকেও সংক্রমিত। এদিক দিয়ে কবি ব্রাউনিং-এর ভাবাদর্শও তুলনীয়। দুঃখের সঙ্গে মানবমহিমাকে যুক্ত ক'রে কয়েকটি তাত্ত্বিক কবিতার রচনা বলাকা পর্যায়ে দেখা যায়। পুনশ্চ প্রভৃতি কয়েকটি কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় এর অনুবর্তন রয়েছে। এ বিষয়ে লেখা "মানুষের ধর্ম" রবীন্দ্রনাথের নবতম জীবন-দর্শন প্রকাশ করছে। রবীন্দ্রনাথ কোনও বাউল-সম্প্রদায় থেকে এ বিষয়ে কিছু প্রেরণা পেয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু পশ্চিমের মিস্টিসিজম্ ও অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গেই এর মিল বেশি।

"সন্ন্যাসী। ঐ যে আকাশ ভরে গেল!

প্রথম বালক। কিসে?

সন্ন্যাসী। কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছো না?

দ্বিতীয় বালক। হাঁ, পাচ্চি।

সন্ন্যাসী। তবে আর কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে। এসেচেন, এসেচেন, আমাদের মাঝখানেই এসেচেন। দেখেচো না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের খেত কিরকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেচে!………

নিসর্গ-সৌন্দর্যের মধ্যে অরূপ-উপলব্ধি শারদোৎসবে একেবারে স্পষ্ট। প্রকৃতিকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারলেই যে মুক্তি ঘটে তা আলোচনা-প্রসঙ্গে কবি এক জায়গায় বলেছেন—

………প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড় হইয়া উঠে। তখন আমরা আকাশ-বাতাস গাছপালা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মিলি—অর্থাৎ যে-প্রকৃতির মধ্যে আমরা মানুষ তাহার সঙ্গে সত্যসম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সে স্বীকার কখনোই নিষ্ফল নহে।

অন্যত্র কবি শারদোৎসবকে ছুটির নাটক ব'লে অভিহিত করেছেন। 'ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই, কেবল একমাত্র হচ্ছে—'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।' প্রয়োজন-সম্পর্করহিত অহেতুক আনন্দের মধ্যেই সন্ন্যাসী, ঠাকুরদা ও ছেলের দল অরূপকে লাভ করেছে। মুক্তির আনন্দের মধ্যে ছাত্রদের আপনা থেকেই শিক্ষালাভ, এই শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গেও শারদোৎসব জড়িত মনে করা যায়। কিন্তু কঠোর কর্মে রত উপনন্দ? কবি বলছেন এইখানেই ঐ অরূপ-উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য। উপনন্দ, নিজের প্রয়োজনে নয়, প্রভুর ঋণ শোধ করতে স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে পুঁথিলেখার কাজ বা কাজের দুঃখ বরণ করেছে। এই স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণেই তার মুক্তি। সন্ন্যাসী বলছেন—'লেখো, বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি! তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।' কবি বলেন, এই ঋণশোধের সৌন্দর্যটিই শারদোৎসবের মূল কথা, কেবল খেলা নয়। "ওই ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ করছে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখতপস্যায় রত; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করেছে। প্রত্যেকটি ঘাস নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে

প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে।" বলা বাহুল্য, এখানেও দুঃখানুভূতির মধ্যে অরূপানুভূতির পূর্ব-পরিচিত তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'ঋণশোধ'-এর তত্ত্বটুকু এই নাটকের আশ্চর্য নিসর্গরস-প্রেরণাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি এমন বলা যায় না। অরূপের সঙ্গে মানব-আত্মার যে আদান-প্রদান সম্পর্কটির উল্লেখ কবি এখানে করলেন তা খেয়ার 'কৃপণ' কবিতাটিতে পূর্বে পরিস্ফুট হয়েছে। ঐ কবিতাটির নিম্নলিখিত চরণগুলি এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য—

হেন কালে কিসের লাগি তুমি অকস্মাৎ
"আমায় কিছু দাও গো" ব'লে বাড়িয়ে দিলে হাত।
মরি এ কী কথা রাজাধিরাজ "আমায় দাও গো কিছু"—
শুনে ক্ষণকালের তরে রইনু মাথা-নিচু।

এই আত্মোৎসর্গের দুঃখাদর্শকেই কবি 'ধর্ম' প্রবন্ধে, (শান্তিনিকেতন) ব্যক্ত করলেন—'ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনই পূর্ণতার মূল্য আছে—তাহাই দুঃখ ; সেই দুঃখই তপস্যা, সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ, মুক্তি, ঈশ্বর।......আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয়, তবে কী দিব, কী দিতে পারি ? তাঁহার ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই—আমাদের একটি মাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়।'

দেখা গেল, অরূপ-লীলারসের প্রথম পর্যায়েই মানবীয় সুখের সঙ্গে দুঃখের মর্মগত পার্থক্যের দিকটি কবি উপলব্ধি করেছেন এবং অরূপ-আনন্দের প্রেরণায় দুঃখ, ভয় এবং মৃত্যুও অতিক্রম করে যাচ্ছেন। এই পর্যায়ের পর গীতাঞ্জলি বিশেষতঃ গীতালিতে এই ভাবটি অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে এবং বলাকায় কবি দুঃখময় গতির জীবনকে সম্পূর্ণ বরণ করেছেন। বলা বাহুল্য, দুঃখকে বরণ ও দুঃখাতিক্রমণের মূল্যেই কবির অভিপ্রেত জীবন-অরূপের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শারদোৎসবের দু-একটি গানে অরূপস্পৃহ কবি সুখত্যাগ ও সর্বনাশকে বরণের আগ্রহ জানালেন—যার মধ্যে 'আনন্দেরি সাগর থেকে' গানটি অন্যতম। কবির অভিলাষ হ'ল—

কোন্ পাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাকব বসে ?
পালের রশি ধরব কসি
চলব গেয়ে গান।

মানুষের সমস্ত আনন্দ ও দুঃখকে একটি নৈসর্গিক রহস্যময়তার মধ্যে গ্রথিত ক'রে রসরূপে উপলব্ধ অরূপের সঙ্গে জীবনের যে উদ্দেশ্যময় সংযোগ-সাধন তাই হ'ল রবীন্দ্র-কাব্যোপলব্ধির মর্মকথা। কবি-দার্শনিক পার্থিব

সুখকে আনন্দে উত্তীর্ণ ক'রে দেখেছেন, দুঃখকেও আনন্দস্বরূপ ব'লেই অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে কেবল স্বার্থময় বিষয়-ভোগে আনন্দ নেই। তাঁর যুক্তি কতকটা এইরকম : সৃষ্টির যাবতীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে লীলাময় আপনাকে প্রকাশ করছেন। তাঁর প্রকাশ আনন্দরূপ এবং দুঃখরূপ দুই-ই ; তা সুখ ও সৌন্দর্যাদি প্রিয় বস্তুর মধ্যেও যেমন অভিব্যক্ত, দুঃখের বা ভয়ানকের মধ্যেও তেমনি প্রতিবিম্বিত। "ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শংকর, হে ভয়ংকর, জীবন-মরণ নাচের ডমরু" প্রভৃতি এ বিষয়ে স্পষ্টোক্তি। যেহেতু লৌকিক জগতে কেবল সুখকেই আমরা চরম ব'লে মনে করি ও চাই এবং দুঃখ ও বিপদ প্রভৃতিকে শত্রুরূপে দেখি, সেইহেতু অরূপানুভূতিলাভ আমাদের ঘ'টে ওঠে না। এই ভাবসংকেতময় তত্ত্বটি 'রাজা' নাটকেও প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

'খেয়া' কাব্য থেকে কবির দুঃখানুভবের প্রবলতার যে সূত্রপাত, গীতালি-বলাকায় সামাজিক দুঃখবোধে যার পরিণাম এবং 'শান্তিনিকেতন' ভাষণগুলির মধ্যে নানাভাবে যা বিস্তৃত, তার মূলে কবির বাস্তবে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত শোক, যেমন, পত্নীমৃত্যু, কন্যামৃত্যু, পুত্রমৃত্যু যে কতক পরিমাণে ক্রিয়াশীল হয়নি এমন নয়, কিন্তু আমরা কবিচিত্তের মর্মগত রোম্যান্টিক বিষাদভাবনাকেই এর মূল ব'লে গ্রহণ করতে চাই। ব্যক্তিগত কোনো শোকদুঃখ যদি কবিচিত্তে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েই থাকে তা এর পূর্বেই হয়েছে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে, আর এই মৃত্যুটির সঙ্গে তাঁর রোম্যান্টিক কবিসত্তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পূর্বেই স্থাপিত হয়ে গেছে।

'ঋণশোধে'র অন্তর্নিহিত এই দুঃখতত্ত্বকে যদি আত্যন্তিক মূল্য দেওয়াও যায়, এর অরূপ-উপলব্ধির প্রকারের দিকটি অবহেলার যোগ্য নয়। 'শারদোৎসব' অরূপের আগমনের বিস্ময়রসে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে—'আমার নয়ন-ভুলানো এলে।' এবং উপনন্দকে অতিক্রম ক'রে ঠাকুরদা ও সন্ন্যাসীই সহৃদয় সামাজিকের আকর্ষণস্থান হয়ে উঠেছে। এই 'ঠাকুরদা' চরিত্রের মধ্যে যেহেতু জীবন ও অরূপসিদ্ধি বিষয়ে কবির উপলব্ধ সত্যটি ধীরে ধীরে প্রকটিত হয়েছে তাই এর সম্পর্কে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

শারদোৎসবের স্বল্প পূর্বে লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' ঐতিহাসিক নাটক হলেও কবির বিশিষ্ট জীবনাদর্শের দ্বারাই অনুরঞ্জিত। এই নাটকের মূল 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের বসন্তরায়ের চরিত্রে কবি তাঁর তৎকালীন আদর্শ—উদার, প্রেমিক ও সদানন্দ মানুষকে রূপায়িত করেছিলেন। 'বিসর্জন' নাটকের 'গোবিন্দমাণিক্য'ও সেকালের এই শ্রেণীর সৃষ্টি। সমগুণান্বিত চরিত্র 'মালিনী' নাটকের 'সুপ্রিয়' আরো একটু অগ্রসর—বাস্তবজীবনবোধে অনুপ্রাণিত।

সর্বত্রই এই ধরনের চরিত্রের সঙ্গে বিপরীতধর্মী চরিত্রের সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তে বসন্তরায়ের পাশাপাশি যে 'ধনঞ্জয় বৈরাগী' কল্পিত হয়েছেন তিনি আরো অধিক অগ্রসর এবং কবির পূর্ববর্তী আদর্শ-অভিলাষের মূলে উৎপন্ন হয়েও বহুলাংশে ভিন্ন। এই বৈরাগী করভার ও ঋণভারে জর্জরিত কৃষককুলের প্রতিবাদ-মূর্তি। এই চরিত্রে কবির বাউলধর্মী অরূপানুরাগ ও বাস্তব-জীবনের একান্ত মিশ্রণ ঘটেছে। চরিত্রটি খেয়া-শারদোৎসব কালের নবোদিত অরূপানুরাগের পরিচয়—চলমান জীবনের মধ্যেই অরূপকে প্রমূর্ত ক'রে তোলা, দুঃখ ও আনন্দকে সমভাবে অন্তরে গ্রহণ করার প্রত্যক্ষ প্রথম দৃষ্টান্ত বহন করছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ধনঞ্জয় বৈরাগীর পরিস্ফুট জীবনধর্মের দিকটি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহী মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টান্ত থেকে গৃহীত। প্রায়শ্চিত্ত রচিত হয় ১৩১৬ (১৯০৯) বৈশাখে। ১৩১৫ সালে গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সত্যাগ্রহ দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে এবং এদেশীয় সংবাদপত্রে আলোচিত হয়। ঐ সময়ে এদেশেও প্রথম যুগের স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা। কিন্তু উক্ত বাস্তব চিত্র থেকে অনুলিখিত হ'লেও ধনঞ্জয় বৈরাগী কেবল রাজনৈতিক সত্যাগ্রহের বিগ্রহ নন, এর সঙ্গে পূর্বপরিকল্পিত সামাজিক ভাবাদর্শ ও অধুনা উপলব্ধ বাউলের যোগে স্বকীয় আশ্চর্য সৃষ্টি। আর এই চরিত্রটি প্রায় অবিকলভাবে বহুপরবর্তী 'মুক্তধারা' নাটকে গৃহীত হ'লেও এবং 'রক্তকরবী'তে আংশিকভাবে অনুসৃত হ'লেও প্রায়শ্চিত্তের অব্যবহিত পরে লেখা রাজা-অচলায়তন-ডাকঘরে 'ঠাকুরদা'র মধ্যে ইনি সত্যাগ্রহী মূর্তি ত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণ নবকলেবর ধারণ করেছেন।

দেখতে হবে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে কবি ঠিক কোনো রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়ীত্ব গ্রহণ করেননি এবং সত্যাগ্রহী ও বাউল 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'ও সে সমস্যার পূর্ণ সমাধান করছেন না, যদিও একথা ঠিক যে প্রায়শ্চিত্তের প্রতাপ-চরিত্রে ইংরেজ শাসনের নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচার প্রতিফলিত হয়েছে এবং বৈরাগীর কার্যকলাপের মধ্যে প্রজাবিদ্রোহের নেতৃত্বও হয়ত ফুটে উঠেছে। কিন্তু আরও পরে আঁকা মুক্তধারা-রক্তকরবীর বৈরাগীদ্বয়ই সমাজ-পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। একালে এ বৈরাগীর অর্ধেক মহাত্মা গান্ধীর চিত্র, বাকি অর্ধেক কবির স্বকীয় এবং সব মিলে কার্যতঃ জীবনবাদী কবির কল্পলোকের বস্তু। লক্ষণীয় এই যে, এই সময়ে কবি শিলাইদহ ও পতিসর অঞ্চলকে কেন্দ্র ক'রে কৃষক ও গ্রাম-সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

প্রতিভার বিকাশ

চতুর্থ পর্যায়

অরূপানুভূতির পূর্ণতা

'গীতাঞ্জলি' থেকে 'গীতালি'

খেয়া ও শারদোৎসবে যে অরূপ নিসর্গাশ্রিত বিস্ময়-ব্যাকুলতার মধ্যে কবির চোখে ধরা দিলেন, তিনি গীতাঞ্জলিতে নিসর্গ এবং মানুষ দুয়েরই মধ্যবর্তী হয়ে কবির হৃদয় জুড়ে বসেছেন দেখা যায়। গীতাঞ্জলির মত বহু-জ্ঞাত, বহুপঠিত ও বহু-আলোচিত রচনার নৈপুণ্য ও বস্তুবিশ্লেষণে আমরা কালক্ষেপ করতে চাই না, শুধু পৌর্বাপর্যের দিক দিয়ে এই উপলব্ধির প্রকার, স্বরূপ ও পরবর্তী কাব্যস্তরে এর প্রভাব প্রভৃতি বর্তমানে প্রয়োজনীয় বিষয়ই আমাদের আলোচ্য। গীতাঞ্জলির সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরের রচনা রাজা (১৩১৭), অচলায়তন (১৩১৮), ডাকঘর (১৩১৮) এই নাটকত্রয় এবং গীতিমাল্য ও কতকাংশে গীতালি এই স্তরে আমাদের একত্র বিচার্য হবে।

শারদোৎসবের পর গীতাঞ্জলির গানগুলির রচনার সময় ঐ কাব্যিক লীলা-ময়ের প্রকাশ দৃঢ়ত্বে ও ধ্রুবত্বে উপনীত হয়েছে এবং কবির চিত্তে তাঁর সঙ্গে একটি হার্দ্য সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অরূপের আশ্রয় প্রকৃতির ভূমিকা তো অপসারিত হয়ই নাই, বরঞ্চ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। এবং পরবর্তী কালের ঋতুনাট্যগুলির রচনা পর্যন্ত সর্বত্র প্রকৃতি-লীলা-নির্ভর অসীমের উপলব্ধিই বহুতরভাবে চিত্রিত হয়েছে। রচনাবলীতে মুদ্রিত গীতাঞ্জলির একশ সাতান্নটি গীতের মধ্যে (শারদোৎসবের কয়েকটি গান সমেত) অন্তত পঁচিশটিতে অরূপানুরাগের ভূমিকারূপে প্রকৃতির বিশেষভাবে আবির্ভাব হয়েছে দেখা যায়। যেমন, 'আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়', 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ', 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে', 'মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে,' 'শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে,' 'আষাঢ়-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল,' 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,' 'আজ বারি ঝরে ঝর ঝর,' 'এসহে এস, সজল ঘন, বাদল-বরিষনে,' 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে' ইত্যাদি। এ সকলের মধ্যে শারদোৎসবে দৃষ্ট, অরূপের আকস্মিক আবির্ভাবে উচ্ছ্বসিত চিত্তের পর্যাকুল অবস্থাও লক্ষিত হয়, যেমন—

> রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের 'পরে
> নবতৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
> এসেছে এসেছে এই কথা বলে প্রাণ,
> এসেছে এসেছে উঠিতেছে এই গান।

এই মনোভাবের দিক থেকে গীতাঞ্জলির সঙ্গে গীতিমাল্য এবং গীতালির কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। গীতিমাল্যে অরূপ-উপলব্ধিতে সিদ্ধ, রস-মুগ্ধ কবি-আত্মার বৈচিত্র্য এবং বিস্তারের দিকটাই বিশেষভাবে প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট দেখা যায়, কবি প্রকৃতি-গত অরূপ-চেতনার বিস্ময়-ব্যাকুলতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নিবিড় আনন্দ-চৈতন্যময় রাজ্যে উপস্থিত হচ্ছেন, অরূপ-তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন এবং গীতালিতে অরূপের আলোকে জীবন ও গতিকে দেখছেন। গীতালিতে এসে এইটুকু বোঝা যায় যে অতঃপর অরূপ-রস-চর্বণায় সমাহিত চিত্তে কবি অবস্থান করবেন না, জীবন ও অরূপের সমন্বয়সাধন ক'রেই তাঁর মানস পরিতৃপ্ত হবে। কবির বর্তমান প্রজ্ঞান-আলোকিত চিত্তের দুঃখবরণের দিকটি যে শারদোৎসব এবং খেয়ায় খুব গৌণ স্থান পায়নি এ আমরা পূর্বেই দেখেছি। এরকম দুঃখানুভবের মূল হয়ত কবির বিষাদবিধুর রোম্যান্টিক চিত্তে, হয়ত ব্যক্তিগত শোকদুঃখ এ বিষয়ে খানিকটা যুক্তও হয়ে পড়েছে, কিন্তু কবির অরূপ-দর্শনের স্বরূপ বিচার ক'রে সমাজের সঙ্গে এর অনিবার্য যোগ স্বীকার করতেই হয়। যার ফলে, একদিকে কবি হয়েও তাঁকে কর্মীরূপে সমাজ-সংগঠনের কাজে নামতে হয়েছে। গীতাঞ্জলির 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান' অথবা 'চিরজনমের বেদনা' প্রভৃতি গানগুলিতে এই সামাজিক দুঃখানন্দ উপলব্ধির কথাই বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত দ্বিতীয় সংগীতটির শেষে দুঃখবোধ কিভাবে আনন্দে উত্তীর্ণ হচ্ছে তার আভাস দেওয়া রয়েছে, যা থেকে রসজ্ঞ পাঠক অরূপাভি-মুখী কবিমানসের পরিণাম সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন—

> গরজি গরজি শঙ্খ তোমার
> বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার,
> গর্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া জাগুক তীব্র চেতনা।

এর সঙ্গে খেয়ার 'আগমন' এবং বলাকার 'শঙ্খ' কবিতা স্মরণীয়। অন্যত্র কয়েক স্থানেই বর্ষাঘন দুর্যোগময় রাত্রির পরিবেশে কবিচিত্তের অরূপ-ব্যাকুলতা বর্ণিত হয়েছে, যেমন—

> গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
> বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি।
> এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
> পরান মম সহসা জাগি
> এমন কেন করিছে মরি মরি।

এই সুখদুঃখাতীত আনন্দাত্মক বিহ্বলাবস্থা (তু° গীতালি—দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে) আরো স্পষ্টভাবে কবি নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে জানাচ্ছেন—

অন্তরে আজ কী কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল,
হৃদয়মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে।

ঠিক এই অবস্থাতেই কবির অরূপের উপলব্ধি ঘটছে—

আজ এমন ক'রে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে।

কিন্তু এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গান হ'ল—'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' বা 'আজি শ্রাবণঘন-গহন মোহে'। বর্ষাপ্রকৃতি কবির অরূপ-উপলব্ধির যেমন সহায়ক হয়েছে এমন বসন্ত বা শরৎ হয়নি এই ব্যাপারটি সাধারণ পাঠকেরও দৃষ্টিগোচর হবে।

গীতাঞ্জলি পর্যায়ের দুঃখবোধ-প্রবর্তিত অরূপ-বিচারের এই প্রসঙ্গে খেয়া ও গীতাঞ্জলির মধ্য-অবকাশে লিখিত 'সুপ্রভাত' কবিতাটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এই কবিতাটিতে কবির অরূপ রুদ্র বা বিপ্লবী ইতিহাস-বিধাতারূপে বর্ণিত হয়েছে। কবিতাটি রচনার পটভূমি হ'ল ইং ১৯০৭-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আনুষঙ্গিক বয়কট ও বয়কট-বিরোধিতা নিয়ে বাঙলায় প্রথম হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। বিবাদ ছিল উপনিবেশবাদী শাসকের সঙ্গে, এখন দেখা গেল সংঘাত এবং দুর্বলতা আমাদের নিজেদের মধ্যেই। এই অপ্রত্যাশিত গুরুতর ব্যাপারটি কবির কাছে জাতির মোহভঙ্গের এবং প্রকৃত পথ চিনে-নেওয়ার ব্যাপার ব'লে প্রতিভাত হয়েছিল। কবি তখন তাঁর স্বদেশী সমাজ বা গ্রাম-সংগঠন চিন্তা নিয়ে ব্যাপৃত। এই দুর্দৈব কবিকে তাঁর ঐ সংগঠন-আদর্শে আরও সুদৃঢ় করে তুললে। এই সংগঠনের পথেই যে হিন্দু-মুসলিম বিচ্ছেদ অন্তর্ধান করবে, ঠিক এই সময়ে প্রদত্ত কবির পাবনা-সম্মিলনীতে ভাষণেও তা প্রকাশিত হয়েছে। যাই হোক 'সুপ্রভাত' কবিতায় এই অন্তর্ঘাতী দুর্যোগকে রুদ্রের দারুণ আঘাতে বিমূঢ় চৈতন্যের জাগরণ ব'লে কবি বর্ণনা করেছেন। 'ভাবিতেছিলাম উঠি কি না-উঠি' প্রভৃতিতে জড় সংশয়ী চিত্তের অবসাদের কথা এবং 'তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে' প্রভৃতিতে আত্মতৃপ্ত মোহাবস্থা থেকে উদ্বোধনের বিষয় বর্ণিত। কবিতাটির সর্বাঙ্গ ঘিরে রয়েছে নিপীড়িত শূদ্রজনের প্রতি কবির সুতীব্র সহানুভূতি। এই অশিক্ষিত, অর্ধবস্ত্র, নিরন্ন জনগণকে ঐ বিপ্লবী রুদ্রেরই অনুচর ব'লে চিত্রিত ক'রে কবি সংকেতে জানিয়েছেন যে এদের মানুষের অধিকার দেওয়াই হ'ল প্রকৃত স্বাদেশিকতা। 'তোমার শ্মশান-কিংকরদল দীর্ঘ নিশায় ভুখারি' প্রভৃতিতে সংকেতসহ শোষিত জনসাধারণের ছবি এবং 'খোলো খোলো দ্বার ওগো গৃহস্থ' প্রভৃতিতে স্বদেশী-সমাজ গঠনের আহ্বান ব্যক্ত করা হয়েছে। আন্দোলন সহজ, কিন্তু সংগঠনের পথ দুরূহ, তাই উৎসাহ সঞ্চার ক'রে ত্যাগস্বীকার করতে বলা হয়েছে—'হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করিয়া ভাণ্ড ভরিয়া

দেহ রে'। অপিচ নিঃশেষে আত্মদানের দ্বারাই যে জাতীয় অমরতা লভ্য তাও এই সহসাগত দুর্যোগে উদ্বোধিতচিত্ত কবি জানালেন। উপসংহারে কবি ব্যাপারটিকে ইতিহাস-বিধাতার আঘাতের সাহায্যে উদ্বোধন ব'লে গ্রহণ ক'রে আমাদের এর অর্থ উপলব্ধি করতে এবং তদনুযায়ী মিলনমূলক সংগঠনের পথে আসার প্রেরণা দিতে গিয়ে বললেন—

ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে,
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে,
মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে
বজ্রশিখার দাহনে।

কবির অরূপ কেবল নৈসর্গিক মাধুর্যে প্রকাশিত নয়, সমাজ-বিপ্লবের মধ্যেও সমভাবে ক্রিয়াশীল এই দৃষ্টিভঙ্গি কবির রচনায় সর্বত্রই প্রকাশিত। এই অরূপ তথাকথিত গতানুগতিক পাপপুণ্যের বিচারক অথবা 'good and kind to all' নয়, ইনি সর্বনাশেরও দেবতা, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষের পরিত্রাতা। এইজন্য গীতাঞ্জলির 'অপমান'-এর মত প্রত্যক্ষ সমাজ-সম্পর্কিত কবিতায়ও 'বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে' ইত্যাদিতে এই বিশিষ্ট বিধাতাকে আহ্বান করা কবির অসংগত মনে হয়নি।

গীতাঞ্জলির নিসর্গ-সন্দর্শন তথা বিস্মিত অরূপ-সন্দর্শন-মুহূর্তের একটি গানে নভোবিজ্ঞান-বর্ণিত মহাকাশ ও মহাকাশ-ধৃত পৃথিবীর সৃষ্টি ও ধ্বংসের নিয়মানুগ ছন্দকে নির্বিকারভাবে বরণের উৎসাহ বিবৃত হয়েছে— 'পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে। এই খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে রে……মরণ-বীণায় কী সুর বাজে তপন-তারা-চন্দ্রে রে॥' সুতরাং বলা যায় যে অরূপ অনন্ত বিষয়ে কবির ধারণা স্বোপার্জিত, এ অনন্তের প্রকৃতি অভিনব, পূর্বেকার কোনো তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত নয়। এই বিজ্ঞান-নির্ভর অনন্তের ধারণা গীতালি-বলাকা অতিক্রম ক'রে পুরবীর সময়কার নটরাজ-লীলা-দর্শন পর্যন্ত প্রসারিত (গ্রন্থের শেষাংশে কবিচিত্তে আধুনিক মহাকাশ-বিজ্ঞানের অধিকার বিষয়ক আলোচনা দ্রঃ)।

আশা করি, কবির অরূপোপলব্ধির এই বিশিষ্ট মনোভাব সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন হবে না। এইভাবে মানবিক ও নৈসর্গিক লীলার মধ্যে লীলাময়ের আগমনসংকেত অন্য কোনো দেশীয় কি বিদেশী কবির অনুভূতিতে এমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে ব'লে আমরা জানি না। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই একান্ত মৌলিক স্থির পরিণামী সত্তাটি অর্থাৎ নিসর্গ-প্রকৃতি

থেকে ক্রমে মানব-সমাজে অনুপ্রবেশের ধারাটি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকলে তাঁর কাব্যের সামগ্রিক স্বরূপও আমাদের অনধিগত থাকবে।

গীতাঞ্জলির এই অরূপানুভূতির পর কবির সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরীয় লীলারসের যে আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্যগুলি পরিস্ফুট হয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান হ'ল নিখিলমানবের মধ্যে নরদেবতারূপে অথবা সমাজপথচারী রুদ্র বিধাতা-রূপে তাঁকে প্রত্যক্ষ করার আগ্রহ, অনুরাগ-সম্পর্ক স্থাপনের ফলে উপাসকের ন্যায় সংযত, শুভ্র ও ভক্তি-বিগলিত ভাবের প্রকাশ এবং মহাকাশ-লীলায় নিশ্চিত বিশ্বাসী কবিমানসের মৃত্যু-অস্বীকার।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে 'আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে বিশাল ভবে,' 'একা আমি ফিরব না আর এমন ক'রে', 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,' 'আজি বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে', 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন,' 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে' এবং 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে' ও 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' প্রভৃতি কবির মানব-প্রীতি সমাজ-অনুভব সম্পর্কিত বহুপরিচিত কবিতাগুলিকে গ্রহণ করা যায়। এগুলি থেকে নিশ্চিতভাবে এই অতি সংগত অনুমানে আসতে হয় যে কবির মানব-প্রীতি অরূপানুরাগের দ্বারা গভীরতর হয়ে উঠেছে। পূর্বজীবনের রোম্যান্টিক বিশ্বাত্মবোধ, এমন কি 'এবার ফিরাও মোরে'র বাস্তব জীবনের প্রতি আগ্রহও বিশেষভাবে কবি-কল্পনার বস্তুরূপেই অবস্থিত ছিল এমন বিতর্ক হয়ত বা সংগত হতে পারে। কিন্তু অধুনা অরূপানুপ্রাণিত স্থির সমাহিত চিত্তে কবি মানুষকে যে-আদর্শের সঙ্গে হৃদয়ে গ্রহণ করলেন তার আন্তরিকতায় আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।

আমরা ক্রমশ দেখতে পাব অরূপবোধের সঙ্গে মিশ্রিত এই উদার মানবীয়তা, দুঃখ ও মৃত্যুকে অস্বীকার প্রভৃতি কবিকে ক্ষণিকের জন্যে গতি-লোকে উধাও ক'রে একটি ধ্রুব সামাজিক আদর্শে জীবনকে দেখায় অনুপ্রাণিত করেছে। যেহেতু কবির বিশিষ্ট অরূপানুভূতিই এরূপ জীবনদর্শনের মূলে, সেইহেতু, অরূপ-সম্পর্কের এই অধ্যায়টি আমরা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব'লেই মনে করি।

সৃষ্টির সত্যতা সম্পর্কে স্থির ধারণায় উপনীত কবির নিবিড় মানবানুরাগ-ময় সমাজবাদী পরিচয় এর পর থেকে তাঁর রচনায় বিশিষ্টভাবে ফুটে উঠতে লাগল। 'অচলায়তন' নাটকে কবি এদেশের অমানবীয় জাতিবর্ণভেদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, বলাকা ও ফাল্গুনীতে দুঃখতাপজর্জর মানুষের মহিমা কীর্তন ক'রে তাকে অগ্রগতিতে উৎসাহিত করলেন, মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় ও ধনবাদী যান্ত্রিক নিপীড়ন থেকে মানুষকে উদ্ধার ক'রে তার স্বরূপে অবস্থিত দেখতে চাইলেন। কাব্যজীবনের সায়াহ্নেও

কবি বাস্তব মানবপ্রীতির বাণীতেই নিজ কাব্যকে চরিতার্থ করতে চেয়েছেন। কবির এই একান্ত মানবানুরাগের কথা দার্শনিকতার আভাসের সঙ্গে 'রিলিজ্যন্ অব্ ম্যান্' এবং 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতায় প্রকাশিত হয়েছে। এ দু'টি গ্রন্থে তাঁর পরিণত মানবমহিমাবোধের প্রায় সম্যক্ পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'পত্রপুট' কাব্যের একটি কবিতায় কবি আত্মস্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্যে শ্রেণীবিভেদনাশী নরদেবতার কাছে নিম্নলিখিতভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি,
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাতজোড় ক'রে—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙালীর ভাবসাধনার মধ্যে মানুষ-জীবনের মহিমা যদিও নানাভাবে লক্ষিত হয়েছে (যেমন, বৈষ্ণবদের 'দুর্লভ মানব জনম', সহজ সাধকদের 'সবার উপরে মানুষ সত্য', শাক্তভক্তের 'এমন মানব-জমিন রইল পতিত'), তথাপি ঠিক মানুষকেই অরূপ বা ঈশ্বর ব'লে ধারণা করা হয়নি। মানুষ-জীবন সেখানে উপলক্ষ্য বা সাধনার সহায়ক মাত্র। আধুনিক কবি-দার্শনিকের এই ভাববাদী অথচ জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নবতম এবং তাঁর স্বকীয়। এ বিষয়ে বাউল-সাধকদের থেকেও তিনি একপদ অগ্রসর এবং যথার্থভাবে সাধারণ মানুষের আধুনিক কবি।

উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের গীতগুলিতে ভক্তিস্নাত শুভ্র জীবনের প্রতি আকর্ষণ লক্ষণীয়। অরূপ-সমাহিত কবিচিত্তের বিগলন যদ্যপি 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না' অথবা 'ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়' কি 'অন্তর মম বিকশিত কর' ইত্যাদির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, তথাপি সাধকের স্বাভাবিক আদর্শ-প্রবণতার জন্য—

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে,
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার।

প্রভৃতি এই শ্রেণীর কয়েকটি গান অনেকটা নীতিমূলক হয়ে পড়েছে। উপরি-

উক্ত কবিতাগুলির মাত্র রূপনির্মাণে বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়, অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই বোঝা যায় এ-সম্পর্ক কবিকর্তৃক আরোপিত। কবির অরূপ নরবপু দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ ভগবান নন এবং কবিও কোনো বিশেষ স্তরের ভক্ত নন। বস্তুত হার্দ্য সম্পর্কের বলেই কাব্যে এহেন অনুরাগ কল্পিত হয়েছে। এমন কি নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির কৃপাভিক্ষারও আত্যন্তিক কোনো মূল্য নেই বা এর মধ্যে বৈষ্ণবীয় কৃপাবাদের ব্যঞ্জনা নেই, কল্পিত বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্পর্ক স্থাপনই এবংবিধ বৈলক্ষণ্যের কারণ। নিম্ন দৃষ্টান্তের 'সাধনা' শব্দে ভজনপূজনাদি শাস্ত্রবিহিত পন্থার প্রতি কবি লক্ষ্য ক'রে বলেছেন—

জানি আমার নাই সাধনা,
ঝরলে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল,
চকিতে ফল ফলবে না।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী হ'লেও জীবনবর্জিত বৈষ্ণবীয় ভাবসাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রকাশভঙ্গির সহায়তার জন্য কাব্যে পদাবলীর রূপ-কল্প গ্রহণ করেছিলেন মাত্র।

উল্লিখিত তৃতীয় প্রকারের কবিতায় দেখা যায় সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু কবির কাছে এক হয়ে পড়েছে। প্রজ্ঞানে উত্তীর্ণ অনুভূতির দ্বারা বহির্বিশ্বে ঈশ্বরীয় লীলা প্রত্যক্ষ করলে স্বার্থময় সুখদুঃখাদির বোধ তিরোহিত হয় এবং মৃত্যুভয় থাকে না। গীতাঞ্জলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, মৃত্যু সম্পর্কে একটি সুনিশ্চিত ধারণায় কবি একালে উপনীত হয়েছেন। ইতিপূর্বে নৈবেদ্যে 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' প্রভৃতির মধ্যে মৃত্যুকে অস্বীকার করার কথা থাকলেও তা বহুলাংশে উপনিষদের ভাবাদর্শ-জাত এমন সংশয় স্বাভাবিক। স্বকীয় উপলব্ধির পথে অরূপকে প্রত্যক্ষ করার পরই মৃত্যুর অবাস্তবতা সম্পর্কে কবির ধারণা জন্মেছে। গীতাঞ্জলি-পূর্ব কাব্যজীবনে কবি যদিও কয়েকবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার বা আত্মবিসর্জনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তা রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়েই করেছেন। যেমন উৎসর্গের 'অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ওগো মরণ, হে মোর মরণ' প্রভৃতিতে কল্পনায় বিহ্বল হয়ে কবি মৃত্যু বরণ করতে চাইছেন, সত্যোপলব্ধির মর্মে নয়। এ সম্পর্কে কবির ধারণার ক্রমবিকাশ আমরা একটু পরেই আলোচনা করব।

মৃত্যু সম্পর্কে লেখা পূর্বেকার কবিতাগুলিতে যদিচ উচ্ছ্বসিত ভাব-বিলাস দেখা যায়, গীতাঞ্জলি থেকে স্থির উপলব্ধিই অনুভূত হয়। গীতাঞ্জলির কবি যদিও সেই আগেকার রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাসী কবিই, তথাপি অধুনা সীমিত অসীমের ধারণায় উপনীত হয়ে যেন যথার্থতর বোধির দৃষ্টিতে তিনি

বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করছেন এমন মনে হয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এই জীবনের যাবতীয় উপলব্ধির পূর্ণতা, অথবা কবিকৃত উপনিষদ্-ব্যাখ্যার অনুসরণে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যে অমৃত, তা যেন এই দার্শনিক কবির একটি বিশেষ সত্যোপলব্ধি। নিম্নলিখিত গানগুলির মধ্যে এই উপলব্ধি বিবৃত হয়েছে—

"ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।"

"কে বলে সব ফেলে যাবি
মরণ হাতে ধরবে যবে।
জীবনে তুই যা নিয়েছিস
মরণে সব দিতে হবে।"

"মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে।
যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন,
এতদিনের সব আয়োজন
চরমদিনে সাজিয়ে দিব উহারে।" ইত্যাদি।

জীবনের যা-কিছু আনন্দের আয়োজন মৃত্যুর মধ্য দিয়েই পূর্ণতার জন্য অপেক্ষা করছে একথা রবীন্দ্রকাব্যে এই প্রথম শোনা গেল। জীবন ও মৃত্যুকে এখানে এক ক'রে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজেকে বোধ থেকে বোধান্তরের মধ্য দিয়ে গতিশীল যাত্রী ব'লে মনে করলেন। এখন থেকে বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক দুঃখের রূপ, মৃত্যু, এবং জীবন ও মৃত্যুর একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের ধারণা কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে। এর পর থেকে স্পষ্টই দেখা যায় কবি কেবল অরূপভাবনিমগ্ন থাকতে পারেননি। অরূপ-সমাহিত চিত্তে জীবনকেই ব্যাখ্যা করেছেন এবং জীবন ও অরূপের একটা সমন্বয় করেছেন। গীতাঞ্জলির 'কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে, সে তো আজকে নয়', 'ঐ যে তরী দিল খুলে', 'যাত্রী আমি ওরে' প্রভৃতি গানগুলি এই সত্যোপলব্ধিজাত প্রাথমিক গতিমুখীতার পরিচয় বহন করছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যসাধারণ স্বকীয় বিকাশের দিক থেকে এগুলির মূল্য অল্প নয়।

নিসর্গরম্য চিত্রময় কাব্যস্বপ্ন নিয়ে, চকিত অথচ নিবিড় রসস্পর্শ বহন ক'রে এবং সত্যোপলব্ধিজাত নিঃশেষে মুক্ত মানুষপ্রীতির দিকে অগ্রসর হয়ে গীতাঞ্জলি সহজতম ভাষায় কবির আত্মপ্রকাশের অসাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

গীতাঞ্জলি থেকে গীতিমাল্যে মোটামুটি কবির অরূপ-বিহারী মানসের বিচিত্র সূক্ষ্ম ভাবাবেশ ও ঐ অরূপের স্বরূপ বিবৃত হয়েছে। গীতিমাল্যের অনেকগুলি গান 'রাজা' নাটকের রচনার সমসাময়িক। 'রাজা'য় যেমন, এখানেও

তেমনি, অরূপের একান্ত রহস্যময় স্বরূপ নির্ণয়ে কবিমানস ব্যাপৃত আছে দেখতে পাই। যেমন—

কোলাহল তো বারণ হ'ল
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে।

অথবা—

ডুবিয়ে দিয়ে সূর্যচন্দ্রে
অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
পশিছে সুর স্বপনে।

এরকম কয়েকটি গানের মধ্যে 'রাজা' নাটকের বিভিন্ন স্থানের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। অন্য কয়েকটি স্থানে চকিতে বা গোপনে আনন্দ-চৈতন্যের মধ্যে এই রহস্যময় অরূপকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় তার প্রকার বিবৃত করা হয়েছে; এই উপলব্ধির বর্ণনাগুলি যেমন তত্ত্বসংকেতে গভীর, তেমনি কবি-মানসের বিশিষ্ট অরূপমুহূর্তের পরিচয়-বহনে বিস্ময়কর, যেমন—

ভোরের বেলায় কখন এসে পরশ করে গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি আঁখির জলে গেছে ভেসে।।

অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এই রহস্যময়ের স্পর্শ যে কিরূপ ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে তা পরবর্তী 'গীতালি'তেও অনুরূপভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যেমন—

ও আমার মন যখন জাগলি না রে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চ'লে যাবার শব্দ শুনে ভাঙ্‌ল রে ঘুম,
ও তোর ভাঙ্‌ল রে ঘুম অন্ধকারে।

গীতিমাল্যের চেয়ে গীতালির গানগুলি আরো অধিক ব্যঞ্জনাধর্মী, এর মধ্যে অরূপ ও তার সঙ্গে কবির ভাবসম্মিলন অধিকতর স্পষ্টরেখায় অঙ্কিত এবং মোটের উপর এগুলি অধিকতর কবিত্বগুণমণ্ডিত। কিন্তু গীতালিতে যদ্যপি একান্ত সমাহিত চিত্তের নিবিড় রসোপভোগের প্রকার বা তত্ত্বসংকেত-ময়তার বর্ণনা সুলভ, এমনকি প্রথমাগত অরূপচেতনার নিসর্গময়তার পুনঃপ্রকাশও দুষ্প্রাপ্য নয়, যেমন, 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি, ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি' প্রভৃতি, তবু গীতালির স্বরূপ-লক্ষণ হ'ল অরূপের উপলব্ধিতে সঞ্জীবিত কবি-মানসের বাস্তব জীবন ও জীবনের অনুভূতিগুলিকে নূতন ভাবসংকেতে গ্রহণ করা। এ হ'ল জীবনের গতি-শীলতার সংকেত। অতঃপর কবি কেবল অরূপ-বিলাসে নিমগ্ন রইলেন না,

নিসর্গ-নির্ভর অরূপানাভূতির সঙ্গে জীবনের একান্ত মিশ্রণ ঘটালেন। এ যেন দুই বিরুদ্ধের, পূর্বেকার রূপতন্ময়তা এবং একালের অরূপ-বিলাস এ দুয়ের দ্বান্দ্বিক সমন্বয়। গীতালিতে অরূপানুভূতির এই দিক্‌পরিবর্তন যে সম্ভব হ'ল তার কারণ নিহিত রয়েছে এই অনুভূতির বিশিষ্ট প্রকারের উপর, পূর্ববর্ণিত দুর্যোগদুঃখের প্রাকৃতিক পটভূমিকার উপর, যা আবার প্রকৃতি ও জীবনের উপর নির্ভরশীল রোম্যান্‌টিক্‌ কবিধর্মের পরিণাম।

'গীতালি'র এই অভিনব কাব্য-স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এতে আছে (১) গীতিমাল্য-গীতাঞ্জলি-খেয়া স্তরের মতই প্রবল দুঃখানুভূতির মধ্যে অরূপ-চেতনার আগ্রহ, (২) অসীমের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত মানসের জন্মমৃত্যুময় বিশ্বসৃষ্টির রহস্যের একত্ব ও অনন্তত্ব উপলব্ধি, (৩) উভয়ের সম্মিলনে সৃষ্টির গতিশীলতা সম্পর্কে ধারণা ও নিজকে অজানা পথের যাত্রী ব'লে বিশেষিত করা। গীতালির অধিকাংশ গানই উপরিউক্ত দুঃখের, গতির ও যাত্রার সুরে স্পন্দিত। তারিখ মিলিয়ে দেখলে, গীতালির গানগুলি ১৩২১-এর ভাদ্র থেকে কার্তিক মধ্যে রচিত, 'ফাল্গুনী' ঐ ফাল্গুন মাসে এবং 'বলাকা' গোটা ১৩২১ এবং ১৩২২-এর লেখা কতকগুলি কবিতার সংকলন। এই জন্যে গীতালির সঙ্গে বলাকার ও ফাল্গুনীর মূলসুরের সাদৃশ্য এত অধিক। বলাকার কয়েকটি সংস্কারমুক্তিবিষয়ক কবিতা গীতালিরও কিছু পূর্ববর্তী, কেবল যে-কবিতাগুলিতে বিশ্বের গতিশীলতার চরমরূপ প্রকটিত হয়েছে তা পরের বৎসরের। গীতালির পূর্বে গীতাঞ্জলির দু-একটি গানে এবং গীতিমাল্যের 'অনেক কালের যাত্রা আমার অনেক দূরের পথে' অথবা 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী' প্রভৃতিতে এই যাত্রা জীবনবোধের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে তবেই গীতালিতে 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার' অথবা 'বুঝি বা এই বজ্ররবে নূতন পথের বার্তা ক'বে, কোন্‌ পুরীতে গিয়ে তবে প্রভাত হবে রাতি,' অথবা 'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে, পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া' প্রভৃতি নূতন ধরনের গান-গুলির জন্ম দিয়েছে। পথ-প্রীতিতে কবি পূর্ব থেকেই স্মরণীয় ('খেয়া' দ্রষ্টব্য), তবু সহৃদয় পাঠক লক্ষ্য করবেন, বিশ্বের দুঃখরূপ, যাত্রা-যাত্রী, পথ ও পথিক ইত্যাদির ধারণা নিয়ে লেখা এতগুলি গান বা কবিতা একসঙ্গে ইতিপূর্বে আর কোথাও পাওয়া যায় না। কবির নিজস্ব যাত্রাবোধ এবং বিশ্ব-গত দুঃখের ও দুঃখ অতিক্রমের রূপ (প্রথম মহাযুদ্ধ) সংযুক্ত হওয়ার ফলে গতির অনুভূতি এই সময়কার প্রধান কাব্য-বিষয় হয়ে পড়েছে। বলাকা-স্তরের আলোচনায় পুনরায় গীতালির এই বৈশিষ্ট্য আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

রাজা-অচলায়তন-ডাকঘর অরূপ-সাধনার যুগের এই তিনটি সাংকেতিক

নাট্যে কবি তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে পাঠকের কাছে এই অরূপকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। অন্তরের গোপন কক্ষে অনির্বচনীয় রসাস্বাদরূপে যিনি অবস্থান করছেন, পার্থিব লীলায় তাঁর কী দান, সমাজ ও মানুষের মধ্যেই বা কিরূপে তিনি নিজকে প্রকাশিত ও উপলব্ধ করেন তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এই তিনটি নাট্যে আলোকপাত করা হয়েছে। এই নাটকত্রয় গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য রচনার সমকালীন এবং কবির দিক থেকে তাঁর অন্তর্গূঢ় মানসের কথা—যা ভাষায় ব্যক্ত করার যোগ্যতা রাখে না—তাকে পরিস্ফুট করার অভিনব প্রয়াসের দৃষ্টান্ত। এগুলির মধ্যে কোথাও সংকেত ও ব্যঞ্জনা, কোথাও ক্ষীণ রূপকের অন্তরালে অরূপ-লীলার আভাস, সর্বত্র সংগীতে ও উক্তিভঙ্গিতে জগন্ময়ের চকিত রসস্পর্শে দর্শক ও পাঠকের হৃদয়ে রোমাঞ্চের সঞ্চার করা হয়েছে।

অচলায়তনে সমাজ-নিহিত প্রাচীন কুসংস্কারের ধ্বংসকারী ও নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তিসাধকরূপে মানুষের মধ্য দিয়েই ক্রিয়াশীল অরূপের আবির্ভাব কল্পনা করা হয়েছে। 'রাজা' নাটকে এই অরূপের প্রায় সম্পূর্ণ একটি রূপ কবি উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। রাজায় প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে তিনি কেবল মনোহর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দর নন, তিনি ভয়ংকর-সুন্দর এবং এই দুইরূপে যিনি তাঁকে জানেন তাঁরই অন্তরের সেই গোপনকক্ষে তিনি আস্বাদন-যোগ্য—যে কক্ষে পার্থিব বুদ্ধি প্রবেশ করতে পারে না, বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ হোক না কেন। ডাকঘরে রাজা-অচলায়তনেরই ধারা অনুবর্তন ক'রে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক আকৃতির স্বরূপ ও রাজার আগমনের প্রকার বর্ণিত হয়েছে।

'রাজা'য় রানী সুদর্শনার উপলব্ধির ভুল দিয়ে নাটক আরম্ভ হয়েছে, ভ্রমনিরসনে নাটকের শেষ। এইটি যদ্যপি এই নাটক রচনার মূল প্রেরণা, নাটকীয় প্রয়োজনে এবং অরূপের প্রকার বিশ্লেষণে বিভিন্ন চরিত্র ও তাদের কার্যকারীতা বর্ণিত হয়েছে—যেমন সুরঙ্গমা, কাঞ্চীরাজ, ঠাকুরদা প্রভৃতি, এবং সমস্ত মিলে অরূপের যে বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়েছে তা এই নাট্যরচনা ছাড়া অন্য কোথাও হয়নি। 'খেয়া' থেকে আরম্ভ ক'রে অরূপ-উপলব্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে নিসর্গের দ্বৈতরূপের মধ্যেই যে লীলাময়ের আত্মপ্রকাশ বর্ণিত হয়েছে সেকথা ইতিপূর্বে বারবার বলা হয়েছে, এবং ঐ দ্বৈতলীলার মধ্যে করুণ-কমনীয় শান্ত-সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে সুন্দরের আগমনের প্রকার অপেক্ষা দুর্যোগময় বর্ষণমুখর রুদ্র পরিবেশে আগমনই যে কবির কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় সেকথাও বিবৃত হয়েছে। আসলে ঐ দুইরূপের মধ্যে সদৃশভাবে অরূপ-উপলব্ধিই কবির মতে যথার্থ উপলব্ধি। যাঁর কাছে অরূপ কেবল বাহ্য সৌন্দর্যেরই প্রতীক তিনি অরূপকে ঠিক জানতে পারেন না।

কারণ,কেবল ইন্দ্রিয়সুখকর বস্তু সুন্দরের ভ্রান্তি জন্মাতে সক্ষম ; অপরপক্ষে, ইন্দ্রিয়ের অপ্রীতিকর ভয়ংকরতা ও দুঃখ প্রায়-অনিন্দ্রিয় ও কাব্যিক বিজ্ঞান-আনন্দময় চিত্তধর্মে গভীরভাবেই মুদ্রিত হওয়ার যোগ্য। সুতরাং অরূপের এই যে আপাতবিরুদ্ধ ভীষণ-মধুর রূপ, তা বহির্দৃষ্টিতে অথবা সাধারণ বিচারদৃষ্টিতে উপলব্ধির যোগ্য নয়। অন্তরের গোপনতম কক্ষে উক্ত আনন্দ-সংবিৎময় রসরূপে একে প্রত্যক্ষ করলে তবেই ঐ বিরুদ্ধতার সমাধান সম্ভব। দুই বিরুদ্ধতার মধ্যে লীলাময় অরূপের বিহারের তত্ত্বই এর পরমাশ্চর্যস্বরূপ, তাই বিশেষভাবে দুঃখ অন্ধকারের মধ্যেই তিনি অনুভবনীয়, ব্যক্তিক মঙ্গল-প্রার্থী দৃষ্টির অনধিগম্য। গীতায় উক্ত আত্মস্বরূপের মত এর সম্পর্কেও বলা যায়—

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥

সুদর্শনা সেই নিভৃতে এ দুয়ের মিলিতরূপে তাঁকে দেখতে পায়নি, এবং স্বার্থজড়িত কেবল-সুন্দর বা ইন্দ্রিয়মনোহর রূপে দেখতে চেয়েছিল বলেই তাঁর রহস্যাবৃত রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারেনি। অথচ কেন অরূপ তাকে আলোকে কেবল-সুন্দররূপে দেখা দেবেন না, তার সে অভিমান ছিল তীব্র।

নাটকের আরম্ভেই দেখতে পাই সুদর্শনা সুরঙ্গমাকে সাধারণ সংসারী মানুষের মত প্রশ্ন করছে—"কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে।" এবং আলোর জন্যে (অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতিগম্য প্রত্যক্ষতার জন্যে) অস্থির হয়ে উঠেছে—'না না, আমি আলো চাই' ইত্যাদি। অথচ তারই দাসী সুরঙ্গমা দুঃখানলে দগ্ধ হয়ে দুঃখের মধ্যে (যেহেতু দুঃখেই অন্তরতম উপলব্ধি সম্ভব) রাজাকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করেছে। আবার ঠাকুরদা ইন্দ্রিয়মাত্র-সুখকর বিষয়ানন্দ ত্যাগ ক'রে আত্মত্যাগময় সামাজিক আনন্দে অধিষ্ঠিত হয়েই রাজার প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছেন। কারণ এ রাজা এককভাবে কারোরই নয়, আর স্বার্থময় সুখের পোষকও নয়। যাই হোক, সুদর্শনার সমস্ত স্বার্থলাভেচ্ছা ও আত্মাভিমান নিঃশেষে দগ্ধ হ'লে অপরিসীম দুঃখভোগের পর সে যখন পথে বেরিয়েছে, দুঃখী সামান্যজনের সঙ্গে নিজকে মিলিয়েছে, তখনই 'অন্ধকার কক্ষে' অন্তরঙ্গ রাজার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্ভব হ'ল। এই সাংকেতিকতা কবি স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন। তার পুনরাবৃত্তি না ক'রে এই অরূপের যে রূপ এবং উপলব্ধির প্রকার কবি আভাসিত করতে চান সে সম্পর্কে আর দু-একটি কথা বলব। এই নাটকে দৃশ্যতঃ না হোক কথোপকথনের মধ্যে রাজাকে অবতীর্ণ করানো হয়েছে, আর পাঠক বা দর্শকের অরূপ-রসানুভূতির সহায়ক কয়েকটি বিশিষ্ট গানের সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এই ঈশ্বর বা অরূপ সম্পর্কে দুঃখী সামান্যজনের প্রতিনিধি সুরঙ্গমার উপরি-উক্ত অন্ধকার গৃহে উপলব্ধি ও ঠাকুরদার আলোকের মধ্যে প্রাপ্তির স্বরূপ প্রথম বুঝতে হবে। বলা বাহুল্য, উভয়েই 'রাজা'র উক্ত দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বরূপের অন্তর্নিহিত ঐক্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ফলে, একজন ভাবানুভূতির মধ্যে সততই অরূপের স্পর্শলাভ করছেন, ইন্দ্রিয়ানীত প্রজ্ঞানলোকে অরূপের সাক্ষাতে তাঁর ইন্দ্রিয়-মন সমস্তই রসতন্ময়তার মধ্যে নিবিড়ভাবে নিমজ্জিত হচ্ছে—ইনি হলেন সুরঙ্গমা। আবার প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে লীলাময় অরূপের যে লীলা চলেছে সেইখানে তাঁর লীলাসহচর হয়ে জীবনের মধ্যে অরূপকে বা অরূপের মধ্যে জীবনকে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি উপলব্ধি করেছেন—তিনি হলেন ঠাকুরদা। সুদর্শনার এই দু'রকম উপলব্ধির কোনোটাতেই অধিকার ছিল না, কারণ তিনি রাজার সমাজনিষ্ঠ রহস্যময় ভয়ংকর-সুন্দর রূপ অনুভব করতে পারেননি; সুখজনক আলোর মধ্যে দৃশ্যতঃ সুন্দর রূপেই দেখতে চেয়েছেন।

এইসব প্রধান চরিত্রের মধ্যে রাজার যে-প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়েছে তাতেই রাজার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়েছে ব'লে অরূপরসিক কবি মনে করেননি। তাই অরূপ সম্পর্কে লৌকিক ধারণার বিভিন্ন দিকগুলি পরিস্ফুট ক'রে ভিন্নভাবে রাজার স্বরূপ অবগত করাতে চান। ঠাকুরদার সঙ্গে পথিক ও নাগরিকদের আলাপের মধ্যে রাজা সম্পর্কে মূঢ় সাধারণ লোকদের হাস্যকর লৌকিক ধারণা বর্ণিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ঠাকুরদার মুখ দিয়ে রাজার স্বরূপও বিবৃত হয়েছে। এইসব লোক রাজার নাম শুনেই রাজাকে মানে, ভুল দেবতাকে রাজার প্রাপ্য অর্ঘ্য দেয়, তাঁর কাছে সাংসারিক অভাব-অনটন দূর করার প্রার্থনা জানায়; আবার চোখে দেখতে না পেলে রাজার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এদের মধ্যে এমন নাস্তিক লোকও আছে। ঠাকুরদার সঙ্গে এদের কথাবার্তার অংশবিশেষ উদ্ধার করছি ঃ

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় না কি রে।

কুম্ভ। না দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না, দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তায় লোকের চোখ ধাঁদিয়ে বেড়ায়। * * *

কুম্ভ। লোকে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বইকি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্য নেই, আলো নেই, কিচ্ছু না।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না।

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুরদা। সে যে কিছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা।

* * *

নিম্নলিখিত অংশে লৌকিক মঙ্গলামঙ্গলের দৃষ্টান্তে রাজার অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব স্থির করার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে—

নাগরিক ১ম। ঠাকুরদা, আমাদের রাজা নেই একথা দুশ'বার বলব।

ঠাকুরদা। কেবলমাত্র দুশ'বার। এত কঠিন সংযমের দরকার কী—পাঁচশ' বার বলো না।

দ্বিতীয়। আমার পঁচিশ বৎসরের ছেলেটা সাতদিনের জ্বরে মারা গেল। দেশে যদি ধর্মের রাজা থাকবে তবে কি এমন অকালমৃত্যু ঘটে।

ঠাকুরদা। ওরে তবু তো এখনো তোর দু' ছেলে আছে—আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল, একটি বাকি রইল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কী রে। ছেলে তো গেলই তাই বলে কি ঝগড়া ক'রে রাজাকেও হারাব। এমনি বোকা!

প্রথম। যাদের ঘরে অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের।

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছিস ভাই। তা সেই অন্নরাজাকেই খুঁজে বের কর। ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।

দ্বিতীয়। আমাদের রাজার বিচারটা কীরকম দেখো না। ওই আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে কিন্তু তার ঘরের এমনি দশা যে চামচিকেগুলোরও থাকবার কষ্ট হয়।

ঠাকুরদা। আমার দশাটাই দেখো না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি, আজ পর্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিলল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কী রে। তাই নিয়েই তো আমার অহংকার। বন্ধুকে কি কেউ কোনো দিন পুরস্কার দেয়!

উপরিউক্ত কথোপকথন থেকে বোঝা গেল যে কবির উপলব্ধ রাজা স্বার্থিক প্রয়োজন ও প্রার্থনার সম্পর্কের ঊর্ধ্বে, কারও নিজ মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না, অসামাজিকের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে তিনি অনধিগম্য। বিশ্বলীলায় বিরুদ্ধভাবে তিনি বর্তমান আছেন, যিনি দেখেন তিনিই দেখেন। বিশ্বের নিয়মের রাজত্বে মানুষ ও অন্য জীবকে তিনি স্বচ্ছন্দ বিচরণের অবকাশ দিয়েছেন, তাঁর বাহ্য শাসনদণ্ড কিছু নেই। নিয়মের কঠোরতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলাতেই আনন্দ, নিয়মলঙ্ঘনেই দুঃখ। তাঁর রাজত্বে যেমন সৎ আছে তেমনি অসৎও আছে, অনুকূল আছে প্রতিকূলও আছে।

এই বহুধা-বিচিত্র পার্থক্য নিয়েই তিনি পূর্ণ একরূপে বিরাজ করছেন। এইরূপে দেখা যায়, মানবিক দুঃখের মধ্যে অনুভবগম্য এই ঈশ্বর সম্পর্কে প্রায়-সম্পূর্ণ একটি দার্শনিক ধারণা কবি-প্রবর এই নাট্যের মধ্য দিয়ে জানাতে চান। বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে বোঝা যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভারতীয় দর্শনের ঈশ্বরীয় লীলার ধারণার সঙ্গে কবির ধারণার অনেকটা মিল রয়েছে। কবি বিশ্বকে স্বীকার ক'রেও, এর বিষয়সুখাদির সত্যতা অনুভব ক'রেও স্বার্থের জৈবতা থেকে মুক্ত হতে চান। তিনি স্থূল প্রয়োজন সাধনের হেতুরূপে সৃষ্টিকে দেখেননি। পার্থিব ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে আনন্দ-সংবিৎরূপে যাঁকে তিনি পেতে চান তিনি বহু বিচিত্র লৌকিকতার মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র এবং অদ্বৈতও বটেন। অথচ রসিকচিত্তের বিশ্বগত পরস্পরবিরুদ্ধ অনুভব-গুলিই যেহেতু ঐ উপলব্ধির একমাত্র উপায়, সেইহেতু, তিনি সৃষ্টিকে সত্য মনে করেন। সুতরাং তিনি না-অদ্বৈতবাদী না-দ্বৈতবাদী। তিনি বৈষ্ণবীয় দ্বৈতবাদী ভাব-সাধনার তথা বিশ্বত্যাগী বৈরাগ্যসাধনার অপক্ষপাতী। ভাব ও বস্তুর পারস্পরিক বিরুদ্ধতার মধ্যে অরূপদর্শনের প্রয়াসী ব'লে তিনি সমাজনিষ্ঠ হেগেলীয় সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

এই নাটকে কাঞ্চীরাজের চরিত্রেও অরূপ-উপলব্ধির একটি বিশিষ্ট প্রকার প্রদর্শিত হয়েছে। রানী সুদর্শনার রাজাকে বাইরে প্রত্যক্ষ-সুন্দররূপে দেখার ভ্রমের সুযোগ নিয়ে এবং জনসাধারণের অজ্ঞতার সদ্ব্যবহার ক'রে তিনি রূপবান্ সুবর্ণরাজের সহায়তায় নিজেকে রাজা ব'লে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সুদর্শনা ভ্রান্তিবশত সুবর্ণরাজের কাছে ফুল পাঠিয়েছিলেন, আর বাধ্য হয়েই কাঞ্চীরাজের দেওয়া সুবর্ণরাজের মালা তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তারপর সুদর্শনাকে পাবার জন্যে কাঞ্চীরাজ প্রাসাদের চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে দিলে এবং পিতৃকুলগতা সুদর্শনার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে সেখানে কান্যকুব্জরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। প্রবল ভোগবাদ এবং শক্তি-মত্তাই কাঞ্চীরাজের চরিত্রের অসামান্য ধর্ম। তিনি নিজেকে রাজা ব'লে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হবার পূর্ব পর্যন্ত অটল আছেন। কঠিন দুঃখের মধ্যদিয়ে পরিশেষে তিনিও রাজাকে বিশ্বাস করলেন। এই ধরনের বীরচরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে-মুহূর্তে তিনি প্রমাণ পান যে সৃষ্টি ও মানুষের নিয়ামক কঠোর সত্তা আছে, সেই মুহূর্তে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে অধ্যাত্মপথে ধাবিত হন। তিনি শেষে তাই সুদর্শনার সঙ্গে পথে বেরিয়েছেন। কঠোরতম দুঃখকে অনায়াসে বরণ করার যে বীরত্ব, রাজা তার মূল্যেই নাস্তিক বীরকে অভ্যর্থিত করেছেন। অথচ দেখা যায়, কাঞ্চীরাজের দলে অন্যান্য যে সব রাজা ছিলেন তাঁদের উপলব্ধি ঘটল না। তাঁরা ছিলেন দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংস্কার ও সংশয়ে পূর্ণ। তাঁরা

বীরত্বময় নাস্তিকতার অধিকারী ছিলেন না। কবির অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, সোজাসুজি নাস্তিকের অরূপানুভূতি আসতে পারে, কিন্তু ঐ প্রকারের দুর্বলচিত্তের কদাপি নয়।

বস্তুত সমাজবিরোধী ও একেবারে নাস্তিক কাণ্ডীরাজকে কম দুঃখভোগ করতে হয়নি। মরণপণ ক'রেই তাঁকে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। কবির আদর্শে তাই তিনি সহজে পুরস্কৃত হয়েছেন। আমাদের আরো মনে হয়, পাপপুণ্যের বিচার সম্পর্কে কবির একটি স্বতন্ত্র ধারণাও এক্ষেত্রে কাণ্ডীরাজের চরিত্রকে, অপ্রত্যাশিত হ'লেও, ধ্রুব পরিণামের মুখে নিয়ে গেছে। পাপপুণ্যের বোধ এবং তার দণ্ড-পুরস্কার সম্বন্ধে আমরা যে লৌকিক ধারণা পোষণ করি কবি তা অপ্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। ব্যবহারিক জগতে নানা প্রয়োজন-সম্পর্কে অবশ্য মানুষের ধারণাগুলি লৌকিকেই প্রযোজ্য, অনন্ত বা পূর্ণের চারিত্র্য সম্পর্কে নয়। তাঁর বিচারের স্বরূপ আমাদের আয়ত্তে নয়। ফলে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, পুণ্যবানও লৌকিক মতে শাস্তি পায়, পাপীও করুণা লাভ করে। এই ধারণাটি কবি তাঁর একটি কবিতায় (বলাকা—'বিচার' দ্রঃ) ব্যক্ত করেছেন—

তারা যে নির্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্বার।

*   *

তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্বাঙ্গে বাজে
সহিতে সে পারি না যে;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি—
খড়্গ ধরো প্রেমিক আমার
কর গো বিচার।
তার পর দেখি
এ কী
কোথা তব বিচার-আগার।
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা 'পরে

আবার লৌকিক ভাবে আমরা যাদের মার্জনীয় ব'লে মনে করি সেখানে কবি উপলব্ধি করেন—

চেয়ে দেখি মার্জনা যে নামে এসে
ঝড়ের প্রচণ্ড বেশে;
সেই ঝড়ে
ধুলায় তাহারা পড়ে।

সুতরাং লৌকিক ধারণা অনুসারে কাণ্ডারাজের চরিত্রের এই পরিণাম আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু কাণ্ডারাজ বৈষ্ণবীয় শত্রুভাবের সাধক নন, কারণ, প্রারম্ভ থেকেই তাঁর সে ধরনের ভক্তিভাবের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না এবং রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণবীয় ভক্তি-সাধক নন। শক্তিমত্তার প্রতি এই সহানুভূতির প্রকাশ পূর্বেকার 'মালিনী' নাটকের 'ক্ষেমংকর' চরিত্রে এবং এখনকার 'অচলায়তন'-এর 'মহাপঞ্চক'-এর চরিত্র-নির্মাণেও আমরা দেখতে পাই।

প্রসঙ্গক্রমে কবির এই অরূপ-সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কিত ধারণার তুলনা ক'রে দেখতে ইচ্ছা হয়। সাহিত্য-বিচারে কবি রসবাদী। রস রূপের সঙ্গেই যদিচ আপনাকে প্রকাশ করে, আনন্দময় সংবিতেই তার স্থিতি। সেই গোপন, রহস্যময়, বুদ্ধির আলোকের অতীত আনন্দময় কক্ষেই ব্যক্তি-কর্তৃক এই রসের উপলব্ধি। (তু°—'সাহিত্য জানাইতেছে সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত, সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—রসো বৈ সঃ। রসোহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।'—সৌন্দর্যবোধ। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—যা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ অমৃতরূপ। সাহিত্যেও মানুষ কত বিচিত্রভাবে আপনার আনন্দ-রূপকে অমৃতরূপকে ব্যক্ত করিতেছে তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়।'—সৌন্দর্য ও সাহিত্য)। আনন্দসত্যময় এই রস কেবল রূপের আধারেই বিচার্য নয়। রূপের যে ইন্দ্রিয়মোহকর গুণ আছে রসে তাকে অতিক্রম ক'রে একটি সুষমাময় ঐক্যে ও ধ্রুবত্বে পেঁছাতে হয়। সুতরাং কঠোর সাধনার দ্বারাই এই কঠোর রসরূপ বস্তু আয়ত্তগম্য ; ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সুখকর উপভোগের মধ্যে নয়, অর্থাৎ কেবল ভাষার সৌন্দর্য, কেবল রচনার নৈপুণ্য, অলংকারের পারিপাট্য বা ছন্দের ঝংকারে মুগ্ধ হওয়াতেই রসোপলব্ধি হয় না। সাহিত্য আলোচনার প্রসঙ্গে রস বিষয়ে স্রষ্টার অন্তরতম কঠোর সাধনার দিকটি কবি বহুবার উল্লেখ করেছেন, যেমন—"অনেক গুণী দেখা যায়, বাহিরের ক্ষুদ্র লালিত্যকে যাঁহারা আমল দিতে চান না ; তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে যেন একটা কঠোরতা আছে। তাঁহাদের ধ্রুপদের মধ্যে খেয়ালের তান নাই।" কলাসৃষ্টিতে বা কলা-আলোচনায় বাহ্যরূপের উপর আসক্তি কবি ত্যাগ করতে বলেছেন—"সাহিত্য-কলার ক্ষেত্রে যারা পেটুক তারাই রূপের লোভে অতিভোগের সন্ধান করে—তাদের মুক্তি নেই।······কলাসৃষ্টিতে রসসত্যকে প্রকাশ করবার সমস্যা হচ্ছে—রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা, অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন ক'রে দেখা, ঈশোপনিষদের সেই বাণীটিকে গ্রহণ করা, পূর্ণের দ্বারা সমস্ত চঞ্চলকে আবৃত ক'রে দেখো এবং মা গৃধঃ—লোভ কোরো না—এই অনুশাসন গ্রহণ করা" (সৃষ্টি)। রসোপলব্ধির অন্তর্গত অলোলুপতা, সামঞ্জস্য, একত্ব, সত্যতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে কবি অসংযত রূপলালসা থেকে রসাস্বাদের

নিম্নলিখিত ভাবে পার্থক্য করছেন—'ভিতমাত্রই শক্ত হইয়া থাকে, না হইলে তাহা আশ্রয় দিতে পারে না।······জ্ঞানের ভিত্তিটাও শক্ত, আনন্দের ভিত্তিটাও শক্ত। জ্ঞানের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত তবে তো সে কেবল খাপছাড়া স্বপ্ন হইত; আর আনন্দের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত তবে তাহা নিতান্তই পাগলামি মাতলামি হইয়া উঠিত।······সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না···প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পুরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই, তবে যে-সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে······' (সৌন্দর্যবোধ)।

কবির এই রসোপলব্ধির এবং ঐ অরূপোপলব্ধির রীতি বিশ্লেষণ ক'রে সাদৃশ্য দেখা যাক। প্রথমত, সত্য ও সুষমাময় ঐক্যস্বরূপ রস যেমন অন্তরের গোপন কক্ষে উপলব্ধির যোগ্য, ভয়ংকর ও সুন্দরের সামঞ্জস্যরূপ রাজাও তেমনি আনন্দময় সংবিৎরূপেই আস্বাদ্য। রূপের মধ্যে বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলার মধ্যেই যদিচ 'রাজা'র প্রকাশ, রূপসর্বস্বতার দ্বারা এবং স্বার্থময়তার দ্বারা তিনি গ্রহণীয় নন। কারণ, যাকে ঠিক ইন্দ্রিয়মনোহর সুন্দর বলা যায় না এমন দুর্যোগদুঃখের মধ্যেও তাঁকে চেনা প্রয়োজন। অমানবিক সুদর্শনা কেবল সুন্দররূপে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়ে ভুল করেছিল। সুতরাং তার চারদিকে লোভের আগুন জ্বলল। 'তখন কেমন করিয়া তাহার চারদিকে আগুন জ্বলিল······সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল' তা-ই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। রসের দিক থেকে বলা যেতে পারে, সুদর্শনা (অর্থাৎ রসান্বেষী পাঠক) সুবর্ণের বা ছন্দঃ-অলংকার-বচনকৌশলের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকেই বরণ করলে বা কাব্য ব'লে গ্রহণ করলে। কাঞ্চীরাজ যেন বচন-রচন-পটু চতুর কাব্য-ব্যবসায়ী। যথার্থ কাব্যের অভাবে কেবল বাহ্যরূপের দ্বারা সুদর্শনার ভ্রান্তি জন্মানো এবং সুদর্শনাকে দলে পাওয়ার জন্য তার চেষ্টা। সেও তাই রূপলোভের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে। এরকম কাব্যসমালোচক আবার নিজ মতে স্থির-বিশ্বাসী ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ হয়ে থাকেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁকেও ভ্রান্তিমুক্ত হতে হয়।

বলা বাহুল্য, 'রাজা'কে কবির মর্ত্যসমন্বিত অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ভাব-সংকেতময় নাটক ছাড়া অন্যভাবে গ্রহণ করার ইঙ্গিত আমার এই আলোচনার তাৎপর্য নয়। আমি শুধু কবির কাব্যোপলব্ধি এবং অরূপ-উপলব্ধির সাদৃশ্য দেখাতে চাই; এবং ব্যঞ্জনা-ক্রমে এটুকু জানাতে চাই যে কবির তত্ত্বোপলব্ধি তাঁর কাব্যোপলব্ধিরই প্রকারবিশেষ, তা স্বকীয়, এবং পূর্বনির্দিষ্ট শাস্ত্র বা ধর্মমতের দ্বারা অপ্রভাবিত।

'অচলায়তন'-এ এই ভয়ংকর-সুন্দরের রুদ্ররূপের আর একটি দিক চোখে পড়ে। তা হ'ল—গতানুগতিক অন্ধতা, আচার-পালনের নির্জীব দাসত্ব ও শাস্ত্রের বা মন্ত্রতন্ত্রাদির কুহক যেখানে মনুষ্যত্বকে নিপীড়িত ক'রে তার সহজ বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছে সেখানে ধ্বংসের দেবতা ও নূতনের প্রতিষ্ঠাতা রূপে 'গুরু'র (বা 'রাজা'র শক্তির) প্রকাশ ঘটেছে। এই নাটকটির রচনার মূলে কবির বাস্তব সমাজবোধ ও মানবীয়তা-বোধ বিশেষভাবে কাজ করেছে এবং কবি যেহেতু অরূপাদর্শে সমাজের গতিশীলতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেইহেতু এখন থেকেই এই অনুমান করা যায় যে, কবি শুধু অরূপ-সাধনাতেই সমাহিত থাকবেন না, বাস্তব জীবনের মধ্যে অরূপকে এবং অরূপের মধ্যে জীবনকে প্রত্যক্ষ করবেন। কবি 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে গুরুর এই যোদ্ধৃ-বেশে ধ্বংসের মধ্যে আগমনের সংকেত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

'যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম ক'রে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই ক'রে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে……আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর মানের প্রাচীর অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে।'

(আত্মপরিচয় দ্রঃ)

এই নাটকে গুরুর আবির্ভাব ঘটেছে দাদাঠাকুরের মধ্য দিয়ে। কবি বলছেন "যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।" সমস্ত রাষ্ট্র ও সমাজ-বিপ্লবের মূলে যে গুরুর নির্দেশ রয়েছে এবং 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্মসংস্থাপনার্থায়' তাঁর আবির্ভাব ঘটে এই তত্ত্বটিই যুগন্ধর মহাকবি নূতন ক'রে প্রতিষ্ঠা করলেন। মানবীয় কল্যাণের বিরোধী, মধ্যযুগের কুসংস্কার ও প্রথার বাহক 'অচলায়তন'ই ভারতবর্ষের ধর্মের গ্লানির প্রতিভূ। স্পষ্টতই দেখা যায় যে গীতাঞ্জলির অরূপ-সিদ্ধ কবি তৎকালে সৃষ্টির মধ্যে জন্মমৃত্যুর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ্য ক'রে জীবন সম্বন্ধে যে-গতির ধারণায় এসে পৌঁছেছেন তা-ই তাঁকে সমাজবোধে ও বৃহত্তর জীবন-বোধে ধীরে ধীরে উদ্দীপিত ক'রে তুলছে। সংস্কারমুক্তি সম্পর্কে চেতনা এরই একটা অংশ। ইতিপূর্বে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় ও 'মালিনী'

নাট্যে সংস্কারমুক্ত মানব-ধর্মবোধের পরিচয় পাওয়া গেলেও সে-বোধ বহুল পরিমাণে রোম্যান্টিক ভাববিহ্বলতা-প্রসূত, বর্তমানের মত স্থির উপলব্ধি-সঞ্জাত নয়। দাদাঠাকুরের মুখে সংস্কারমুক্তি সম্বন্ধে চরম কথা শোনা গেল—'যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের ক'রে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।' কিন্তু যে-বিপ্লবমূলক পন্থায় নূতনের আবির্ভাব ঘটল কবি তাকে হিংসাহীন বিপ্লবের আকার দেননি। যুদ্ধের মধ্যেই কবি অমানবীয় জাতবিচারের সমস্যার সমাধান করেছেন—স্থবিরক ও শোণপাংশুর রক্ত মিশ্রিত ক'রে দিয়েছেন। কবির এই বৈপ্লবিক মানবিকতার সমর্থন পরিচয়, কালান্তর ও পল্লী-প্রকৃতির গদ্যলেখনসমূহ থেকেও পাওয়া যাবে।

নূতন এবং উন্নততর জীবনের প্রতি আগ্রহবশতঃ কবি গ্লানির ক্ষয়কর যুদ্ধকে নৈসর্গিক ঘটনা এবং আমাদের শ্রেয়ের পন্থা ব'লেই নির্দেশ করেছেন। আবার মৃত্যুকেও যে-কবি অস্বীকার করেছেন তাঁর কাছে শ্রেয়ের জন্যে জীবন-দান আদর্শের দিক থেকে কর্তব্য ব'লেই মনে হয়েছে। ভারতীয় বৈদান্তিক জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দও নিষ্ক্রিয় কাপুরুষতাকে ধিক্কার দিয়ে আত্ম-বলিদানের জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই আহ্বান জানিয়েছেন। প্রথম মহা-যুদ্ধের কালে লেখা 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে ও শান্তিনিকেতন-ভাষণমালায় কবি এইরূপ যুদ্ধকে আনন্দে বরণ করতে চেয়েছেন দেখেছি। দেশ ও জাতির অর্থাৎ বৃহৎ মানবের অভ্যুদয়কে যে-যুদ্ধবিগ্রহ নিয়মিত করে, সেই ধর্মযুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ হিংসার ব্যাপার ব'লে গ্রহণ করেননি, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থসাধনকেই হিংসা ব'লে মনে করেছেন এবং সেক্ষেত্রে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার কথা তুলেছেন এবং তার অন্যথায় বিদ্রোহ-বিপ্লবকে অভিনন্দিত করেছেন।

দাদাঠাকুরের মুখ দিয়ে কবি মানবাত্মার নিপীড়নের বিরুদ্ধে চিরন্তন বিদ্রোহের কথাই আমাদের শোনালেন—'না যদি কুলোয় তাহ'লে এমনি ক'রে দেয়াল আবার আর একদিন ভাঙতেই হবে সেই বুঝে গেঁথো—।' কবির অরূপ 'নরদেবতা' ব'লেই ভারতের অন্ধ অমানবীয় অস্পৃশ্যতা ও বিভেদ প্রথার সমূলে বিনাশ সাধনও তাঁর কর্তব্য হয়েছে—'ওই ভিতের উপর কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।' এই ভাবে এই নাটকটির মধ্যে কবি সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটি পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করলেন এবং এই প্রকারে অরূপের স্বরূপ এবং কার্যকারীতা আর এক দিক থেকে স্পষ্ট ক'রে তুললেন। এই নাটকটি 'প্রবাসী'-পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ'লে পর দেশের রক্ষণশীল দল সমালোচনায় এই

অভিমত প্রকাশ করেন যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মকে ভাঙতে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথের জবাব ছিল, মানবঘৃণা কোনো ধর্মেরই উদ্দিষ্ট হতে পারে না, হিন্দুধর্ম আর হিন্দুয়ানি এক নয়। যাই হোক, শ্রেণীস্বার্থপরায়ণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উপর কবির এই প্রথম প্রত্যক্ষ আঘাত। এরপর পরিচয় ও কালান্তরের প্রবন্ধে, তাসের দেশ, কালের যাত্রা প্রভৃতি নাট্যে ও বহু কবিতায় ভারতের এই স্থায়ী শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে উৎসাহিত করেছেন। পূর্ণ জীবনবোধ এবং সংগ্রামের দিকটি 'বলাকা'য় এবং অমানবীয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিকটি 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'তে কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা আমরা পরে দেখব এবং কবির কাব্য-জীবনে শেষ পর্যন্ত অনুসৃত ও অরূপোপলব্ধির ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এই বাস্তব মানবীয়তার চিহ্ন দেখে কবিপ্রতিভার ঐক্য অনুধাবন ক'রে বিস্ময় বোধ করব।

অচলায়তনে আরো দু'টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় বস্তু আছে। একটি কবির তীব্র বিদ্রূপপরায়ণতা, আর একটি তাঁর অরূপদর্শনের বৈশিষ্ট্য—পূর্বদৃষ্ট বর্ষণমুখর দুর্যোগময় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গুরুর আগমনসূচনা। 'রাজা' নাটকে ভূমিকম্পের মধ্য দিয়ে যোদ্ধৃবেশে তিনি এসেছেন, এখানে বর্ষার দুর্যোগের আনন্দে—

> বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কারা। এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ন বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো যাক—আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, যাক না—আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।'

ডাকঘরেও এই ভাঙনের শক্তি দ্বার ভেঙে ফেলে অমলের সঙ্গে সকলকেই অসীমের মুখোমুখি ক'রে দিয়েছে। 'খেয়া'র স্তর থেকে আরম্ভ ক'রে অরূপের আগমনের এই বিশিষ্ট নিসর্গ-সংকেতময় সামাজিক পটভূমিকা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পাঠকের যেমন বিচার্য, তেমনি এর সঙ্গে 'বলাকা' কাব্যের সমাজ-পরিবর্তন ও ভাঙনের সুর মিলিয়ে দেখা কর্তব্য; কারণ, বলাকার—

> জানি জানি তন্দ্রা মম
> রইবে না আর চক্ষে।
> জানি শ্রাবণ-ধারাসম
> বাণ বাজিবে বক্ষে।
> কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
> কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
> দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে সুপ্তির পর্যঙ্ক।

প্রকৃতির মধ্যে ব্যঞ্জিত বাস্তব দুঃখকে বরণের সংগ্রামী চিত্র এর পূর্বেই দুর্যোগের মধ্যে অরূপাভিসারে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা—
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা। (খেয়া—'আগমন')

কবির এই অরূপানুভূতি এবং প্রাসঙ্গিক জীবনবোধ কিভাবে তাঁকে জীবন ও অরূপের সমন্বয়ে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যথার্থ জীবনের প্রতিষ্ঠায় ধীরে ধীরে প্রবর্তিত করেছে সে-ইতিবৃত্ত রসিকচিত্তের কাছে যথার্থই কৌতূহল-জনক।

প্রকৃতি-ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে অরূপানুভূতির একটি পরিপূর্ণ চিত্র এই যুগের 'ডাকঘর' নাটকে পাওয়া যায়। কবি শারদোৎসব ও গীতাঞ্জলির মধ্যে, প্রকৃতি থেকে, সুতরাং অরূপানুভূতি থেকে বঞ্চিত মানবাত্মার করুণ ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেও তা বাস্তবতায় পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারেননি। 'ডাকঘর' নাটকে এই চিত্র সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিসর্গ ও মানুষের সঙ্গে সহজ মিলনে শিশুমনের যে বিকাশ, তাতে বাধার সৃষ্টি করেছে সমাজ, কঠিন নিয়ম আরোপ ক'রে। বন্ধন সরিয়ে দাও, আপনা থেকে সে সমাজমুখী অরূপমুখী হোক, এই ভাবার্থই ডাকঘরের। এর সঙ্গে রুশোর Emile, ওয়ার্ডস্‌ওআর্থের 'লুসি' কল্পনার মিল দ্রষ্টব্য। অমল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ ক'রে দেখা যেতে পারে। প্রথম স্তরে তার প্রকৃতির ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আগ্রহ, দ্বিতীয় স্তরে রাজার বা অরূপের জন্য উদ্বেগ। দ্বিতীয়টি যে প্রথমটিরই পরিণাম তা কবি নাটকের মধ্যেই স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অমলের নিসর্গব্যাকুলতা সামগ্রিক ভাব-ব্যাকুলতায় এবং পরিশেষে অরূপসন্ধিতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন ঠাকুরদা-শ্রেণীর চরিত্রে তেমনি অমলের চরিত্রেও কবি স্বয়ং প্রতিফলিত হয়েছেন। প্রকৃতি থেকে কবি নিজে কী প্রকারে অধ্যাত্মে উপনীত হয়েছেন তা Religion of Man গ্রন্থে তিনি বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলেছেন—

'During the discussion of my own religious experience I have expressed my belief that the first stage of my realisation was through my feeling of intimacy with Nature......'

কবির কাব্যানুভূতি যে তাঁর অগোচরে কাব্যিক অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছে তা নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে তিনি জানিয়েছেন—

'...it is evident that my religion is a poet's religion, and neither that of an orthodox man of piety, nor that of a theologian. It's touch comes to me through the same unseen and trackless channel as does the inspiration of my songs. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life. Somehow they are wedded to each other and though their betrothal had a long period of ceremony it was kept secret to me.'

প্রকৃতির সঙ্গে অধ্যাত্মের যে-সম্পর্কের বিষয় কবি ধ্যানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, একদিকে Beautiful আর একদিকে Sublime-এর মধ্যে অরূপ-দর্শনের যে-বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে বারবার উল্লেখ করেছি, তা-ও কবি উক্ত গ্রন্থে বিবৃত করেছেন—

'When I look back upon those days, it seems to me that unconsciously I followed the path of my Vedic ancestors, and was inspired by the tropical sky with its suggestion of an uttermost Beyond. The wonder of the gathering clouds hanging heavy with the unshed rain, of the sudden sweep of storms arousing vehement gustures along the line of cocoanut trees, the fierce loneliness of the blazing summer noon, the silent sunrise behind the dewy veil of autumn morning kept my mind filled with the intimacy of a pervasive companionship.'

'খেয়া' থেকে প্রারব্ধ, শারদোৎসব ও গীতাঞ্জলিতে উপলব্ধ এবং ডাকঘরে পরিস্ফুট কবির উপলব্ধির স্বকীয় পরিণামের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে অতঃপর যেন সংশয়াতীত হতে পারি।

মানবচিত্তের এই প্রকৃতি-মুখীনতাকে কবিকল্পনায় গৃহীত অরূপানুভূতির ভূমিকা হিসেবে না দেখে একটু জীবনদর্শন মিশিয়ে দেখলে আমরা একদিকে যেমন রুশো, ফিকটে, শেলিং প্রভৃতি মনীষীদের প্রকৃতিবাদের তত্ত্বে এসে পড়ি আর একদিকে তেমনি ভারতীয় মধ্যযুগের সূফী সাধকদের বন্ধনহীন মানবাত্মার স্বাধীন মিলনমার্গে বিচরণের ধারণার সঙ্গে এর সংগতি দেখতে পাই। শাস্ত্রনির্দেশশূন্য স্বাভাবিক পরিণামের পথই মানুষের ঈশ্বরাভি-মুখীতার একমাত্র পথ এই বলিষ্ঠ ধারণা প্রকাশ ক'রে সূফী সাধকেরা এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত সহজিয়া মতাবলম্বী ও বাউলেরা ভারতের ধর্মসাধন-পন্থায় যুগান্তর এনেছেন। কবীর শাস্ত্রনির্দেশ বা পুঁথির মত অগ্রাহ্য ক'রে

প্রভৃতির মধ্যে ব্যক্তিত বাস্তব দুঃখকে বরণের সংগ্রামী চিত্র এর পূর্বেই দুর্যোগের মধ্যে অরূপাভিসারে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা—
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা। (খেয়া—'আগমন')

কবির এই অরূপানুভূতি এবং প্রাসঙ্গিক জীবনবোধ কিভাবে তাঁকে জীবন ও অরূপের সমন্বয়ে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যথার্থ জীবনের প্রতিষ্ঠায় ধীরে ধীবে প্রবর্তিত করেছে সে-ইতিবৃত্ত রসিকচিত্তের কাছে যথার্থই কৌতূহল-জনক।

প্রকৃতি-ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে অরূপানুভূতির একটি পরিপূর্ণ চিত্র এই যুগের 'ডাকঘর' নাটকে পাওয়া যায়। কবি শারদোৎসব ও গীতাঞ্জলির মধ্যে, প্রকৃতি থেকে, সুতরাং অরূপানুভূতি থেকে বঞ্চিত মানবাত্মার করুণ ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেও তা বাস্তবতায় পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারেননি। 'ডাকঘর' নাটকে এই চিত্র সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিসর্গ ও মানুষের সঙ্গে সহজ মিলনে শিশুমনের যে বিকাশ, তাতে বাধার সৃষ্টি করেছে সমাজ, কঠিন নিয়ম আরোপ ক'রে। বন্ধন সরিয়ে দাও, আপনা থেকে সে সমাজমুখী অরূপমুখী হোক, এই ভাবার্থই ডাকঘরের। এর সঙ্গে রুশোর Emile, ওয়ার্ডসওআর্থের 'লুসি' কল্পনার মিল দ্রষ্টব্য। অমল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ ক'রে দেখা যেতে পারে। প্রথম স্তরে তার প্রকৃতির ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আগ্রহ, দ্বিতীয় স্তরে রাজার বা অরূপের জন্য উদ্বেগ। দ্বিতীয়টি যে প্রথমটিরই পরিণাম তা কবি নাটকের মধ্যেই স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অমলের নিসর্গব্যাকুলতা সামগ্রিক ভাব-ব্যাকুলতায় এবং পরিশেষে অরূপসন্ধিতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন ঠাকুরদা-শ্রেণীর চরিত্রে তেমনি অমলের চরিত্রেও কবি স্বয়ং প্রতিফলিত হয়েছেন। প্রকৃতি থেকে কবি নিজে কী প্রকারে অধ্যাত্মে উপনীত হয়েছেন তা Religion of Man গ্রন্থে তিনি বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলেছেন—

'During the discussion of my own religious experience I have expressed my belief that the first stage of my realisation was through my feeling of intimacy with Nature……'

কবির কাব্যানুভূতি যে তাঁর অগোচরে কাব্যিক অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছে তা নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে তিনি জানিয়েছেন—

'...it is evident that my religion is a poet's religion, and neither that of an orthodox man of piety, nor that of a theologian. It's touch comes to me through the same unseen and trackless channel as does the inspiration of my songs. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life. Somehow they are wedded to each other and though their betrothal had a long period of ceremony it was kept secret to me.'

প্রকৃতির সঙ্গে অধ্যাত্মের যে-সম্পর্কের বিষয় কবি ধ্যানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, একদিকে Beautiful আর একদিকে Sublime-এর মধ্যে অরূপ-দর্শনের যে-বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে বারবার উল্লেখ করেছি, তা-ও কবি উক্ত গ্রন্থে বিবৃত করেছেন—

'When I look back upon those days, it seems to me that unconsciously I followed the path of my Vedic ancestors, and was inspired by the tropical sky with its suggestion of an uttermost Beyond. The wonder of the gathering clouds hanging heavy with the unshed rain, of the sudden sweep of storms arousing vehement gustures along the line of cocoanut trees, the fierce loneliness of the blazing summer noon, the silent sunrise behind the dewy veil of autumn morning kept my mind filled with the intimacy of a pervasive companionship.'

'খেয়া' থেকে প্রারব্ধ, শারদোৎসব ও গীতাঞ্জলিতে উপলব্ধ এবং ডাকঘরে পরিস্ফুট কবির উপলব্ধির স্বকীয় পরিণামের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে অতঃপর যেন সংশয়াতীত হতে পারি।

মানবচিত্তের এই প্রকৃতি-মুখীনতাকে কবিকল্পনায় গৃহীত অনুপানুভূতির ভূমিকা হিসেবে না দেখে একটু জীবনদর্শন মিশিয়ে দেখলে আমরা একদিকে যেমন রুশো, ফিক্‌টে, শেলিং প্রভৃতি মনীষীদের প্রকৃতিবাদের তত্ত্বে এসে পড়ি আর একদিকে তেমনি ভারতীয় মধ্যযুগের সূফী সাধকদের বন্ধনহীন মানবাত্মার স্বাধীন মিলনমার্গে বিচরণের ধারণার সঙ্গে এর সংগতি দেখতে পাই। শাস্ত্রনির্দেশশূন্য স্বাভাবিক পরিণামের পথই মানুষের ঈশ্বরাভিমুখীতার একমাত্র পথ এই বলিষ্ঠ ধারণা প্রকাশ ক'রে সূফী সাধকেরা এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত সহজিয়া মতাবলম্বী ও বাউলেরা ভারতের ধর্মসাধন-পন্থায় যুগান্তর এনেছেন। কবীর শাস্ত্রনির্দেশ বা পুঁথির মত অগ্রাহ্য ক'রে

অন্তরকেই শ্রেষ্ঠ গুরুর মর্যাদা দিয়ে বলছেন—পড়ী পড়ীকে পথর হও, প'ড়ে প'ড়ে শুধু পাথর হয়। পুঁথি-আগত বিদ্যা বিদ্যাই নয়। দাদু বলছেন—পঢ়ি পঢ়ি থাকে পংডিতা কিনহুঁ ন পায়া পার, অর্থাৎ পণ্ডিতেরা শুধু পড়েই যায়, পারে যেতে পারে না।* ডাকঘরের অমলের চরিত্রেও গৃহত্যাগ ও প্রকৃতি-অনুরাগের সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির উপর ঐকান্তিক বিরাগ দেখা যায়। অমল এবং তার আচারপন্থী প্রাচীন অভিভাবক মাধব দত্তের সংলাপে কবি কারুণ্যের সঙ্গেই পুঁথির পাণ্ডিত্যের অত্যাচার এবং তা থেকে মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক মুক্তির আগ্রহ বর্ণনা করেছেন—

অমল। পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জানতে পারে।

মাধব দত্ত। বেশ! তাও বুঝি জানো না।

অমল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছু পড়িনি—তাই জানি নে।

মাধব দত্ত। দেখো, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা সব তোমারই মতো—তারা ঘর থেকে তো বেরোয় না।

অমল। বেরোয় না।

মাধব দত্ত। না, কখন বেরোবে বলো। তারা ব'সে ব'সে কেবল পুঁথি পড়ে—আর কোনো দিকেই তাদের চোখ নেই। অমলবাবু, তুমিও বড় হ'লে পণ্ডিত হবে—ব'সে ব'সে এই এত বড়ো সব পুঁথি পড়বে—সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

অমল। না না, পিসেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না, পিসেমশায়, আমি পণ্ডিত হব না। —ইত্যাদি

শিক্ষণ-পদ্ধতির সংস্কারক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি কোন্ গভীরে তা-ও এসকল দৃষ্টান্ত থেকে অনুমিত হতে পারে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুমনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার যে আয়োজন চলছে তা তাঁর শিক্ষামূলক প্রবন্ধাবলীতে এবং লিপিকার 'তোতা-কাহিনী' নামক করুণরসাত্মক রূপকটির মধ্যেও কবি ব্যক্ত করেছেন। এরই মর্মে তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারা প্রবর্তন, যার মধ্যে কাব্যস্বপ্ন ও সহজ বাস্তবের আশ্চর্য সমন্বয়। শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি যে-কোনো বিষয়েই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা তাঁর অন্তরের সহজ উপলব্ধিরই নৈতিক প্রকাশ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ অন্তরের দিক থেকে তাঁর প্রতিভার মর্মে যেমন স্বভাব-পরিণামধর্মের অধিকারী হয়েছেন, তেমনি বাইরে সর্বমানবের ক্ষেত্রেও ঐ স্বভাব-পরিণামধর্মের প্রতিফলন দেখতে চান। আর রবীন্দ্রনাথের ধর্মোপলব্ধি সহজ স্বকীয় উপলব্ধি ব'লেই এদেশীয়-

* দাদু—ক্ষিতিমোহন সেন।

মরমী সাধকদের সঙ্গে তাঁর এত মিল দেখতে পাওয়া যায়। অমল চরিত্রের দ্বিতীয়াংশে রাজার চিঠির জন্যে প্রতীক্ষমাণ অমল, খেয়া-শারদোৎসব-গীতাঞ্জলির কবির সঙ্গেই তুলনীয়—যিনি বিস্ময়ব্যাকুলতাসহকারে নিসর্গের মধ্যে অরূপের আগমন-সংকেত লাভ করছেন। অথবা গীতিমাল্যে যেমন এই সহজ মিলনের অনুভব ব্যক্ত হয়েছে—'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর' প্রভৃতির মধ্যে। যে-অমল রাজার কাছে কোনো প্রয়োজনের প্রার্থনা করে না, কেবল দেশে দেশে চিঠি বিলি করার দায়িত্ব নেয়, মানুষের সঙ্গে মিলন চায়, সে আর কেউ নয়, কবি স্বয়ং। শেষ দৃশ্যে অমলের নিমীলিতাবস্থা যে মৃত্যু এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। আর সুধার উক্তি অনুসারে, অমল পৃথিবী থেকে বিযুক্তও নয়। অরূপানুভব জীবনেই লভ্য।

রাজা, অচলায়তন এবং ডাকঘর, ভাবের দিক থেকে তিনটি নাটকের ঐক্য অনুধাবন করবার বিষয়। তিনটি নাটকেই অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে; প্রথমটিতে স্বার্থবাদী অসামাজিক সুদর্শনার, দ্বিতীয়টিতে সংস্কারে অবরুদ্ধ পঞ্চকের, এবং তৃতীয়টিতে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন অমলের। অমল পঞ্চকেরই স্ফুটতর সংস্করণ, অধিকতর করুণ। তিনটিতেই নাট্যের শেষের দিকে রাজা আত্মপ্রকাশ করেছেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিবেশে। তিনটিতেই দাদাঠাকুর বা ঠাকুরদা অরূপের ইঙ্গিতবহ দূতরূপে এসেছেন।

বস্তুত এই 'ঠাকুরদা' চরিত্রটির মাধ্যমেই নব-ঈশ্বর সম্পর্কে কবির উপলব্ধি ও বক্তব্য নানাভাবে বিবৃত হয়েছে। ঋতু-উৎসব বিষয়ক এবং প্রত্যক্ষভাবে আধ্যাত্মিক নাটকগুলির মধ্যেই এই চরিত্রের আবির্ভাব ও পূর্ণতা, যদিও পূর্বলিখিত প্রায়শ্চিত্ত নাটকের নিঃস্পৃহ তেজস্বী ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে ঠাকুরদার আংশিক প্রকাশ ঘটেছে।* অধ্যাত্ম-পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে 'রাজা' নাটকেই ঠাকুরদার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাটকে ঠাকুরদা নৈসর্গিক ঈশ্বরের স্বরূপকেও প্রকাশ করছেন, আবার নিজেকেও প্রকাশ করছেন। শারদোৎসবে যেমন ঠাকুরদা 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে, আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে' ইত্যাদির মধ্যে বিস্ময়সহকারে অরূপকে প্রত্যক্ষ করছেন, তেমনি এখানেও নিসর্গরসের ধারায় ঐ সুন্দরের আগমন অনুভব করা হয়েছে। সেখানে শরৎ, এখানে বসন্ত—

আজ দখিন দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো!

* 'প্রায়শ্চিত্ত' আলোচনা দ্রঃ।

ঠাকুরদা গৃহত্যাগী, বিশ্বের সঙ্গে যেখানে ঈশ্বরের একাত্মতা ('নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয় আমাদের আপন মনে') সেখানে বিশ্বোপলব্ধির উদার ক্ষেত্রে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের যোগ সাধন করেন। সুতরাং বাইরের প্রকৃতি এবং মানুষই তাঁর সর্বস্ব, সংকীর্ণ গৃহের কোনো বন্ধন তাঁর নেই। বিশ্বাত্মবোধের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে অনায়াস যোগস্থাপনের ফল একদিকে যেমন প্রত্যক্ষতার আনন্দ, আর একদিকে তেমনি সুবিপুল দুঃখ, কারণ, কবির উপলব্ধি অনুসারে ধ্বংস এবং সৃষ্টি, মৃত্যু এবং জীবন উভয়ই বিশ্বের রূপ—একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে গ্রহণ করা যায় না। তার উপর গৃহে লালিত আরামের শয্যাতল শূন্য হ'লে সমাজবর্তী পথের দুঃখই প্রধান হয়ে ওঠে। কবি ঠাকুরদার চরিত্রে এই দুঃখকে আনন্দরূপে বরণ করার আগ্রহ নিম্নলিখিত অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিগুলিতে প্রকটিত করেছেন—

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।

সর্বনাশকে সানন্দে বরণ করার এই যে উৎসাহ এ ঠাকুরদা-শ্রেণীর চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং কবির উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী। প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্ত-ধারায় 'ধনঞ্জয় বৈরাগী' এবং রক্তকরবীতে 'বিশু পাগল' নিবিড় আনন্দের সঙ্গেই বন্দীত্বের দুঃখ গ্রহণ করেছে। মহাকবির কাব্যজীবনের প্রথম থেকে যদিচ আত্মবিসর্জনের উচ্ছ্বাসময় তীব্রতা ও আত্মবিস্মৃতির অলৌকিক আনন্দ তাঁর চিত্তে বার বার সঞ্চারিত হয়েছে (সোনার তরীর 'ঝুলন', চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে', কল্পনার 'বর্ষশেষ' ও 'বিদায়', উৎসর্গের 'মরণমিলন' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য), তথাপি অরূপ-উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত এবং জন্মমৃত্যুর সাময়িক অস্তিত্বে বিশ্বাসী কবি যে-ঐকান্তিকতার সঙ্গে জীবনের এই লৌকিকভাবে অবাঞ্ছিত দিককে এখন বরণ ক'রে নিচ্ছেন, তা অবশ্যই পূর্বেকার রোম্যান্টিক চেতনা থেকে পৃথক্, পরিণাম হ'লেও স্বতন্ত্র। বর্তমানে কবি বলছেন 'আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়', এবং এই ভালোবাসায় নিমগ্ন হয়েই, অর্থাৎ, ভয়ংকর ও সুন্দরের মিলিতরূপে যিনি রহস্যময় ও আনন্দ-সংবিৎময় গোপন কক্ষে উপলব্ধির যোগ্য, তাঁকে উপলব্ধি ক'রে তবেই কবি তথা ঠাকুরদা সর্বনাশের পথে অগ্রসর হতে পারছেন। অন্তরের মধ্যে যার আবির্ভাবে ঘরবাহির একাকার হয়ে যায়, পার্থিব সুখদুঃখবোধ, লাভক্ষতির হিসাব থাকে না, মানসলোকে যার নৃত্যচ্ছন্দে—

কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে

এবং অপার্থিব আনন্দরূপ অমৃতে চিত্ত পূর্ণ হয়ে যায়, তাকে প্রাপ্তির অবস্থায় পার্থিব স্বার্থবোধ তিরোহিত হওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার মাধ্যমে একজন মানবিক ভাবে প্রবুদ্ধ ও জীবন্মুক্ত যোগীর চিত্রই অঙ্কিত করেছেন।* এবং জীবনের সঙ্গে অরূপের যোগসাধনে একপ্রকার অভিনব বৈরাগ্যের পন্থা নির্দেশ করেছেন। এ বৈরাগ্য বিশ্বত্যাগের নয়, বিশ্বকে সম্পূর্ণ গ্রহণ ক'রে পার্থিব আরাম ও ভোগসুখের অতীত হয়ে নিষ্কাম আনন্দে প্রতিষ্ঠিত মানবানুরাগীর বৈরাগ্য। ঠাকুরদার চরিত্রে একদিকে যেমন গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষির আদর্শ, অন্যদিকে তেমনি বাউলদের জীবনাদর্শের মিল দ্রষ্টব্য। জীবনকে গ্রহণ ক'রে জীবনের কেন্দ্রবর্তী অন্তরতম মানুষের অনুসন্ধান এবং শাস্ত্রনির্দিষ্ট মার্গ পরিত্যাগ ক'রে অন্তর্মুখী নিষ্কাম ও মানবিক সাধনার দ্বারা সেই আদর্শে নিজেকে উন্নয়ন বাউল-সাধনার মূল কথা; মরমী রবীন্দ্রনাথের এই স্বরূপ ৺ক্ষিতিমোহন সেন ও ৺উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আলোচনা করেছেন।

কিন্তু এই দাদাঠাকুর লক্ষণীয়ভাবে সমাজ-বিপ্লবেরও গুরুস্থানীয়। প্রথানির্ভর অথবা রাষ্ট্রিক অথবা ধনতান্ত্রিক শোষণ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য আত্মবিসর্জনময় সংগ্রামের ইনি উৎসাহদাতা। ঠাকুরদা চরিত্রের অনৈহিক-তার দিকটি ইতিপূর্বে আমরা উদাহরণ সহকারে দেখিয়েছি। তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্রীড়া-রসিকতা। শারদোৎসবে ছেলের দল নিয়ে তিনি পথে বেরিয়েছেন, 'রাজা'য় বসন্তোৎসবে তিনি সকলের আনন্দের সাথী, অচলায়তনে শোণপাংশুর সঙ্গে বনভোজনে ব্যস্ত, ডাকঘরেও তিনি ছেলে খেপাবার সর্দার—'ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়োবয়সের খেলা।' অথচ এই বালস্বভাব চরিত্রের উপর যোদ্ধার তেজ ও সংস্কারকের নৈপুণ্যও কবি আরোপ করেছেন। এখানে তিনি কঠোর-কোমল অরূপের যোগ্য প্রতিনিধি—গুরু, এবং যাবতীয় শৃঙ্খল-মোচনের প্রেরণাদাতা প্রায় অবতার-স্বরূপ। মনে হয় শারদোৎসবের ঠাকুরদা ও সন্ন্যাসী মিশ্রিত হয়ে পরে ঠাকুরদার একটি সম্পূর্ণ মূর্তি গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মসংস্থার আদর্শে অনুপ্রাণিত না হ'লেও ভারতীয় ধর্মাদর্শের গুরুবাদ ও অবতারবাদ তাঁর অধ্যাত্ম আদর্শে একটি নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে এমন

* তু° গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ' প্রভৃতি, পঞ্চম অধ্যায়ের 'ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য' প্রভৃতি এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং' প্রভৃতি। এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বহুশঃ কথিত সর্বভূতে সমদর্শী, করুণা ও মৈত্রীর আধার জীবন্মুক্ত ভিক্ষুর দৃষ্টান্ত।

ধারণা অযৌক্তিক হবে না; আর এই চরিত্রে মরমী কবি যে যথাসম্ভব নিজেকেই প্রতিফলিত করেছেন সহৃদয় পাঠক তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন।

আমরা আলোচ্য পর্যায়ে এসে দেখলাম রবীন্দ্র-কবিমানসের একটি দার্শনিক গঠন রয়েছে, যদিও কোনো নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ অনুসরণ বা স্থাপন করা কবির অভিপ্রায় নয়। আর সাধারণভাবে এই শ্রেণীর কাব্যের পাঠে বা গীতরসপানে যদিও বাধা নেই, তথাপি, পূর্ণতম রসাস্বাদনের প্রয়োজন-বশেই পাঠকদের এই আভাসিত দর্শনস্বরূপ হৃদয়ংগম করা অবশ্য কর্তব্য।*

রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভার স্বকীয় কোনো দার্শনিক সত্তা আছে একথা অনেক পাঠকের কাছেই অস্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সকলের অস্বীকারের মূলে সমান যুক্তি বিদ্যমান নেই। কেউ কেউ মনে করেন, কবিরা যেহেতু কল্পনাময় ভাববিলাসের সুতরাং মিথ্যার স্রষ্টা, সে মিথ্যা যতই উন্নত ও সুন্দর হোক না কেন, তাঁরা দ্রষ্টা হতে পারেন না। তাঁদের মতে কাব্যে মননের স্থান নেই ব'লে বস্তু ও বিশ্ব-সম্পর্কে সম্যগ্‌জ্ঞান কবিদের আয়ত্তে নেই। কেউ রবীন্দ্র-নাথে, সাধারণ কবিদের মত কেবল প্রেম, স্নেহ, প্রকৃতিপ্রীতিই নিরীক্ষণ করেছেন, তদতিরিক্ত অরূপানুভূতির কোনো মূল্য দেননি, আবার কেউ কেউ তাঁর বিপুল কাব্যসৃষ্টিতে উপনিষদাদির প্রভাব ছাড়া আর কিছুই দেখেননি। সুতরাং এ প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে, রবীন্দ্রনাথে আভাসে থাকলেও দার্শনিকতা কেন অনুসন্ধান করব তার উত্তর দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আমরা অবশ্য এরকম প্রশ্নের জবাব কতক পরিমাণে প্রস্তাবনায় ও অন্যত্র দিয়েছি। তথাপি এখানে সংক্ষেপে কারণগুলি বর্ণনা করা প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করছি।

রবীন্দ্রনাথ যদিচ অতুলনীয় কবিস্বভাবের অধিকারী ছিলেন, তথাপি কতকগুলি সাধারণ প্রেম, প্রকৃতি বা জাতীয়ভাবমূলক কাব্যসৃষ্টিতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় ব্যক্ত হয়নি। তাঁর সমস্ত সৃষ্টিই অসাধারণত্বে মণ্ডিত এবং তাঁর কাব্যধারার একটি ক্রমবিকাশ আছে। এই ক্রমবিকাশের সূত্রে অতিশয় প্রবল ও সূক্ষ্ম রোম্যান্টিক আনন্দ-চৈতন্য ধীরে ধীরে অনির্বচনীয় রসরূপ

* আমরা পূর্বের অধ্যায়ে প্রয়োজনবশে ক্রোচের কাব্য-দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি এবং পরবর্তী অধ্যায়ে বের্গসঁর কথাও বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করব। এখানে প্রসিদ্ধ ধর্মীয় ও দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির কথার অবতারণা করা হচ্ছে।

ও স্বকীয় কাব্যিক ঈশ্বরানুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার ফলে মহাকবি-সুলভ ধ্যান-দৃষ্টিতে জীবন ও সমাজ-দর্শন কবির পক্ষে সম্ভব হয়েছে। মনে হয় যেন পূর্বকল্পিত একটি নির্দিষ্ট ঐক্যমূলক পরিণাম সূত্রে কবির গতিশীল কাব্যধারার বিকাশ ঘটেছে—যা অন্য কোনো কবির প্রতিভায় দুর্লভ-দর্শন। যুগের দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় এই আবির্ভাবের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্যের এবং সংস্কৃতের জীবনমুখী রোম্যান্টিক কাব্য-ধারা এবং এদেশীয় ভাববাদীদের জীবনমুখী অধ্যাত্মসাধনার ধারা। এ দুয়ের প্রথমটি দার্শনিক-স্বভাব-সম্পন্ন এবং দ্বিতীয়টি পরিস্ফুটভাবে দার্শনিক। উচ্চকোটির গীতিকবির কল্পনা এবং ধ্যানীর ধারণার মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য বেশি নেই (বৈষ্ণব-দর্শন তু°) তা রবীন্দ্রকাব্য-পাঠে আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি। সর্বসংস্কারমুক্ত নির্মল কবিস্বভাব তার স্বক্ষেত্রে যে স্বতই সাধকদের অভিলষিত তুরীয় অবস্থার প্রায় অধিকারী হতে সক্ষম তা রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিশেষভাবে দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে ফরাসী মনীষী ব্রেম'র বিচারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে পারি। ব্রেম' ধর্মপ্রবণ মানস এবং গভীর সমীক্ষণ শক্তি নিয়ে রোম্যান্টিক গীতিভাবুক কবিদের এবং মিস্টিক্ সাধকদের অনুভবের নৈকট্য দেখিয়েছেন তাঁর Pure Poety এবং বিশেষভাবে Prayer and Poetry নামে উল্লেখ্য গ্রন্থদ্বয়ে। রবীন্দ্রনাথ উচ্চকোটির গীতি-কবি ব'লেই সাধক-সুলভ আত্মদর্শন-শক্তি সহজেই তাঁর আয়ত্তে ছিল। যথার্থ কবি ও ধ্যানী ভাব-সাধকের মানসিক সাধর্ম্যের স্বরূপ 'ডাকঘর' নাটকে কতকটা বিবৃত আছে।* ঐ নাটক আলোচনার প্রসঙ্গে Religion of Man বক্তৃতার সাক্ষ্য নিয়ে কবির কাব্যে সহজ কাব্যধর্মী অধ্যাত্মদর্শন কী প্রকারে সম্ভব হয়েছে তা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্য যাবতীয় সৃষ্টির মূলে স্বকীয় উপলব্ধি-বিশিষ্ট একক কবিমানস বিরাজ করছে। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল চিন্তাশীল মনীষী নন, তাঁর বিভিন্ন চিন্তাশীলতার মূলে যে প্রজ্ঞানময় একটি ঐক্যের উপলব্ধি রয়েছে, তা তাঁর কাব্য-নাটক ছাড়া অন্যবিধ রচনাও প্রমাণ করে। অবশ্য আমরা তাঁর আত্মদর্শন ও বিশ্বদর্শনের বিচারকালে যথাসম্ভব তাঁর কাব্যসৃষ্টির উপরেই নির্ভর করেছি। খেয়া, শারদোৎসব, গীতাঞ্জলি প্রভৃতির আলোচনায় কবির অধ্যাত্ম-অনুভূতির স্বরূপ আমরা উদাহরণ সহকারে বিশ্লেষণ করেছি এবং সংক্ষেপে নির্দেশ করেছি যে, অখণ্ড একটা উপলব্ধিই কবির কাম্য বটে, কিন্তু তিনি সৃষ্টির নানাত্বকে স্বপ্নবৎ অলীক এবং

* সাধর্ম্য বা নৈকট্য আছে মাত্র, কবি-মিস্টিক এবং সাধক-মিস্টিক ঠিক একজাতীয় জীব নন, এই কথাটি সর্বত্র মনে রাখতে পাঠকদের অনুরোধ জানাই।

ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে মায়া ব'লে পরিত্যাগ করতে চান না। এ সকলকে তিনি পারমার্থিক সত্য ব'লেই মনে করেন এবং এর মধ্যেই অদ্বৈতের বিহারলীলা অনুভব করেন। এতাবৎ তাঁর কাব্যপাঠে আমরা যে সিদ্ধান্তগুলিতে এসে পৌঁছাই, কোথাও কোথাও পুনরুল্লেখ হলেও সেগুলির বিবৃতি এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন হবে না ঃ

প্রাকৃতিক রমণীয়তার মধ্যে কবি যেন বিশেষ কোনো একটি সত্তার আবির্ভাব লক্ষ্য করেন।

কাব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই সত্তার উপলব্ধির সঙ্গে অব্যবহিত-ভাবেই কবির অন্তরে একটি আনন্দ-চৈতন্যময় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

যাকে আমরা সাধারণভাবে সৌন্দর্য বা রমণীয়তা ব'লে মনে করি, যেমন ফুল, শরৎ-প্রভাত, নীল আকাশে ভাসমান সাদা মেঘ প্রভৃতি—কেবল তা-ই যে কবির চিত্তে এই সত্তার অনুভূতি জাগরিত করে তা নয়, এর বিপরীত যে প্রাকৃতিক ভাব, যেমন দুর্যোগময়ী কৃষ্ণা রজনী, বজ্রপাত, প্লাবন প্রভৃতি, তা-ও অবিকৃতভাবে ঐ সুন্দরের অনুভূতি জাগায়। 'খেয়া' থেকে আরম্ভ ক'রে এযাবৎ আমাদের আলোচনায় এই বিষয়টি প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

প্রকৃতিগত এই দুই বিপরীত অনুভূতির মধ্যস্থতায় আগত একের লীলা সম্পর্কে সচেতনতা ঋতুপরিবর্তনের মধ্য দিয়েও কবির মনে উদ্ভূত হয়েছে। বিশেষত পৌষের রিক্ততা ও বসন্তের পূর্ণতা তাঁর অন্তর্লোকে পার্থিব ধ্বংস ও সৃষ্টির পর্যায়ক্রমে আবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে এবং কবি এর থেকে ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলায় মত্ত রুদ্রের অনুভূতিতে এসেছেন। কবির বিজ্ঞান-ভিত্তিক মহাকাশ দর্শনের বহু কবিতায় ('আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য) এবং ঋতুনাট্য-গুলিতে বা নটরাজ-ঋতুরঙ্গে কবির এই অধ্যাত্মদৃষ্টির পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়।

এই কাব্যিক দ্বৈতাদ্বৈতদৃষ্টিসম্পন্ন কবি প্রকৃতি-জগৎ থেকে মানুষের জগতে, ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে, অনায়াসে পদক্ষেপ করেছেন এবং আমাদের প্রেম স্নেহাদি পার্থিব আনন্দ-অনুভূতিতে তো বটেই, বিপদ বাধা বিপ্লব মৃত্যু প্রভৃতির মধ্যেও ঐ একেরই উদ্দেশ্যমূলক সঞ্চরণ লক্ষ্য করেছেন। সংঘাতমুখর দুঃখের জীবনের প্রতি যৌবন থেকেই কবির যে একটি রোম্যান্টিক আকর্ষণ ছিল তা তাঁর অদ্বয়দৃষ্টির উন্মেষে সার্থক হয়ে উঠেছে এবং একটি সামাজিক সত্যোপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে। কবির বৈশিষ্ট্য এই যে, যাকে স্থূল বিষয়ানন্দ বলা যায় তা থেকে তিনি যেমন আনন্দরসে উত্তীর্ণ হতে পারেন, প্রাণীর স্বাভাবিকভাবে অনভিলষিত দুঃখ থেকেও তেমনি। বরঞ্চ তীব্র দুঃখবোধ থেকেই কবির গভীরতর আনন্দোপলব্ধি ঘটে। দুঃখকে আনন্দরূপে উপলব্ধি করার বিষয় সম্পর্কে গীতাঞ্জলির 'বিপদে মোরে রক্ষা

করো এ নহে মোর প্রার্থনা' প্রভৃতি মৃত্যু-উত্তরণের গানগুলি, 'বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান' প্রভৃতি, গীতিমাল্যের 'নয় এ মধুর খেলা' প্রভৃতি, গীতালির 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার,' 'ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়', নটরাজের 'নৃত্যের তালে তালে'—প্রভৃতি অসংখ্য গান এবং বলাকার সংস্কারমুক্ত গতিশীলতার ও মৃত্যুবরণের কবিতাগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই যে অরূপের উপলব্ধিতে কবি এলেন তা কবির কাছে বিশ্ববহির্ভূত বা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন বায়ুভূত নিরালম্ব কোনো তত্ত্ব নয়। কবি হিসাবে তাঁর বোধের তত্ত্ব হ'ল ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ থেকে রসময় প্রজ্ঞানে যাওয়ার তত্ত্ব। বিশ্ব ছাড়া অরূপের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কবি স্বীকার করেন না, এবং তিনি মনে করেন যে মানুষের উপলব্ধির বাইরে কোনো তত্ত্ব নেই। অর্থাৎ বহির্বস্তু এবং মনের সংযোগ-সম্পর্কে তিনি আস্থাবান্ এবং তুরীয় বিজ্ঞানবাদী নন, তবে ভাববাদী। বস্তু ও মনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বাইরে কোনো সত্যবস্তু যে থাকতে পারে না একথা নির্বিশেষ-সত্য-বাদী Einstein-এর সঙ্গে তাঁর আলাপের কিয়দংশে তিনি পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করেছেন—

> E. The problem begins whether Truth is independent of our consciousness. We attribute to turth a superhuman objectivity ; it is indispensable for us, this reality which is independent of our existence and our experience and our mind—though we cannot say what it means.........
>
> T.......Science has proved that the table as a solid object is an appearance, and therefore that which the human mind perceives as a table would not exist if that mind is naught. At the same time it must be admitted that the fact, that the ultimate physical reality of the table is nothing but a multitude of separate revolving centres of electric forces, also belongs to the human mind......if there be any truth absolutely unrealated to humanity then for us it is non-existing....if there be some truth which has no sensuous or rational relation to the human mind it will ever remain as nothing so long as we remain human beings. ("The Religion of Man'—পরিশিষ্ট দ্রঃ)

বলা বাহুল্য, কবি প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্বকীয় অনুভূতি ছাড়া শাব্দপ্রমাণে বিশ্বাসী নন।

এইজন্য, নিগুর্ণ নিরুপাধি ব্রহ্ম মানুষের তথা কবির ধারণার বাইরে ব'লে, কবির উপাস্য নয়। ঐ গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'But as our religion can only have its significance in its phenomenal world comprehended by our human self, this absolute conception of Brahman is outside the subject of my discussion.' অন্যকথায়, ঈশ্বর বা অনন্ত সান্তের মধ্য দিয়েই আপনাকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করছেন, বিশ্বের অন্তর্বর্তী না হ'লে এই সত্তা মিথ্যা ('আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে')। এই লীলাময় অরূপ-সত্তাই বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট থেকে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নামরূপের—অসংখ্য বৈচিত্র্যে, বিশেষ ক'রে মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করছেন।

সুতরাং মানুষী প্রেম, স্নেহ, প্রকৃতিপ্রীতি এসবের কিছুই ব্যর্থ নয়। এমনকি, কাব্য, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাষ্ট্র, প্রভৃতি যাবতীয় মানুষী সৃষ্টি সবই অর্থপূর্ণ। ঋতুবৈচিত্র্যের মধ্যে যেমন সুন্দররূপে, তেমনি ভূকম্প প্লাবনের মধ্যেও সমভাবে চলে অরূপের লীলা। যেমন, স্নেহপ্রীতিময় সমাজ-স্থিতির মধ্যে তেমনি সংঘাতমুখর সমাজবিপ্লবের মধ্যেও অরূপের সঞ্চরণ। এসকলকে গ্রহণ ক'রেই অরূপ-উপলব্ধিতে জীবন্মুক্তি। চলমান অভিযাত্রী মানুষই অরূপপথের পথিক।

কবি তাঁর এই দার্শনিক উপলব্ধির Ethics-এর দিকও নানা জায়গায় বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে করণীয় হ'ল জীবনকে বাস্তবভাবে গ্রহণ ক'রে অরূপানুভূতিকে জাগিয়ে তোলা, এবং এর জন্য সংকীর্ণ স্থূলবাসনাময় জৈব জীবনের বিষয়সুখ বিসর্জন দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ সৌন্দর্য-উপলব্ধিতে কামনা পরিত্যাগ করতে হবে, প্রকৃতি-প্রীতিতে বা মানব-প্রীতিতে প্রয়োজনের সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। এইভাবে নিষ্কাম হয়ে রসাবিষ্ট চিত্তে যে অবস্থা অনুভব করা যায় তা-ই মর্ত্যজীবনে স্বার্থ-বিসর্জনময় অরূপোপলব্ধি। রসোপলব্ধিই ঈশ্বরোপলব্ধি। ঐ অবস্থা ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর নয়, ব্রহ্মাস্বাদেরই অবস্থা।

এই আদর্শের বাস্তব চিত্র কবি এঁকেছেন ঠাকুরদা চরিত্রের মধ্যে। ঠাকুরদা স্বার্থত্যাগী নিষ্কাম বৈরাগী (পূর্ব-আলোচনা দ্রঃ)। অরূপের সঙ্গে জীবনের সমন্বয় রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর চরিত্রে করেছেন এবং সর্বদাই অঙ্গুলিসংকেতে এই ঈশ্বর-সেবক আনন্দের উপাসক বৈরাগীকে দেখিয়েছেন। এই চরিত্রে অরূপসাধনায় সিদ্ধিলাভের দ্বারা জীবনকে ও বিশ্বকে সর্বতোভাবে বরণের যে ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা কবির একালের পরিণত ভাবাদর্শের নিদর্শন। অতঃপর আনন্দের তুল্যভাবে বিপদকে বরণ ক'রে বিশ্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলার কথা ফাল্গুনী, বলাকা প্রভৃতির মধ্যে প্রধানভাবে দেখা দিয়েছে।

দেখা যায়, বিশ্বের দুঃখরূপ সম্পর্কে কবির স্বকীয় বিশিষ্ট উপলব্ধি তাঁর সমূহ দার্শনিকতা ও ধর্মভাবের মূলে। তাঁর কৈশোরের কাব্যগুরু সৌন্দর্য-সাধক বিহারীলাল সৃষ্টির এই দুই আপাতবিরুদ্ধ রূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, কিন্তু দুঃখরূপকে আত্মস্থ করতে পারেননি। তাঁর 'সাধের আসন' কাব্যে এ সম্পর্কে স্বীয় মনোভাব নিবেদন করতে গিয়ে কবি প্রথমে সৌন্দর্যের দিক উপলব্ধি ক'রে বলছেন—

অহো! বিশ্ব-পরকাশী উদার সৌন্দর্যরাশি
জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত;
যেদিকে ফিরিয়া চাই সৌন্দর্যে ডুবিয়া যাই,
অত্যুল্লাসকরী অয়ি, পরম আনন্দময়ী!
কে তুমি মা! কান্তিরূপে সর্বভূতে বিভাসিত?

কবির প্রত্যক্ষানুভূতি থেকে যেহেতু বিশ্বের দুঃখময় দিক আবৃত থাকতে পারে না, সেইহেতু সজ্ঞানেই এই কবি বলছেন—

কেন এর অন্যদিকে যেন কিছু নাই ঠিকে,
পাপতাপ হাহাকার, ঘোর ধুন্ধুমার?
কত গ্রহ উপগ্রহ, সূর্য পড়ে অহরহ
কতই বিষম কাণ্ড ঘটে অনিবার?
হয়তো এদিক হবে প্রলয়-প্রবণ,
এদিকে যাইছে যাত্রী হইতে নিধন।
উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রলয় ধেয়েছে রঙ্গে,
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মরণ।

যে-মুহূর্তে কবির প্রলয় সম্পর্কে চিন্তা এল এবং একদেশদর্শী সৌন্দর্য-অনুভূতি অন্তর থেকে বিলীন হ'ল, কবি আক্ষেপ ক'রে ব'লে উঠলেন—

কোথা? কোথা? কোথা তুমি বিশ্ববিকাশিনি?
এস মা! ঘোরান্ধকারে তিষ্ঠিতে পারিনি।
তুমিই বিশ্বের আলো, তুমি বিশ্বরূপিণী।

অবশেষে রহস্যের সমাধান করতে না পেরে কবি সৌন্দর্যময়ীর অঞ্চলতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন—

হও অবোধের প্রতি প্রসন্না প্রকৃতি-সতী!
রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না।
না বুঝিয়া থাকি ভাল, বুঝিলেই নেবে আলো
সে মহাপ্রলয়-পথে ভুলে কভু ধাব না।

অথচ এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি তুলনা ক'রে দেখলেই বোঝা যাবে সৃষ্টির

দুঃখমৃত্যুর দিকটির এই দার্শনিক কবি সদ্ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এরকম ক্ষেত্রে উপলব্ধি হ'ল—

আমার সকল নিয়ে ব'সে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে-জন ভাসায়।

অথবা, কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

অথবা, প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,

অথবা, ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু
বাজাও জলদ-মন্দ্র হে।

যে বিশ্বপুরুষের নৃত্যচ্ছন্দে ধ্বংস-সৃষ্টি জন্ম-মৃত্যু এক হ'য়ে প্রতিভাত হচ্ছে 'সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়' নিমগ্ন হয়েই এই কবি সব কিছুকে আনন্দরূপ ব'লে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

দেখা গেল, কবি বিশ্বের মধ্যেই ঈশ্বরের লীলার অভিব্যক্তি নির্দেশ করেছেন এবং বিশ্বের বাইরে, মানুষের উপলব্ধির বাইরে কোনো তত্ত্বকে স্বীকার করেননি। এই ঈশ্বর নিজকে নিয়ত প্রকাশের জন্যে ব্যাকুল, মানুষী প্রেমের জন্যে অধীর, আবার মানুষও অনুরূপভাবে অরূপানুভূতি লাভের জন্যে ব্যগ্র। নানাত্বের মধ্যবর্তী (Unity in Diversity) অদ্বৈত প্রেমলীলা-তত্ত্ব পরিণামমুখী রবীন্দ্র-কাব্যের যা কিছু তত্ত্ব। আমরা প্রস্তাবনায় নির্দেশ করেছি যে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ভারতীয় অধ্যাত্মজীবন নানা আকারে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করছিল, আবার ঊনিশ শতকে পাশ্চাত্য জীবনাশ্রয়ী রোম্যান্টিক ভাবধারাও ভারতে প্রবেশ ক'রে পূর্ণতা লাভ করতে চেয়েছিল। উভয়ের মিলন ঘটল রবীন্দ্রনাথে। সে মিলনে কোনো ফাঁক রইল না, যেহেতু একটি ব্যাপক ও প্রায় স্বয়ংপূর্ণ দার্শনিক মতবাদের মধ্যে তা বিধৃত হ'ল—যাকে কতকাংশে ধর্মমূলক বিশিষ্টাদ্বৈত মতের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দেখা চলতে পারে। অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতের কয়েকটি শাখার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন

শাখা উৎপন্ন করলেন এমন ভাবতে ক্ষতি নেই। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বা বিশ্ব-ব্রহ্মবাদ তত্ত্ব কবির উপরি-উক্ত উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে অক্ষম, কারণ, ব্রহ্মের লীলাময়ত্বের দিক বিশ্বব্রহ্মবাদে পরিস্ফুট নয়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র Hegel-এর সঙ্গেই কবির বহুল-পরিমাণে মিল দেখা যায়। Hegel-এর মতই কবির অরূপ কেবল Absolute Being বা নির্গুণ সত্তা নয়, Becoming অর্থাৎ প্রকাশশীল, যা যা হচ্ছে হবে সবার মধ্যেই তার আত্মবিস্তার। Hegel ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শংকরের অনুযায়ী ঈশ্বরকে শুদ্ধ সাক্ষী মনে করেন না, বহুধা বিচিত্র ও বিরুদ্ধগুণ-সম্পন্ন বিশ্বের মধ্যে স্বয়ংনিযুক্ত ব'লে মনে করেন। Hegel-এর সঙ্গে কবির উপলব্ধির রীতিরও মিল রয়েছে। Hegel-এর মতে বৈচিত্র্য থেকে এবং প্রাথমিক ঐক্যানুভূতি থেকে বিরোধের মধ্য দিয়ে সমাধানরূপ একত্বে গিয়ে উপনীত হই। কবি গীতাঞ্জলির যুগে যে অরূপ-উপলব্ধিতে এসে পৌঁছেচেন তার পশ্চাতে তিনটি স্তর আমরা লক্ষ্য করেছি: (১) প্রকৃতির শান্তসুন্দর অবস্থার সঙ্গে কবিহৃদয়ের মিলন, (২) প্রকৃতির দুর্যোগময় রূপ ও বাস্তব জীবনের দুঃখবিপদের সঙ্গে ঐ শান্তাবস্থার বিরোধ, (৩) অরূপকল্পনায় এর সমাধান। এই ধারাগুলি ইতিপূর্বেই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কবি স্বয়ং 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে তাঁর উপলব্ধির ভূমিকায় দ্বান্দ্বিক গতিশীলতার কথা ব্যক্ত করেছেন (আত্মপরিচয় দ্রঃ)—"যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেননা, এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা।...কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেননা, আমাদের যে চিত্ত আছে সে-ও আপনার একটা বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব।.........যে-শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে।......এর পর থেকে বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্ব-প্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানব-লোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিলে? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন।......তারপর আমার রচনায় বারবার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে—জীবনে এই দুঃখবিপদ বিরোধ-মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব।"

কবির দ্বন্দ্বময় উপলব্ধির বিস্তৃত বিবরণই ঐ প্রবন্ধের মূলকথা। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধটিতে কবির স্বীয় কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যেরূপ ব্যক্ত হয়েছে অন্য কোথাও তেমন হয়নি। কিন্তু কবির হেগেলীয় চিন্তাধারার উন্মুক্ত প্রকাশ কেবল এখানেই নয়। দর্শন বা ধর্মবোধ যে বিচিত্রের মধ্যে বিরোধ থেকে সামঞ্জস্যে উপস্থিতি, তা-ও কবি নানাভাবে বিবৃত করেছেন, যেমন—

'এই যে দ্বন্দ্ব—মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ; এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পায়—যে সমাধানে পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বারবার আমি বলেছি।' অথবা—'এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ ক'রে এবং অতিক্রম ক'রে'।

এ সমস্ত হেগেলীয় চিন্তাধারার কথা। দেখা যায় কবি দার্শনিকের মত চিন্তার নির্দিষ্ট রীতি গ্রহণ না করেও শুদ্ধ ভাবানুভূতির মধ্যস্থতাতেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অন্তর্বর্তী সত্যটুকু মেনে নিচ্ছেন। এই কাব্যিক পদ্ধতি ও রীতি অবশ্য মধ্যযুগের ভারতীয় ভাববাদী ধর্মদর্শনের সঙ্গেও তাঁর সাজাত্য দেখায়। কিন্তু বিশ্বের নানাত্বের সত্যতা কবি যেভাবে অনুধাবন ও প্রতিষ্ঠা করছেন তাতে হেগেলের সঙ্গেই তাঁর মিল সমধিক হয়েছে। হেগেলের মতই তিনি সাধারণত্বকে বিশেষের মধ্যে অন্তভুর্ক্ত দেখতে চান, অনন্তকে সান্তের বা immanence-এর বাইরে দেখতে চান না, নিসর্গ-ব্যাকুলতা থেকে অরূপ-ব্যাকুলতায় পরিণাম নির্দেশ করেন। আর, কবি ব'লেই Concrete Concept-এরও তিনি অধিকারী। কিন্তু Hegel-এর সঙ্গে তাঁর যেখানে অমিল তা হচ্ছে Hegel তাঁর Absolute-কে পরিণামমুখী পরিবর্তন-রূপে ছাড়া স্বতঃপূর্ণসত্তা (Perfection) রূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম। অথচ দু'-একটি আলোচনার মধ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ধারণা অনুসারে তিনি শান্ত, শিব এবং সগুণ অদ্বৈতও। আমরা পরে দেখব Bergson-এর সঙ্গে অন্য বহু বিষয়ে মিল থাকলেও কবির এবিষয়ে গরমিল আছে। Bergson পরিবর্তনরূপে ছাড়া ঐক্যতত্ত্বকে দেখতে পারেননি, অথচ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের পরিবর্তন-রূপ উপলব্ধি করেন, কিন্তু অদ্বৈতের সঙ্গে যুক্ত ভাবেই বিরোধের সামঞ্জস্য দেখেন। মানুষের যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ তাঁতেই বিধৃত এবং তাঁর সঙ্গে মিলিতভাবেই পরিসমাপ্ত। তবু হয়ত বা এটুকু পার্থক্য অর্থাৎ এরকম সাময়িক অনুভব খুব একটা লক্ষণীয় ব্যাপার নয়। (তু°—'যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে, তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে', 'আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন 'পরে বাঁধা সবার কাছে', 'অসীম সে চাহে

সীমার নিবিড় সঙ্গ' প্রভৃতিরূপ শতাধিক উক্তি)। বলা বাহুল্য, রামানুজাচার্য তাঁর বিচিত্র-বিরুদ্ধের মধ্যবর্তী অদ্বৈতকে লৌকিক জীবনের এত কাছাকাছি নিয়ে যাননি। অথচ লীলার দিক উপলব্ধি ক'রে কবি মানুষের পূর্ণতার পথে দুঃখ-সাধনমূলক যাত্রার কথা যে-বলেছেন এবং তার নৈতিক ব্যবহারিক দিক সম্পর্কেও যেভাবে আলোকপাত করেছেন তাতে যেন Hegel-এর সঙ্গে তাঁর যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য এবং বিশিষ্ট সাধনমার্গের পথিক রামানুজাচার্যের সঙ্গেই তাঁর কতকটা সাদৃশ্য। Hegel বিরোধের সমাধানরূপে অদ্বৈতকে দেখেন না, বিরোধের মধ্যবর্তী সত্তারূপেই দেখেন। রবীন্দ্রনাথ রামানুজাচার্যের মতই সৎ-চিৎ-আনন্দ ও সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ প্রভৃতি ঈশ্বরের গুণ ও ধর্ম ব'লে মনে করেন, পার্থিব বৈচিত্র্যকে স্বীকার ক'রেও অদ্বৈতানুভূতির দিকে ধাবমান হন এবং চিৎ ও অচিৎ এর পরিবর্তনশীলতার মূলাধার অপরিবর্তন অথচ লীলাময় সত্তা রূপে নটরাজকে (বা বিশিষ্ট ব্রহ্মকে) দেখেন। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির সাময়িক বিরামরূপ প্রলয়ের এবং তারপর আবার নূতন সৃষ্টির ধারণা ব্যক্ত করেননি, সৃষ্টির প্রবাহকে অনাদি ও অনন্ত ব'লেই অনুভব করেছেন। এ বিষয়ে Bergson-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল আমরা বলাকা-পর্যায়ে দেখব। কবি রামানুজাচার্যের অনুসৃত কর্মবাদ মানেন না, আবার দুঃখ বিপদ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তিই সৃষ্টির লীলারহস্য ব'লে মনে করেন, এবং স্বার্থময় সংকীর্ণতা থেকে বা অহংবোধ থেকে রসানুপ্রাণিত বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিকেই জীবন্মুক্তি ব'লে গ্রহণ করেন ('ঠাকুরদা' আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

উৎসর্গ-শারদোৎসব থেকে আরম্ভ ক'রে কবির অরূপ-উপলব্ধির যে প্রকার আমরা বিবৃত করেছি এবং বলাকা থেকে আরম্ভ ক'রে ঋতুনাট্য ও নটরাজ প্রভৃতির মধ্যে যে মনোবিজ্ঞান-মূলক ঐক্যলীলাতত্ত্ব প্রকটিত হয়েছে, তা থেকে এই অনুমানে আসা সংগত হবে না যে কবি বিশ্বকে অরূপ থেকে স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা ব'লেও মনে করেন এবং দ্বৈততত্ত্বই কবির উপলব্ধির বিষয়। শব্দ-স্পর্শাদির মাধ্যমে কবির যে রসানুভূতি ঘটে—যাতে বিষয়ের স্বরূপ বিলোপ বা রূপান্তর হয়, তাতে বিষয়কে স্বতন্ত্র সত্তারূপে গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠে না। বস্তুত বিষয়ের মধ্যেই বিষয়ীর প্রকাশ ঘটছে ব'লে বিষয় বিষয়ীকে, কবির উপলব্ধি অনুসারে, একান্তভাবে পৃথক্ করছে না। বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীর স্থিতির ধারণাতেই বোধ হয় এ দ্বন্দ্বের সমাধান, আর এ সমাধান হেগেলীয়। 'চিত্রা' কবিতায় কবি সৌন্দর্য উপলব্ধি বিষয়ে যে তত্ত্ব বিবৃত করেছেন তাকে একটু প্রসারিত ক'রে অরূপরসোপলব্ধিতেও তাঁর উক্তির যাথার্থ্য বিবেচনা ক'রে দেখা যেতে পারে ; তা হ'ল এই—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
......অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।

দ্বৈতের বা বহুত্বের মধ্যবর্তী একত্বের উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের পূর্বে অর্থাৎ তাঁর মানসের একটি সম্পূর্ণ কাব্য-দার্শনিক গঠন প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর বহু রচনায় প্রপঞ্চ বা বিশ্বকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা ব'লে গ্রহণ করার কথা অবশ্য আছে, কিন্তু তা কবি-সাধারণ মনোবৃত্তি হিসাবেই আছে, যদিও প্রকৃতিকে গ্রহণ বা উপলব্ধির দিক থেকে একটি ঐক্যব্যাকুলতা তখনকার রচনাতেও নির্দেশ করা যেতে পারে। কিন্তু যাই হোক, তিনি ঐ পর্যায়েই থাকতে পারেননি এবং যেহেতু তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে, অরূপ-উপলব্ধিতে এবং তা থেকে অরূপ-জীবনের সমন্বয়ে পরিণাম ঘটেছে, সেইহেতুই তাঁর প্রতিভার অন্তর্নিহিত দার্শনিক সম্ভাব্যতার বিষয়ে আলোচনা চলছে। আর পরিণামপ্রাপ্ত উপলব্ধিতেও কবি যে দু'-একটি ক্ষেত্রে বিশ্বকে স্বতন্ত্র সত্তা ব'লে তাঁর উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন (যেমন 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী' কবিতায়), সেখানে তাঁর উক্ত আচরণ কবি-ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। তা ছাড়া সেখানে বিশ্ব ও ঈশ্বর উভয়ের স্বতন্ত্র সত্তা মনে ক'রে কবি লিখছেন না, বা এদের পারস্পরিক সম্পর্কের অনুভবও ব্যক্ত করছেন না। আমরা কাব্যের মধ্যে কবির ঐক্য-রসানুভূতির আগ্রহের স্বরূপ সম্পর্কে খেয়া-স্তরে পূর্বেই আলোচনা করেছি। বৈষ্ণবীয় দ্বৈতের (জীব ও ব্রহ্মের আত্যন্তিক পার্থক্য) সঙ্গে রবীন্দ্র-উপলব্ধির বিরোধ সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। বলা বাহুল্য, বিশেষভাবে **Hegel** এবং কতকাংশে ধর্ম-প্রেরণামূলক ব্যাপক বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ ছাড়া অন্য কোনো মতবাদের সঙ্গেই কবির উপলব্ধির অধিক সামঞ্জস্য পাওয়া যাবে না। আধুনিক বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার সঙ্গেও বিশিষ্টাদ্বৈতের নানান্ শাখার সাধনমার্গের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তা ছাড়া কবি আধুনিক পরমাণু-বিজ্ঞানমূলক বিশ্বদর্শনকে সম্পূর্ণ মান্য করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যে স্বার্থবাসনাময় কৃপণ লৌকিক জীবনের প্রতি (সাধারণভাবে লৌকিক জীবনের উপর নয়) বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর প্রতিভার বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় 'এবার ফিরাও মোরে' 'বর্ষশেষ' প্রভৃতি দু'-একটি জীবন-প্রেরণামূলক কবিতায় স্থূল বাসনাময় জীবন থেকে উত্তরণের প্রবল আগ্রহ কবি প্রকাশ করেছেন, যেমন—

মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

অথবা,

শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা-স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ-ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর জীবনের খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় ॥

আবার আর্ট বা সৌন্দর্যের বিশুদ্ধতা অনুভবের মধ্যেও, যেমন, চিত্রাকাব্যের উর্বশী, বিজয়িনী, আবেদন প্রভৃতি কবিতার ক্ষেত্রে, জৈব প্রয়োজনসম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়েছে। তবু অরূপানুভূতি লাভের পরই এই বৈরাগ্য দৃঢ়-ভূমিতে স্থাপিত হয়েছে। ঠাকুরদা চরিত্রে এবং ফাল্গুনী, বলাকা প্রভৃতি রচনায় এই ক্ষুদ্রজীবন-বৈরাগ্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। কবির প্রত্যক্ষ-আশ্রিত দার্শনিক অনুভবই তাঁর এই স্থির বৈরাগ্যের কারণ। তাঁর নীতিমূলক কবিতা-গুলির উৎপত্তি এই বৈরাগ্যবাদ থেকেই। এই বৈরাগ্য প্রকারে নূতন হ'লেও কার্যতঃ বৈদান্তিক বৈরাগ্যেরই মত। অবশ্য মায়াত্যাগ নয়, মায়াকে সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মূল্য দিয়ে জৈবতা থেকে মুক্তি পাওয়ার তত্ত্ব। অথবা লোভ, বাসনা স্বার্থ থেকে মুক্ত অবস্থায় বিশ্বকে গ্রহণ করা। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করা, কিন্তু লিপ্ত না হওয়া। কীভাবে তা সম্ভব? কবি বলছেন, ঠিক বাউলের মত অন্তরের ভোগকামনাহীন, পার্থিবতা-বিনির্মুক্ত মন নিয়ে রসাস্বাদন করতে হবে। তিনি বলেন, ভোগের মধ্যেই বৈরাগী তার একতারা নিয়ে ব'সে আছে। প্রশ্ন হ'তে পারে, পার্থিব সুখসম্পর্কগুলি গ্রহণ করলে বৈরাগ্য লাভ করা কি সম্ভব? যেমন, গীতায় বলা হয়েছে, 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ' ইত্যাদি? কবি বলেন, নিশ্চয়ই সম্ভব, কারণ পৃথিবীকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করছি। কেবল সুখ নয়, দুঃখকেও গ্রহণ করতে হবে—আনন্দময় চিত্তবৃত্তির বিশেষ অবস্থার সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হ'ল—যে মায়ামৃগী তোমাকে ভোলাচ্ছে ব'লে মনে কর, তার দুই শৃঙ্গ সজোরে ধারণ কর। একে আয়ত্ত ক'রেই মুক্তি। আর তা ছাড়া আকৃষ্ট না হয়ে পালাবই বা কেন, পালিয়ে লাভও নেই। বলা বাহুল্য, উদাসীন রসাভিলাষী কঠিন কবিচিত্ত না থাকলে সুখদুঃখ সম্বন্ধে

নির্বিকার আনন্দানুভব আসে না। আসুক বা নাই আসুক, তা অসম্ভব নয়। ঠাকুরদার চরিত্র-আলোচনায় এই বৈরাগ্যের দিক সম্পর্কে বলেছি, এবং বাউলশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যে ঐ ভোগমুক্ত সর্বনাশের পথিকের মধ্যে আদর্শ মানুষ কল্পনা করেছেন তা-ও দেখিয়েছি। গীতাঞ্জলি থেকে আরম্ভ ক'রে এই পর্যায়ের বহু গানের মধ্যে, 'অসংখ্য-বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ' প্রভৃতির মধ্যে কবি যে-মুক্তি চান তার নৈতিক জীবনের দিক ফুটে উঠেছে। প্রাচীন-ধারণার যাঁরা আজও রবীন্দ্রনাথকে ভোগবাদী এবং দেহবাদী ব'লে দূরে রাখেন তাঁদের প্রত্যয়ের জন্য আমরা শুধু 'গীতাঞ্জলি' থেকে তাঁর ভোগ-বাসনা পরিত্যাগের পরিস্ফুটভাবে সমর্থক কতকগুলি স্থান উদ্ধার করছি ঃ

(১) এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার।

(২) বাসনা মোর যারেই পরশ
করে, সে
আলোটি তার নিবিয়ে ফেলে
নিমেষে।

(৩) রাজার মত বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণিরতন হার—
খেলাধুলা আনন্দ তার সকলি যায় ঘুরে
বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার।

(৪) নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ
বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে।

(৫) আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ,
রাজসমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধুলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্র-আলোকে এসো। ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে ভোগ করতে চাইলেই ভোগ্যবস্তু পাওয়া যায় না। বিশ্বের প্রকৃতি তা নয়। বস্তুত অবিমিশ্র সুখ বিশ্বে হয় না, দুঃখও আছে। বিশ্বের এই বাস্তব দুঃখরূপকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবেই স্বীকার করেছেন। আয়োজন যে ভোগের নয় তা বোঝাতে গিয়ে কবি বলেছেন—

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল-সন্ধ্যাবেলা।
কতবার যে নিবল বাতি
গর্জে এল ঝড়ের রাতি
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।

* *

ওগো রুদ্র দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজল বুকে
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইক অবহেলা।

সুতরাং দুঃখ ও সুখ মিশ্রিত বিশ্বের চরমতত্ত্বকে জানলে অতঃপর সংসারে স্বার্থে আবদ্ধ হওয়ার প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই তিরোহিত হয়ে যায়। তখন নিরাসক্ত চিত্তে দুঃখকে আলিঙ্গন করতেই ইচ্ছা করে। সমগ্র 'গীতাঞ্জলি-গীতালি' কাব্য এই দুঃখ বরণের উৎসাহবাণীতে পূর্ণ—

এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা,
এই তো দুখের অগ্নিমালা,
এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি,
এই তো ভালো—

ঈশ্বরের উপর যে বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা বৈরাগী-মনে দুঃখকে আনন্দরূপে গ্রহণ করার শ্রেষ্ঠ সহায় তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ববর্তী বহু সাধকের মতই ঐকান্তিক অনুরাগের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। 'রাজা' নাটকের সেই—

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।

প্রভৃতি উক্তির সঙ্গে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি একত্র পাঠ করলেই কবিচিত্তে দুঃখবাদ, বৈরাগ্য ও ভগবদুপলব্ধির একত্রাবস্থানের স্বরূপ বোঝা যাবে—

ওরে ভীরু, তোমার হাতে
নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।

তুফান যদি এসে থাকে
তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখো ঢেউয়ের খেলা,
কাজ কি ভাবনায়।
আসুক-নাকো গহন রাতি
হোক না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।
এবং
গনি গনি দিনক্ষণ
চঞ্চল করি মন
বোলো না যাই কি না যাইরে।
সংশয়-পারাবার
অন্তরে হবে পার
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
এবং
শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয়-গান—প্রভৃতি।

ভারতীয় ভাব-সাধনারও এই শেষ কথা। ঈশ্বরে-বিশ্বাস-রূপ অঞ্জন অনুলেপন ক'রে সেই দৃষ্টিতে জীবনকে যথার্থভাবে দেখা এবং বাস্তব দিনযাপন ক'রে জীবন্মুক্তির সাধনা করা ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য এবং এই পর্যায়ে তা রবীন্দ্রনাথেরও প্রতিপাদ্য।

এর পরে 'বলাকা'য় কবির জীবন-দর্শন অরূপ-সমাহিত দৃষ্টিতে কী আকার লাভ করেছে যখন দেখব তখন গীতালির সঙ্গে (সুতরাং তার পূর্ব-বর্তী অরূপ-দর্শনমূলক কাব্য বা নাট্যকাব্যগুলির সঙ্গেও) ভাবের দিক থেকে বলাকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাটি প্রথমে স্মরণ করব।

কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের দার্শনিক পটভূমি বিচার করতে গিয়ে আর একটি বহুকথিত এবং সাধারণ্যে প্রায় স্বীকৃত তথ্যের মীমাংসা করা প্রয়োজন বোধ করি। তা হ'ল—রবীন্দ্র-কবিস্বভাবের উপর উপনিষদের প্রভাব। আমরা পূর্বে রবীন্দ্র-কবিস্বভাবের স্বাতন্ত্র্য ও পরিণামের পথে যাত্রার কথা বারংবার উল্লেখ করেছি এবং কাব্য-আলোচনার মূলে তা প্রমাণ করতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আর সেই সঙ্গে এই কথাও নিবেদন করতে চেয়েছি যে, কোনো ধর্ম শাস্ত্র বা তত্ত্বকে রবীন্দ্র-কবি-মানসের পূর্বে স্থাপন করলে এই কবি-স্বভাবকে

বোঝার পক্ষে বাধা হবে এবং কবিকৃতির প্রাপ্য ন্যায্য মর্যাদা থেকেও কবিকে বঞ্চিত করা হবে। বস্তুত বিশুদ্ধ রবীন্দ্র-কবিমানস যে পরিমাণে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, তা না ক'রে আজ পর্যন্ত আমরা তার স্থানে উপনিষদের আলোচনাই বেশী পরিমাণে করেছি। অথচ কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্র-কবিমানসের সাধর্ম্যের দিকটি প্রায় অবহেলিত রেখে দিয়েছি। যাই হোক, প্রভাবই বলা যাক বা অজ্ঞাতসারে স্বচ্ছন্দ অনুসরণ করাই বলা যাক, এ সকলকে যথাযোগ্য স্থানে মিলিত ক'রে একটি পূর্ণ কবিপ্রতিভার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা প্রায়শই হয়ে ওঠেনি।

রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম ও উপনিষদ্ চর্চার পরিবেশ এবং কবির পিতার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অবশ্য লক্ষণীয়। কবির কৈশোরে ও যৌবনে রচিত ব্রহ্ম-সংগীতগুলি, যেমন, 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে', কি 'তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন' প্রভৃতি এই প্রকার প্রভাবের নিদর্শন। কবির তপোবনাদর্শের প্রতি আকর্ষণ, এবং নৈবেদ্য কাব্য বা জাতীয়তামূলক প্রবন্ধাবলীর মূলেও হয়ত উক্ত পারিবারিক পরিবেশ সূক্ষ্মসূত্রে যৎসামান্য ক্রিয়া করেছে। কিন্তু উপনিষদের বাণীই যে তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের মূলে রয়েছে এরূপ ধারণা অকর্তব্য ব'লেই মনে করি, কারণ, তাতে অসাধারণতা-সম্পন্ন রবীন্দ্র-কবিস্বভাবের উপর দোষারোপ করা হয়। অর্থাৎ যদি বলা যায় যে 'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥' ইত্যাদিরূপ মন্ত্র 'বসুন্ধরা'র ন্যায় অতি সুন্দর কবিতার ও অদৃষ্টপূর্ব রোম্যান্টিক সর্বাত্মক অনুভূতির পশ্চাতে রয়েছে, অথবা, যেমন মনে করা হয়েছে যে 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে' ইত্যাদি 'দুই পাখি' শীর্ষক নিসর্গব্যাকুলতার কবিতায় মুণ্ডকোপনিষদের 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি মন্ত্রে কথিত বদ্ধ ও মুক্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে, তাহ'লে কবির স্বকীয়তা সম্পর্কে বিশ্বাস হারাতে হয়। এযুগের অন্য উত্তম কবিতাগুলিতে, যথা—সুরদাসের প্রার্থনা, মেঘদূত, অহল্যার প্রতি, সোনার তরী, মানস-সুন্দরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, উর্বশী, এবার ফিরাও মোরে প্রভৃতির মধ্যে যেমন উপনিষদের তত্ত্বের অনুসরণ নেই, তেমনি উপরি-উক্ত দুটি কবিতাতেও নেই। আমাদের ধারণায় রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভা মৌলিকতা-ধর্মী। তা ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো বচনের অনুসরণে কবিতা এত উত্তম হতে পারে তার দৃষ্টান্ত নেই, আর ঐ কবিতাগুলি পাঠ করতে গিয়ে পাঠকের তা মনেও হয় না। ওগুলি স্বকীয় কাব্যগৌরবেই প্রতিষ্ঠিত, উপনিষদের গৌরবে নয়। তবে রবীন্দ্র-কাব্যের স্থানবিশেষের সঙ্গে উপনিষদ্ বা বেদের স্থানবিশেষের যে মিল থাকতে না পারে একথা আমরা মনে করি না, যেমন অন্য বহু কবির রচনার

সঙ্গেও তাঁর কোনো কোনো পঙ্‌ক্তির মিল থাকতে পারে। আর, যদি একথা বলা যায় যে কবি-প্রতিভা তার নিগূঢ় ধর্মবশে অতীতের যা-কিছু আত্মসাৎ করতে চায় তাহ'লে সেরকম ক্ষেত্রেও 'প্রভাব' শব্দটির ব্যবহার অসমীচীন হবে। কারণ, এই প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব। প্রস্তাবনায় আমরা সংক্ষেপে নির্দেশ করতে চেয়েছি, যে, মহৎ কবিপ্রতিভা অতীত ও বর্তমানকে এমনকি ভবিষ্যৎকেও একসূত্রে গ্রথিত ক'রে মৌলিক-স্বভাব-সম্পন্ন হয়।

আর এক কথা। কবি রবীন্দ্রের কৈশোরের পরিবেশ আলোচনাকালে যেমন ব্রাহ্মধর্ম ও মহর্ষির কথা মনে করা হয়েছে, তেমনি ভুলে গেলে চলবে না যে ঐ পরিবারে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে-অকৃত্রিম বিশুদ্ধ সাহিত্যের হাওয়া বইয়েছিলেন এবং অক্ষয়চৌধুরী ও বিহারীলাল যে-রোম্যান্‌টিক সংগীত-সুধা পরিবেশন করেছিলেন, কিশোর কবি তা-ই সর্বতোভাবে গ্রহণ ও আকণ্ঠ পান করেছিলেন। এঁদের মধ্যস্থতায় একদিকে ইংরেজি রোম্যান্‌টিক কাব্য এবং অপরদিকে সংস্কৃত রোম্যান্‌টিক সাহিত্যের সঙ্গে কবির গভীর পরিচয় হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্ম ও উপনিষদ্‌ নিয়ে মহর্ষি বরং দূরে থাকতেন এবং তিনি পুত্রের কল্পনালোকে স্বেচ্ছাবিহার নিয়ন্ত্রিত করেছেন এমন কোনো প্রমাণ তো নেই-ই, বরংচ বিরুদ্ধ প্রমাণই আছে (জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয় প্রভৃতি দ্রঃ)। উপনিষদের কয়েকটি মন্ত্র আবাল্য উচ্চারণ করতে কবি অভ্যস্ত থাকলেও সেগুলি তাঁর একেবারে আত্মস্থ হয়ে স্বকীয় হয়ে পড়েছিল এমন ধারণা অযৌক্তিক। কবির চিত্তে তখন রোম্যান্‌টিক নিসর্গ-প্রীতি, রোম্যান্‌টিক সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা। কবি তখন নূতন কল্পলোকে ধাবমান্‌, উপনিষদ্‌ কাকে প্রভাবিত করবে? তাই উপনিষদ্‌ সেই সময় যদি কোনো প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে বলা যায়, বা কবি যদি কোথাও উপনিষদের অনুকরণ করেছিলেন, তা কবির প্রতিভার অপরিচায়ক ঐকালের কতকগুলি প্রায়-ফরমায়েশি ব্রহ্ম-সংগীতে। কবির নিজের উক্তি থেকে এ সম্পর্কে প্রমাণ সংগ্রহ করতে চাইলে দেখা যায় 'জীবনস্মৃতি' নামক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে উপনিষদ্‌ সম্পর্কে কবি অত্যন্ত নীরব। অন্যত্র নানা উক্তির মধ্যে কবি আমাদের জানিয়েছেন যে এযুগে প্রকৃতি-ব্যাকুলতাই তাঁর প্রধান অনুভূতি, উপনিষদের মন্ত্রের জীবাত্মা-পরমাত্মাসম্পর্ক বা ঈশ্বরতত্ত্ব নয়। তাঁর **Religion of Man** গ্রন্থে তিনি শুধু গায়ত্রীমন্ত্রের প্রভাবের (তা-ও অস্পষ্ট অনির্বচনীয়ভাবে অনুভূত) কথা উল্লেখ করেছেন এবং সর্বত্র নিসর্গ-ব্যাকুলতাজাত অরূপ-উপলব্ধির স্বকীয়তার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। পূর্বে খেয়া শারদোৎসব প্রভৃতি আলোচনার প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে প্রমাণ উদ্ধার করেছি। এ বিষয়ে 'জন্মদিনে' প্রবন্ধে (আত্মপরিচয় দ্রঃ) কবি যা বলছেন তা আমাদের বিবেচনা ক'রে দেখবার বিষয়: "জন্মকাল থেকে আমার যে-প্রাণরূপ রচিত হয়ে

উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটেনি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টিপথে প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনীর প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হয়নি। এই বিশ্বরচনায় বিস্ময়করতা আছে, চারিদিকেই আছে অনির্বচনীয়তা, তার সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারেনি আমার মনে কোনো পৌরাণিক বিশ্বাস, বিশেষ পার্বণ-বিধি। আমার মনের সঙ্গে অবিমিশ্র যোগ হতে পেরেছে বিশ্বদৃশ্যে……"—ইত্যাদি।

'পথে ও পথের প্রান্তে'র চিঠিতে কবি এক জায়গায় লিখেছেন—"ঐ প্রতিদিন প্রভাতের কাঁচা সোনাকে কিছুতেই একটুও ম্লান করতে পারেনি, আর আমার দ্বারের কাছে নীলমণিলতা যে উচ্ছ্বসিত বাণী আকাশে প্রচার করছে আজ পর্যন্ত সে একটুও ক্লান্ত হতে জানল না। আমি ঐখান থেকে আমার জীবনের মন্ত্র নিতে চাই, কোনো গুরুভার গুরুবাক্য থেকে নয়……"

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রত্যক্ষ অনুভূতি ছাড়া শাব্দ প্রমাণে কবি বিশ্বাস করেন না। বাল্যজীবন সম্পর্কে কবি যেখানেই উল্লেখ করেছেন সেখানেই প্রকৃতির সঙ্গে স্বকীয়ভাবে গঠিত নিজ আত্মিক যোগের কথা বলেছেন। উপনিষদ্ সম্পর্কে কবি যেখানে উল্লেখ করেছেন সেখানেই তার সুর ও ধ্বনিমন্ত্রের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। প্রাচীন ভারতের যে তপোবনাদর্শে কবি উদ্বুদ্ধ হয়ে পরে ধর্মাদর্শ তথা উপনিষদের মধ্যে প্রবেশ করেন, সে তপোবনাদর্শ তিনি কালিদাসের কাব্য থেকেই পেয়েছিলেন, উপনিষদ্ থেকে নয় (উক্ত 'আত্মপরিচয়' দ্রঃ)। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা জীবনাশ্রয়ী ব'লেই উপনিষদের তাত্ত্বিকতা থেকে কালিদাসের কাব্য তাঁকে বেশি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে উপনিষদ্ বা বেদ থেকে কদাচিৎ কোনো কল্পনা বা তত্ত্ব গ্রহণ করলেও তাঁর কবিমানসের মূলে সমগ্রভাবে উপনিষদের বা বেদের প্রভাব স্বীকার করা যায় না, এবিষয়ে তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য মানতেই হয়।

আমরা মনে করি, উপনিষদকে যদি রবীন্দ্রনাথ কখনো আত্মীয়ভাবে গ্রহণ ক'রে থাকেন তা 'নৈবেদ্যে'র পূর্বে নয়। তার পূর্বে বরংচ 'চৈতালি'তে কালিদাসের তপোবনাদর্শ এবং 'কল্পনা' কাব্যে প্রাচ্যকাব্যাদর্শ অনুসরণের স্পৃহা দেখা যায়। 'নৈবেদ্য' রচনার পূর্বে 'উপনিষদ্-ব্রহ্ম' (পরে 'ব্রহ্মমন্ত্র') রচনার মধ্যেই কবিকে প্রথম স্বকীয়ভাবে উপনিষদের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এইজন্য নৈবেদ্যের মধ্যে উপনিষদের বহু মন্ত্রের ভাব ইতস্তত নানা আকারে বিক্ষিপ্তও দেখা যায়, যদিও এদের সমঞ্জসীকরণের ধারাটি কবির নিজের। আমরা এ সকল কথা পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম থেকেই উপনিষদের প্রভাব সম্পর্কে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁদের বিবেচনার জন্যে আরো দু'টি কথা আমরা বলতে চাই। একটি

হ'ল এই যে, উপনিষদ্ কোনো পরিস্ফুট দার্শনিক মতবাদ নিয়ে রচিত হয়নি। বিভিন্ন ঋষি তাঁদের উপলব্ধি বিভিন্নভাবে বিবৃত করে গেছেন, একে সমঞ্জসীভূত যুক্তিতর্কপ্রতিষ্ঠ কোনো দার্শনিক রূপ দেওয়ার প্রয়োজনবোধ তাঁরা করেননি। পরবর্তীকালে এর উপর নির্ভর ক'রে বহু যথার্থ দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে। এই সকল মতবাদে উপনিষদের বহু বচন নানা দার্শনিকের স্বকীয় মতানুসারে ব্যাখ্যাত হয়েছে। অতএব যাবতীয় দর্শনের বীজরূপ উপনিষদের উপর নির্ভরশীল কোনো একটিমাত্র দার্শনিক মতের দাতা-গ্রহীতারূপ সম্পর্ক স্থাপন অনুচিত। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের দ্বারা প্রভাবান্বিত এমন কথা অত্যন্ত ব্যাপক কথা মাত্র এবং তাঁর কাব্যের বিশেষ আলোচনায় এমন ব্যাপক উক্তিও অযৌক্তিক। কারণ, তখনই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, উপনিষদের পরস্পরবিরুদ্ধ নানা উক্তির মধ্যে এবং তা নিয়ে গঠিত নানা মতবাদের মধ্যে কোন্‌টির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত ?

এইরূপ যুক্তিসংগত প্রশ্ন থেকে আমরা আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্যটির মধ্যে উপনীত হচ্ছি। তা হ'ল এই যে উপনিষদের মন্ত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বকীয়ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, যেমন হয়েছে পূর্বেকার বিভিন্ন মনীষীদের দ্বারা। কবি আপনার কাব্য ব্যাখ্যাকালে অথবা ধর্ম ও আদর্শ-সম্পর্কে ভাষণের কালে, উপনিষদের বহু বাণী যদ্যপি উদ্ধার করেছেন, সেগুলিকে স্বকীয় উপলব্ধির সমর্থক হিসাবেই অন্তরে গ্রহণ করেছেন। তা যদি না হ'ত অর্থাৎ কবি যদি উপনিষদকে স্বীয় মনের অনুকূলভাবে গ্রহণ না করতে পারতেন তাহ'লে গ্রহণ করতেনই না ; কারণ, পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় কতকগুলি বিশেষ মন্ত্র কতকগুলি বিশেষ অর্থেই কবির প্রিয়, উপনিষদের সব বচন নয় এবং পূর্বসূরীদের অর্থে নয়।

মহর্ষির আত্মজীবনী পাঠে জানা যায় যে ধর্ম নামক বস্তুটি তিনি প্রথমে স্বকীয়ভাবে হৃদয়ে লাভ করেছিলেন (তু—হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতং—মনু) এবং পরে উপনিষদের সঙ্গে স্বীয় উপলব্ধি মিলিয়ে নিয়েছিলেন। ঐ আত্মজীবনীতে তিনি বিবৃত করেছেন যে অসংখ্য উপনিষদের কণ্টকারণ্যে পরস্পর-বিরোধী অগণিত মতবাদের ভিড়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের (যা তাঁর হৃদয়ে উপলব্ধ) জন্য কোন্ কোন্ উপনিষদ্ ও কোন্ কোন্ মন্ত্র গ্রহণীয় তা তাঁকে বিচার করতে হয়েছে। এবিষয়ে তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিসমূহ প্রণিধানযোগ্য—"দেখিলাম যে, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে উপনিষদের সম্পর্ক মহর্ষির ধর্মের সঙ্গে উপনিষদের সম্পর্কের চেয়েও অধিকতর সুদূর বই আর কিছুই নয়। বস্তুত কবি স্বীয় কাব্যজগতের উপলব্ধিকে পরবর্তী কোনো-না-কোনো সময় উপনিষদের বাণীর সঙ্গে স্বকৃতভাবে মিলিয়ে নিয়ে সন্তুষ্টি বোধ করেছেন মাত্র। ধর্ম, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি বক্তৃতামালায় বা প্রবন্ধে স্বীয় ধর্মবোধ বা জীবনদর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে উপনিষদ্ থেকে তাঁর উপলব্ধির সমর্থক মন্ত্র মাত্র উদ্ধার করেছেন। অথচ পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় কবিকৃতির উৎসমূলে উপনিষদ্ খোঁজবারই চেষ্টা করেছেন। এ কথা ভেবে দেখেননি যে কবি যে-অর্থে উপনিষদ্‌কে গ্রহণ করলেন সেই অর্থ নিয়েই আবার তাঁকে প্রভাবিত বলা যুক্তির দিক থেকে ভ্রান্তিময়। আমরা উপনিষদের কয়েকটি মন্ত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়ভাবে উপনিষদ্‌কে গ্রহণের নিদর্শন দেখাতে চাই :

ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' মন্ত্রটি সম্বন্ধে কবি বলেছেন যে এই মন্ত্রটি বার বার তাঁর কাছে নূতন নূতন অর্থ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। 'তেন ত্যক্তেন (ভুঞ্জীথাঃ)' এর অর্থ করেছেন 'তাঁহার দ্বারা যাহা দত্ত, যাহা কিছু তিনি দিতেছেন' (ঔপনিষদ ব্রহ্ম)। এই ব্যাখ্যা মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মসম্মত এবং শাংকর ভাষ্যের অনুকূল। এই অংশের রামানুজাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন 'তেন হেতুনা ত্যক্তেন ত্যাগেন', অর্থাৎ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে। এই ব্যাখ্যাই রবীন্দ্রনাথ পরে গ্রহণ করেছেন।

'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে 'স্তব্ধ' শব্দকে রবীন্দ্রনাথ স্থির, ধ্রুব, অপরিবর্তিত অর্থে গ্রহণ করেছেন (প্রাচীন ভারতের একঃ—ধর্ম)। অথচ শ্রীরামানুজের ব্যাখ্যায় দেখছি স্তব্ধ অর্থাৎ যিনি কারো কাছে প্রণত হন না।

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদির মধ্যে 'আনন্দ' শব্দের অর্থ শংকর-রামানুজ মতে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, অন্যত্র 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন' ইত্যাদিতে 'ব্রহ্মের উপাসনারূপ আনন্দ'। মহর্ষি মোটামুটি এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ 'আনন্দ' বলতে ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ রূপরসাদির অনুভবের পরিণামাবস্থাকেই নির্দেশ করেছেন। কবির মতে এই অনুভবই সত্যবস্তু। 'সাহিত্যের পথে' নামক সমালোচনা পুস্তকের 'কবির কৈফিয়ৎ' থেকে কবির ব্যাখ্যা দেখা যাক—

> 'আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সবচেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সংপ্রযন্ত্যভিসং-

বিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে। এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলতে চান জগতে পাপ নাই দুঃখ নাই রেষারেষি নাই।...................কিন্তু কবির বীণায় বারাবর বাজিবে—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ....সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে আলোক-বীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে—আনন্দং সংপ্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি—যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধূলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার জন্য নহে।'

'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যাও তিনি কবি-হৃদয়ের, কবি-স্বভাবের অনুকূলভাবেই করেছেন। শুক্লসন্ধ্যায় আকাশ জ্যোৎস্নায় উপচে পড়েছে...........বলি, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সেই যে যৎ, আনন্দ-রূপে যার প্রকাশ, সে কোন্ পদার্থ।' অমৃত শব্দের শংকর ও রামানুজ মতে ব্যাখ্যা 'দেবতাত্মভাবম্'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'অমৃতের দুটি অর্থ—একটি যার মৃত্যু নেই, এবং যা পরম রস। আনন্দ যে রূপ ধরেছে এই তো হ'ল রস। অমৃতও যদি সেই রসই হয় তবে রসের কথা পুনরুক্ত হয় মাত্র। কাজেই এখানে বলব অমৃত মানে যা মৃত্যুহীন—অর্থাৎ আনন্দ যেখানে রূপ ধরেছে সেইখানেই সেই প্রকাশ মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে।'

এখানে আবার মহর্ষির সঙ্গে কবির মতৈক্য দেখতে পাই—'যখন সেই সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্মকে এই অসীম আকাশস্থিত জগতের শোভাসৌন্দর্যের মধ্যে দেখি, তখন দেখি যে আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।' আনন্দং ব্রহ্মণো ইত্যাদিকে কিন্তু মহর্ষি 'ব্রহ্মের আনন্দ' ব'লেই অভিহিত করেছেন। আবার 'যাত্রার পূর্বপত্র' প্রবন্ধে এবং শান্তিনিকেতন ভাষণমালার 'অমৃতের পুত্র' প্রভৃতিতে, এমনকি 'মানুষের ধর্ম' বিশ্লেষণেও কবি সংগ্রামী ও অভিযাত্রী মানুষের সংঘাতক্ষুব্ধ জীবনের মধ্য দিয়ে অগ্রগতিকেই অমৃত-পথ ব'লে নির্দেশ করেছেন।

'আবিঃ' শব্দকেও রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ আনন্দরূপে প্রকাশের অর্থে গ্রহণ করেছেন—'কিন্তু যিনি আবিঃ যিনি প্রকাশরূপ, আনন্দরূপে যিনি ব্যক্ত হচ্ছেন।' ('সাহিত্য'—সাহিত্যের পথে)

'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' এ অংশের 'তপোঽতপ্যত' ইত্যাদির অর্থ শংকর ও রামানুজ উভয়েই একভাবে করেছেন—'তপ ইতি জ্ঞানমুচ্যতে। যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ.........স তপোঽতপ্যত তপ্তবান্ সৃজ্যমানজগদ্রচনাদিবিষয়াম্ আলোচনামকরোৎ' অর্থাৎ, তপঃ শব্দের অর্থ জ্ঞান; অন্য এক মন্ত্রে আছে যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ; তিনি

তপ করলেন অর্থে জগৎসৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করলেন। মহর্ষিও এঁদের অনুসরণ করেছেন—'তিনি বিশ্বসৃজনের বিষয়ে আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।' (আত্মজীবনী)। রবীন্দ্রনাথ এই 'তপস্যা' করার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দিচ্ছেন। আমাদের পার্থিব দুঃখানুভূতির সাদৃশ্যে তিনি ঈশ্বরেও ঐ প্রকার দুঃখানুভূতির কল্পনা করেছেন। নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাংশ দ্রষ্টব্য ঃ

> 'সেই তাঁর তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি'। (দুঃখ—ধর্ম)

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ' ইত্যাদির ব্যাখ্যায় পথ অর্থে শংকরাচার্য আত্মজ্ঞান বা মুক্তির পথ মনে করেছেন—'পথঃ পন্থানং তত্ত্ব-জ্ঞানলক্ষণং..............জ্ঞেয়স্য অতিসূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিষয়স্য জ্ঞানমার্গস্য দুঃসম্পাদ্যত্বং' অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পথই পথ; জ্ঞেয় বিষয়ের অতিসূক্ষ্মত্বের জন্যে জ্ঞানমার্গ দুঃখকর। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুসারে, লৌকিক বিঘ্ন-বিপৎসংকুল পতন-উত্থান-বন্ধুর পন্থা। বাস্তব জীবন-সংগ্রামের গৌরব কবি এইভাবে বিবৃত করেছেন—"অতএব প্রভাতে যখন বনে উপবনে পুষ্পপল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা তাহাদের সহজশোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ আপন দুঃসহ দুঃখ আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না? ....সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার—তাহার সংগ্রামক্ষেত্র, সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়-চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখ-দুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে—কারণ, মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ—'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।" (মনুষ্যত্ব—ধর্ম)।

'ভয়াদগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ' ইত্যাদির ব্যাখ্যায় শংকর এবং রামানুজ 'ভয়াৎ' শব্দে 'তাঁর শাসনের নিয়মানুবর্তী হয়ে' এরূপ অর্থ করেছেন। মহর্ষিও তাঁদের অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভয় শব্দের প্রয়োগকে বিশেষণে আরোপিত ক'রে তিনি ভয়ানক, তিনি গুহাহিত, তিনি জগতের দুঃখরূপ, এরকম অর্থ করেছেন।

এই আলোচনায় আমরা দিগ্‌দর্শন মাত্র করতে পারলাম। বিষয়টি বিস্তৃত-তর আলোচনা ও গভীরতর অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন কারণে, রবীন্দ্রনাথের মুক্ত কবিস্বভাব তত্ত্বের চাপে কোথাও বাধাগ্রস্ত হয়নি ব'লেই আমরা মনে করেছি। তা নানাভাবে একটি স্বকীয় পরিণামের পথেই ধাবমান হয়েছে। সেই পরিণামের পথে কিভাবে আপনা থেকেই আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শ, পদাবলীর ভাষাভঙ্গি, সংস্কৃত রীতি ও সাহিত্যাদর্শ, কালিদাসের তপোবন, উপনিষদ এবং মরমী বাউলদের জীবন-সাধনা, আধুনিক বিজ্ঞান ও নির্যাতিত মানুষের আহ্বান সমন্বয়ধর্মী ও যুগোপযোগী মৌলিক রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভায় মিশে গেছে তার ইতিহাস আমরা চিত্রিত করবার প্রয়াস পেয়েছি। তত্ত্বের অনুসরণে মহৎকাব্যসৃষ্টি হয় না, এই অতি মূল্যবান্ ধারণা স্মরণে রেখে পূর্বনির্দিষ্ট শাস্ত্র বা তত্ত্ব দিয়ে কবিকে দেখার চেষ্টা করিনি। কবি নিজেও যে এরূপ দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না সে সম্বন্ধে তাঁর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু আত্ম-আলোচনামূলক উক্তি আছে। পূর্বপূর্ব আলোচনায় এরূপ কয়েকটি স্থান উদ্ধারও করা গেছে। সুপরিণত বয়সে 'চিত্রা' কাব্যের ভূমিকার (রচনাবলী দ্রঃ) শেষ কয় পঙ্‌ক্তিতে বেদনার সঙ্গে কবি যেখানে তাত্ত্বিক সমালোচকদের বিচারের প্রতিবাদ করেছেন, সেখানে তিনি এই কথাই জানিয়েছেন যে কেবল উপনিষদের অনুসরণে কাব্য হয় না ঃ

> 'লোক-জীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা ক'রে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং উপনিষদিক মোহ বিস্তার ক'রে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি—এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা ক'রে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন।'

প্রয়োজনবশে তিনি কাব্যরচনাতেও নানাস্থানে পূর্বনির্দিষ্ট তাত্ত্বিকতার ও তাত্ত্বিক পারিপার্শ্বিকের অনুসরণের প্রতিবাদ করেছেন এবং পাঠক-সাধারণকে বিভ্রান্তি থেকে সাবধান হওয়ার জন্য অনুনয় করেছেন, যেমন উৎসর্গের— 'বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে দেখো না আমায় বাহিরে' ইত্যাদিতে। ঐ কাব্যেই চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির একটি কবিতায় কবি বলছেন যে, কোনো কবি তাঁর অপার বিস্ময়দৃষ্টি তাত্ত্বিকদের কাছে পেতে পারেন না—

'আছি আর আছে'
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার আছে
শুধাইব অর্থ এর ? তত্ত্ববিদ্ তাই
কহিতেছে 'এ নিখিলে আর কিছু নাই,

শুধু এক আছে।'   করে তারা একাকার
অস্তিত্ব-রহস্যরাশি করি অস্বীকার।
একমাত্র তুমি জান এ ভব সংসারে
যে আদি গোপন তত্ত্ব,—আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া ॥

গীতিমাল্যে'র একটি গানের মধ্যে কবি দৃঢ়ভাবে বহিঃপ্রভাবকে অস্বীকার করলেন এবং স্বতোবিকাশশীল আত্মসচেতন কবিধর্ম সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নিজ ধারণা ব্যক্ত করলেন—

মিথ্যা আমি কী সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার।
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।
শুধাতে যাই যারি কাছে,
কথার কি তার অন্ত আছে—
যতই শুনি চক্ষে ততই
লাগায় অন্ধকার।

পূরবী-কাব্যের 'মুক্তি' কবিতায়ও মর্ত্যরসানুভূতির চরমতা বিষয়ে কবি-মনোভাব দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কবি তাঁর এই সর্বসংস্কারমুক্ত স্বাধীন মনোধর্মের বৈশিষ্ট্য সায়াহ্নের রচনা 'পত্রপুটে'র পনেরো সংখ্যক কবিতায় বিশেষ জোরের সঙ্গেই জানাতে চেয়েছেন। তিনি-যে কোনো বাঁধাধরা ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন, তাঁর মানস যে সহজভাবে বিকাশ লাভ করেছে এবং তাঁর সাধনা যে মধ্যযুগের কবীর, দাদূ ও মরমিয়া বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার সগোত্র তা এই কবিতাটিতে তিনি যেমন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন এমন আর কোথাও নয়, যেমন—

কবি আমি ওদের দলে,—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
পূজারি হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে,
আমাকে শুধায়, "দেখে এলে তোমার দেবতাকে ?"
আমি বলি, "না।"
অবাক হয়ে শুনে, বলে "জানা নেই পথ ?"
আমি বলি, "না।"

* * *

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
রীতিবন্ধনের বাইরে আমার আত্মবিস্মৃত পূজা
কোথায় হল উৎসৃষ্ট জানতে পারিনি।

অতএব, রবীন্দ্র-রহস্যালোকের দীপবর্তিকা কবি স্বয়ং। কবিকে বুঝতে উপনিষদ্ সম্পর্কে যৎসামান্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন থাকলেও তা গৌণ। কবি ব'লেই একমাত্র কালিদাসের, বৈষ্ণব কবিদের বা ইংরেজি রোম্যান্টিক কবিদের বিশিষ্ট কল্পনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার মিল কোথাও কোথাও দেখা গেছে এবং তাকে প্রভাব বললেও রবীন্দ্র-প্রতিভা কতকাংশে কালিদাসাদির সমধর্মী ব'লেই তা ঘটতে পেরেছে এমন ধারণা করাই সমীচীন। অন্যথায় বিভিন্ন আদর্শের বশবর্তী হয়ে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে কবি কাব্য রচনা করেছেন, এমন অযৌক্তিক ধারণায় আসতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির তাত্ত্বিকতা বিশ্লেষণে কবিকে যদি মোটামুটি একজন বিংশশতকের নব্য-হেগেলীয় মনে করা যায়, অথবা, ভারতীয় বিশিষ্টা-দ্বৈত শ্রেণীর ভাব-সাধকদের পর্যায়ভুক্ত করা যায় এবং একান্ত দ্বৈতবাদী ধারণা থেকে তাঁকে মুক্ত ক'রেও দেখা যায়, তাহ'লেও একটা অপেক্ষিত প্রশ্ন আলোচনা করতেই হয়, তা এই যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব ভক্তদের সম্বন্ধ কী? রবীন্দ্রনাথ কি বৈষ্ণব কবি?* বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে রবীন্দ্র-নাথে অনেকেই বৈষ্ণবধর্মেরও প্রভাব দেখেছেন, এবং ভাষায় ও ভঙ্গিতে তাঁর কাব্যে ও নাট্যে বৈষ্ণবীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বেকার তত্ত্বালোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে যে-দার্শনিক মতবাদের মধ্যে ধ'রে দেখবার চেষ্টা করেছি তাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মোপলব্ধির সঙ্গে কবির উপলব্ধির মৌল পার্থক্যের দিকটি দেখানো হয়নি।

রবীন্দ্রনাথে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবদর্শন মূলতঃ বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা ও ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্র-কবিতার ভাষায় ও ভঙ্গিতে বৈষ্ণব পদাবলীর রূপ প্রকাশ পেয়েছে ব'লেই তাঁর আন্তর ধর্মের দিকে লক্ষ্য না রেখে তাঁকে বৈষ্ণব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমত গীতিকবি, দ্বিতীয়ত, বাঙালী কবি এবং তৃতীয়ত, অরূপসাধনার অংশগত ধর্মভাবুক কবি ব'লে বৈষ্ণব

* এ বিষয়ে লেখকের 'বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ' গ্রন্থের 'বৈষ্ণবীয়তা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধও পঠনীয়।

ভাবভঙ্গি অনায়াসেই তাঁর কাব্যে সংক্রমিত হতে পেরেছে। কারণ, এ ছাড়া কবির আত্মপ্রকাশের কোনো উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য থাকলেও এবং পদাবলীর সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্য স্বাদে বিভিন্ন হ'লেও অনেক সময় রূপে এক হ'য়ে পড়েছে। তাঁর কাব্যে পদাবলী-সাহিত্যের রূপকৌশলের বা ভঙ্গির অস্তিত্ব কোনো কোনো রসজ্ঞ পাঠককেও বিভ্রান্ত করেছে, যার ফলে কবির অরূপকে বৈষ্ণবীয় ঈশ্বর-রূপে অভিহিত করতে তাঁদের বাধেনি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'জীবন-দেবতা' যদিও ঈশ্বর নন, কবির অন্তরস্থিত কল্পিত চালকশক্তি বা ব্যক্তিত্ব মাত্র, তথাপি তার বর্ণনায় এবং স্তুতিবাদে কবি কল্পিত মধুর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন ও বৈষ্ণবীয় ভঙ্গি সম্পূর্ণ আরোপ করেছেন, যার ফলে ব্যক্তিগত জীবন-দেবতা ঈশ্বর-ভ্রান্তি ঘটাতে যথেষ্ট সমর্থ হয়েছে। পদ-সাহিত্যের অভিসারিকা, বাসকসজ্জা প্রভৃতির বাক্‌চিত্রও সেখানে বাদ যায়নি। গীতাঞ্জলি প্রভৃতি অরূপানু-ভূতিপ্রধান কাব্যেও অনির্বচনীয় অরূপের সঙ্গে কবি প্রভু-ভক্ত বা প্রিয়-প্রেমিক সম্পর্ক আরোপ করেছেন ব'লে এবং পূজা আরতি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেছেন ব'লে, কবির সঙ্গে অরূপের সম্পর্ক তত্ত্বতঃ পৃথক্‌ হলেও দৃশ্যত বৈষ্ণবীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। 'রাজা' নাটকে কবি যেন এইভাবে চূড়ান্ত ভ্রান্তি উৎপন্ন করেছেন। সেখানে তিনি সুদর্শনার 'স্বামী', 'পৃথিবীতে তাঁর মতো পুরুষ আর নেই', রাজার হৃদয়ে সুদর্শনা তাঁর 'দ্বিতীয়'। রাজা সুদর্শনার যে ভাবমূর্তি দেখতে চান তা বৈষ্ণবীয় বাসক-সজ্জারই নামান্তর—

ভরি লয়ে ঝারি　　এনেছ কি বারি,
সেজেছ কি শুচি দুকূলে।
বেঁধেছ কি চুল,　　তুলেছ কি ফুল,
গেঁথেছ কি মালা মুকুলে।

আবার, ঠাকুরদা রাজার 'বন্ধু' বা 'সখা', আর সুরঙ্গমা—

'আমি কেবল তোমার দাসী।......
বিনামূল্যে কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী।'

এই রাজা অরূপ, অথচ তাঁর হাতে বাঁশি বাজে—

'আমার রাজাটির নিজের নাকি কোন রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে। এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার... ...আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।'

অরূপানুভূতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে কবিকে এই যে বৈষ্ণবীয় ভাব-মণ্ডলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে তার অভ্যন্তরে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ঈশ্বর কিন্তু আবৃত হয়ে পড়েনি। তাঁর যে কোনো রূপ নেই, বিশ্বের বিচিত্র রূপের মধ্যেই অরূপভাবে তিনি যে প্রকাশমান, তিনি যে ভয়ংকর-সুন্দর, সুতরাং কবির ভাষায় 'অনুপম' তা নাট্যের মধ্যে সংলাপে গানে নানাভাবে ফুটে উঠেছে। ঐ নাটকে সুদর্শনাকে রাজা যখন প্রশ্ন করলেন 'আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না' এবং সুদর্শনা তার উত্তরে যখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের—বর্ণগন্ধগীতের অপূর্ব মোহের কথা উল্লেখ করলেন, তখন রাজা পুনরায় প্রশ্ন করলেন—'এত বিচিত্র রূপ দেখছ তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ?' (বৈষ্ণবতার সঙ্গে বিরোধ লক্ষণীয়)। বস্তুত কবির এই ভয়ংকর-সুন্দর অতি গভীর, সুদুর্দর্শ; অন্ধকারে অর্থাৎ গভীরতম দুঃখোপলব্ধির মধ্যে তিনি যেমন অনুভবগম্য, তেমনি সৌন্দর্যের সুখকর বৈচিত্র্যের মধ্যেও। তিনি যাবতীয় রূপের সঙ্গে যুক্তভাবেই প্রকাশমান। তিনি সুন্দর অথচ তিনি অন্ধকারের প্রভু, তিনি নিষ্ঠুর, তিনি ভয়ানক। এইজন্যই তিনি অনুপম। তিনি রসিকশেখর সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথ নরবপু শ্রীকৃষ্ণ নন।

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালিতে দৃষ্টিপাত করলেও দেখা যায় নিসর্গ-সৌন্দর্যেই অরূপের আবির্ভাব ঘটছে। 'সজল ঘন বাদল বরিষনে' তাঁকে আহ্বান করা হচ্ছে, শেফালিকা-বিকীর্ণ শিশির-সিক্ত পথে তিনি হেঁটে আসছেন, ঝড়ের রাত্রে তিনি অভিসারে বেরিয়েছেন। কখনো যদি বা তাঁর পদধ্বনি শোনা যায়, তাঁকে চোখে দেখা যায় না, কারণ, নিসর্গসৃষ্ট বিহ্বলতার মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করা যায় মাত্র। অপিচ তিনি নরদেবতা, পথের সাথী, বিপ্লবের পরিচালক, ব্যথাপথের পথিক। তিনি কোনো মন্দিরে আবদ্ধ নন; তিনি শুধু মনের মানুষ, তরীর মাঝি; তাঁর হাতে বাঁশি যদিও বাজে, তা বজ্রের মধ্যে বাজে। বৈষ্ণবদের ঈশ্বরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অরূপের একমাত্র অতি ব্যাপক মিল এই যে উভয়েই হৃদয়ানুভবগম্য। বৈষ্ণবদের সঙ্গে বাউলদেরও এই একমাত্র সাদৃশ্য।

বৈষ্ণবের ঈশ্বর মানবীয় বিভিন্ন অনুভবের দৃষ্টান্তে কল্পনীয়, কিন্তু মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে বেদ্য নন; তিনি প্রকৃতিতেও নেই, তিনি সমস্ত লৌকিকতা-মুক্ত অ-লৌকিক সত্তা। রতি, স্নেহ, প্রণয় প্রভৃতি ভক্তের ভাব-গুলিও অ-লৌকিক। বৈষ্ণবমতে মানবীয় প্রেম যত উচ্চস্তরেরই হোক না কেন তা স্বার্থমলিন, অথচ ঈশ্বরীর প্রেম 'শুদ্ধ গঙ্গাজল' 'নিকষিত হেম' 'কাম-গন্ধহীন'—'হেন প্রেমা নৃলোকে না হয়।' শান্তাদি যে পঞ্চরসে তিনি আরাধ্য তা-ও দিব্য। তিনি মূর্তিমান শৃঙ্গার, সর্বগুণাধার, সর্বরূপাশ্রয়। কৃষ্ণনাম

ছাড়া নাম নেই, কৃষ্ণরূপ ছাড়া রূপ নেই, কৃষ্ণগুণ ছাড়া জগতে কোনো গুণেরই অস্তিত্ব নেই। শোভা-সৌন্দর্য পুত্র-কন্যা ভাই-বন্ধু সব কৃষ্ণময়, কৃষ্ণব্যতিরেকে এদের স্বতন্ত্র স্থিতিই নেই। 'যাঁহা যাঁহা নেত্রে পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'। সুতরাং তিনি মূলে একমেবাদ্বিতীয়ম্, লীলারসবৈচিত্র্যের জন্য দ্বৈতভাবাপন্ন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে যদি বিশ্ব নেই তাহ'লে কিছুই নেই। বিশ্ব ছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। বিশ্ব তাঁকে ধ'রে রেখেছে, তিনি বিশ্বকে আবৃত ক'রে নিজে প্রকাশমান নন। দৃশ্যগন্ধগান হ'ল তাঁর প্রকাশের মাধ্যম। ঐ সকলের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে চিত্তে যে রসসঞ্চার হয়, তাতে স্থূল প্রয়োজনের জৈব জীবন পরিত্যক্ত হয় এবং রসপিপাসু আনন্দচৈতন্যময় অবস্থায় বিরাজ করতে থাকেন, আর তাতেই অরূপের স্পর্শ লাগে। তিনি কৃপা করে মানবদেহ ধারণ করছেন না, বাস্তব মানবদেহে, মানবীয় সুখ-দুঃখের মধ্যেই তিনি লভ্য হচ্ছেন। তবে স্থূল প্রয়োজনসম্পর্কে নয়, তার অতীত বাস্তব রসবিহ্বলাবস্থায়। বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে পান, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণকে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাধনমার্গ বৈষ্ণবের বিপরীতলক্ষণাক্রান্ত। একমাত্র বাউলদের সঙ্গেই তা কতক পরিমাণে তুলনার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সৃষ্টির বাইরে নন, মায়া তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি নয়, অন্তরঙ্গ স্বরূপ। তিনি বাস্তবভাবেই মায়াময়, লীলাময়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈষ্ণব ঈশ্বরের এই 'গুণীকৃত-বিশ্ব' অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রথম আক্ষেপ শোনা গেল 'বৈষ্ণব কবিতা' নামে সোনার-তরীর একটি কবিতায়। বৈষ্ণব পদাবলী কাব্য-সৌন্দর্যে অপরূপ, এর মানবীয় প্রেমসম্পর্কের চিত্র অদ্ভুত সুন্দর, অথচ লৌকিকভাবে, মানবপ্রেমের কাব্যরূপে এর রসগ্রহণ বৈষ্ণবধর্মসম্মত নয়। ঈশ্বরীয় ভাবে অনুপ্রেরিত হয়েই পদাবলী আস্বাদন করতে হবে, কারণ, এর রাধাও মানবী নন, কৃষ্ণও মানব নন, কেবল আরোপিত মানবীয়-প্রেমসম্পর্কে আবদ্ধ। মানবীয় প্রণয় এর অভিধাবৃত্তি মাত্র। ব্যঙ্গ্যার্থ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম। ব্যঙ্গ্যার্থে নিয়ে যাওয়ার জন্যই অভিধেয় প্রণয়ের যা-কিছু সার্থকতা। ফলতঃ আধুনিক কবি, যিনি বিশ্বের অতিরিক্ত ঐশ্বরিক সত্তা মানেন না, যিনি মানুষী প্রেমকেই ঈশ্বরীয় মনে করেন, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই 'বৈষ্ণব কবিতা'য় সংশয় প্রকাশ করলেন.—'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?'

> '... ... ... এত প্রেমকথা,
> রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
> চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
> আঁখি হতে।'

কবি বোঝেন না যে, যা দেবতাকে দিতে হয় তা প্রিয়জনকে দিতে নেই, যা প্রিয়জনের উপহার তা দেবতার পূজায় অচল।

প্রকৃতপক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ঈশ্বরকে তাঁর মহিমময় উচ্চাসন থেকে মানুষের দ্বারে নামিয়ে এনেছিল মাত্র, একেবারে মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলেনি। জীবের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ যদি বা করেছে, জীবকে দেবতারূপে দেখেনি। বাউলেরা বৈষ্ণবদের থেকে ভিন্নপথে আর একপদ অগ্রসর হয়েছিলেন মানবীয় সম্পর্কের মাধ্যমে দেবতাকে দেখতে চেয়ে, মানবের বাইরে নয়। মনের মানুষের অনুসন্ধান এবং পার্থিব আনন্দসম্পর্কের শ্রেষ্ঠ বস্তু যে প্রেম, তারই দেহবাসনামুক্ত অমানুষী রসাস্বাদ তাঁদের লক্ষ্য। বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবসাধনার এ এক অভিনব পন্থা। বাউলদের গানে যা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তা-ই রবীন্দ্রনাথে একটি সমঞ্জসীভূত পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঐ অমানুষী প্রেমবাদকে একটি বহুব্যাপক পটভূমিকার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখানে প্রকৃতি, সৌন্দর্য, স্নেহ, প্রীতি সব একাকার হয়ে পড়েছে, এক আনন্দরসাস্বাদের ঐক্যসূত্রে সকলই একত্র স্থানলাভ করেছে। অনাসক্ত ভোগবাদ, ত্যাগের দ্বারা চরিতার্থ ভোগস্পৃহা, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আগত বিষয়ানন্দকে ইন্দ্রিয়োত্তীর্ণ বিশুদ্ধ আনন্দে রূপান্তরিত করা—এই আর্টের মুক্তিই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কাম্য। এই হ'ল তাঁর অরূপানুভবের স্বরূপ এবং এইখানে তিনি সকলের থেকেই পৃথক্। এই অভিনব মুক্তিবাদ তিনি তাত্ত্বিকদের কাছ থেকে পাননি, তাঁর অন্তরে আপনা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এই চরম তত্ত্ব—

> মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস্ তত্ত্ব-শিরোমণির পিছে ?
> হায়রে মিছে, হায়রে মিছে।

সহৃদয় পাঠক লক্ষ্য করলে দেখবেন 'মুক্তি' কথাটি এই নূতন অর্থেই কবি সর্বত্র প্রয়োগ করেছেন।

> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি—সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।

এখানে ব্যবহৃত প্রথম 'মুক্তি' শব্দটি বিষয়কে সম্পূর্ণ বর্জন করে এমন চিরাচরিত বৈদান্তিক মুক্তি নির্দেশ করছে। দ্বিতীয় 'মুক্তি' কবির স্বকীয় উপলব্ধিগত অর্থযুক্ত। বিষয়কে গ্রহণ ক'রেই বাসনা থেকে আনন্দে উত্তরণের মুক্তি। সহজানন্দ। এই মুক্তি দুঃখেও সুখেও। কবির কাম্য এই মুক্তির স্বরূপ অন্যত্রও একই ভাবে বিবৃত হয়েছে—

এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা,
এই তো দুখের অগ্নিমালা,
এই তো মুক্তি এই তো দীপ্তি,
এই তো ভালো—

কবি যে মুক্তিই পেতে চান, স্বার্থজড়িত গতিহীন অবস্থায় বেঁচে থাকতে চান না, তা নিম্নলিখিত গানটিতে ব্যক্ত হয়েছে—

এই কথাটা ধরে রাখিস্,
মুক্তি তোরে পেতেই হবে,
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে।

কিন্তু পূরবীর 'মুক্তি' কবিতায় কবির অভিপ্রায় আরও স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হয়েছে এবং সেখানেও রসগত মুক্তির প্রতিই কবি নির্দেশ করেছেন—

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।
সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া,
সেথা আমি খেলা-খেপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া,
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।

কবির রচনার বহুস্থলেই বৈষ্ণবতার প্রতিবাদ স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভক্ত বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরকৃপা প্রার্থনা করেছেন। ঈশ্বরকৃপা ছাড়া ভক্তির উদয় হয় না, আত্মজ্ঞানও জন্মে না। "তে পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানু-গৃহীত এব হি জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

কবি বড় জোর বীর্যের সঙ্গে সুকঠোর সাধনপথে চলবার সাহস প্রার্থনা করতে পারেন—

ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল,

এইজন্য জ্ঞানহীন অ-সাধনলব্ধ 'উচ্ছল-ফেন ভক্তি-মদধারা' কবির অভিলষিত নয়। যে জীবনভাবুকতা বা প্রকৃতিভাবুকতার উপর কবির ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা তা পূরবীর 'ভাঙা-মন্দির' কবিতাটিতে চমৎকারত্বের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। এই কবিতাটি দেবতা সম্পর্কে লৌকিক ধারণা ও কবির ধারণা এ দুয়ের

বৈপরীত্যের উপর ভিত্তি ক'রেই লেখা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে সুন্দর আপনা থেকে ধরা দিচ্ছেন, ভাঙা মন্দিরে নাই বা দেবতা থাকল। অতিথি-সজ্জনের আগমন নেই, কিন্তু তাদের স্থান পূর্ণ করেছে বিহঙ্গেরা—

পূজার মঞ্চে বিহঙ্গদল
কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাহল,
তাই তো হেথায় জীববৎসল
আসিছেন ফিরে ফিরে।
নিত্যসেবার পেয়ে আয়োজন
তৃপ্ত পরাণে করিছে কূজন,
উৎসবরসে সেই তো পূজন
জীবন-উৎস-তীরে।

গীতাঞ্জলির 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে, অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে, কাহারে তুই পূজিস্ সংগোপনে, নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে দেবতা নাই ঘরে' প্রভৃতির মধ্যেকার এই অরূপ-তত্ত্ব তাঁর হৃদয়ে উপলব্ধ অন্তরতম সত্য। তা অভিনব এবং উনিশ শতকের পার্থিবতা-কলুষিত জীবন-কোলাহলের মধ্যে যুগোচিত জীবনাশ্রিত মুক্তির বাণীতে সার্থক।

রবীন্দ্রকাব্যে বাউলগানের পদ্ধতির অনুসরণ কিন্তু পদাবলীর মত অতটা বহিরঙ্গ নয়। যদিও একথা ঠিক যে, ধর্মসাধনা নিয়ে সমগ্রভাবে বাউলেরা কবিচিত্তে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারেনি। বিশিষ্ট করণ-কারণ ধ্যান-ধারণা নিয়ে বাউলেরা একটি আশ্চর্য ধর্মসম্প্রদায়, এর নানান্ শাখা, অগণিত পল্লব। এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই যে এককালে এই বাউলেরা তন্ত্র-মন্ত্রাদিময় সহজ সাধনপথের পথিক ছিলেন। নারী এই সাধনার ছিল মুখ্য অবলম্বন, পথ ক্ষুরধার। চর্যাগীতিকারেরা এই সম্প্রদায়েরই সিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের পদ্ধতি ঠিক কী ছিল তা জানবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু এই শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে ক্রমশ তন্ত্র এবং যোগের প্রভাব ক্ষীণ হ'য়ে আসে, সুফী প্রেমমার্গ আত্মবিস্তার করে। তারপর বৈষ্ণবভাবুকতার স্পর্শে নবকলেবর হ'লেও ধর্ম অত্যন্ত জটিল ও ছোট ছোট গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সব শতাধিক শাখায় বিভক্ত সহজিয়াদেরই সাধারণ নাম আমরা দিয়ে থাকি বাউল। এদের মধ্যে এমন দল থাকাও বিচিত্র নয় যাদের লক্ষ্য সকাম।

সকামই হোক, নিষ্কামই হোক, রবীন্দ্র-কাব্যচেতনার সঙ্গে এদের ভাবুকতার কিছু মিল গোড়া থেকেই রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পার্থিব স্নেহপ্রেমকে অনন্তে উত্তীর্ণ ক'রে দেখেন। এরই চরমতা খ্যাপন করেন। আবার তিনি অজানার যাত্রীও। ঠিক রবীন্দ্রার্থে না হ'লেও এঁরা গৃহধর্ম পালন করেন, প্রেমস্নেহ-নীড় এঁদের মুখ্য আশ্রয়। ভক্তি-সম্প্রদায় অথবা মায়াবাদী সম্প্রদায়ের মত সন্ন্যাস এঁরা প্রায়শই মানেন না। আবার এঁদের ধর্ম আচরণের মধ্যেই নিহিত। সে আচরণের পিছনে কোনো বিশেষ একটি যৌক্তিকতা বা দার্শনিক মতবাদ নেই। সহজ ভজন, মানুষের মর্মে প্রবেশ ক'রে সৃষ্টির অন্তরঙ্গ স্বরূপের অনুধাবন, এসব বিষয় কোনো তত্ত্বের মানদণ্ডে বিচার্য বা অনুসরণীয় নয়। যখন এঁরা বলছেন যে 'আলার ভিতর কালাটি রয়েছে' তখন এঁরা বৈষ্ণবদের কৃষ্ণকে নির্দেশ করছেন না, তাঁদের বিশিষ্ট প্রাণের ঠাকুরের কথাই বলছেন এবং সে পথের পথিক না হ'লে সে বস্তুটি যে কী তা বোঝবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তাঁদের অন্তরতম বস্তু যাই হোক না কেন, তা ঠিক সুনির্দিষ্ট পরিচিত ধর্মমতের মধ্যে ধরা পড়ে না ব'লেই তাকে নানাভাবে অভিহিত করার প্রয়াস এঁরা করেছেন। এসবের মধ্যে একটি হ'ল 'মানুষ', 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে'। একটি হ'ল অচেনা, অধরা, বিদেশী, অজানা। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের মিল। এঁদের সাধন-ভজন রবীন্দ্রনাথে না থাকলেও এঁদের প্রত্যাশার সঙ্গে সাধারণভাবে কবির উচ্চ-অভিলাষের যোগ লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর সহস্র গানে ও কবিতায় যে-অনির্দেশ্য সুদূরচারীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা ঠিক পূর্বেকার কোনো দার্শনিক মনন বা ধর্মমতের মধ্যে ধরা পড়ে না। এই সত্তা যদি শূন্যসত্তা নাও হয়, অদ্বৈত ব্রহ্মও নয়। সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট নারায়ণ বা ব্রজলীলারসিক কৃষ্ণও নন। তিনি নিজে একে সীমাবিহারী অসীম বা রূপমধ্যবর্তী অরূপ ব'লে অভিহিত করেছেন। নানা কারণে আমরা এই সত্তাকে বৈচিত্র্যবিরোধের মধ্যবর্তী হেগেলীয় একের সদৃশ ব'লেই মনে করেছি। যাই হোক্, নামরূপের মধ্যে থাকলেও কবির কাছে এ ধরা পড়বার নয়, তাই অজানা, অচেনা। এরই ঠিকানা না পাওয়ায় কবি ব্যাকুল হয়েছেন, সুদূরের সন্ধানে পারের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন বারবার।

সম্প্রতি ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যেসব বাউল গান সংগ্রহ করেছেন* তার অধিকাংশ নিগূঢ় ধর্মাচরণের বিষয় নিয়ে লেখা হ'লেও কয়েকটিতে

*'বাঙলার বাউল ও বাউল গান'

অজানার ঠিকানা জানার আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। এরকম কাব্যরসময় গীতের উপর নির্ভর ক'রে স্বভাবতই রোম্যান্‌টিক ও মিস্‌টিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাকে সুদূরলোকে প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন, বাস্তবজীবনকেও অরূপের রঙে রঞ্জিত করেছেন। আমাদের মনে হয়, বাউলদের অগণিত সম্প্রদায়ভেদের মধ্যে দু'একটি এমন সম্প্রদায়ও আছে যাদের মধ্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতির সাধন-ভজনের বাঁধন কম। অথবা এর গীতিকাররা বহুল পরিমাণে কবিও। উত্তম কবিত্বের স্পর্শ লাগলেই রচনা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হয়ে পড়ে। যে-কারণে মঙ্গলকাব্য কাব্য হয়েছে, বহু বৈষ্ণবপদ হয়েছে এবং রামপ্রসাদের কয়েকটি সংগীত হয়েছে। এইভাবে কতকগুলি উত্তম বাউলগানের সাধন-সংকেত বর্জন ক'রে সর্বজনীন একটা ভাবুকতার রূপ পরিগ্রহ করা অস্বাভাবিক নয়।* রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রাপ্ত গগন হরকরার বিখ্যাত গানটি ঠিক এই জাতীয়। লালন ফকিরের কয়েকটি গানও কাব্যের দিক থেকে রসোত্তীর্ণ, সর্বজনীন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকসাহিত্যে,' 'Creative Unity' গ্রন্থে, 'মানুষের ধর্ম' পুস্তকে নিজভাবে বাউলদের ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন। এর অনেকাংশ রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় মানসিকতার আরোপ (যেমন উপনিষদের ব্যাখ্যা বা পদাবলীর ভাবনির্দেশ তিনি স্বকীয় উপলব্ধিমতেই করেছেন) হ'লেও এর মধ্যে কিছু যথার্থতাও যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষভাবে 'পত্রপুট' কাব্যের পনেরো সংখ্যক কবিতায় তিনি দৃঢ়ভাবে বাউলদের সঙ্গে নিজের সাজাত্য ঘোষণা করেছেন। এই সাজাত্যের সবচেয়ে বড় লক্ষণ, তাঁর মতে, প্রাচীন সংস্কার যথা দেবপূজাদি, এবং প্রাচীন প্রথা যথা জাতিভেদ-বিচার, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির মূল্যহীনতা। সর্বোপরি রাষ্ট্র ও সমাজের বন্ধনপাশ অস্বীকার। এইভাবে কবির উপলব্ধি ও আচরণের সঙ্গে বাউলদের আচরণের বেশ কিছুটা মিল দেখানো যেতে পারে এবং রবীন্দ্রভাবনা মূলে একান্ত স্বকীয় হলেও বাউল-সংস্পর্শ অন্যান্য ব্যুৎপত্তি থেকে যে তাঁকে বেশি উপকৃত এবং কতকটা চালিত করেছে সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কাব্যে রবীন্দ্রের মানবানুরাগ 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই সাধনসংকেত থেকে ভিন্নতর হ'লেও এবং তাঁর বিশেষ কল্পনামূলক পৃথিবীপ্রীতির সঙ্গে যুক্ত হ'লেও বাউল-সংস্পর্শে সুদৃঢ় ও কতকটা বাস্তব হয়েছে এমন মনে করতে বাধা নেই। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে (১) রবীন্দ্র-সংগীতে বাউল-সুরের আবির্ভাব বাউল-সংস্পর্শ স্বীকরণের

* আমাদের এই যুক্তি শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের সংগৃহীত বাউল গানগুলির প্রামাণিকতা সমর্থন করবার জন্য নয়।

প্রত্যক্ষ ফল (২) ঐ গানে ও ঐ ধরনের কবিতায় মর্মমুখী ও সাংকেতিক ভাষাভঙ্গির প্রয়োগ—একাধারে সরলতা অথচ সাংকেতিকতা বাউল-সংক্রমিত (৩) অনির্দেশ্য অরূপকে অচেনা অজানা বিদেশীরূপে কল্পনা, অজানার অবস্থানটিকে বিদেশ, পরপার, ঠিকানা, ঘাট, যাত্রা, যাত্রী প্রভৃতি নির্দেশের দ্বারা চিহ্নিত করা বাউল মনোভাবেরই প্রকাশক (৪) সংস্কারমুক্তি এবং পথে চলার আগ্রহ বাউল-অনুরাগের দ্বারা সুদৃঢ়।

প্রায় আক্ষরিক মিলের দৃষ্টান্তরূপে আমরা নানা বাউল গান থেকে কয়েকটি মাত্র পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করছি। রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকেরা এর থেকে রবীন্দ্র-সংগীতে অনুরূপ পঙ্‌ক্তির যে-সব স্মৃতিচিহ্ন পাবেন বাহুল্যভয়ে তার উল্লেখ করলাম না—'আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে', 'আমার ঘরের চাবি পরেরি হাতে,' 'আপনার জন্মলতা, জানগে তার মূলটি কোথা', 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে', 'তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি কোথায় পাই,' 'নাই আমার ভজন সাধন চিরদিন বিপথে গমন', 'বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা দেখ আপন ঘরে', 'ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই', 'মনের ঠিকানা মনে হ'ল না গো এতদিনে', 'লীলার যাহার নাইরে সীমা কোনখানে কোন্ রূপ ধরে, সে লীলা বুঝবি খেপা কেমন ক'রে' ইত্যাদি।

এই অধ্যায়টিতে আমাদের প্রয়োজনবশেই ধর্ম ও তত্ত্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হতে হয়েছে। সে প্রয়োজন এই মিস্‌টিক কবির কাব্যার্থ সম্পর্কে প্রচলিত তাত্ত্বিক ধারণার নিরসন এবং সহজ প্রভাবদর্শনের আবিলতা থেকে নির্মলস্বচ্ছ রবীন্দ্র-কাব্য-স্রোতকে তার স্বরূপে মুক্ত ক'রে দেখা। মুখ্যতঃ এই প্রেরণাই আমাদের এই পুস্তিকার যাবতীয় বাক্যব্যয়ের মূলে। আমাদের ধারণায় মৌলিক কাব্যার্থ অনুধাবনে অস্পষ্টতা ও অসংগতি থাকলে রসানন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। সুতরাং এরূপ আলোচনার ঐকদেশিক মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়ে কেউ শুধু তত্ত্বের বাড়াবাড়ি দেখলে তাঁর কাছে নতি স্বীকার ক'রে বাউল-রসিকের কথারই পুনরাবৃত্তি করব—

'মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা'।

রবীন্দ্রনাথের অরূপ-দর্শনের সঙ্গে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ধারণা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। মৃত্যু সম্পর্কে অধিকাংশ ভারতীয় দর্শন যে ধারণা ব্যক্ত করেছে

* প্রসঙ্গত আমাদের বক্তব্য এই যে, কবি-মিস্‌টিক এবং সাধক-মিস্‌টিকের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা ক'রেই আমরা চলতে চাই।

রবীন্দ্রনাথও নিজ পথে সেই সত্যে উপনীত হয়েছেন। তা এই যে, দৃশ্যতঃ মৃত্যু আছে, কার্যত নেই। আমরা রূপ-রূপান্তর এবং জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি। মৃত্যুর মধ্যেই একটা জীবনের পূর্ণতা এবং এইভাবে নানা রূপের মধ্য দিয়ে আমরা পরিণামের পথে এগিয়ে চলেছি। সুতরাং মৃত্যুভয় অকর্তব্য। কিন্তু এই পরিণাম মুক্তি অথবা নির্বাণ, সালোক্য না সাযুজ্য? বলা বাহুল্য, এ-রকম কোনো ভাষাতেই কবি তাঁর উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেননি। রাজা ও ডাকঘর নাটকের মধ্যে এ-সম্পর্কে তিনি আভাসে মাত্র জানিয়েছেন। তা ভাষায় ব্যক্ত করলে বলা চলতে পারে, অরূপ-সাক্ষাৎকার বা দৃশ্য-গন্ধ-গানের মাধ্যমে রস-স্বরূপ সত্তার সঙ্গে যে সম্মিলন তাতেই জীবনের পরিণাম। 'রাজা' নাটকে ভয়ানক-সুন্দর জীবনের মধ্যেই ধরা দিয়েছেন যাঁরা জীবন্মুক্ত হয়েছেন তাঁদের কাছে, আর 'ডাকঘরে' অমল পরিণামের মধ্য দিয়ে অরূপ-রহস্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ফাল্গুনী নাটক এবং বলাকা ও পূরবীতে যেখানে জীবনকে অরূপ-সমৃদ্ধ দৃষ্টিতে বৃহত্তর ভাবে দেখা হয়েছে সেখানেও কবি জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে পরিণামের কথা ইঙ্গিতে জানিয়েছেন। যাই হোক, মৃত্যু সম্পর্কে কবির ধারণা তাঁর অরূপদর্শনের মধ্যেই একটি পূর্ণ সংগতি লাভ করেছে। কিন্তু অরূপানুভূতির মত এই উপলব্ধিও কবিমানসে প্রথম থেকেই ঘটেনি, এরও একটা ইতিহাস আছে।

কবির প্রতিভা-বিকাশের প্রথম স্তরে মানসী-সোনারতরী-চিত্রার যুগে মৃত্যু-সম্পর্কে কবির কল্পনাময় উচ্ছ্বাস-মিশ্রিত রোম্যান্‌টিক মনোভাব দেখা যায়। এ হ'ল আধুনিক গীতিকবিদের প্রিয় মনোভাব—সৌন্দর্যবিহ্বলতায় মরবার আগ্রহ প্রকাশ করা, অথবা তীব্র আত্মসচেতনতার মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছা, (তুং—এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বরগ-সমান—ইত্যাদি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) যেমন—

দীঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

অথবা, শোয়াও যতনে
মরণস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি-শয়নে।

অথবা, মরণ-দোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা।

এই সময়কার 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় (চিত্রা দ্রঃ) মৃত্যুসম্বন্ধে কবির স্বকীয় কোন উপলব্ধি নেই। কবি সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য কবিদের অনুসরণে মৃত্যুর পর অন্যত্র জীবনের পূর্ণতা আছে কিনা এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন।

হেথায় যে অসম্পূর্ণ, সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃত,
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তার
জীবিত কি মৃত।
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি,
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি ॥

অথবা মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তি নিসর্গের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে এরকম ধারণা পোষণ করেছেন—

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখো তারে সর্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া ;

এই যুগের 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি বিশ্বাত্মবোধমূলক কবিতায় যদিও কবি জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে নানারূপে পৃথিবীতে বর্তমান ছিলেন ব'লে উল্লেখ করেছেন, তথাপি ঠিক মৃত্যু সম্পর্কে কোনো ধারণায় উপনীত হননি বা হবার প্রয়াসও করেননি। কারণ, ঐ কবিতায় কবি নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্ন করেছেন মাত্র, এর উত্তর সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ের বিষয় জানান নি—

আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরান ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
পাতিবে সংসার-খেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি ?............
....................ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,
যুগ-যুগান্তের মহা-মৃত্তিকা-বন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে ? করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?

এর সঙ্গে পরিণত উপলব্ধির বলাকা ও ফাল্গুনীর মৃত্যু সম্পর্কে ধারণা অবশ্য তুলনা ক'রে দেখবার যোগ্য। দুই-ই কাব্য, কিন্তু কী পার্থক্য !

চিত্রা পর্যায়ের জীবনদেবতা-শ্রেণীর দু'টি প্রধান কবিতায় মধ্যে জন্ম-জন্মান্তর বা মৃত্যু সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি। একমাত্র 'সিন্ধুপারে'

কবিতায় কবি অপ্রাকৃত শিহরণের যোগে রহস্যময় পরলোকের একটা কল্প-পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মাত্র। এই কবিতাটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অলৌকিক স্বপ্নাবেশের উপর কল্পিত ব'লেই মনে হয়। মহর্ষির আত্মজীবনীতে ঐরূপ একটি ঘটনা বিবৃত আছে। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যও এ প্রসঙ্গে তুলনীয়।

এই পর্যায়ের কল্পনামূলক ধারণার পর একেবারে নৈবেদ্যে এসে মৃত্যু-সম্পর্কিত প্রায়-নিশ্চিত ধারণার পরিচয় পাওয়া গেল। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি যে নৈবেদ্য রচনার কালে কবি ভারতীয় ভাবে বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যু জীবনের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে যাওয়ার মধ্যেকার একটা বিরাম, এই রকম পরিণত ধারণা নৈবেদ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই ধারণা কী পরিমাণে উপনিষদের থেকে নেওয়া বা কী পরিমাণে অন্তর থেকে উৎসারিত তা বিচারের দ্বারা নির্ধারণ করার উপায় নেই। কিন্তু এমন অনুমান অসংগত হবে না যে, এই সময়কার অরূপানুভবের প্রতি আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু সম্পর্কেও একটি স্থির ধারণার দিকে কবি আপনা থেকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। এ বিষয়ে লেখা নৈবেদ্যের নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠক-সাধারণের সুপরিচিত :—

ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম-মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্বে। মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।
স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে ॥

নৈবেদ্যের পর মৃত্যু সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কবিতা উৎসর্গের 'মরণ' (অত চুপি চুপি কেন কথা কও ওগো মরণ, হে মোর মরণ)। কবির যে-স্বকীয় অরূপানুভূতি বিশ্বের সৌন্দর্যরূপ এবং দুঃখরূপের মিলিত বোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত, উৎসর্গে তার প্রারম্ভ একথা আমরা আগেই বলেছি। ঐ দুঃখ-রূপেরই একটি বিশিষ্ট অনুভূতি এই 'মরণ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যুই মানবীয় দুঃখের চরম রূপ। সেইদিক থেকেই এই কবিতাটিতে মৃত্যুর ভয়ানকতাকে বরণ করার আগ্রহ পরিস্ফুট। মৃত্যুর নীরব শান্ত মূর্তিতে কবির কোনো আকর্ষণ যেন নেই, ভয়ংকরতাতেই তাঁর পরিতৃপ্তি—

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মরণ।
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধ-জাগরূক নয়নে—
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

* * *

যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎ-ফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়,
আমি নীরবে করিব তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

প্রথম জীবনের মৃত্যু সম্পর্কিত নিছক কল্পনাবিলাসের সঙ্গে এখানকার বরণ করার আগ্রহের দিকটি একটু পৃথক, তথাপি উৎসর্গেও কবি আবেগময় উৎসাহের বশীভূত, মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর প্রজ্ঞানময় উপলব্ধি এখনো আসেনি একথা বলা যেতে পারে। তা ছাড়া কবিতাটি কেবল মৃত্যু সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকাশ করার জন্য লেখা, একথাও বলা যায় না। যাই হোক, অতঃপর জীবন থেকে জীবনান্তরে যাওয়ার কথা মাঝে মাঝে পাওয়া যেতে লাগল। একমাত্র গীতাঞ্জলিতে অরূপদর্শনের ফলে মৃত্যুকে কবি অনন্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন, এবং এই মৃত্যু যে তাঁর কাছে কত বরণীয় তা কারণসহ স্পষ্টাক্ষরে জানালেন—

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
ওগো মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।

মৃত্যু এবং জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। মৃত্যুতেই যেহেতু এক জীবনের পূর্ণতা, সেইহেতু মৃত্যু বরণীয়, বর্জনীয় নয়। গীতাঞ্জলিতে এই স্থির উপলব্ধির ফলে অতঃপর কবি নিজেকে বারবার যাত্রী বা পথিকরূপে অভিহিত করতে লাগলেন। আবার মৃত্যুর পথ দিয়েই যে অরূপের আবির্ভাব তাও প্রবলতার সঙ্গে ব্যক্ত করলেন—

মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আসছে জীবনমাঝে,
ও যে আসছে বীরের সাজে। (গীতালি)

এবং দুঃখকে গ্রহণ ক'রেই দুঃখমুক্তি ঘটবে, মৃত্যুকে বরণ ক'রে মৃত্যুভয় ঘুচবে, কবি এই অমৃতবাণী অতঃপর বিতরণ করতে লাগলেন—

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে। (ঐ)

কবির এই মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণার প্রসঙ্গে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় চোখে পড়ে। তা হ'ল এই। কবির কাব্য যে অরূপ-উপলব্ধিতেই পরিসমাপ্ত হয়নি, তার কারণ, কবি জীবন ও বিশ্বকে কখনও অরূপানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেননি। তাঁর অরূপানুভূতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের দুঃখরূপের উপর, মৃত্যু যার চরমাবস্থা। এই জন্য গীতাঞ্জলি এবং গীতিমাল্যের পর অরূপপ্রসঙ্গ ধীরে ধীরে কমে গিয়ে জীবনের যাত্রার কল্পনা প্রাধান্য লাভ করেছে। গীতালিতে একাধারে দুঃখবোধ, মৃত্যু ও যাত্রার কথা প্রবলতা সহকারে ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায়, পরবর্তী বলাকা-ফাল্গুনী-মহুয়ার বলিষ্ঠ জীবনবাদের সঙ্গে পূর্ববর্তী অরূপ-উপলব্ধির যোগ স্থাপন করেছে কবির এই দুঃখ ও মৃত্যু সম্পর্কে ধারণা। তাই বলাকায় যেখানে কবি বিশ্বের ও মানবের গতির কথা বললেন সেখানে 'মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন'কে শুচি ক'রে তোলার কথা বললেন এবং 'যুগে যুগে এসেছি চলিয়া স্খলিয়া স্খলিয়া' ইত্যাদিরূপে জন্মমৃত্যুর ক্রমপর্যায় সম্পর্কে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করলেন।

'ফাল্গুনী' নাটক যথার্থভাবে মৃত্যু ও জীবনের দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য ক'রে জীবন প্রকাশ পাচ্ছে, ধ্বংসকে অতিক্রম ক'রে সৃষ্টি,

বার্ধক্যকে পরাভূত ক'রে যৌবন, এই ভাবটিই ফাল্গুনীর মূল কথা। 'ফাল্গুনী'তে বালকদের প্রশ্নের মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কে লৌকিক ভয়ের ভাবটি কবি বিবৃত করেছেন। বালকেরা 'চন্দ্রহাস'কে প্রশ্ন করছে—

কাকে তুমি ধরেচো তাও কি বুঝতে পারলে না ?
জগতের সেই বুড়োটাকে।
যে বুড়োটা অগস্ত্যের মতো পৃথিবীর যৌবনসমুদ্র শুষে খেতে চায় ?
সেই যে ভয়ংকর ? যে অন্ধকারের মতো ? যার বুকে দুটো চোখ ?
যার পা উল্টো দিকে ? যে পিছনে হেঁটে চলে ?
নরমুণ্ড যার গলায় ? শ্মশানে যার বাস ?

মৃত্যুর ধারণার সঙ্গে কবির জন্মান্তরের ধারণাও বহুস্থানে প্রকাশলাভ করেছে। প্রথম কাব্যজীবনের রোম্যান্টিক ব্যাকুলতার মধ্যেকার জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্যের স্পর্শ ('সোনার-তরী', 'মানসী' আলোচনা দ্রঃ), অথবা 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা' ইত্যাদির কল্পনাবিহ্বল পৃথিবী-প্রীতির সঙ্গে বিজড়িত রূপ-রূপান্তর এবং 'ক্ষণিকা'র 'পরজন্ম সত্য হলে কী ঘটে মোর সেটা জানি' ইত্যাদির হাস্যরসালাপে জন্মান্তর সম্পর্কে কবির ধারণা অপরিণত ও অপরিস্ফুট এমন মনে করা গেলেও গীতাঞ্জলি গীতালি প্রভৃতির উপলব্ধি যে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সময় থেকে বলাকা-ফাল্গুনী-পূরবীর প্রতিভার পরিণামের কাল পর্যন্ত জন্মান্তর ও অনন্ত জীবন সম্পর্কে কবি স্বকীয় উপলব্ধি স্ফুটতর ক'রেই চলেছেন এবং শেষের দিকে জীবন-সায়াহ্নের রচনাগুলিতেও আত্মবিবৃতি-প্রসঙ্গে এ-জন্ম থেকে জন্মান্তরে যাত্রার ঐ উপলব্ধ তত্ত্বটি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে গীতালির 'এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা' অথবা ফাল্গুনীর 'তুমি আমার চিরকালের। ক্ষণকালের লীলার স্রোতে হও যে নিমগন', অথবা, পূরবীর 'জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন ক'রে তোলা ; ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা' প্রভৃতি উক্তি প্রামাণিক ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে। জীবনের মাধুর্যকে পরিপূর্ণ অঙ্গীকার ক'রে কবি কিরকম প্রসন্নমনে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে চান তার পরিচয় বিশেষভাবে ফুটেছে তাঁর জীবন-সায়াহ্নে লেখা 'প্রান্তিক'-এ—'মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়', 'আদি মুক্তিমন্ত্র গায় আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম', 'যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে। কিন্তু দেখতে হবে পারগামী হয়েও কবি জীবনের অতীত অর্থাৎ নামরূপের অতীত কোনো পরিণামকে দেখেননি। তাঁর ধারণায় অনন্ত সৃষ্টি,

অনন্ত জীবন, এবং জীবনেই মুক্তির স্বাদ। সুতরাং কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন, বলাকার 'মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্য-সীমা, তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা' প্রভৃতি স্থলে পরিণামের কথা বললেও এ-পরিণামকে নির্বাণাবস্থা ব'লে নিশ্চয়ই কল্পনা করেননি। 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে' ইত্যাদির মধ্যে জন্মান্তরগামী অনন্ত জীবনই কল্পনা করেছেন। এবং পরবর্তী 'প্রবাসী' কবিতার—'হই যদি মাটি হই যদি জল, হই যদি তৃণ যদি ফুল ফল, জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল' প্রভৃতির মধ্যে বিশ্বে বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাকুলতা জানালেও এমনতর পৌরাণিক মনোভাবের সূচক কথা কবি বলেননি যে মানুষ কর্মফল অনুযায়ী যে-কোনো জীবদেহ পরিগ্রহ করতে পারে।

বলাকা-পূরবী-ফাল্গুনী-মহুয়া নবজীবনবাদের বাণীতে মুখর, এবং সেখানে জীবনের মর্মমূলে এই তত্ত্বটিই সংকেতিত হয়েছে যে, দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনকে পেতে হবে। কবির এই অনুভব তাঁর এই পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক মহাকাশ-দর্শন থেকেও সমর্থিত হয়েছে। নীহারিকা-নক্ষত্রে সৃষ্টি, প্রকাশের জ্যোতিরূপ ও বিলয় কবিকে জীবন-মরণ-ঐক্যের ধারণায় নিঃশেষে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতঃপর 'বলাকা' থেকে কবির জীবন-দর্শনের নূতন অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করছি।

প্রতিভার পরিণাম

জীবন ও অরূপের সমন্বয়

গীতালি-বলাকা-ফাল্গুনী-পূরবী-মুক্তধারা-রক্তকরবী-মহুয়া

বলাকার কয়েকটি কবিতা পদ্মাতীরে লেখা। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি প্রভৃতির কতকগুলি বিশিষ্ট কবিতার প্রেরণা ও রচনার উৎসমূলে স্থান হিসাবে পদ্মা ও পদ্মাতীর বিদ্যমান। কিন্তু স্থান এবং দৃশ্যত ব্যক্তি এক হলেও কালের প্রভাবে পরিবর্তন কী গভীর তা সাধারণ পাঠকেরও অগোচর থাকে না। এই পরিবর্তন কবিব্যক্তিত্বের মধ্যে ক্রমশ ঘটেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভা অতি চঞ্চল এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল। অথচ তা পরিণামীও বটে। আলোচ্য পর্যায়েই এই পরিণাম ঘটেছে এবং তারপর অপরাহ্নে কবির লেখনী নির্বাক হয়নি সত্য, কিন্তু আন্তর ধর্মের দিক থেকে একেবারে নূতন পথে তার অগ্রগতি হয়নি। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ঘটেছে, ভঙ্গির মধ্যে নূতনত্ব এসেছে, এমনকি কোথাও কোথাও মানবিক মমত্ব ও সহানুভূতি ঘনীভূত এবং আরও স্পষ্ট হয়েছে, কিন্তু কবি-আত্মার রূপান্তর ঘটেনি। পুরাতন ধর্মেরই বিভিন্ন নূতন ও বাস্তব আধারে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মাত্র। জীবন ও সুদূর-কল্পনার মিলন-সাধনাই কবি রবীন্দ্রের শেষ সাধনা এবং স্ফুরণোন্মুখী মানসী-চিত্রাযুগের কবি-প্রতিভারও উচ্চতম অভিলাষ। যে সূক্ষ্ম ঐক্যের সূত্রে তার উন্মেষ থেকে বিকাশ ঘটেছে তা আমরা বিস্ময় সহকারে লক্ষ্য করেছি। অতঃপর পূর্ণতম বিকাশের প্রকার আমাদের দর্শনের বস্তু হবে।

এক দিক থেকে দেখলে সকল কবিই জীবন ও অরূপের সমন্বয় সাধনাই ক'রে থাকেন। কারণ, কাব্যে লোক-সাধারণ মানবীয় ভাবসমূহের ভিত্তিতে অতিলৌকিক রম্য আনন্দ পরিবেশিত হয়। কাব্যপাঠের ফল যে আনন্দ-বিহ্বলতা তা ব্যবহারিক জীবনের যে-কোনো আনন্দ থেকে যেমন পৃথক্‌, তেমনি জীবনের সঙ্গে যুক্তও বটে। কিন্তু সাধারণ কবি থেকে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এই যে তাঁর কাব্যরস-চেতনা বিশিষ্ট অর্থাৎ সমাজ-জীবন-সঞ্চারী নটরাজ-মহাকাল-চেতনায় অনিবার্যভাবে মিশে গেছে। কবির কল্পনা এমন অপূর্ব এমনি বিস্ময়কর ভাবে নূতন ও সুদূরপ্রসারী যে অরূপ-ভাবুকতায় সমাহিত হওয়ার জন্যেই যেন তা সৃষ্ট হয়েছিল। আবার রবীন্দ্রের কল্পসত্তা ঈশ্বর যেহেতু প্রকৃতি ও মানুষ থেকে, মোটামুটি বিশ্ব থেকে অপৃথক্‌, যাবতীয় মানবীয় ভাবের মধ্যেই আস্বাদ্য, সেইহেতু জীবনের মধ্যে ঐ অরূপের

স্পন্দনের প্রকার অন্বেষণেই তাঁর প্রতিভা স্বাভাবিক ভাবে নিয়োজিত হয়েছে। তাছাড়া এহেন সমন্বয়ের মধ্যে একটি যুগ-প্রয়োজনও অনিবার্যভাবে কাজ করেছে—সে-যুগ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বাঙালী-জীবনের ঐহিকতার গ্লানির দ্বারা কলঙ্কিত, অথচ বহুকালাগত রস-সাধনার ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। যে-যুগে প্রয়োজন-বশে আর একদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল। রবীন্দ্র-প্রতিভার উত্তুঙ্গ স্বকীয়তার মধ্যে এই যুগোচিত বাঙালীর তথা ভারতবাসীর চিত্ত-ধর্মের অভিব্যক্তিও লক্ষ্য করতে হবে। অরূপ-সমাহিত দৃষ্টিতে জীবনকে দেখার যে বিশিষ্টতা, বলাকা প্রভৃতি কাব্যের মূলে তা বর্তমান। কিন্তু বলাকার সমসাময়িক গীতালির গান-গুলিতে জীবনকে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার একটি সম্পূর্ণরূপ একই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের দু'-একটি গানে অবশ্য দুঃখ-মৃত্যুময় বিঘ্নসঙ্কুল জীবনের দিকে কবির দৃষ্টি পড়েছে এবং যাত্রার ইঙ্গিতও রয়েছে। কিন্তু সমগ্র গীতালি এই যাত্রাময় জীবনোৎসবে মুখর। গীতালি সম্পর্কে পূর্বে বিবেচনা করা গেলেও বলাকার আলোচনায় পুনরায় গীতালির উল্লেখ অপরিহার্য। গীতালি ও বলাকাকে একত্র ক'রে দেখাই যথার্থ দেখা।

পূর্বে আলোচনায় বলেছি, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যে কবি অরূপস্পর্শ লাভ ক'রে সেই আনন্দের বহুবিচিত্র রসাস্বাদেই প্রায়শ নিমগ্ন আছেন। এই সময়কার বিশিষ্ট মানসিক প্রশান্তির অভিব্যক্তিগুলি ও বিস্ময়াবেগে আপ্লুত সুর নিম্নলিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যাবে—

পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ ক'রে দিন তাই—

অথবা, কোলাহল তো বারণ হ'ল
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবল মাত্র গানে গানে।

অথবা, এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।

অথবা, আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র-ছায়া
বর্ষা আসে, বসন্ত।

অথচ গীতালিতে এই শ্রেণীর গান নেই বললেই চলে, সেখানে স্পষ্টভাবে জীবনের দুঃখ ও আঘাতের কথা প্রকাশ পেয়েছে, ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর ব'লে

অভিহিত করা হয়েছে, দুর্যোগ এবং ঝড়ের রাত্রিকে প্রধানভাবে কবিকল্পনায় অঙ্গীকার করা হয়েছে। উপরের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত উদাহরণের সঙ্গে গীতালির নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তির তুলনা করলে একটা পার্থক্য অবশ্যই উপলব্ধ হবে—

তোমার মোহন রূপে
কে রয় ভুলে ?
জানি না কি মরণ নাচে
নাচে গো ঐ চরণ-মূলে ?

গীতাঞ্জলি এবং গীতিমাল্যে এই সুরের রচনা কম। এবং যদিও কবির অরূপ-সাক্ষাৎকার প্রকৃতির দ্বিধা-বিভক্তরূপে, বিশেষভাবে সৃষ্টির ভয়ংকর রূপেই অনুপ্রাণিত, তা দিয়ে জীবনকে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করা গীতালির পূর্বে হয়ে ওঠেনি। তাই গীতালিতে জীবনের গতির কথা এবং কবির নিজের যাত্রার আনন্দ বারংবার অনুরণিত হয়েছে। এবিষয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের ভূমিকা অবশ্য স্মরণীয়।

বলাকার প্রথমের দিকের কয়েকটি কবিতা ১৩২১ সালের মধ্যে লেখা। এর মধ্যে চঞ্চলা (হে বিরাট নদী), দান (হে প্রিয় আজি এ প্রাতে), শাজাহান, ছবি, শঙ্খ, পাড়ি (মত্ত সাগর পাড়ি দিল গহন রাত্রিকালে), সর্বনেশে প্রভৃতি কবিতাগুলি রয়েছে। গীতালির গানগুলি লেখা হয় ১৩২১ ভাদ্র থেকে কার্তিক মাসের মধ্যে। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে কালগত একটা সাধারণ সাদৃশ্যের সম্ভাব্যতা ছাড়িয়ে গীতালির সঙ্গে বলাকার গতি-অনুভূতির অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য রয়েছে। দেখা যায়, বলাকার গতি-অনুভূতি বিষয়ক দু'-তিনটি বিখ্যাত কবিতা মাত্র ১৩২২-এর রচনা, যেমন বলাকা (সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি), ঝড়ের খেয়া (দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন), নববর্ষের আশীর্বাদ (পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি)। অপর পক্ষে অধিকাংশ বিখ্যাত রচনাই ১৩২১-এর। যাই হোক, সম্ভাব্য সাদৃশ্য ছেড়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে গভীরতর সাদৃশ্য ও তার স্বরূপ অনুসন্ধান করা যাক।

আমরা পূর্বে বলেছি গীতালিতেই কবি দৃষ্টিকে নিরাশ্রয় অরূপভাব-লোক থেকে নামিয়ে এনে মানবজীবনে নিক্ষেপ করেছেন। এই নব জীবনবাদের প্রকাশ দুই ভাবে হয়েছে। এক, সর্বনাশ ও মৃত্যুকে বরণ করার উৎসাহে, দুই, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রার প্রেরণায়। এই ভাবমুহূর্তগুলিই রবীন্দ্র-কাব্যের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত, তাঁর কাব্য-সাধনার পরিপাকাবস্থা। সর্বনাশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার অভিনব প্রেরণা তাঁর বিশিষ্ট অরূপানুভূতির সঙ্গে কোন্ সূত্রে জড়িত তা রাজা, অচলায়তন, খেয়া, গীতাঞ্জলি প্রভৃতির

আলোচনাকালে নির্দেশ করেছি। ঐ দুই মনোভাব গীতালিতে এবং যুদ্ধারম্ভে বলাকার কবিতাগুলির মধ্যে কিভাবে রয়েছে উদাহরণ সহকারে তা দেখানোর চেষ্টা করছি। গীতালির—

সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে (১৯ সং)

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই ক'রে নেবে জিতে পরানটি তোমার।
মরণেরি পথ দিয়ে ঐ আসছে জীবন-মাঝে,
ও যে আসছে বীরের সাজে। (২০ সং)

ঝড়কে আমি করব মিতে,
ডরব না তার ভ্রূকুটিতে ;
দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি তুফান পেলে বাঁচি। (২৪ সং)

ঝড় এসেছে ওরে, এবার ঝড়কে পেলেম সাথি।
আকাশ-কোণে সর্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে
প্রলয় আমার কেশে বেশে করছে মাতামাতি। (৩৩ সং)

ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে ক'রে নিল আমায় জন্ম-মরণ-পারে— (৬২ সং)

পুষ্প দিয়ে মার যারে চিনল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে ধরে তোমার চরণকে। (৭৩ সং)
—ইত্যাদি

উল্লিখিত কবিতাগুলিতে যা বলা হয়েছে বলাকার নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত-গুলিতে ঠিক তা-ই বলা হয়েছে। তফাত এই যে, প্রথমটিতে গানের সুরে, দ্বিতীয়টিতে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে, কবিতায়—

(১) এবার ঐ যে এল সর্বনেশে গো…
চাহিস নে আর আগুপিছু,
রাখিস নে তুই লুকিয়ে কিছু,

চরণে কর মাথা নিচু
সিক্ত আকুল কেশে গো।
* * *
ঝড়ে যে তোর ঘর ভরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
নিরুদ্দেশের দেশে গো।

(২) ছিঁড়ব বাধা রক্তপায়ে
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে।
* * *
মৃত্যুসাগর মথন ক'রে
অমৃতরস আনব হ'রে,
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে,
মরণ-সাধন সাধবে।

(৩) তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।

(৪) ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হ'ল আরামের শয্যাতল;
'যাত্রা করো, যাত্রা করো, যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ—
'বন্দরের কাল হল শেষ।' —ইত্যাদি

কবির গতি-অভিমুখী যে-মন যাত্রা, যাত্রী, তরী, কাণ্ডারী, নেয়ে, পথ, পান্থ, সাথী প্রভৃতির কল্পনায় 'গীতালি' পূর্ণ ক'রে তুলেছে, সেই মনই বলাকার সমাজগত যাত্রার কবিতাগুলিতে সদৃশ কল্পনা আশ্রয় করেছে। তরীতে যাত্রাই হোক বা পদক্ষেপই হোক, মূলত কোনো পার্থক্য নেই। গীতালির এই চলা-সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করছি। এরূপ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, বলাকার গতিবাদ নূতন হ'লেও আকস্মিক নয়, তা কবির অরূপানুপ্রাণিত জীবনবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ঃ

পথ দিয়ে কে যায় গো চ'লে
ডাক দিয়ে সে যায়।

আমার ঘরে থাকাই দায়। (২১ সং)
মাঝির লাগি আছি জাগি সকল রাত্রি বেলা। (২৪ সং)
নাই কি রে তীর, নাই কি রে তোর তরী ?
…দেখিস নে কি কান্ডারী তোর হাসে যে হাল ধরি। (৩০ সং)
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে।
অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি
গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুশী হয়ে ঝড়ের হাওয়ায়
ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে। (৪৭ সং)

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু (৫৯ সং)
কান্ডারী গো, এবার যদি পেঁাছে থাকি কূলে
হাল ছেড়ে দাও, এখন আমায় হাত ধরে লও তুলে। (৬৬ সং)

আমি পথিক, পথ আমারি সাথি। * * *
বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরি বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি। (৮৩ সং)

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে
পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া (৯৫ সং)

পথের সাথি, নমি বারংবার, ***
জীবন-রথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার। (৯৮ সং)

উদয়াচলের সে তীর্থ-পথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী
*　　*　　*
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা। (১০৭ সং)

সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের জড়তা চূর্ণ করার আহ্বান কবির প্রথম যৌবন থেকে শোনা গেলেও এবং বিদ্রোহ ও যাত্রার বাণী গীতাঞ্জলি অচলায়তন প্রভৃতি পূর্বেকার রচনাতে পরিস্ফুট হ'লেও তা এমন সর্বতোব্যাপী, এমন প্রবল নয়, একথা পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন। আর, বহু পূর্বেকার কাব্যজীবনে কর্মমুখর অগ্রগতি বা অভিসারের ধ্বনি যদি বা কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুরণিত হয়েছে (যেমন, 'এবার ফিরাও মোরে'), তার প্রকৃতি বাস্তব হলেও বহুল পরিমাণে উচ্ছ্বাসময়, বর্তমানের মত সুদৃঢ় ধ্যানদৃষ্টির মধ্যে নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠার দাবী সেগুলির আছে কিনা সন্দেহ। অরূপানুভূতি লাভের পর জীবন-সম্পর্কে একটা নিশ্চিত ধারণায় কবি এসেছেন ব'লেই এই যুগের কয়েকটি কবিতাও আদর্শবাদী মনের প্রকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশুদ্ধ কবিতা থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে Ethics-এর মধ্যে প্রবেশ করতে কবি দ্বিধা করেননি তা আমরা পূর্বেও লক্ষ্য করেছি।

গীতালি ও বলাকার জীবনসংকেত-সমৃদ্ধ কবিতাগুলির বহিঃপ্রেরণারূপে দু'টি ঘটনার উল্লেখ অবশ্যই করতে হয়, একটি প্রথম মহাযুদ্ধ, অন্যটি 'সবুজ-পত্রে'র প্রকাশ। এর মধ্যে প্রথমটিই গুরুতর, কারণ এতে কবি নবজীবনের বার্তা শুনেছিলেন। সবুজপত্র কবিকে পূর্ণ সংস্কারমুক্তি ও নূতনকে বরণের মুখে চালিত করেছিল। বিশিষ্টভাবে অরূপনিষ্ঠ কবি নিসর্গ থেকে সমাজজীবনে চালিত হবেন এ তাঁর কবিস্বভাবে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার হলেও মহাযুদ্ধ দ্রুত ও আকস্মিকভাবে কবিকে ভাবান্তরে পৌঁছে দিয়েছে, এও ঠিক কথা। দেখা যায়, যুদ্ধারম্ভে কবি যুদ্ধকে সাগ্রহে অভিনন্দিত করছেন এই ভেবে যে, এতে পুঞ্জীভূত সামাজিক পাপের অবসান ঘটবে, সাম্রাজ্যবাদ মুছে যাবে এবং সেইসঙ্গে এদেশেও জাতি-বর্ণবিভেদে কলুষিত অমানবীয়তার সঙ্গে সংগ্রামে নিপীড়িত মানুষ বিজয়ী হবে। এই ভাব নিয়ে শান্তিনিকেতন উপাসনা-মন্দিরে কবি 'মা মা হিংসীঃ,' 'পাপের মার্জনা' প্রভৃতি কয়েকটি ভাষণ দেন, যার সঙ্গে সর্বনেশে, শঙ্খ প্রভৃতি কবিতার সংগ্রামী আহ্বানের মিল রয়েছে। এ ছাড়া যে-তৃতীয় ব্যাপার কবিকে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত পরিবর্তন-সত্যে প্রত্যয়বান্ ক'রে তোলে তা হ'ল ফরাসী দার্শনিকের Creative Evolution গ্রন্থ পাঠ।

গীতালির সমকালীন যে দু'টি বলাকার কবিতায় তরীতে যাত্রার পূর্ণ-সংকেত বর্তমান তা হ'ল 'পাড়ি' এবং 'অজানা'। এর মধ্যে 'পাড়ি' যুদ্ধারম্ভের এক সপ্তাহের মধ্যে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এতে কবি কল্পনায় দেখেছেন যে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্যই ('অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী' প্রভৃতি তু°) ইতিহাস-বিধাতা অরূপ দুর্যোগের মধ্যদিয়ে অভিসার করছেন। কবির অরূপ এখানে জীবন-সংস্পর্শে এসে নাবিকের রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার আগমনকালের প্রাকৃতিক পটভূমিও পাঠকের বহু-পরিচিত দুর্যোগময় পটভূমি—

মত্ত সাগর পাড়ি দিল গহন রাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।
* * *
হেন কালে এ দুর্দিনে ভাবল মনে কী সে
কুলছাড়া মোর নেয়ে।

নাবিক কখন কী রূপে আসবেন তার নির্দেশ পূর্বাহ্নে কেউই দিতে পারে না। ইনি আমাদের পূর্বপরিচিত গীতাঞ্জলির অনির্বচনীয় অনুভূতিরূপে প্রত্যক্ষীভূত অরূপ, যাঁর আগমনের নিঃশব্দ পদসঞ্চার কবি বিস্ময়বিমূঢ় হৃদয়ে শুনেছিলেন—

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
ঐ যে আসে, আসে, আসে।

ইনি খেয়ার 'আগমন' কবিতার রাজাও বটেন। সর্বত্র এঁর আগমনের প্রকার একই। গীতালির যুগ থেকে ইনি জীবনময় হয়ে প্রকটিত হয়েছেন মাত্র এবং কবির জন্মান্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়েও পড়েছেন। ইনি কবির কাছে রত্নের ভার নিয়ে উপস্থিত হবেন, কিন্তু কোনো পার্থিব প্রকৃত রত্ন নয়, বিমূঢ়তার অন্ধকারে পরিস্ফুট বিশুদ্ধ জীবনের আশ্বাসের প্রতীক রজনীগন্ধা নিয়ে তিনি আসবেন।

নহে নহে, নাইকো মানিক, নাই রতনের ভার,
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আনমনে গান গেয়ে।

কিন্তু রজনীগন্ধা হাতে ক'রে যাত্রায় মুক্তজীবনের আশ্বাস ও সৌন্দর্য দ্যোতনা যিনি করছেন তাঁর পারিপার্শ্বিককে কী অপরিসীম বেদনা, শূন্যতা ও ভয়ংকরতার চিত্র!

রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।

পাঠক অবশ্যই বুঝবেন এর মধ্যে এদেশের যুগ-যুগ-লাঞ্ছিত দরিদ্র মানুষেরই অসহায় করুণ জীবনচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এই সহানুভূতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ একাত্ম। যাঁরা বলেন রবীন্দ্রনাথ রূঢ় বাস্তবের কবি নন, এবং যাঁরা বুর্জোয়া ব'লেই এই মহাকবিকে দূরে রাখতে চান, দুঃখের বিষয়, তাঁরা এসব কবিতার কথা ভেবে দেখেন না। গীতাঞ্জলি-ডাকঘর প্রভৃতিতে যদি অরূপ মুখ্য—জীবন গৌণ, গীতালি ও বলাকায় সমাজ ও জীবন মুখ্য—অরূপ গৌণ। অরূপ এখানে ইতিহাস-রূপ পরিগ্রহ করেছেন, অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছেন দুঃখাত্মক জীবনে বাণীময়। এই সব কবিতার মধ্যে যাঁরা বহু পূর্বেকার 'জীবন-দেবতা' কল্পনা করেন তাঁদের অভিমত যুক্তিসহ নয়।

'অজানা' কবিতাটিতে কবি বৈরাগী মন নিয়ে বাউলের ভঙ্গিতে স্বীয় যাত্রার ভাব প্রকটিত করেছেন। এখানে কবির জন্মান্তর সম্পর্কে অনুসন্ধানী মনোভাবও তিরোহিত। তিনি যে যাত্রী এবং 'অজানা'র পথের যাত্রী এই তাঁর আনন্দ। এ হ'ল বলাকার বিশিষ্ট 'পথের আনন্দবেগ', কিন্তু অজানাকে লক্ষ্য ক'রে। পথ অজানা হ'লেও আনন্দ-উপলব্ধি তো সত্য। 'অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মুক্তি।' সুতরাং অজানা আর কেউ নন, কবির বিশিষ্ট অরূপরসানুভূতির নিমিত্তভূত সৌন্দর্য-সত্য; গীতাঞ্জলির—'ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে' অথবা গীতালির অচেনা—

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে।
অচেনাকেই চিনে চিনে উঠবে জীবন ভ'রে।

কবির অরূপ নিসর্গ-উপলব্ধির আনন্দ থেকে পথের বা অজ্ঞাত ভাবী জীবনের আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছেন। পরবর্তীকালে লেখা 'সুন্দর'-এর 'কবে তুমি আসবে ব'লে রইব না বসে' প্রভৃতি বিখ্যাত গানটিতেও অরূপানুভূতির সূত্রেই পথের আনন্দ কবির অভিপ্রেত হয়েছে—

তোর পথ জানা নাই, নাই বা জানা নাই,
তোর নাই মানা নাই, মনের মানা নাই ;

আরও পরবর্তীকালে শেষ-সপ্তক, প্রান্তিক, জন্মদিনে কাব্যে যাত্রাপথের মধ্যেকার এই আনন্দ-উপলব্ধির কথা বিজ্ঞান-প্রত্যয়ী ও বিদায়ী কবির মনে বারংবার উদিত হয়েছে, যার সূত্র বলাকায়। ফলে 'মেঘদূত'-এর পূর্বমেঘের যাত্রাটিও বিরহীর পথের আনন্দ ব'লে কবি অভিহিত করেছেন—

সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী
('বিচ্ছেদ'—পুনশ্চ)

নিবিড় ব্যথার সাথে পদে পদে পরমসুন্দর
পথে পথে মেলে নিরন্তর। ('যক্ষ'—সানাই)

'বলাকা'র এই অংশের সুবিখ্যাত 'শাজাহান' কবিতাটিও এই যাত্রার বিস্ময়-কল্পনাতেই রচিত। বৃহত্তর জীবনের প্রতি আগ্রহে কবি এখানে ইহজীবনের প্রতি অনুরাগও যেন ত্যাগ করেছেন। যাত্রার প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ যেখানে, সেখানে 'অভ্যাসের সীমা-টানা' পঙ্গু মর্ত্য-জীবনের প্রতি বৈরাগ্যই স্বাভাবিক। কিন্তু 'শাজাহান' কোনো তত্ত্ব নয়, বিশুদ্ধ কবিতা, আদ্যন্ত বিস্ময়াবেগ-স্পন্দিত। প্রথম অংশে মর্ত্য-প্রণয় সম্পর্কে, দ্বিতীয় অংশে প্রণয়াতিরিক্ত সমগ্র জীবন সম্পর্কে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিস্ময়ের আধিক্য, এই পর্যন্ত। যাইহোক, অসম্পূর্ণ মর্ত্য-জীবনের প্রতি আত্যন্তিক বিরাগ যদি কোনো কালে কবি-অভিপ্রায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে তাহ'লে তা ক্ষণিকের জন্যে এই যুগেই হয়েছে। কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে। জীবনের দুঃখ ও মৃত্যুকে গ্রহণ ক'রে গঠিত, সমগ্র দৃষ্টি-ভঙ্গির মূলে জাগরিত যে মর্ত্য-অনুরাগ তা-ই কবির কাম্য। সুতরাং বর্তমানের ক্ষণিক মর্ত্য-বৈরাগ্যের দ্বারা কবি স্থির দৃঢ় জীবন-অনুরাগকে লাভ করলেন, যা প্রথম কাব্যজীবনের কল্পনামূলক মর্ত্য-প্রীতি থেকে বিভিন্ন। শ্রেণীস্বার্থ-কলঙ্কিত স্থূল প্রয়োজনের জীবনের প্রতি কবির অনাসক্তি চিরন্তন। আবার অরূপ-উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবি ব্যক্তিগত অথবা সমাজগত বিষয়সুখের জীবনের বিশেষভাবে বিরোধী হ'য়ে উঠেছেন। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আশ্রয় মাত্র ক'রে, ইন্দ্রিয়গত অমানবিক স্বার্থ-সুখানুভূতিতে লিপ্ত না হয়ে, স্বার্থাতীত ঐক্যমূলক রসাস্বাদই কবির অভিপ্রেত; এবং এরই মাধ্যমে কবির অরূপ-সাক্ষাৎকার। এই অরূপ-উপলব্ধির পরে মৃত্যু ও জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে কবি স্বীয় পদক্ষেপের শব্দ যেমনি শুনতে পেলেন, অমনি ভোগবাসনাময় অসামাজিক জীবনের মূল্যও তাঁর কাছে ক্ষীণ হয়ে এল। যাত্রার অনুভূতি যেখানে তীব্র নয় এমন দু'-একটি কবিতায় (বলাকা-কাব্যের মধ্যেই) অবশ্য পুরাতন পৃথিবী-অনুরাগের ছবি ফুটে উঠেছে। কবি সেজন্য কয়েকটিতে এই দ্বৈতের সামঞ্জস্যসাধন ও করতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, সেসব ক্ষেত্রে পরিণামসত্তা অরূপের প্রতিই তিনি অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। উপরিলিখিত কারণে 'শাজাহানে'র—

যে-প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,

যে-প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে……

ইত্যাদি অংশে নিঃশেষে আত্মসুখযুক্ত, দানের ও গ্রহণের অযোগ্য, জীবন-ও সমাজভাবনাহীন সুতরাং অরূপসম্পর্কহীন প্রেম স্বাভাবিক ভাবেই তিরস্কৃত হয়েছে। 'উপহার' কবিতাতেও কবি এরকম দানকে নিন্দা করেছেন যা মুক্তির স্বাদ দেয় না, জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যা অগ্রসর হতে পারে না, যা পথিককে বন্ধ করে মাত্র। পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার বাইরেকার স্বত-আগত, চলার প্রেরণা-যুক্ত যে দান তাকেই কবি ঐ কবিতায় সত্য ব'লে গ্রহণ করেছেন। এ দান ক্ষণিকের, এর প্রেরণা পথিক-চিত্তকে ক্ষণেকের জন্য তার অজ্ঞাতে অনন্তের অভিমুখী করে, এ হ'ল বিশুদ্ধ নির্বিষয় আনন্দ-স্বরূপ।

আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে—
চ'লে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।

স্পষ্টতই কবি এখানে পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার বাসনাময় সুখকে অতিক্রম ক'রে আনন্দের বিশুদ্ধতাকে একান্ত কাম্য ও জীবনের চলিষ্ণুতার সঙ্গে যুক্ত ব'লে মনে করেছেন। 'যে-প্রেম সম্মুখপানে' প্রভৃতি উপরে-উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি নিচয়ে কবি পূর্ববর্ণিত মর্ত্যপ্রণয়-মহিমা থেকে পশ্চাদপসরণ করেছেন সত্য, কিন্তু তার কারণ এই হতে পারে না যে শাজাহান বহুপ্রণয়ী ছিলেন এবং মমতাজের সঙ্গে বিলাস-ঐশ্বর্য-প্রবণ মহারাজার যথার্থ প্রণয় ছিল না। কারণ, তখনই প্রশ্ন হবে যে কবি তাহ'লে এতক্ষণ কী বর্ণনা করছিলেন। শাজাহানের অন্তঃপুর-চারিত্র্য নিয়ে ইতিহাস কী বলে না বলে তার উপর নির্ভর ক'রে তো কবিতাটি লেখা হয়নি। বস্তুত স্বয়ং কবি এ দুয়ের বিরোধ মেটাতে আত্মসমালোচনায় যা বলেছেন তা ঠিক গ্রহণযোগ্য কিনা সন্দেহ। আসলে প্রথমে প্রণয়াদর্শ এবং পরে সামগ্রিক জীবনাদর্শ তুলে ধরাতেই এরকম আপাত-বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধান হয়ত-বা খুঁজে পাওয়া যাবে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের শেষ কবিতাটিতে এবং সাধারণভাবে মহুয়ার প্রেম-কবিতায়।

'শাজাহানে' চলার সঙ্গে যুক্ত জীবনের ঐহিক-বাসনা পরিত্যাগ করার চিত্রই ফুটে উঠেছে। একটু তাত্ত্বিক ভাষা প্রয়োগ করলে বলা যায়, শাজাহানের যে বন্ধ ব্যক্ত রূপ তা এ-জীবনে প্রেম-সম্ভোগে রত ছিল। কিন্তু যেহেতু আসল শাজাহান অব্যক্ত-স্বভাব, সেইহেতু নামরূপের বন্ধন ত্যাগ ক'রে সেই অব্যক্তেই সে বিলীন হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, জীবনান্তর বা অবস্থান্তর-বাদের অর্থাৎ যাত্রার অনুভূতির প্রতি কবির তীব্র আসক্তিই কবিকে অনাসক্তির ধারণায় প্রবর্তিত করেছে। আর এই উপলব্ধির তীব্রতাকে প্রকট ক'রে তোলার জন্যেই ঐ কবিতাটির ভূমিকাংশে শাজাহানের জীবনানুরাগের চিত্রটিকে অত দীর্ঘ ও সুন্দর ক'রে নির্মাণ করতে হয়েছে। 'শাজাহান' কবিতা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনাপ্রসঙ্গে একস্থানে যা বলেছি তার অংশবিশেষ উদ্ধার করছি।

"......মানুষ চলেছে আলোকতীর্থে। রূপ-রূপান্তর জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে তার এই যাত্রা। কোথায় এবং কিসে তার পূর্ণতা তা সে জানে না, তবুও একটি উদ্দিষ্ট পূর্ণতার প্রত্যাশা নিয়ে সে যেন পথ-পরিক্রমা ক'রে চলেছে। মৃত্যু নবজীবনের প্রবেশপথে তোরণদ্বার মাত্র। এক জীবনের আনন্দ-সম্ভারের মূল্য তার কাছে ততটুকুই যতটুকু অংশে তা তাকে ঐ অজ্ঞাত পূর্ণতার পথে প্রেরণা দেয়। যদি না দেয় তার আত্যন্তিক মূল্য তার কাছে কিছুই নেই। শাজাহানের যে প্রগল্ভ প্রণয় তা কি তাঁর চলার পথে কোনো প্রেরণা দিয়েছিল? তাঁর সঙ্গীহীন ব্যক্তিত্বকে উদ্বুদ্ধ করতে কোন সহায়তা করেছিল? এক্ষেত্রে কবি বলছেন—না, ঐ প্রেম তাঁকে এ জীবনে বিহ্বলতাময় রসের ঐশ্বর্য দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা হ'ল একটা সীমিত গণ্ডীতে আপেক্ষিক আনন্দ দেওয়া মাত্র। বস্তুত পার্থিব অন্য সমস্ত প্রবৃত্তির মত প্রেমও একটা লৌকিক সংস্কার, এবং এই সংস্কারের অর্থই হ'ল ব্যক্তিকে আকর্ষণে আবদ্ধ করা, মুক্ত করা নয়। অথচ শাজাহানের এ সকলকে তুচ্ছ ক'রে চলে-যাওয়া তো প্রত্যক্ষ। আনন্দাস্বাদময় মর্ত্যজীবনের চেয়ে চলে-যাওয়ার সত্যই তো আরো প্রধানভাবে আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। শাজাহানের যাত্রার এই অনিবার্যতার দিকটি প্রত্যক্ষ ক'রে কবি কল্পনা করলেন যে, লৌকিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার যা তাও শাজাহানের গতিশীল জীবনের কাছে তুচ্ছ।

"কবি বলছেন, একদা প্রণয়ের বিলাসসমূহ তাঁকে মর্ত্যের সৌন্দর্যে নিবিড়-ভাবে আবদ্ধ করেছিল, শাজাহান নিজে জানতেও পারেননি যে তাঁর জীবনের চরম অর্থ এখানে অস্থায়ী আনন্দবোধের মধ্যে নয়, কারণ, জন্ম-জন্মান্তরে ঐ রকম বহুতর আনন্দ-সৌন্দর্যময় পথ তিনি অতিক্রম করেছেন এবং আরো পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হবে; যা অনিবার্য তা ঘটবেই। শাজাহানকে তাঁর

গুপ্ত অন্তর-দেবতার অভিপ্রায় অনুসরণ ক'রে সবকিছু ত্যাগ ক'রে ধাবিত হতেই হবে, সৃষ্টির নিয়মই এই। লৌকিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে যে চ'লে-যাওয়াকে ট্র্যাজেডি ব'লে মনে করি, কবি বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে কল্পনায় গভীরতর নূতন অর্থ আবিষ্কার করলেন।

"এই নূতন উপলব্ধির জন্য কবিকেও কম মূল্য দিতে হয়নি। তাঁর বহু-কালাগত কাব্য-সংস্কার যে-মর্ত্যপ্রীতিকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছিল বলাকার নূতন কল্পনায় তার চরমমূল্য আর দিতে পারলেন না। কিন্তু এতে কি কবি তাঁর নিজের স্বভাবের কাছে অপরাধী হয়েছেন? এইভাবে বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করাতে কবিধর্মে রবীন্দ্রনাথ কি স্ববিরোধী হয়ে পড়েছেন? আমাদের জবাব নেতির দিকে।

"কারণ, রবীন্দ্রনাথ ঠিক তত্ত্ব প্রচার করতে চাননি এবং কাব্যের ভিন্নতা কবির দৃষ্টিকোণের পার্থক্যমাত্র। অব্যবহিত পূর্বে লেখা 'ছবি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে পার্থিব-আনন্দ-রসাস্বাদকে বর্জন করেননি তার প্রমাণ রয়েছে। বস্তুত বলাকায় রবীন্দ্রনাথ নূতনতর আনন্দে আমাদের বিমূঢ় করেছেন, যেমন করেছিলেন তাঁর কাব্যজীবনের প্রথমের দিকে, আশ্চর্য মর্ত্যপ্রীতিরসে।

"প্রসঙ্গক্রমে একথা বলতে হয় যে, শাজাহান কবিতার প্রথমার্ধে কবি যেমন মর্ত্য-প্রণয়ের অপূর্ব একটি চিত্র এঁকেছেন তেমনি অপূর্বভাবে ঐ চিত্রকে অতিক্রম করতেও তাঁর লেখনী দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। প্রথমাংশের জীবনসৌন্দর্যের বর্ণনাটি দ্বিতীয়াংশের জীবন-বৈরাগ্যের পরিপূরক মাত্র। কবি যেন বলতে চেয়েছেন, জীবনের এই পরমাশ্চর্য, এই অপূর্ব আনন্দ-উৎসব তো দেখ্‌লে, এখন এর চেয়েও বিস্ময়কর বস্তু দেখো। সুদূরচর রহস্যের দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ জীবনের মূল্য দেখেছেন কিন্তু জীবনাতীতের মূল্যের দিকেও ইঙ্গিত করতে ভোলেননি। কারও কারও মতে গীতিকাব্যের মধ্যে ভাবগত যে অখণ্ডতা থাকে তা এখানে ব্যাহত, সুতরাং কাব্যরস বিপর্যস্ত হয়েছে। আমরা একথা মাননীয় ব'লে মনে করি না, এজন্য যে, এখানে কবি-অভিপ্রায় শুধু অখণ্ড নয়, স্পষ্টও, কাব্যরীতিতে কবি একটু বিচিত্রপন্থা অবলম্বন করেছেন ব'লেই ভাবগত অখণ্ডতার বিনাশ কল্পনা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম নন, আর শাজাহান কবিতাও রসের ব্যাঘাত যে ঘটায়নি, রসিকের অন্তঃকরণই তার প্রমাণ। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ যৌক্তিক প্রবন্ধ লিখছেন না, তাহ'লে বরং তাঁর তত্ত্বের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন আসত। এই রচনারীতি, দ্বিতীয় ভাবুকতায় উত্তরণে প্রথম ভাবুকতাকে অপ্রতিপন্ন করার কৌশল, বিগতা কাদম্বরীদেবীর চিত্রদৃষ্টে উদ্দীপিত 'ছবি' কবিতায়ও লক্ষণীয়। প্রথমাংশে যেমন দ্বিতীয়াংশেও তেমনি কবির বিস্ময়ই 'শাজাহান' কবিতার মূলে।"

বিরোধাভাস এবং তত্ত্ব বর্জন ক'রে কবির বিস্ময়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিচার করলে কবিতাটির অসামান্য কাব্যগুণ লক্ষ্য করা সহজ হয়। কবিতাটির প্রণয়ের প্রসাধন নির্মাণ যেমন অপূর্ব, তেমনি আকর্ষক হল অদৃষ্ট-সীমিত অথচ যৌবন-বসন্ত-প্রণয়রসপিপাসু মানুষের অসহায় ব্যর্থতার ব্যঞ্জনা। শব্দ এবং অর্থালংকারের এহেন সুচারু গ্রন্থনও অন্য বিরল।

গীতালিতে যাত্রার কল্পনায় যার ভূমিকা, বলাকায় সেই বস্তুবৈরাগ্য বা বস্তুগতজীবন-বৈরাগ্যই কবির স্বকীয় জীবন থেকে বিশ্বগত গতিবাদে প্রতিফলিত হয়েছে। পূর্বের অধ্যায়ে গীতালির আলোচনায় আমরা বলেছি যে 'যাত্রা' বা 'চলা'ই গতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কবির পক্ষে যাত্রা, বিশ্বের পক্ষে গতি। বিশ্বের কোনো কিছুই স্থির নেই, বস্তুও নয়, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা তো নয়ই। বস্তু মানুষের ভাবকে প্রেরণা দিচ্ছে, আবার ভাব রূপের মধ্যে ধরা দেওয়ার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছে—কবির এই মনোভাবটি বলাকা থেকে অবশ্য প্রাচীনতর, কিন্তু তাকেই 'রূপ' (১৬ সং) কবিতার মধ্যে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে প্রকাশ করলেন—

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
তাদের খেলায় হতে সাথী।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল।

দেখতে হবে, এখানে কবি বিশ্বের বস্তুনিচয়ের গতি-বিরুদ্ধতার কথা বলেননি। কিন্তু বিষয়াসক্তির সঙ্গী জড়বস্তু যে বাধা, তা যে পঙ্কিল, অশুচি, অবরুদ্ধতার কলুষে দূষিত এই ভাবটি অন্যত্র কবির বিশ্বগতিতত্ত্বের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত এবং 'চঞ্চলা' কবিতায় তা প্রকাশও পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মর্ত্য-অনুরাগী হ'লেও যেমন স্থূল জৈব বাসনার পোষকতা করতে পারেননি, তেমনি জড়বস্তুর মহিমা কীর্তনেও চিরকালই বিমুখ। বিষয়-বাসনা ও বস্তুর মধ্যে সংযোগ-সম্বন্ধ বিদ্যমান। বস্তু স্থূল বাসনার প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং বিশুদ্ধ আনন্দ-উপলব্ধির পথে বাধা। যে গতির অনুভূতি—'অকারণ অবারণ চলা' কবির পূর্বকাব্যজীবনের সুদূরের আকর্ষণের মতই বিশুদ্ধ আনন্দ-স্বরূপ, তা বিষয়বাসনার পোষক নয়, সুতরাং জড়ত্বেও আবদ্ধ নয়। এই গতির আনন্দে পাথেয় সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, পুঁজিপাটা অবাধে ক্ষয় ক'রেই চলতে হয়। বিশ্বগত এই গতির আনন্দময়তার দিকটি 'চঞ্চলা' কবিতায় একটি পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই বিশিষ্ট বিশ্বগতিরহস্যের কবিতাটি ফাল্গুনীর গানগুলির রচনার ঠিক আগে এবং

গীতালির অব্যবহিত পরে লেখা। কবিতাটিতে কেবল কালরূপ একটি অতি-চঞ্চল সত্তার প্রকার এবং প্রকর্ষই বর্ণিত হয়নি, কবির আত্মকথাতেই কবিতাটির সমাপ্তি ঘটেছে। আর, কবিতাটির প্রারম্ভে আধুনিক মহাকাশ-বিজ্ঞানের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। বস্তুজগতের ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা থেকে ঋতুপর্যায়ের আবর্তন ও জন্ম-মৃত্যুর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই শক্তির প্রবাহ অবিরাম চলছে।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।

চলাই হচ্ছে এর একমাত্র সত্যস্বরূপ, এ অনাসক্ত, শোকভয়াদি পার্থিব বিকারের অতীত, সুতরাং স্থিতিশীল রক্ষণশীল বাসনাদির বিরোধী—

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও;
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লওনা কিছু, করো না সঞ্চয়;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

এই শক্তির বিরাম বা স্থিতিময় পূর্ণতা কল্পনার অতীত। কাল অনাদি এবং অনন্ত, সৃষ্টিও সেই কারণে অহরহ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে অনাদি ও অনন্ত। সুতরাং কাল গতিহীন হয়ে পড়েছে এবং বিশ্ব পরিবর্তনহীন হয়ে পড়েছে এমন চিন্তা স্বপ্নেরও অগোচর। লৌকিক পূর্ণতা ও পরিণামের ধারণা এই কবিতায় তিরস্কৃত হয়েছে—

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে-মুহূর্তে কিছু তব নাই।

সৃষ্টির প্রাণ-প্রবাহ যদি এই পরিবর্তন-সত্তার স্বরূপ হয় তা হ'লে জড়বস্তু? কবি বলছেন, প্রাণ-প্রবাহের বিরাম নেই, তার গতির পথে ক্ষণিক বাধাই জড় বস্তুর রূপ গ্রহণ করে, কিন্তু এই বাধা যদি অকল্পনীয় বিরতিতে পরিণত হয় তাহ'লে সৃষ্টি নিশ্চল হ'য়ে পুঞ্জীভূত বস্তুর ভারে পীড়িত হয়ে যাবে। নিশ্চল বস্তু যেমন অপবিত্র, তেমনি ভয়ংকর। রুদ্ধগতি বদ্ধ জীবন অসহনীয়।

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,

তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে—

সুতরাং মৃত্যুও বরণীয়, বিশ্বের ধ্বংসের রূপও অভ্যর্থিত হওয়ার যোগ্য, কারণ, মৃত্যুর দ্বারা রূপান্তরিত জীবনই যথার্থ জীবন। 'মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ সেই তো তোমার প্রাণ'। এইজন্য কবি মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা এবং পবিত্রতার দিকটি পরিবর্তনরূপা সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করলেন—

ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য-মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।

অতঃপর কবি আত্মজীবনে গতির শিহরণ অনুভব করলেন এবং পরিশেষে স্বীয় গতাগতি-রহস্য সম্পর্কে যে উপলব্ধির পরিচয় দিলেন তা বহুপুরাতন ব্যঞ্জনা নিয়ে (সোনার-তরীর 'বসুন্ধরা,' 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি, তু°) পাঠকের গোচর হ'ল—

মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে,
রূপ হতে রূপে

বহু জন্মের মধ্য দিয়ে আগত একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ-প্রবাহের বোধ যেন অধুনা নিজের ও বিশ্বের যাত্রা-অনুভূতির স্পর্শে একটি উপলব্ধ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, বিশ্বের অন্তর্নিহিত পরিবর্তন-প্রবাহ সম্পর্কে রচিত হ'লেও কবিতাটি স্বগতভাষণ থেকে বঞ্চিত নয় এবং সেইখানে গীতালির যাত্রা ও পূর্বেকার অরূপ-উপলব্ধির সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। কবিতাটির 'নদী' আখ্যা থেকে 'চঞ্চলা' আখ্যা অধিকতর কাব্যিক এবং আদিঅন্তহীন পরিবর্তনরূপা শক্তির দ্যোতক হয়েছে। কিছু পরেই দেখা যাবে, নভোবিজ্ঞানে উদ্‌বোধিত কবিচিত্ত নীহারিকা-নক্ষত্রলোকে মুহু-মুহু সংঘটিত ধ্বংস-সৃষ্টির ছবিকে অন্তরে বরণ ক'রে সেই আলোকে পৃথিবী ও নিজকে প্রত্যক্ষ করেছে (নটরাজ, শেষ সপ্তক প্রভৃতি দ্রঃ)।

নিঃসংশয় গতিমনোভাবের আর একটি বহুপরিচিত কবিতা এবং সম্ভবত এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিতা হ'ল 'বলাকা' (সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি)। 'চঞ্চলা' থেকে একবৎসর পরে রচিত হ'লেও ভাবে ও কল্পনায় 'চঞ্চলা'র সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়, অথচ কাব্যরসে কবিতাটি উৎকৃষ্টতর। বলাকার বিমানগতি এবং তার পাখার শব্দ কবির ঐ অদ্ভুত কল্পনার জাগরণের সহায়ক হয়েছে। উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত হয়ে কবির গতি-অনুভব এখানে একটি বিস্ময়কর সমগ্রতা লাভ করেছে এবং এ অনুভূতি যে কবির একান্ত স্বকীয়, এ যে চলমানতার সঙ্গে একাত্ম কবিমানসের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তের বহিঃপ্রকাশ এসম্পর্কে পাঠকের কোন সংশয় থাকে না। এই জন্যই এই কবিতাটির বহিঃরূপেও অকৃত্রিম চমৎকার ফুটে উঠেছে। যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী ভাষা। এই পর্যায়ের কাব্যে কবির উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশও যে পরিণত প্রতিভার পরিচায়ক হয়েছে তা কয়েকটি কবিতার মধ্যে এইটি বিশেষভাবে প্রমাণ করে। এখানে—

ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির প্রাকৃতিক ধ্বনিময়তার সঙ্গে—

এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে ॥—

প্রভৃতি চরণে বিশ্বের গতি-চাঞ্চল্যের সুর এত অনায়াসে মিলিত হয়ে পড়েছে যে কী উপায়ে কবি একটি থেকে অপরটিতে উত্তীর্ণ হচ্ছেন তা বোঝার অবকাশ থাকে না। ছন্দে ভঙ্গিতে অলংকারে এবং আদ্যন্ত বিচ্ছুরিত তীব্র আবেগে কবিতাটি কবির আত্মলীনতার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক হয়েছে এবং শুধু গীতিধর্মের দিক থেকেই Shelley-র Ode to the West Wind-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কবিতাটির শেষে 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌-খানে' এই চিরস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিটির 'Lyric Cry'-এর মধ্যে কবির যে আত্ম-পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে তা যেমন সমসাময়িক কবিতা ও গানের সঙ্গে 'বলাকা'র সামঞ্জস্য স্থাপন করছে, তেমনি প্রবলতার সঙ্গে মানব-সাধারণের সুদূরের প্রতি চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকেই রূপদান করছে। কবিতাটির শেষাংশের আত্ম-বিবৃতি থেকে অনুমান করা যায় যে কবি শুধু নৈর্ব্যক্তিক ভাবে গতিস্পন্দিত বিশ্বকে দর্শন করছেন না, সেই সঙ্গে তিনি আত্মদর্শনেচ্ছুও বটেন—যে-কবি-

প্রবৃত্তি গীতালির সর্বস্ব এবং ফাল্গুনী পূরবী প্রভৃতির একমাত্র প্রেরণার আশ্রয়। সুতরাং 'বলাকা'র দর্শনে বের্গস-এর প্রভাব দেখলেই চলবে না, কবি যে স্বকীয় বিস্ময়ে পরিচালিত তাও বুঝতে হবে।*

'যাত্রা' নামে (১৮ সং) আর একটি চলার অনুভূতির কবিতায় কবির আত্মবিচারণা ফুটে উঠেছে। এখানেও সংকীর্ণচেতা মানুষের, বিশেষতঃ আমাদের, প্রাত্যহিক সঞ্চয়ের গ্লানি, প্রয়োজন-বাসনার মোহ এবং আরাম-প্রয়াসী স্থিতিশীল জীবন নিন্দিত ও ত্যাগমূলক গতিশীল জীবন প্রশংসিত হয়েছে। একদিকে বার্ধক্য এবং অপরদিকে যৌবনের পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মের বর্ণনায় বিশিষ্ট এই কবিতাটি ফাল্গুনীর পূর্বাভাস সূচনা করে। গীতালি এবং বলাকার সঙ্গে সুরের দিক থেকে ফাল্গুনী-নাটক অন্তরঙ্গ। মৃত্যু ও জরা অসত্য, গতিময় জীবন ও যৌবনই সত্য, কবির এই উপলব্ধি ফাল্গুনীতে নাট্য ও সংগীতাকারে বিন্যস্ত হয়েছে। এখানেও অতি সংক্ষেপে সেই কথাই বলা হয়েছে—

ওগো আমি যাত্রী তাই—

* *

আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রব না ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।

একদিকে ঐ বিপুলা গতির অনুভব, এই সংঘাতমুখর জীবনকে বরণ করার উৎসাহ ও মৃত্যুকে অস্বীকার এবং অন্যদিকে নিসর্গ ও জীবনের প্রতি কবির ঐকান্তিক অনুরাগ, এই দুই আপাতবিরুদ্ধ প্রবৃত্তির মধ্যে কবি দার্শনিকের মতই সামঞ্জস্য দেখতে পেলেন। সে সামঞ্জস্য অবশ্যই অনন্তে, নানাত্বের মধ্যবর্তী একক সত্তায়, যেখানে যাবতীয় সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, ভাব-অভাব ইত্যাদি লৌকিক মানসের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থেকেও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, অরূপ-সমাহিত কবির নূতন জীবনবোধের উদ্রেকেই এবংবিধ সমাধান সম্ভব হয়েছে। যার ফলে পরিবর্তন এবং মৃত্যুর দ্বারা বিশিষ্ট যথার্থ জীবনের প্রতি কবি অনুরাগী হয়েছেন। কারণ, বহু পূর্বেকার রোম্যান্টিক ভাববিলাসে প্রমত্ত কবি স্থিতিশীল নিসর্গ এবং নিসর্গ-অনুরাগকেই যে চরমমূল্য দিয়েছিলেন তা সোনার-তরী, চিত্রা প্রভৃতি কাব্যগুলির বহু কবিতাতেই সুপ্রকাশিত। কিন্তু পার্থিব দুঃখ এবং সুখ

* এইসব কবিতার সৌন্দর্যাশ্রয়ী আলোচনার জন্য লেখকের "চিত্রগীত-ময়ী রবীন্দ্র-বাণী" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এই উভয় অনুভূতির মাধ্যমে স্বরূপানন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কবি যখন দুঃখ এবং মৃত্যুকে এবং সেই সূত্রে পরিবর্তন-সত্যকে যথার্থ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করার অধিকারী হলেন তখনই পূর্ব-কথিত মর্ত্য-অনুরাগ এবং নব-উপলব্ধ পরিবর্তন-অনুরাগকে মিলিয়ে দেখার সুযোগ পেলেন এবং তাঁর চলিষ্ণু কবি-অনুভবের এই অংশে সুদৃঢ় প্রীতির নিঃসংশয় উপলব্ধিতে এসে পেঁাছালেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথ সমন্বয়ী জীবন-দার্শনিক মহাকবি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জীবনধারা এবং ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আগত চিরন্তন সৃষ্টির রূপই তাঁর কাছে সত্য। এই মিলন এবং সামঞ্জস্যের উপলব্ধিতেই রবীন্দ্র-প্রতিভা সার্থক, একদেশদর্শী কল্পনানির্ভর শিথিল-মূল মর্ত্য-অনুরাগের বাণীতে নয়। রবীন্দ্রনাথে যেমন বিস্ময়-অনুভবের চমৎকার আছে, তেমনি আছে বিস্ময়তর অনুভবের আশ্চর্য মহিমা। অতঃপর যেন সাধন-লব্ধ স্থির প্রজ্ঞান-সহকারে বলাকার কয়েকটি কবিতায় কবি এই অভেদবোধের দিকটি পরিস্ফুট করেছেন।

'জীবন-মরণ' (১৯ সং) এবং 'ঝড়ের খেয়া' (৩৭ সং) এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে প্রধান। বলা বাহুল্য, এগুলিতে গতি ও স্থিতির সামঞ্জস্যের যে সুর প্রকাশ পেয়েছে তা বলাকার গতিতত্ত্বের বিরোধী অনুভূতি নয়, পরিপূরক উপলব্ধি, পরিবর্তন-বিশিষ্ট স্থিতি বা জীবনই কবির কাছে কাম্য। লক্ষ্য করতে হবে, বহুপূর্বে কাব্যজীবনে ছেড়ে-যাওয়াকে কবি সত্য ব'লে অনুভব করতে পারেননি। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনের আনন্দ, এ উপলব্ধিও কবির ছিল না, তাই 'জীবন-মরণ' কবিতায় দৃঢ়তার সঙ্গে কবি এখন বললেন—

> এমন একান্ত ক'রে চাওয়া
> এও সত্য যত,
> এমন একান্ত ক'রে ছেড়ে যাওয়া
> সেও এই মতো।
> এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল
> নহিলে নিখিল
> এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
> হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।

সেই মিল অবশ্যই জন্ম এবং মৃত্যুর অন্তর্বর্তী একক সত্তার বিহার-লীলার ধারণায়। মানব-জীবন কেবল নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডি এবং প্রবঞ্চনা নয়, দুঃখ ও মৃত্যুকে বরণ ক'রে এবং তাকে অতিক্রম ক'রে এক পরিণামে মানুষকে পেঁাছাতেই হবে—ভারতীয় জীবন-দর্শনের এই মৌলিক সত্য কথাই কবির মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, অবশ্য দার্শনিকভাবে নয়, সংশয়বিমিশ্র কল্পনায়।

স্থূল বাসনাময় স্থিতিশীল পার্থিব জীবনের জড়ত্বকে অতিক্রম ক'রে

জীবনের মধ্যবর্তী অথচ বস্তুবিড়ম্বিত জীবনের অতীত সেই লীলাময় একের অনুসন্ধানের প্রয়াস ও তজ্জনিত আবেগ 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটিতে নিঃসংশয় ঐকান্তিকতার সঙ্গে ও বিস্তৃত-ভাবে বিবৃত হয়েছে। এই কবিতাটির মধ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসহকারে কবির মহাযুদ্ধগত বাস্তবজীবন অধ্যয়ন এবং ততোধিক বলিষ্ঠতার সঙ্গে স্থূল বিষয়াসক্ত জীবনকে তৃণ-জ্ঞান ক'রে ত্যাগময় এবং সংগ্রামক্ষুব্ধ মুক্তজীবনকে গ্রহণ করার অভিলাষ সূচিত হয়েছে। দীনতা, কাপুরুষতা, জঘন্য শ্রেণীস্বার্থপরতা এবং সংশয়, যা বস্তুপ্রিয় মানুষকে পঙ্গু ক'রে রাখতে চায়, তার প্রতি উদ্ধত বিদ্রোহ এবং সর্বনাশের মুখে আত্মসমর্পণের দ্বিধাহীন সাহসের অভিব্যক্তি সবচেয়ে এই কবিতাটিরই আকর্ষণের বস্তু। স্থূলজীবনের প্রতি নির্মম বৈরাগ্য বা বিষয়সুখ-বিমুখতা কবির বিশ্বোপলব্ধির প্রথম স্তর থেকে সূচিত এবং গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য প্রভৃতির মধ্যে পরিণামপ্রাপ্ত হ'লেও এহেন তীব্র আবেগের সঙ্গে ইতিপূর্বে উৎসারিত হয়নি। মহাযুদ্ধই এই প্রবলতার কারক। বস্তুত (ইয়োরোপ-পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী ও আমাদের পক্ষে সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থে সমাচ্ছন্ন) বিষয়সুখ এবং প্রার্থিত শুদ্ধ জীবনানন্দ একই আধারে অবস্থান করতে পারে না, তাই মুক্তিপ্রয়াসী কবি 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি যুক্ত মৃত্যুভয়ে ভীত দীনচিত্ত আমাদের আহ্বান ক'রে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন—

দূর হ'তে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,

এবং পশ্চিমের মরণমুখী জীবনাগ্রহের দিক চিত্রিত ক'রে ধরলেন—

বাহিরিয়া এল কারা? 'মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জনমাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হ'ল আরামের শয্যাতল;
'যাত্রা করো, যাত্রা করো, যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ—
'বন্দরের কাল হল শেষ'।

এই চিত্রটি তৎকালীন বিপ্লবীদের স্বদেশী-সংগ্রামের উৎসাহ থেকেও আংশিকভাবে গৃহীত। এই যাত্রার পরিণামের বিষয়টি কল্পনায় কবি-দার্শনিকের গোচর হ'লেও তিনি একই সঙ্গে দেখিয়েছেন যে সংগ্রামী মানুষের পক্ষে এরকম যাত্রা প্রকৃতপক্ষে অজানার দিকে, তা ফলাফলবিচারশূন্য, কারণ, সমাগত বিশ্বযুদ্ধে কী হবে তা পূর্বাহ্নে কেউই বলতে পারছে না। তা না পারুক,

এই যুদ্ধে ইতিহাস-বিধাতা যে-নূতন ইতিবৃত্তের সূচনা করছেন, মানুষকে তা অনিবার্যভাবে গ্রহণ করতেই হবে।

কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার মত এখানেও কবির বাস্তবজীবনবোধ প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে। পশ্চিমের রাষ্ট্রিক জীবনে দৃষ্ট উগ্র জাতীয়তাবাদ ও তার সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন এবং নিজ সমাজে দৃষ্ট ভীরু সহনশীলতার সঙ্গে উন্নত সম্প্রদায়ের অন্যায়, অত্যাচার এবং নিপীড়িতের মর্মবেদনার একটি পরিপূর্ণ রূপ কবি নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে দিয়েছেন—

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নির্যাতনের অমানবীয়তা কবির হৃদয়ে আঘাত করতেই তাঁর আমূল পরিবর্তনের প্রয়াসী বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের জাগরণ হ'ল এবং মুহূর্তের মধ্যে কবি জন্ম ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও প্রলয়ের পার্থক্য ভুলে গিয়ে যেন বৈদান্তিক সত্যে আরূঢ় হয়ে ভাঙন ও মৃত্যুকেই আহ্বান করলেন—

ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।

মানবপ্রেমিক বাস্তব বিপ্লবীর মৃত্যুবরণের দিকটি পরবর্তী 'মুক্তধারা' এবং কতক পরিমাণে 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

বলাকায় যদি জীবন-বৈরাগ্য থাকে, তা বিষয়সুখময় সংকীর্ণ জীবনের প্রতিই প্রযোজ্য, কাব্যোপলব্ধিময় বা সমাজসাম্যে স্থিত এবং অরূপানুপ্রাণিত জীবনের প্রতি নয় একথা আমরা পূর্বে বহুবার বলেছি, এবং জন্মান্তরেই হোক, ইহজীবনেই হোক, রসোপলব্ধিগত স্বার্থহীন জীবন্মুক্তিই কবির কাম্য এও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ঠাকুরদা-শ্রেণীর চরিত্রে পূর্বেই দেখা গেছে, আর, একটু ভিন্নভাবে পরবর্তী মুক্তধারা ও ঋতুনাট্যগুলির মধ্যেও সংলাপ-চরিত্র-সংগীতে ব্যক্ত হয়েছে। আলোচ্য বিশিষ্ট কবিতাটির উপসংহারের দিকে কবি সমূহ দ্বন্দ্বের সমাধানরূপে এবং

সংগ্রাম-পরায়ণ পীড়িত মানবের আশ্রয়রূপে জীবনমধ্যবর্তী একের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন—

তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

কবিতাটির শেষে ভারতীয় বিশ্বাসের বাণীতে অনুপ্রাণিত কবি, দুঃখদৈন্য-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আত্মদানেই যে নিশ্চিত অমৃতত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়, এই মাভৈঃ বাণী প্রকাশ করলেন এবং যেন পাশ্চাত্যের এবং পাশ্চাত্য-প্রভাবিত বিষয়সুখের অনুরাগী ঐহিকতাগ্রস্ত আধুনিক বাঙালীর শোচনীয় নাস্তিকতার উপর তীব্র আঘাত দিয়ে বিশ্বাস উৎপাদনের প্রয়াস করলেন—

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশলজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাসরবে
মরিতে ছুটিছে শত শত…

এ 'পাপ' বা 'অহংকার' শোষণযন্ত্রসহায় সাম্রাজ্যলোভীদের পক্ষেও যেমন, এদেশীয় জাতিবর্ণসংরক্ষকদের পক্ষেও তেমনি প্রযোজ্য (শান্তিনিকেতন ভাষণমালার 'মা মা হিংসীঃ' ও 'পাপের মার্জনা' দ্রঃ)। অমৃতত্ব বা নবজীবন প্রাপ্তির জন্য দুঃখ এবং মৃত্যুবরণকেই কবি এখন একান্ত কাম্য ক'রে তুললেন—

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

দেখা গেল, বলাকার গতি-অনুভূতি এবং বৈরাগ্যধর্ম সগোত্র হ'লেও এই গতি অনিশ্চিত শূন্যে ধাবমান হওয়া নয়, এবং বৈরাগ্যও অভাবাত্মক নয়, সম্পূর্ণরূপেই ভাবাত্মক। গীতাঞ্জলি এবং গীতিমাল্যের বিস্ময়ভিত্তিক ভগবদনুরাগের পর গীতালির দুঃখ, মৃত্যু ও যাত্রার অনুভূতির মধ্য দিয়ে বলাকায় পরিবর্তন-সত্যের সঙ্গে কবি জীবনকে কিভাবে মিলিয়ে নিলেন তাও দেখলাম। বলাকায় কেবল-গতিতত্ত্বের অনুভব যে ক'টি কবিতায় প্রকাশিত

তার সংখ্যা তিন চারটির বেশি নয়। এগুলিকে ভাবাত্মক বা পরিণামমুখী গতিতত্ত্বের ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা বা পরিণামবাদ সম্পর্কিত কবিতাগুলিকে ঐসব কবিতার পরিপূরকরূপে দেখাই উচিত।

বলাকার অন্য কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতায়ও নবজীবনবাদের সঙ্গে অরূপের অনুভব নিশ্চিতরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সর্বনেশে, শঙ্খ, বিচার, মুক্তি, দেওয়া-নেওয়া, রাজা, দেনা-পাওনা (পাখিরে দিয়েছ গান), তুমি-আমি, প্রেমের বিকাশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে আবার 'সর্বনেশে' কবিতাটিতে পূর্বদৃষ্ট বিশিষ্ট অরূপ-উপলব্ধির মূলীভূত দুর্যোগময় প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্র দেওয়া হয়েছে। গীতালির বহুশ্রুত যাত্রার আহ্বান এবং প্রবলতম দুঃখকে বরণ ক'রেই দুঃখের অতীত হওয়ার কথা এই কবিতাটিতে পুনরায় শ্রুতিগোচর হ'ল। এই কবিতাটি প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে লেখা ব'লে কবি ভবিষ্যদ্‌বক্তারূপে অভিহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর বন্ধু পিয়রসন সাহেবের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কোন কবিকে এহেন Oracle-রূপে দেখার যে-চমৎকারীতাই থাকুক, তা কবির প্রতিভা সম্পর্কে যথার্থ ধারণার পোষক নয়। তা ছাড়া কবিদের সামাজিক সত্তা অনস্বীকার্য হ'লেও তাঁরা লৌকিকভাবে কোনো ঘটনাবিশেষের নিতান্ত পুরোবর্তী বা অনুবর্তী হবেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এরূপ ধারণায় বাধা আছে। দেখা যায়, যুদ্ধ সাধারণভাবে অনভিপ্রেত হলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। ইতিহাস-বিধাতার নির্দেশকে বরণ করার প্রেরণা দিচ্ছেন। আসন্ন দুর্যোগের যে আভাস মানুষকে শঙ্কিত ক'রে তুলেছিল তারই পটভূমিতে এই সব কবিতা লেখা, অথচ এগুলির লক্ষ্য নিবীর্য দীনচিত্তে উৎসাহের সঞ্চার করা। অপিচ ঐ বিশিষ্ট কবিতাটির ভাব যদি যুদ্ধ-রূপ ঘটনার পূর্বসূচক হয় তাহ'লে খেয়া-কাব্যের—

> বজ্র ডাকে শূন্যতলে
> বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে
> ছিন্নশয়ন টেনে এনে
> আঙিনা তোর সাজা।

এবং

> এ তো মালা নয় গো, এ যে
> তোমার তরবারি।
> জ্বলে ওঠে আগুন যেন
> বজ্র হেন ভারি।

প্রভৃতির মধ্যে তা বহুপূর্বেই ধরা পড়েছে, এমনকি অচলায়তনে শৃঙ্খলিত মনুষ্যত্বের মুক্তির জন্য যুদ্ধ-ঘোষণার মধ্যেও এবং রাজা নাটকের রাজার

আশ্চর্য ভয়ংকর রূপের মধ্যেও। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ স্বরূপমূল্যের 'নবী' নন। কবি হিসাবে পূর্ব পূর্ব কালের এবং তৎকালের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কাল্পনিক ধারক ও বাহক। সেই সূত্রে ভাবী জীবনের স্পন্দন তাঁর কাব্যে অনুভূত হ'লেও তা সামগ্রিকভাবেই হয়েছে। কোনো ঘটনা-বিশেষের ইঙ্গিত পূর্বাহ্নেই যদি কবির কাব্যে পাওয়া যায় তাহ'লে কবি-প্রতিভায় অতিপ্রাকৃত ধর্মের আরোপ করতে হয়। বস্তুত গীতালি ও বলাকায় কবি প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'লেও স্বকীয়ভাবেই হয়েছেন, যুদ্ধকে অভ্যর্থনা জানিয়ে স্বীয় আদর্শ ভাবলোকেই স্থান দিয়েছেন। অবশ্য কবি আশা করেছিলেন যে এ যুদ্ধে ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পারস্পরিক আঘাতে বিচূর্ণ হবে।

যাই হোক, অরূপ-উপলব্ধির পর থেকে রবীন্দ্রকাব্যে যে দিক্-পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায় তার জন্যে তাঁর অরূপানুভূতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তৎকালকে একত্র দায়ী করলে কোনো বিরোধ ঘটে না। কারণ প্রজ্ঞানসম্পন্ন কবি বর্তমানে যেমন একদিকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল জীবনে বিশ্বাসী, তেমনি সমাজ-জীবনের যাবতীয় গ্লানির নিঃসংশয় সংস্কারের পক্ষপাতী। অরূপের রুদ্র-ভয়ংকরত্ব যেমন তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়, তেমনি ঐহিকতাগ্রস্ত এদেশের প্রথাসম্বল সংকীর্ণ জীবনের অসারত্বও তাঁর প্রতিপাদ্য। এই জন্য কবির ঈশ্বর ভারতীয় সমাজের পুঞ্জীভূত গ্লানি নিঃশেষে দূর করার উদ্দেশ্যে বিপ্লব নিয়ে আসছেন এবং বিশ্বের অন্যত্রও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির বাহকরূপে আসছেন যুদ্ধের মধ্যে। কবি তাঁর কাব্যে যেমন স্বতন্ত্রভাবে এই ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করেছেন, যুগের পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও তেমনি তার সমর্থন পেয়েছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা যেমন যুগবর্তী তেমনি বিশেষ-ভাবে কালাতিক্রমী, প্রাচীন অতীত থেকে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এইজন্য বলাকার সর্বনেশে, শঙ্খ প্রভৃতি কবিতাগুলিকে কবির বিশিষ্ট প্রতিভার বর্ণে অনুরঞ্জিত অথচ যুগের প্রেরণার সঙ্গে সমধর্মী ব'লেই অনুভব করতে হবে। 'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা' প্রভৃতি উক্তিতে কেবল তাৎকালিক যুদ্ধেরই নয়, যেন সমস্ত যুদ্ধেরই সূচনা নিহিত রয়েছে। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, কেবল প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বনাশের বন্যায় সমস্ত গ্লানি মুছে যায়নি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসেছে—এবং তার পরেও বিশ্বের নানাস্থানে গুরুতর অসন্তোষ ও বিক্ষোভ রয়েছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পরও আমাদের অশিক্ষা, আর্থিক শোষণ এবং শ্রেণীবিভেদের বিরুদ্ধে কি সংগ্রাম করতে হচ্ছে না? সুতরাং একান্তভাবে তাৎকালিক ব্যাখ্যার দ্বারা প্রজ্ঞানসম্পন্ন কবির রসভূয়িষ্ঠ কবিতার শেষ বিচারে আমরা বাধা অনুভব করেছি। 'গীতালি'র যাত্রা-প্রীতির মধ্যে অবশ্য কোথাও কোথাও মহাযুদ্ধের বজ্র ও বিদ্যুতের

ঝলক অবশ্যই আমরা যে পেয়েছি 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার' প্রভৃতি গানই তার প্রমাণ। কিন্তু এগুলিও মৌলিক কবি-প্রতিভার সর্বকালীনতার সঙ্গে সর্বথা সামঞ্জস্যপূর্ণ ; সহসা উদিত কোনো তত্ত্ব নয়। 'শঙ্খ' কবিতাটি বীররসাত্মক প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিতা হিসাবেও উল্লেখ্য। এতে আবেগের প্রবলতার সঙ্গে সংযম এবং ভাবের প্রারম্ভ উত্থান ও পরিণামের সংহত সুষমা রয়েছে। মহাযুদ্ধের পূর্বাভাস অবসরে লেখা হলেও এতে সংগ্রামী আবেদনের সঙ্গে স্বদেশের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার আহ্বানও স্বাভাবিকভাবেই সংযুক্ত হয়েছে।

অরূপ-সম্পর্কের অন্যান্য কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে কবির ব্যক্তিগত কাব্য-জীবনেতিহাস, জীবন ও অরূপকে মিলিয়ে উপলব্ধির প্রকার বিবৃত হয়েছে। এগুলি কাব্য-সম্পদের দিক থেকে পূর্ববর্ণিত অন্যান্য কবিতাগুলি থেকে স্বল্প পৃথক্ হ'লেও একালের কবি-আত্মার স্বরূপ জানার দিক থেকে মূল্যবান্। যেমন ২২ সং 'মুক্তি' কবিতায় গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের অরূপ-রসনিমগ্ন কবিচিত্তের বর্তমানে জীবনের মধ্যে নিষ্ক্রমণের চিত্র দেওয়া হয়েছে—

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।
লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায়
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায়
মুক্তিমদে করল মাতাল।

কবি স্পষ্টতই বলেছেন যে অরূপ-নিলীন অবস্থায় অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্গে যেন-তেন প্রকারে তৃণতরুলতা ইতর প্রাণীর মত মিলিত ও সুরক্ষিত জীবন-যাপনে অরূপকে সম্যক্ চেনা যায় না, জীবনের কঠোরতার মধ্যে, অপ্রাপ্তির মধ্যে এবং বিচ্ছেদের মধ্যে তাঁকে প্রাপ্তিই চরম প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ রুদ্র-অরূপের সঙ্গে জীবনকে মেলাবেনই, এইখানেই তাঁর কাব্য-সাধনা পূর্ণতা লাভ করবে। তাঁর অরূপ, সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে অসহায় একাকী ক'রে পাঠিয়ে দুঃখময় সংগ্রামের পথে ধীরে ধীরে তার পূর্ণ চৈতন্যের উদ্বোধ ঘটাবেনই—

তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি,
দেখি বদনখানি।

'দেওয়া-নেওয়া' কবিতাটিতে কবি মুক্তিকামী সাধকের মতই জৈব প্রয়োজন-সঞ্চয় ও প্রাপ্তি থেকে পরিত্রাণ চাইছেন। ঐহিকতাকে 'শূন্য পিপাসায় গড়া পেয়ালা' বলে অভিহিত করছেন এবং বাসনার চরিতার্থতাকে ভার ব'লে মনে করছেন—

যত পাই তত পেয়ে পেয়ে
তত চেয়ে চেয়ে
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায় ;
অনন্ত সে দায় -
সহিতে পারি না হায়,
জীবনে প্রভাত সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়।

পরিচিত 'পাখিরে দিয়েছ গান' কবিতাটিতে কবির অতিপ্রিয় এবং নানাস্থানে বহুকথিত মনুষ্যত্বের মহিমা গান করা হয়েছে। অপরিসীম দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে যাত্রায় মনুষ্যজীবন সার্থক। বিধাতা মানুষকে ইতর প্রাণী থেকে অপেক্ষাকৃত সম্বলহীন অবস্থায় পাঠিয়ে চিরন্তন দুঃখ ও সংগ্রামের অভিমুখী করেছেন। অত্যল্প উপকরণ পেয়ে অভিযাত্রী মানুষ স্বীয় সংগ্রামী শক্তিবলে যে বিস্ময়কর জ্ঞান ও ভাবের পরিচয় দিয়েছে তা থেকে কবি কল্পনা করছেন যে মানুষের মধ্য দিয়ে তাঁরই নিজ অভিপ্রায়ের চরিতার্থতা ঘটছে। মানুষের মাধ্যমে তিনি নিজ লীলার সার্থক অনুভবে ধন্য হচ্ছেন।

আর সকলের তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।

* *

মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

* *

লীলাময়ের সঙ্গে মানুষের এই নিবিড় অথচ নিষ্ঠুর সম্পর্কটি—যাতে মানুষ একান্ত স্বাধীন অথচ নিতান্ত নিঃসহায়—তার উপলব্ধি কবির বিশেষ প্রজ্ঞান-বোধেরই পরিচয় বহন করে। প্রাচীন ভগবৎপ্রেমিকদের বিশিষ্ট উক্তির সঙ্গে নিম্নলিখিত উক্তি একত্র তুলনা ক'রে দেখার ইচ্ছা হয়—

শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।

এই কবির পরবর্তী লেখা 'যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা, আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা' প্রভৃতি ঐ ঈশ্বর-মানুষের নিবিড়তম সম্পর্কের মর্মে রচিত এবং মনুষ্যমহিমাগানে মুখর। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলি ছন্দোবদ্ধ তত্ত্বকথা মাত্র, অনির্বচনীয় কাব্য নয়। Religion of Man বা 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে কবির এই আইডিয়াগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

বলাকার সঙ্গে গীতালির নিবিড় সাদৃশ্য তথা কবির অরূপ-সাধনার বৈশিষ্ট্যের উপর বলাকার যাত্রী-মনোভাবের প্রতিষ্ঠার বিষয় লক্ষ্য করা গেল। কবির এই কালের রচনা একদিকে মর্ত্য-অনুরাগ, অপরদিকে মর্ত্য-বিরাগের

আশ্চর্য নিদর্শন। কিন্তু এই দুটি ভাব পরস্পর-বিরোধী হয়ে কবির অনুভূতিতে প্রকাশলাভ করেনি। এরা সমন্বয়ধর্মী। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে কবির মর্ত্য-প্রীতি কল্পনামূলক অথচ চলিষ্ণু রোম্যান্টিক মনোবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব জীবনের দীনতা সংকীর্ণতা প্রভৃতি যে-মুহূর্তে কবির চিত্তে প্রতিকূল চেতনার প্রতিক্রিয়া জাগরিত করেছে, সেই মুহূর্তে কবি মানুষের যাত্রার তথা যাত্রাপথের কাল্পনিক পরিণামের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কবির ঈশ্বর-উপলব্ধির সঙ্গে যে-প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্র ও মানবীয় জীবন-সংগ্রাম যুক্ত রয়েছে তা কবির উপরি-উক্ত ধারণাকে দৃঢ় ক'রে তুলেছে। পরিশেষে সেই মর্ত্য-অনুরাগই কবির কাম্য হয়েছে যা জীবনাশ্রিত হয়েও আর্ট-এর মত নির্লিপ্ত বিশুদ্ধ। এই নির্লিপ্ততা ও জৈববাসনাহীনতার মধ্য দিয়ে যে অরূপের উপলব্ধি ঘটেছে তা আমরা শারদোৎসব প্রভৃতিতেও লক্ষ্য করেছি। যাই হোক, বাসনাকলুষিত সৌন্দর্যহীন জীর্ণ মর্ত্য পরিত্যাজ্য; সৌন্দর্যময় স্বার্থ-কলুষহীন অরূপ-সাক্ষাতের হেতুভূত মর্ত্য ভোগ্য; এই দর্শনেই কবি শেষে স্থির হয়েছেন। বলাকাতেও এই দুই প্রকার মর্ত্যের পরিচয় বিবৃত রয়েছে। একটি কবির বিশেষ আবেগমণ্ডিত তাৎকালিক জাতীয় জীবনের পরিবেশের মধ্যে গঠিত, অপরটি অপেক্ষাকৃত পুরাতন—উভয়ই অরূপ-উপলব্ধির দ্বারা নবীকৃত। রবীন্দ্রনাথ জীবনপ্রীতির অদ্বিতীয় কবি হ'লেও জীবনকে স্থূলভাবে ভোগ করার, শোষণ নিপীড়ন ও সঞ্চয় করার চিরন্তন বিরোধী ছিলেন একথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এইসব কারণে, বলাকাকে বা পূর্বের কোনো রচনাকে রবীন্দ্র-কাব্যের বিচ্ছিন্ন অধ্যায় ব'লে আমরা অনুভব করিনি। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে একটি ধারাবাহিক পরিণাম-প্রবণ ঐক্য উপলব্ধি করেছি। তথাপি বলাকার তীব্র গতিমনোভাবের মূলে কোনো বহিঃপ্রভাব আছে কি না বা তার পরিমাণ কিরূপ তাও আলোচনা ক'রে দেখবার বিষয়।

এই কাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে কবির উপর যে-প্রভাবের কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয় তা হ'ল ফরাসী দার্শনিক Bergson-এর মতবাদ। বের্গসঁ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। বলাকা-গীতালি রচনার কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর বিখ্যাত **Creative Evolution** গ্রন্থ (ইংরেজি অনুবাদ) প্রকাশিত হয়। ঐ দার্শনিক তাঁর পূর্ব পূর্ব রচনাগুলির সার উপস্থাপন ক'রে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে ক্রমবিকাশের সর্বোচ্চ স্তরের জীব মানুষ প্রাণবেগ-শক্তির ক্রিয়ায় প্রতিমুহূর্তে নূতন নূতন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পদক্ষেপ ক'রে চলেছে। বিশ্বের প্রাণীজগৎ যদিচ একটা স্থির অভিব্যক্তির নিয়মে ধাবমান হয়েছে, তথাপি তরুলতা ও ইতর প্রাণীর যাত্রা কোনো কোনো সময়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে

এবং মানুষ হয়েছে এই যাত্রায় জয়ী। অবিরাম সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের এই যাত্রার দিকটি বের্গসঁ নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন—

"Life as whole, from the initial impulsion that thrust it into the world, will appear as a wave which rises, and which is opposed by the descending movement of matter. On the greater part of its surface, at different heights, the current is converted by matter into a vortex. At one point alone it passes freely, dragging with it the obstacle which will weigh on its progress but will not stop it. At this point is humanity; it is our privileged situation......All the living hold together and all yield to the same tremendous push. The animal takes its stand on the plant, man bestrides animality, and the whole of humanity in space and in time, is one immense army galloping beside and before and behind each of us in an overwhelming charge able to beat down every resistance and clear the most formidable obstacles, perhaps even death."

মানুষের এই অবিরাম যাত্রার দিকটি বের্গসঁর একটি প্রতিপাদ্য বিষয়। বের্গসঁ যদিও অভিব্যক্তিবাদের উপর ভিত্তি ক'রেই তাঁর দর্শনকে গড়ে তুলেছেন তথাপি প্রচলিত অভিব্যক্তি-তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর প্রকট বৈসাদৃশ্য রয়েছে। ইনি যান্ত্রিক পরিবর্তনের নিয়মকেও মানেননি, আবার অভিপ্রায়মূলক বা পরিণাম-মূলক ধারণাকেও অঙ্গীকার করেননি। কারণ, তাঁর মতে উপরি-উক্ত দুই ধারণাতেই স্বাধীন অজ্ঞাত পরিবর্তনকে অস্বীকার ক'রে অতীত ও ভবিষ্যৎ সবই স্থির আছে এমন অমূলক চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে ভবিষ্যৎ আমাদের অনুভব বা প্রজ্ঞার কাছে কেবল যে অভিনব তা-ই নয়, তা একেবারেই অজ্ঞাত। আমরা শুধু সেই মুহূর্তটুকুই জানতে পারি যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে তৎকালে প্রত্যক্ষ। জগতের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর মতে অভিনব অধ্যায়ের অভিনব মুহূর্ত, অর্থাৎ আমরা কেবলমাত্র পরিবর্তনকে জানতে পারি, তার বেশি কিছুই নয়; এবং এই পরিবর্তনই আমাদের কাছে একমাত্র সত্য। 'we change without ceasing and the state itself is nothing but change.' অবিরাম-গতি কালের মধ্যে জড়-চেতন সমুদয় বস্তুকে নিহিত ক'রে এই দার্শনিক দেখেছেন সমস্তই 'growing old.' তিনি বলেন, প্রাণীজগতের জন্মপূর্ব বহু অবস্থা ছিল। জীবন আর কিছুই নয়, অতীতের বর্তমান অবস্থায় নূতন আকারে অগ্রগমন মাত্র, 'persistence of the past into the present'। তিনি যথার্থভাবে

দার্শনিক-সুলভ তীক্ষ্মবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ-শক্তির দ্বারা অভিব্যক্তিবাদের স্বরূপ, তৃণ-লতা ও জীব-জগতের উৎপত্তি ও অগ্রগতি, এই দুয়ের বিকাশের মূলীভূত ঐক্য অথচ ধারার মধ্যে পার্থক্য প্রভৃতি নির্ণয় ক'রে এই অগ্রগতির মূলে একটি 'Vital Impulse' বা প্রাণবেগ কল্পনা করেছেন এবং তার ক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ধারণায় এই প্রাণশক্তির প্রচণ্ড উদ্‌গমনের ক্রিয়া অব্যাহত নয়। প্রতি মুহূর্তে একে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্‌গতি, আবার প্রগতি—এই হ'ল গতির ধারা। তিনি বলছেন, এই বাধাই বস্তুর আকারে রূপায়িত হয়েছে। বস্তু আর কিছুই নয়, 'inverse movement' মাত্র। প্রাণীজগতের জীবনকে যদি ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত একটি হাউয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহ'লে জড়বস্তুকে তুলনা করতে হয় তার ছাইয়ের সঙ্গে। এইজন্য জড় ও চেতন এই দুই সত্তা বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন। কেবলমাত্র চেতনের মধ্যেই পরিবর্তনশীলতার গুণ আরোপ ক'রে তিনি বলছেন—'We find that for a conscious being, to exist is to change, to change is to mature and to mature is to go on creating oneself endlessly.'

আমাদের মধ্যেকার এই প্রাণবেগকে আমরা কী প্রকারে উপলব্ধি করতে পারি? বের্গসঁ বলছেন, প্রজ্ঞান বা বোধির দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা নয়। Intellect বা বুদ্ধি দিয়ে আমরা বস্তুজগতের আকার প্রকার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারি মাত্র এবং ফলে তাদের কাজেও লাগাতে পারি। কিন্তু প্রজ্ঞান ছাড়া প্রাণের স্বরূপ বোঝা যায় না। বস্তুর সঙ্গে বুদ্ধির মিল এবং প্রাণের সঙ্গে প্রজ্ঞানের সম্পর্ক দেখিয়ে তিনি বলছেন যে, বস্তু যেমন একটা প্রবাহের পশ্চাদ্‌গমন, বুদ্ধি তেমনি বোধির বিপরীত ধর্ম। বোধি যেমন আমাদের মুক্ত করে, বুদ্ধি তেমনি বন্ধ বা যুক্ত করতে চায়। বের্গসঁ প্রথমে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন প্রকাশ অবলম্বন ক'রে পরিবর্তন-গত সত্য আবিষ্কার করেছেন, পরে বিশ্বের মধ্যেও ঐ চিন্তাকে প্রসারিত ক'রে দেখেছেন —যা ভাণ্ডে তা-ই ব্রহ্মাণ্ডে। "The universe is becoming."

বের্গসঁর দার্শনিক উপলব্ধির সঙ্গে বলাকার কাব্যোপলব্ধির এক দিক থেকে মোটামুটি আশ্চর্য মিল দেখা যায়। 'চঞ্চলা' কবিতার প্রারম্ভে কালের অবিরাম গতির কথাই কবি বলেছেন। বের্গসঁর Duration-তত্ত্বের সঙ্গে কবির এই ধারণার মিল রয়েছে—

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল

ভবিষ্যৎ যে অজ্ঞেয় তা কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবি জানিয়েছেন। যেমন 'আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ' অথবা—

দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।

'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা' ইত্যাদি উপলব্ধির মধ্যেও কালের পদক্ষেপ কবির শ্রুতিগোচর হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে বর্তমানের মৃত্যু ঘটছে ও ভবিষ্যৎ নবজীবন গড়ে উঠছে—এই উপলব্ধিকে কবি নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করেছেন—

তব নৃত্য-মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।

একটি বিশিষ্ট জীবনবেগ থেকে যে বিশ্বের উৎপত্তি, ঠিক সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেননি, কিন্তু ঐ বেগের অগ্রগতির সঙ্গে পশ্চাদ্‌গতি বা বাধা অনিবার্যভাবে যুক্ত হওয়ায় এর প্রতিঘাতই যে বিশ্বের বস্তুরূপ তা তিনি নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে বিবৃত করতে চেয়েছেন—

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম-মূলে
কলুষের বেদনার শূলে।

বস্তুগত স্থূলতার সম্মান রবীন্দ্রনাথ কোনো কালেই দেননি, কিন্তু এখানে যেভাবে বস্তুর ও সঞ্চয়ের স্বরূপ বিবৃত করছেন (অর্থাৎ গতির স্তব্ধতাই যে বস্তু এই ধারণা এবং 'আকাশের মর্মমূলে' প্রভৃতি কল্পনা) তাতে বের্গসঁ তাঁর নিশ্চিত পড়া ছিল ব'লেই মনে করি। তার পর সংঘাতবন্ধুর পথে মানুষের উৎক্রান্তির মুখে যাত্রার বর্ণনা কবি উক্ত দার্শনিকের সদৃশভাবেই করেছেন। উপসংহারে কবি আত্মকথা বিবৃত করছেন—

নাহি জানে কেউ—
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা ;
মনে আজি পড়ে সেই কথা— ইত্যাদি।

এখানে বের্গস-কথিত প্রাণপ্রবাহের সূত্রে মানুষের আগমন, Memory, Duration প্রভৃতির তত্ত্ব সংক্ষেপে এবং অনায়াসে কবিমানসগত হয়েছে। বের্গসঁর পূর্বলিখিত উদ্ধৃতিসমূহের সঙ্গে 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার বিভিন্ন স্থানও তুলনা ক'রে দেখার যোগ্য।

এইভাবে বের্গসঁর Creative Evolution গ্রন্থের নানান্ স্থান ও অভিমতের সঙ্গে বলাকার কোনো কোনো স্থানের প্রায় আক্ষরিক মিল থাকলেও, দার্শনিক ও কবির মধ্যে একটি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়। তা হ'ল কোনও কোনও ক্ষেত্রে কবির পরিণাম সম্পর্কে ধারণা। বের্গসঁ প্রারম্ভবাদী হ'লেও হ'তে পারেন কিন্তু কদাচ পরিণামবাদী নন। রবীন্দ্রনাথ অভিব্যক্তিতত্ত্ব এবং যাত্রী মানুষের অভিযানের গৌরব স্বীকার ক'রেও পূর্ণতাবাদী। কেবল পরিবর্তনকেই সর্বব্যাপী শেষ শক্তি ব'লে তিনি মনে স্থান দিতে পারেননি। সৃষ্টি একটা আদিঅন্তহীন প্রহেলিকা মাত্র, এরকম ধারণা এই কবির ধর্মবিরুদ্ধ বললেও চলে। রবীন্দ্রনাথের এই পরিণামভাবের দৃষ্টি বলাকাতেই 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, যার 'মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,… ………তবে ঘরছাড়া সবে, অন্তরের কী আশ্বাস-রবে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে।

এখানে বের্গসঁ সম্পর্কেও একটা সংশয় মনে দেখা দেয়। বের্গসঁর আদিঅন্তহীন সৃষ্টিক্রিয়াসম্পন্ন গতিবেগমুখর ঐ Vital Impulse যদি পরিণামী না হয়, এর ধারণা কি স্পষ্টতই প্রাকৃতিক যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদেরই অঙ্গ নয়? বের্গসঁ কি পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ল্যামার্ক বা ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদকেই একটু বিশেষ দৃষ্টিতে আরোপ ক'রে দেখছেন না? বের্গসঁ সম্পর্কে এ প্রশ্ন সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার এ-ও সত্য যে বের্গসঁ সৃষ্টির পরস্পরবিরোধী অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যে-ঐক্য দেখতে পেয়েছেন, আপাত-অনুভূত বুদ্ধিগ্রাহ্য শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে-সামঞ্জস্য আবিষ্কার করেছেন, বস্তুবাদী ও ভাববাদী ও পূর্বতন ধারণার ত্রুটিগুলি বিচার ক'রে যে-সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেচেন, ব্যবহারিক বুদ্ধিকে 'তিষ্ঠ' ব'লে যে-নির্দেশ দিয়েছেন এবং বস্তুর অতীত জীবনবেগ-রূপ Spirit-কেই যেভাবে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছেন —তার মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি আশ্চর্য এককশক্তির লীলার তত্ত্বই প্রকটভাবে অনুভূত হয়নি কি? মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও সৃষ্টির স্বাধীনতা অথচ বিশ্বগত আকার-প্রকারমূলক বস্তু-নিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধতার

কথা বলতে গিয়ে বের্গসঁ যখন বলেছেন, 'We are not the vital current itself; we are this current already loaded with matter, that is, with congealed parts of it own substance which it carries along its course,' তখন সাধারণ প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ধারণা ছাড়াও মুক্ত আত্মার বন্ধতা সম্পর্কে এদেশীয় ধারণার কথা মনে উদয় হয় না কি? বস্তুত বের্গসঁ তাঁর উপলব্ধিকে এমন একটি স্তরে স্থাপন করেছেন যাতে এসম্পর্কে দু'টি বিপরীত প্রশ্ন একই সঙ্গে করা যেতে পারে।

বের্গসঁর ধারণার সঙ্গে এদেশীয় বৈদান্তিক ও ভাববাদী দার্শনিক ধারণাও একত্র তুলনা ক'রে দেখার যোগ্য। বের্গসঁর মতো বস্তু-জগতের রূঢ়তা, স্থূলতা, সীমাবদ্ধতা এবং অন্তর্জগতের স্বাধীন অগ্রগতির কথা আর কোন্ আধুনিক পাশ্চাত্য মনীষীর প্রজ্ঞানে এমনভাবে ধরা পড়েছে? বের্গসঁর মতে সত্য এক, ঘাত এবং প্রতিঘাত, অগ্রগতি এবং পশ্চাদ্‌গতি উভয়ই যার স্বরূপের অন্তর্ভূত। আমরা ব্যবহারিক বস্তু-সীমিত বুদ্ধি নিয়ে সৃষ্টির স্বরূপ নির্ণয় করতে যাই, ফলে বস্তুকেই তত্ত্বরূপে দেখতে চাই। অথচ বিশ্বে বস্তু নেই, আছে শুধু কার্য। তিনি বলছেন—

'Everything is obscure in the idea of creation if we think of things which are created and a thing which creates…It is natural to our intellect, whose function is essentially practical, to present to us things and states rather than changes and acts. But things and states are only views, taken by our mind, of becoming. There are no things, there are only actions. More particularly, if I consider the world in which we live, I find that the automatic and strictly determined evolution of this well-knit whole is action which is unmaking itself, and that the unforeseen forms which life cuts out in it, forms capable of being themselves prolonged into unforeseen movements (তু°—'তাজমহল' কবিতা—'কে তোমারে দিল প্রাণ, হে পাষাণ' এবং 'চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে' ইত্যাদি ১৬ সংখ্যক কবিতা) represent the action that is making itself.'

(Creative Evolution—Ideal Genesis of Matter)

গ্রন্থের এই অধ্যায়ে বের্গসঁ-এর উপলব্ধি আত্মদর্শী প্রাচ্য দার্শনিকদের সগোত্র হয়ে উঠেছে। জীবনবেগময় বিশ্বের সৃষ্টির মূলে তিনি বস্তুকে দেখেননি, দেখেছেন একটি উৎক্ষেপের অবিরাম প্রবাহ—'A Centre from which the worlds shoot out like rockets in a firework display…provided,

however, that I do not present this centre as a thing, but as a continuity of shooting out.' (ঐ)

তারপর এই প্রজ্ঞানবাদী দার্শনিক সৃষ্টির মূলীভূত সত্যরূপে তাঁর স্বকীয় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, (যদিও গতিরূপে ছাড়া ঈশ্বরকে ধারণায় আনতে পারেননি ব'লে ভারতীয় আস্তিক দর্শনের সঙ্গে তাঁর বৈসাদৃশ্যও প্রকট হয়ে পড়েছে)—'God, thus defined has nothing of the already made ; He is unceasing life, action, freedom. Creation, so conceived, is not a mystery : we exprience it ourselves when we act freely.' আমাদের ধারণায় একক সত্তা বা ব্রহ্ম গতিস্বরূপ এবং স্থিতিস্বরূপ দুইই। তিনি প্রাণ, চৈতন্য, ব্যক্তিত্ব, কর্ম প্রভৃতিরূপে বিশ্বে বিরাজমান, কিন্তু এতদতিরিক্ত অদ্বৈতানুভূতিরূপেই মানুষের হৃদয়গম্য, তিনি পথ ও পরিণাম উভয়ই। রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি এই রকম ধারণাই প্রকাশ করেছেন। এজন্যে বের্গসঁ-র সঙ্গে তাঁর মিল আছে, আবার নেইও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনুভূতি-প্রবণ কবি ব'লে, বা পরিবর্তনশীল অনুভূতির মধ্য দিয়ে অরূপ নানাভাবে তাঁর কাছে প্রতিফলিত হয়েছে ব'লে, এবং জীবনাশ্রয়ী হয়ে আমাদের মানবীয় প্রেম, সৌন্দর্য-স্পৃহা প্রভৃতির সঙ্গে অরূপকে তিনি যুক্ত ক'রে দেখেছেন ব'লে বের্গসঁর ধারণার সঙ্গে কবির উপলব্ধির মিলও যথেষ্ট। Hegel-এর Becoming এর সঙ্গেও এঁদের দু'জনের উপলব্ধির মৌল সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বের্গসঁ ব্রহ্মকে স্থিতিরূপেই দেখুন বা গতিরূপেই দেখুন, সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ক'রে দেখতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গভীর সাদৃশ্য পরিস্ফুট হয়েছে। কবির সঙ্গে দার্শনিকের এই ব্যাপক মিলের দিকটি বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে।

বের্গসঁ যেমন একটি সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বস্তুর সঙ্গে আত্মার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন, তেমনি বুদ্ধির সঙ্গে বোধির বৈষম্য কল্পনা ক'রে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক জৈব প্রয়োজনের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে বাহ্য-জীবনের সঙ্গে অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্বের দিকটি তিনি নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করেছেন—'In the humanity of which we are a part, intuition is, in fact, almost completely sacrificed to intellect. It seems that to conquer matter, and to reconquer its own self, consciousness has had to exhaust the best part of its power.' (Creative Evolution—Ideal Genesis of Matter) আবার তিনি আত্মসাক্ষাৎকারের প্রকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতেও কবির সঙ্গে সাদৃশ্যই দেখা যায়। বের্গসঁ বলেন, বস্তু-শৃঙ্খলিত প্রয়োজনের জীবন যাপন করতে করতে কখনো কখনো প্রবল দুঃখে আমাদের প্রজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত

হয় এবং সেই অবস্থায় আমরা জীবনবেগকে প্রত্যক্ষ করি ও নিজেদের সম্পূর্ণ চিনে নিতে পারি। প্রবল দুঃখের মধ্যে যে আমাদের আত্মোপলব্ধি ঘটে—এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও গদ্যে বলাকার পূর্বে ও পরে নানাভাবে আমাদের জানিয়েছেন। কবির অরূপ-উপলব্ধির মূলে এই দুঃখবোধ কীভাবে কাজ করেছে তা আমরা পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। কবির পক্ষে বিশেষ এই যে, কবি ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমেই সেই প্রজ্ঞানে সহজে উত্তীর্ণ হতে পারেন। বের্গসঁ বুদ্ধির সঙ্গে প্রজ্ঞানের বিরোধ দেখালেও ইন্দ্রিয়ানুভূতির এই দিকটি সম্পর্কে অবশ্য স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। তিনি বলছেন, 'Intuition is there, however, but vague and above all discontinuous. It is a lamp almost extinguished which only glimmers now and then, for a few moments at most. But it glimmers wherever a vital interest is at stake.' (ঐ)

এদিক থেকে কবির সদৃশ উপলব্ধি হ'ল—

হয়তো তারে দুঃখদিনে
অগ্নি-আলোয় পাবে চিনে,
তখন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্বালবে শিখা।

এই কবিতাংশটি 'পূরবী'র হলেও এর উপলব্ধ তত্ত্বটুকু বহু প্রাচীন,—দুঃখ-দুর্যোগের মধ্যে অরূপ-সত্যের বা সৌন্দর্য-বিরহের মধ্যে সুদূর কোনো সত্তার উপলব্ধি। বের্গসঁ আরও বলেছেন—"At times, however, in a fleeting vision, the invisible breath that bears them is materialised before our own eyes. We have this sudden illumination before certain form of maternal love, so striking and in most animals so touching, observable even in the solicitude of the plant for its seed. This love in which some have seen the great mystery of life may possibly deliver us life's secret."*

(ঐ—Development of Animal Life)

রবীন্দ্রকাব্যে আশ্চর্য সর্বগ্রাসী রোম্যান্টিক ক্ষুধার মধ্যে যখনই কবির প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, তখনই তিনি বিশ্বের অন্তর্গত একক প্রাণশক্তির লীলা অনুভব করেছেন দেখেছি। কখনো বা সৌন্দর্যরহস্যরূপেও একক সত্তার লীলা অনুভব করেছেন। এবিষয়ে তাঁর প্রথম কাব্যজীবনের বসুন্ধরা, সমুদ্রের প্রতি, চিত্রা, এবার ফিরাও মোরে প্রভৃতি উত্তম কবিতাগুলি লিখিত হয়েছে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় 'আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা

* মনুষ্যেতর জীবজগতের মধ্যে Intuition-এর এই প্রাধান্য-দর্শনও সমালোচকের প্রশ্নের বিষয়। আসলে এই Intuition-এর ব্যাপ্তিতাথই পৃথক্।

আশা—প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে তাঁর কাব্যে তখন থেকে অনুসৃত প্রজ্ঞামূলক উপলব্ধির কথাই বারবার বিবৃত হয়েছে। সেকালের এবং কিছু পরবর্তী কালের চৈতালি, নৈবেদ্য, উৎসর্গ প্রভৃতিতে অরূপ-উপলব্ধির পূর্বাহ্নে কবি যে কোনো-বিশেষ মুহূর্তে অভাবনীয়ের চকিত স্পর্শ লাভ করছেন তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। চৈতালির 'ক্ষণমিলন' কবিতায় কবি বের্গস়ঁর উপরি-উক্ত ধারণার মতোই ক্ষণিক আত্মীয়-সম্পর্কের মধ্যে অনন্তের আভাস প্রত্যক্ষ করছেন—'এ ক্ষণমিলনে তবে, ওগো মনোহর, তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর।' নৈবেদ্য কাব্যে যেখানে কবি নিজের মধ্যে প্রাণশক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করছেন ও বিশ্বের মধ্যে তাকে প্রসারিত ক'রে দেখছেন, সেখানে তাঁর প্রজ্ঞানময় উপলব্ধি দার্শনিক বের্গস়ঁর সদৃশই হয়েছে, যেমন—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে..............

আপনার ও বিশ্বের অন্তর্গত এই একত্বের উপলব্ধির জন্যেই বিরহী কবি 'প্রবাসী' এবং অন্য নানা কবিতায় এই অভিমত সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছেন যে—

জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চিরগৌরব, একথা না যদি শিখিলে
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।

*　　*　　*

যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে,
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে জনমে জনমে মরণে॥

কবির প্রথম কাব্যজীবনের বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্যে বের্গস়ঁর সঙ্গে বিস্ময়কর মিল দেখা যায় কবির 'জীবনদেবতা' বা 'অন্তর্যামী' নামক স্বীয় ব্যক্তিত্বের বা আত্মশক্তির (বের্গস়ঁ-কথিত Self বা Creative Personality-র) ধারণা বিষয়ে। বের্গস়ঁ তাঁর Creative Evolution ছাড়া Matter and Memory,

Introduction to Metaphysics প্রভৃতি আলোচনাতেও ব্যক্তি-মানুষের অন্তর্বর্তী একক শক্তির পরিবর্তনমূলক বিকাশলীলার কথা বলেছেন এবং একমাত্র প্রজ্ঞানগোচর শক্তি ব'লে একে উল্লেখ করেছেন। 'জীবন-দেবতা' সম্পর্কে আলোচনায় আমরা কবির পূর্ব পূর্ব স্মৃতির বাহক অথচ নব নব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অজানার পথে বিকাশপ্রবণ এই ব্যক্তিসত্তার দিকটি সম্পর্কে নির্দেশ করেছি এবং এরই মর্মে যাত্রী কবির বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে স্বকীয়ভাবে অগ্রসর ঐক্যধারা সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিয়েছি।

এইভাবে বের্গসঁর সঙ্গে কবির বিশ্বদর্শনের প্রকার ও ধারার সাধারণভাবে প্রায় আদ্যন্ত সংগতি দেখানো যায়, অথচ বলা যায়, যে-বিষয়ে কবির উপলব্ধির সঙ্গে বের্গসঁর তারতম্য রয়েছে, সে বিষয়ে বের্গসঁই বরংচ আমাদের প্রশ্নের পাত্র হয়েছেন।

উপরি-উক্ত আলোচনা ও উদ্ধৃতিনিচয় থেকে এও বোঝা যায়, বের্গসঁ বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তিবাদ থেকে কোথায় এসে পড়েছেন। তিনি নৈসর্গিক ও অভিপ্রায়মূলক পরিবর্তন উভয়কে বর্জন ক'রে যে-জীবনবেগের ধারণায় এসেছেন তাকে স্থির অপরিবর্তন সত্তারূপে গ্রহণ না করলেও একমাত্র অধ্যাত্ম-মানসেরই গোচর ক'রে তুলেছেন। এবং এইখানে আমাদেরও প্রশ্নের অবকাশ ঘটেছে। জননীর সন্তানস্নেহ, বিরহীর নিবিড়তম ব্যথার মধ্যে যে অদৃশ্য জীবনবেগ প্রজ্ঞান-গোচর হয়, অথবা অনুরূপ অবস্থায় আমাদের যে আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে তাতে আমাদের সংবিৎ বস্তুর আবরণমুক্ত হ'লে আমাদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই একটি ধ্রুব অখণ্ড অস্তিত্বের মধ্যে উপলব্ধ হয় না কি? দার্শনিকপ্রবরের কাছে ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, প্রজ্ঞানের দ্বারা জীবনবেগের স্বরূপ জ্ঞাত হ'লে তার ভবিষ্যৎ পন্থাও কি আমাদের অজ্ঞাত থাকবে? তিনি সৃষ্টিপরম্পরার কারণরূপ প্রাণবেগকে যে-নিরাশ্রয় শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন তা তো আর একপদ অগ্রসর হওয়ারই অপেক্ষা রাখে। তখনই একটি ধ্রুব অপরিবর্তন সত্যের ধারণাও অপরিহার্য হয়ে ওঠে, এবং মায়াচক্রে পরিবর্তনের মধ্যে স্থির না হতে পেরে ভারতীয় দর্শনের মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়,—বিশ্ব পরিবর্তনশীল, কিন্তু আত্মা ধ্রুব; প্রকৃতি পরিবর্তনরূপা, পুরুষ স্থির। বস্তুত বের্গসঁ যে-প্রজ্ঞানকে দুর্লভ ব'লে অভিহিত করেছেন, ভারতীয়ের কাছে তা সুলভ এবং ভারতীয়েরা সেই প্রজ্ঞান-দৃষ্টি সহকারে সত্যকে পরিবর্তনশীল ব'লে দেখতে পায়নি, স্থির ধ্রুব ব'লেই জেনেছে।*

* অবশ্য বের্গসঁ-কথিত প্রজ্ঞান বা বোধি মানুষেতর প্রাণীর সহজাত এবং অভিব্যক্তির ধারায় মানুষের মধ্যে ক্ষীণভাবে আগত ব'লে কথিত হওয়ায় এ-বোধির সঙ্গে ভারতীয় 'চিৎ'-এর তুলনা করা সংগত কিনা তাও বিবেচ্য।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর রচনায় স্বকীয় উপলব্ধিবলে পরিণামের আশ্রয়, গতির গতি, ধ্রুবসত্তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। পরিবর্তন প্রহেলিকার চরম মূল্য দেননি। এইখানে বের্গ্‌সঁর সঙ্গে কবির মৌলিক পার্থক্য। কিন্তু অন্য সব বিষয়ে বের্গ্‌সঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মিল দেখে এই পার্থক্যটুকু একটি সূক্ষ্ম আবরণের পার্থক্য ব'লেই মনে হবে। পূর্বে যে কথা বলেছি, বের্গ্‌সঁর উপলব্ধির সেই আর একপদ অগ্রসর হওয়ার যৌক্তিকতার কথা, তা রবীন্দ্রনাথেই ঘটেছে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অরূপ-কল্পনায় সেই শূন্য পূর্ণ হয়েছে। বের্গ্‌সঁ 'এত প্রেম, এত আশা, এত ভালোবাসা'র মধ্য দিয়ে যে দুর্জ্ঞেয় ও অন্ধ জীবনবেগকে দেখতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তা লীলাময়ের প্রকাশ ব'লেই অনুভব করেছেন। ঐ পার্থক্যটুকু বাদ দিলে, কবির সঙ্গে দার্শনিকের সর্বাবয়বগত যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাকে প্রভাবমূলক সুতরাং সহসা উদিত ব'লে মনে করলে ভুল করা হবে। মোটকথা, বের্গ্‌সঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল কেবলমাত্র পরিবর্তন-তত্ত্বেই আবদ্ধ নয়। সৃষ্টির প্রকার, প্রণালী, মানুষের মহিমা, জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মের যোগ, ব্যক্তিগত জীবনের গতিশীল বিকাশ প্রভৃতির অনুভবে উভয়ের ব্যাপক সাদৃশ্য রয়েছে। এবং কেবল বলাকা পর্যায়েই নয়, তার পূর্ব পূর্ব পর্যায়ের বিভিন্ন উপলব্ধি-গুলির মধ্যেও দার্শনিকের সঙ্গে কবির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সেজন্য আমরা কবির পরিবর্তনবাদের বিষয়টি বের্গ্‌সঁ-এর প্রভাব-জাত ব'লে মেনে নিতে পারিনি, তবে উদ্দীপিত, এমন মনে করছি। রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় উপলব্ধির মূলে ধীরে ধীরে এই জীবন-দর্শনে এসে পৌঁছেচেন এই সমীচীন ধারণাই পোষণ করেছি। বের্গ্‌সঁ ও রবীন্দ্রনাথ স্থূল বস্তুগত পার্থিব প্রয়োজনের জীবনের প্রাপ্যমূল্যে দিয়ে জীবনাতীতের সঙ্গে জীবনকে যুক্ত ক'রে দেখেছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ ও পরিণাম যে-ঐক্যসূত্র অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে কবির জন্মান্তরের অনুভূতি, নিরুদ্দেশ সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, বসুন্ধরার তাবৎ বস্তুতে জীবন-চাঞ্চল্যের অনুভব, সৌন্দর্য বা আর্টের তথা অনির্বচনীয় অরূপের মধ্যে মুক্তির অনুসন্ধান, দুর্যোগময় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অরূপানুভূতি, সংঘাতক্ষুব্ধ বন্ধুর পথে মানব-জীবনের জয়যাত্রা প্রভৃতি কিভাবে একত্র যুক্ত হয়ে একটি বিশিষ্ট কবি ও একটি বিস্ময়কর সমগ্রতা অভিব্যক্ত করেছে তা এতাবৎ আলোচনার মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এর মধ্যে কেবল বলাকাতেই বের্গ্‌সঁর প্রভাব নির্দেশ করলে যেমন কবি-প্রতিভার অনন্য-পরতন্ত্র ঐক্যমূলক বিকাশের ধারণায় কুঠার-আঘাত করা হয় তেমনি উভয়ের জীবন-দর্শনের গভীরতর ঐক্যের উপলব্ধি থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। এই কারণে আমরা মনে করি যে উভয় দার্শনিকই স্বকীয় বিশিষ্ট উপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রায় এক ধারণায় এসে পৌঁছেচেন।

একজন প্রজ্ঞাময় মননের দ্বারা, আর একজন ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে আনন্দ-চৈতন্যময় লোকে উত্তীর্ণ হয়ে। বলাকার কয়েকটি কবিতায় Creative Evolution-এর বিশিষ্ট কয়েকটি ধারণার ও ভাষার যে মিল রয়েছে তা থেকে শুধু এই মনে হয় যে, ঐ গ্রন্থ কবি পাঠ করেছিলেন এবং ওর প্রতিপাদ্য রহস্যময় জীবন-বেগের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওর মধ্যে তিনি নিজেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। ফলে সেই আত্মদর্শনের কৃতজ্ঞতাস্বরূপেই যেন ঐ পুস্তকের কয়েকটি প্রবল উক্তি অলংকাররূপে বলাকার কয়েকটি কবিতায় গ্রহণ করেছেন।* আমাদের আরো মনে হয়, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের নানান্ ক্ষেত্রে প্রাচ্য রহস্যময়তার যে স্পর্শ লেগেছে তারই ফলে ফিকটে, শেলিং, হেগেল থেকে বের্গস এবং ক্রোচে পর্যন্ত প্রায় সকলেরই বিশ্বোপলব্ধির সঙ্গে ভারতীয় ঐক্যদর্শী ভাবধর্মী দর্শনের মিল দেখা যায়। যাই হোক, বের্গসঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই বৃহত্তর সাদৃশ্যের দিকটি লক্ষ্য করতে হবে, এবং বলাকা-পূরবী পর্যায়ে জীবন-অরূপের অথবা প্রকৃতি ও অধ্যাত্মের অপূর্ব মিলন-উপলব্ধির অধ্যায়টি রবীন্দ্র-কাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে চলবে না। গীতাঞ্জলি ও গীতালি থেকে আরম্ভ ক'রে মহুয়া পর্যন্ত জীবন ও ধর্মের সামঞ্জস্যের সূত্রটি ক্রমশ আবিষ্কার ক'রে চলার ছন্দের উপর কবি যেমন প্রাধান্য দিচ্ছেন তেমনি দেখা যায়, এই বিখ্যাত দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গতিতত্ত্ব উপস্থাপিত ক'রে অরূপকে জীবনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইছেন। অধ্যাত্মকে যাঁরা কেবল জীবনাতিরিক্ত (Transcendent) ব'লে দেখতে চান এমন 'মরম না জানে ধরম বাখানে' ব্যক্তিদের বিষয়ে এই সমন্বয়বাদী দার্শনিকের সমালোচনা যেন তাঁর লেখনীতে রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি—"The great error of the doctrines on the spirit has been the idea that by isolating the spiritual life from all the rest, by suspending it in space as high as possible above the earth, they were placing it beyond attack, as if they were not thereby simply exposing it to be taken as an effect of

* প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করতে হয় যে বের্গসঁর কোনো রচনাই খ্রীঃ ১৯১০-এর আগে ইংরেজিতে অনূদিত হয়নি। এই সময়েই সারা পশ্চিমে এই নোতুন মতবাদ নিয়ে আলোড়ন। অনুমান, এর অব্যবহিত পরেই ১৯১২ খ্রীঃ রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গিয়ে সদ্য প্রকাশিত ইং Creative Evolution গ্রন্থ সাগ্রহে পড়ে নেন। মহাযুদ্ধের অভিঘাতে কবির নবচৈতন্যের উদ্বোধ ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ভাবতত্ত্বের স্মৃতি এসে তাতে যোগ দেয়।

mirage !.........a philosophy of intuition will be a negation of science, will be sooner or later swept away by science, if it does not resolve to see the life of the body just where it really is, on the road that leads to the life of the spirit." অর্থাৎ, বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবাদীরা জগৎ ও জীবন থেকে অধ্যাত্মকে পৃথক ক'রে উচ্চে তুলে ধ'রে তাকে রক্ষা করার যে প্রয়াস করেছেন তাতে অধ্যাত্ম তার মূল হারিয়ে ফেলেছে এবং সাধারণ্যে মরীচিকার ভ্রান্তি জন্মাচ্ছে। প্রজ্ঞানবাদীরা যদি আত্মাকে দেহের সঙ্গে যুক্ত ক'রে না দেখেন, জীবনের মধ্যেই জীবনবেগ-রূপ কারণ অনুসন্ধান না করেন তাহ'লে জড়বিজ্ঞানের প্রবাহে অধ্যাত্ম ধুয়ে মুছে যাবে।

বের্গসঁর মতে দেহের মধ্যে দেহাতীত অলৌকিককে প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ দর্শন, বিশ্বের চৈতন্যময় জীবনস্পন্দনের স্বরূপ জীবনের মধ্যেই প্রাপ্তব্য, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সীমার মধ্যেই অসীমের লীলা' প্রত্যক্ষ করতে হবে, জীবনের সবকিছুর মধ্যে জীবনময়কে দেখতে হবে, বৈরাগ্য-প্রণোদিত তুরীয়-লোকে নয়।

দেখা গেল, বের্গসঁ এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে বহুতর মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। কবির এই সংঘাতময় অবিরাম চলার ধারণার মূলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি' মন্ত্রটি রয়েছে এমন ধারণা কোনো কোনো মনীষী পোষণ করেন। 'ব্রাহ্মণে'র এই মন্ত্রটি গতিশীলতার প্রকাশের দিক থেকে অসামান্য, কিন্তু যেহেতু মোটামুটি উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে ও বেদান্ত-অনুসারী ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের মধ্যে বিশ্বের পরিবর্তনশীলতার কথা নানা আকারে বিক্ষিপ্ত রয়েছে—এমনকি, লৌকিক বাউল সংগীতেও নানাস্থানে যাত্রার অনুভূতির স্পর্শ লেগেছে, সেইহেতু একটি বিশিষ্ট মন্ত্রকেই কবি-অভিপ্রায়ের মৌলিক প্রেরণারূপে মনে করতে আমরা দ্বিধাবোধ করেছি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিগূঢ় এবং তা রহস্যময় কবিব্যাপারের মধ্যে এমনিভাবে গ্রথিত যে বিশ্লেষণ ক'রে একথা বলা চলে না যে অমুক মন্ত্র অবলম্বন ক'রে কবি অমুক কবিতা লিখেছেন। এক্ষেত্রে নানাদিক দিয়ে Creative Evolution-এর গ্রন্থকারের উপলব্ধির সঙ্গে তথা Hegel-এর সঙ্গেও কবির যে বিস্তৃত সাদৃশ্য রয়েছে তা আমরা আলোচনার মধ্যেই দেখিয়েছি। বস্তুত রবীন্দ্রকাব্য বিস্ময়-চালিত স্বকীয় উপলব্ধির ক্রমবিকাশের এক বিস্ময়কর চিত্র।

বলাকার বৈষয়িকতামুক্ত যাত্রী-জীবনকে বরণ করার আগ্রহ এবং জীবনের মধ্যে অরূপকে দেখার প্রকার কবি এই সময়কার 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শচীশ-চরিত্রের মধ্যে বাস্তব আধারে দেখানোর প্রয়াস করেছেন এবং বলাকার অব্যবহিত পরের কাব্য 'পলাতকা'র মধ্যে করুণ কাহিনীর আশ্রয়ে জীবনের

গতানুগতিকতা থেকে নিষ্কৃতির অভিলাষ বর্ণনা করেছেন। পলাতকায় নিসর্গকে ঐ মুক্তির বাণীর বাহকরূপে এবং মৃত্যুকে সহায়রূপে কল্পনা করা হয়েছে। 'পলাতকা'র কাব্যমূল্য বলাকা থেকে ভিন্ন শ্রেণীর। বলাকা জীবন-দর্শনে গম্ভীর, ভাষারীতিতে মার্জিত, সংহত, ওজঃপ্রাসাদগুণ-সমন্বিত, আলংকারিক। পলাতকায় সহজ বাস্তব জীবনের আশা ও দীর্ঘশ্বাস, সমাজ ও পরিবারের যান্ত্রিক জীবন থেকে মুক্তির জন্য নারীর করুণ আগ্রহ। কাহিনীর আশ্রয়ে এবং লঘুপর্বিক ছড়ার ছন্দে বাহিত 'পলাতকা' রসিক পাঠকদের কাছে একালের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি।

কবির উপলব্ধির এই পরিণতির কালে নটরাজ-ঋতুরঙ্গের কবিতা ও ঋতু-নাট্যগুলি অসামান্যভাবে তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক হয়েছে। অরূপের যে লীলা চলেছে মহাকাশে, পার্থিব সৃষ্টির মধ্যে, জীবনের মধ্যে, মূলতঃ তারই বিচিত্র অনুভব ঋতুরচনায় প্রকাশিত। খেয়া, শারদোৎসব ও গীতাঞ্জলির আলোচনার সময় আমরা দেখিয়েছি কিভাবে নিসর্গ-সৌন্দর্য-অনুভূতি কবির অরূপ-উপলব্ধির মূলে রয়েছে, প্রকৃতির সুন্দর ও ভয়ানক এই দুই রূপের মাধ্যমে রসনিমগ্ন কবিচিত্ত রসের কারণস্বরূপ (যেহেতু, অরূপ বা সুন্দর কবির রসোপলব্ধির বা জীবনবোধের সঙ্গে এমনভাবে বিজড়িত যে তা পৃথক্ ব্যপদেশের অযোগ্য) অনির্বচনীয়ের সন্ধানে কিরূপে অগ্রসর হয়েছে। সমাজ-জীবনের ও ঋতু-পর্যায়ের বৈচিত্র্যের মধ্যে একের পদধ্বনি তখন থেকে বাস্তবভাবে কবির শ্রুতিগোচর হয়েছে। একালে সেই অনুভবকে প্রবৃদ্ধ করেছে মহাকাশে সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলাদর্শন ও যাবতীয় পার্থিব চঞ্চলতায় সৌররশ্মির বিক্রিয়া অধ্যয়ন। গীতাঞ্জলির নিম্নলিখিত গানটিতে (নিসর্গ-রঙ্গভূমির কল্পিত সূত্রধারকে 'নটরাজ' আখ্যা দেওয়ার পূর্বেই) কবি তন্ময় হয়ে ঐ নটরাজের লীলা অনুভব করেছেন এবং পার্থিব স্বার্থের আত্যন্তিক বিলয়ের মধ্যে এই লীলারসের অনুভবনীয়তা ব্যক্ত করেছেন—

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে।
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।

* * *

সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয়ঋতু যে নৃত্যে মাতে,

প্লাবন বয়ে যায় ধরাতে
বরণ-গীতে-গন্ধে রে ॥

এই গানটিকে ঋতুপ্রকৃতির সঙ্গে কবিমানসের নিবিড় সম্পর্কের ও ঋতু-পর্যায়ের মধ্যে উপলব্ধ অরূপের চরণক্ষেপের দ্যোতক একটি বিশিষ্ট কবিতা ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই অরূপই পরে সন্ন্যাসী, সুন্দর বা মুক্তিদাতা নটরাজে রূপান্তরিত হয়েছে। 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গে'র ভূমিকায় নিসর্গাশ্রিত অরূপের রসিক কবি বলছেন—"নটরাজের তান্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখন্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।"

কার এবং কিসের বন্ধন ? চিরযৌবনময় ও রূপরূপান্তরের মধ্যে অগ্রগামী অন্তরাত্মার স্বার্থকলুষিত জৈব প্রয়োজনের বন্ধন। যুক্তিতর্ক, প্রথা, শাস্ত্র ও পার্থিব বুদ্ধি দিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গ্লানির মধ্যে অনন্ত জীবনকে আমরা বন্দী ক'রে রেখেছি। কবি বলছেন—

মুক্তির প্রয়াসী আমি, শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে
যৌবন হয়েছে বন্দী বাক্যের দুর্গের অন্তরালে ;
স্বচ্ছ আলোকের পথ রুদ্ধ করি ক্ষুব্ধ শুষ্ক ধূলি
আবর্তিয়া উঠে প্রাণে অন্ধতার জয়ধ্বজা তুলি
চতুর্দিকে। ('উদ্বোধন'—বনবাণী)

•

অবসাদের মধ্যে বিস্মৃত নীলমণিলতাকে স্মরণ ক'রেও কবি এই বৈষয়িকতা-গ্রস্ত জড়ত্বে আবদ্ধ ঐহিক জীবনকে নিন্দা করেছেন—

অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে
ঔদাস্যের ধুলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।
মন জড়তায় ঠেকে,
নিখিলেরে জীর্ণ দেখে,
হেনকালে হে নবীন, তুমি এসে কী বলিলে কানে।
(বনবাণী)

মুক্তি জীবনবৈরাগ্যে নয়, স্বার্থবৈরাগ্যে, কবির এই সুপ্রাচীন উপলব্ধিটি প্রকৃতিরসভাবুকতার এই অভিনব পর্যায়ে তিনি অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। নটরাজের লীলায় নিমগ্ন হয়ে কবি এই মুক্তিরস পান করছেন এবং যেন বিষয়াসক্ত বুদ্ধিজীবীদের এই উদার মুক্তিকে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন—

শূন্যবিরে আয় কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।
রবির মুক্তি দেখ না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্যগগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।
প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রাপথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সূতোর
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে।

আধুনিক পরমাণু-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার পর মহাকাশ-দর্শনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। দেখা গেছে যে সূর্য-নক্ষত্র-নীহারিকায় গ্যাসীয় পরমাণুর রাসায়নিক সংশ্লেষ-বিশ্লেষে অহরহ রূপান্তর-চক্রের কাজ চলেছে। তারই ফলে পৃথিবী-পৃষ্ঠে আমরা পাচ্ছি আলো ও সৌন্দর্য, আর অকল্পনীয় উচ্চতাপের অতি নগণ্য অংশ। জটিলতম রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে জীবন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখানেও চলেছে পরিবর্তনের খেলা, যেমন ঘটছে মহাকাশে মুহূর্তে মুহূর্তে সৃষ্টি ও ধ্বংসের আয়োজনে। দাক্ষিণাত্যের শিল্পিত নটরাজ মূর্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি ধ্বংস ও সৃষ্টির সর্বব্যাপী দ্বৈতমূর্তিকে নটরাজের লীলা ব'লে অনুভব করলেন এবং ছন্দিত বাক্যে ও নৃত্যে কণিকা-রূপী মানুষকে ঐ লীলার সঙ্গে একাত্ম হবার আহ্বান জানালেন। এ বিষয়ে "নৃত্যের তালে তালে" গানটি প্রতিনিধি-স্থানীয় রচনা। পরমাণু-বিজ্ঞানের ইলেকট্রন-প্রোটনের চারিত্র্যও এর বর্ণনায় ধরা পড়েছে দেখা যায়—'নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল বিদ্রোহী পরমাণু।' এর পরে 'শেষসপ্তকে' দেখা যাবে আইনস্টাইনের দেশকাল-সমীকরণ তত্ত্বকেও কবি স্বচ্ছন্দে তাঁর কাব্যানুভবে বরণ ক'রে নিয়েছেন।* বলাকার বিশ্বগতিলীলাতত্ত্বও এই অনুভবের মধ্যে নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে। নটরাজ-লীলা প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করার বিষয়, 'খেয়া'য় প্রথম উপলব্ধ দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ রূপের মধ্যে রহস্যময় অরূপ-দর্শনের বিষয়টি এগুলির মধ্যেও নানাভাবে আবর্তিত হয়েছে। চঞ্চল নটরাজের ঐ মিলিত দুই রূপই ঋতুকাব্যের অবলম্বন, যেমন, নটরাজে—

* কবির আধুনিক নভোবিজ্ঞানকে অন্তরঙ্গ ক'রে তোলার পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত গ্রন্থের শেষাংশে দ্রষ্টব্য। 'রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার' গ্রন্থও দ্রঃ।

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে ॥

'শেষ-বর্ষণে' আষাঢ়ের রূপে—

সবুজ সুধার ধারায় ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী
বন্যা মরণ-ঢালা ॥

'বাঁধনহারা' 'পথিক' বসন্তের আহ্বানে বৈরাগী চিত্তের কঠোর রিক্ততার মধ্যে—

আসবে যে সে স্বর্ণরথে,
জাগবি কারা রিক্তপথে
পৌষরজনী তাহার আশায়।

পৌষের রিক্ততা ও ফাল্গুনের পূর্ণতার মধ্যে—

"আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল, আবার যখন পাল্টে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যা-বেলার মালতী—তখন ফাল্গুনের আম্র-মঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।"

অতএব "তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো তুমিই সর্বনেশে"।

•

এই ঋতুপর্যায়ের নাটকের মধ্যে শারদোৎসবের পর দ্বিতীয় রচনা 'ফাল্গুনী' এই সময়কার চলার সুরে বিশেষভাবে স্পন্দিত। 'ফাল্গুনী' বলাকার কবিতাবলীর রচনার মাঝখানেই লেখা। বলাকার সঙ্গে তাই এর ভাবগত মিল। বলাকার কয়েকটি কবিতায় ফাল্গুনীর সুরও অনুভবগম্য। বিশেষত "পৌষের পাতাঝরা তপোবনে" কবিতাটিকে ফাল্গুনীর পূর্বাভাস বলা চলতে পারে। জরা ও জড়ত্বকে অতিক্রম ক'রে 'বারে বারে প্রথম' যৌবনের বিজয়যাত্রা চলেছে, শীতকে বিনির্জিত ক'রে বসন্তের আগমনের রূপকের মধ্যে কবির এই উপলব্ধি অভিব্যক্ত হয়েছে। গীতালির—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

প্রভৃতি গানটি ফাল্গুনীর ভূমিকারূপে স্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায় উৎসর্গ-খেয়া-গীতাঞ্জলি-ডাকঘর-এর চিরপরিচিত সুদূরের বাঁশির সুরেরই

শুনবি রে আয় কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।
রবির মুক্তি দেখ না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্যগগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।
প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রাপথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সূতোর
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে।

আধুনিক পরমাণু-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার পর মহাকাশ-দর্শনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। দেখা গেছে যে সূর্য-নক্ষত্র-নীহারিকায় গ্যাসীয় পরমাণুর রাসায়নিক সংশ্লেষ-বিশ্লেষে অহরহ রূপান্তর-চক্রের কাজ চলেছে। তারই ফলে পৃথিবী-পৃষ্ঠে আমরা পাচ্ছি আলো ও সৌন্দর্য, আর অকল্পনীয় উচ্চতাপের অতি নগণ্য অংশ। জটিলতম রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে জীবন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখানেও চলেছে পরিবর্তনের খেলা, যেমন ঘটছে মহাকাশে মুহূর্তে মুহূর্তে সৃষ্টি ও ধ্বংসের আয়োজনে। দাক্ষিণাত্যের শিল্পিত নটরাজ মূর্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি ধ্বংস ও সৃষ্টির সর্বব্যাপী শৈবমূর্তিকে নটরাজের লীলা ব'লে অনুভব করলেন এবং ছন্দিত বাক্যে ও নৃত্যে কণিকা-রূপী মানুষকে ঐ লীলার সঙ্গে একাত্ম হবার আহ্বান জানালেন। এ বিষয়ে "নৃত্যের তালে তালে" গানটি প্রতিনিধি-স্থানীয় রচনা। পরমাণু-বিজ্ঞানের ইলেকট্রন-প্রোটনের চারিত্র্যও এর বর্ণনায় ধরা পড়েছে দেখা যায়—'নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল বিদ্রোহী পরমাণু।' এর পরে 'শেষসপ্তকে' দেখা যাবে আইনস্টাইনের দেশকাল-সমীকরণ তত্ত্বকেও কবি স্বচ্ছন্দে তাঁর কাব্যানুভবে বরণ ক'রে নিয়েছেন।* বলাকার বিশ্বগতিলীলাতত্ত্বও এই অনুভবের মধ্যে নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে। নটরাজ-লীলা প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করার বিষয়, 'খেয়া'য় প্রথম উপলব্ধ দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ রূপের মধ্যে রহস্যময় অরূপ-দর্শনের বিষয়টি এগুলির মধ্যেও নানাভাবে আবর্তিত হয়েছে। চঞ্চল নটরাজের ঐ মিলিত দুই রূপই ঋতুকাব্যের অবলম্বন, যেমন, নটরাজে—

* কবির আধুনিক নভোবিজ্ঞানকে অন্তরঙ্গ ক'রে তোলার পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত গ্রন্থের শেষাংশে দ্রষ্টব্য। 'রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার' গ্রন্থও দ্রঃ।

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে ॥

'শেষ-বর্ষণে' আষাঢ়ের রূপে—

সবুজ সুধার ধারায় ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী
বন্যা মরণ-ঢালা ॥

'বাঁধনহারা' 'পথিক' বসন্তের আহ্বানে বৈরাগী চিত্তের কঠোর রিক্ততার মধ্যে—

আসবে যে সে স্বর্ণরথে,
জাগবি কারা রিক্তপথে
পৌষরজনী তাহার আশায়।

পৌষের রিক্ততা ও ফাল্গুনের পূর্ণতার মধ্যে—

"আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল, আবার যখন পাল্টে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যা-বেলার মালতী—তখন ফাল্গুনের আম্র-মঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।"

অতএব "তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো তুমিই সর্বনেশে"।

•

এই ঋতুপর্যায়ের নাটকের মধ্যে শারদোৎসবের পর দ্বিতীয় রচনা 'ফাল্গুনী' এই সময়কার চলার সুরে বিশেষভাবে স্পন্দিত। 'ফাল্গুনী' বলাকার কবিতাবলীর রচনার মাঝখানেই লেখা। বলাকার সঙ্গে তাই এর ভাবগত মিল। বলাকার কয়েকটি কবিতায় ফাল্গুনীর সুরও অনুভবগম্য। বিশেষত "পৌষের পাতাঝরা তপোবনে" কবিতাটিকে ফাল্গুনীর পূর্বাভাস বলা চলতে পারে। জরা ও জড়ত্বকে অতিক্রম ক'রে 'বারে বারে প্রথম' যৌবনের বিজয়যাত্রা চলেছে, শীতকে বিনির্জিত ক'রে বসন্তের আগমনের রূপকের মধ্যে কবির এই উপলব্ধি অভিব্যক্ত হয়েছে। গীতালির—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

প্রভৃতি গানটি ফাল্গুনীর ভূমিকারূপে স্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায় উৎসর্গ-খেয়া-গীতাঞ্জলি-ডাকঘর-এর চিরপরিচিত সুদূরের বাঁশির সুরেরই

সঙ্গে ফাল্গুনীর চলার সুর একাত্মও বটে। কিন্তু ফাল্গুনীতে আমাদের সমাজের জীর্ণতা ও জড়ত্বের উপর কবির বিরাগ অতিশয় প্রবল। আমাদের অত্যন্ত প্রবীণ, সংশয়-কুণ্ঠিত, বুদ্ধি-অবগুণ্ঠিত, জরাগ্রস্ত মনটাকে কবি 'মান্ধাতার আমলের বুড়ো' ব'লে অভিহিত ক'রে ওর সুচির-লালিত দৃঢ়মূল বার্ধক্যের আবরণ সবলে উন্মোচন করেছেন এবং তার যথার্থ স্বরূপ এখানে উদ্ঘাটিত করেছেন। ফাল্গুনীর অকারণ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য-পরিণাম-হীন চলা কিশোরদের কণ্ঠে কেমন সহজ প্রকাশ লাভ করেছে।—

আমরা যাব।—

কোথায়?

সেটা আমরা ঠিক করিনি।

যাওয়াটাই ঠিক করেছ কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক করনি।

সেটা চলতে চলতে আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

'যাওয়ার সুরে আসার সুরে' একাকার হয়ে সমস্ত বিশ্বে যে একটা সত্যের লীলা চলেছে তা ফাল্গুনীর কয়েকটি গানের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। কবি বলছেন, যাত্রার মধ্যে মিলন ও বিরহের সুর রয়েছে একত্র মিশ্রিত। "জগৎটা কেবল পাব পাব বলছে না—সঙ্গে সঙ্গেই বলছে ছাড়ব ছাড়ব।"

নতুন ক'রে পাব ব'লে
হারাই ক্ষণে ক্ষণে।

* * *

তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন।

এই হ'ল প্রকৃতির মধ্যে বসন্তের লীলা, নব নব রূপের মধ্যে অরূপের পুনঃ-পুন প্রকাশ। প্রাণের মধ্যেও সেই ফাল্গুনের লীলা চলেছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে পাবার আগ্রহে, যার প্রেরণায় বালকের দল ছুটে চলেছে শীতবৃদ্ধের বস্ত্রহরণ করতে। "বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলেছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।" এবং অনুসিদ্ধান্তে সমাজপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবনের মুক্তির লীলা। বালকদের কর্তব্যের বালাই নেই, প্রয়োজনের তাগিদ নেই, তারা বুদ্ধির বন্ধতা থেকে মুক্ত। তাদের আছে শুধু 'পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয়' ক্ষয় করা। 'আমরা কিছু বুঝব না বলেই আজ বেরিয়ে পড়েছি।' বুদ্ধিকে বিষয়-সুখের সঙ্গে জড়িত ক'রে প্রজ্ঞানবাদী বের্গসঁর মত 'কবিশেখর' বা রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় না। ওরা বুদ্ধিমান।"

বলা বাহুল্য, একথা লেখার সময় আধুনিক বৈষয়িকতা-প্রবণ বুদ্ধিজীবী তরুণদের কথাই কবির মনে হয়েছিল। জীবনের মধ্যে স্বার্থবৈরাগ্যের সাধনাই মুক্তির সাধনা, তাতেই অরূপের লীলাচ্ছন্দে যোগদানের পথ উন্মুক্ত হয় এই সত্যোপলব্ধিটি অন্যত্র যেমন ফাল্গুনীতেও তেমনি স্পষ্ট ক'রেই 'কবিশেখর' বা কবি ব্যক্ত করলেন—

"যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেছে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয়, যারা কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপছে তারাও নয়, যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে ব'লেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে—সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সবচেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।"

এই হ'ল আধুনিক কবিশ্রেষ্ঠের নবতম জীবন-দর্শন। প্রথার জীর্ণতা এবং যাবতীয় পুরাতন অবরুদ্ধতা থেকে মানুষের মুক্তি, নবজীবনের জয়। কবি কর্তৃক দৃষ্ট এ মুক্তি-সত্যের আর এক যুগোপযোগী বাস্তব মূর্তি আমরা একটু পরেই দেখতে পাব মুক্তধারা ও রক্তকরবী নাটকদ্বয়ের আলোচনায়। কিন্তু তার পূর্বে ফাল্গুনীর সঙ্গে সমসূত্রে আবদ্ধ পুরাতনের পরাজয় ও নবীনের জয়সূচক 'তাসের দেশ' নাটকের কথা অবশ্য স্মরণ করতে হয়। ফাল্গুনী থেকে এই নাটকের বিশেষ এই যে এদেশের প্রথাজীর্ণ ও ভেদবুদ্ধিতে কলঙ্কিত সমাজকে ভেঙে নোতুন সমাজ গ'ড়ে তোলার প্রেরণা এর মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করা হয়েছে। "জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্" এ যেমন ফাল্গুনী তেমনি তাসের দেশেরও মর্মকথা এবং পূর্বেকার অচলায়তনও এই বৈপ্লবিক সমাজ-পরিবর্তনের সূত্রেই গ্রথিত।

গীতালি ও বলাকার অ-বস্তুতান্ত্রিক জীবনরসবাদ বা আমাদের কথিত জীবন ও অরূপের সমন্বয়, পূরবী ও মহুয়াতে কী রূপান্তর গ্রহণ করেছে তা এখন আমাদের লক্ষণীয় হবে। কিন্তু তার পূর্বে এই সময়ের রচনার একটি লঘু প্রবণতার দিক সম্পর্কে অচেতন থাকলে চলবে না। তা হ'ল কবির বিশেষভাবে সাময়িক রচনা, যা কোনো ব্যক্তির প্রেরণায় লেখা, ঘটনা-বিশেষের আবরণে আবৃত। এরকম একান্ত তাৎকালিক কবিতা ইতিপূর্বে লেখা হ'লেও তাদের সংখ্যা বর্তমানের থেকে খুবই কম। কবির পরিচয়ের ও লৌকিক সহানুভূতির সীমানা বেড়ে যাওয়ার ফলে এরকম আধা-ফরমায়েশি বা ফরমায়েশি রচনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে কিনা তা চিন্তনীয়, অথবা এই যুগের

পর কবির প্রতিভা-দীপ্তি (বহুবিস্তৃত হ'লেও) ক্ষীণ হয়ে আসছে ব'লে, তার পূর্বাভাস পূরবী-মহুয়ার অসামান্যতার মধ্যেও সূচিত হয়েছে কিনা তাও ভেবে দেখবার বিষয়। অবশ্য তাৎকালিক দাবীর পরিপূরক হ'লেও এগুলি যে কাব্য হিসাবে উপাদেয় নয় তা আমরা বলি না। এগুলির মধ্যে কয়েকটি তাঁর প্রতিভার স্বকীয়ত্বে মণ্ডিত হয়ে কেবলমাত্র সাময়িকতাকেই অতিক্রম করেনি অধিকন্তু এই পর্যায়ের বিশিষ্ট পরিণত কবি-প্রতিভার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলির রচনার মুহূর্ত যেন কবির রসসাক্ষাৎকারের দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেমন ধরা যাক পূরবীর শেষের দিকে মুদ্রিত 'বিদেশী ফুল', 'অতিথি' প্রভৃতি, তাঁর বিদেশবাসের গৃহকর্ত্রীর উদ্দেশ্যে অথবা তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে লেখা কয়েকটি অনুরাগের কবিতা। নানান্ স্মৃতি-বিস্মৃতি জড়িয়ে এক একটি বিশেষ মুহূর্তে এগুলির প্রকাশ এবং এগুলির মাধুর্যও অনস্বীকার্য, বিশেষভাবে 'শেষ বসন্ত' কবিতাটিতে প্রেমনিবেদনের মধ্য দিয়ে পথিক কবির ক্ষণিকতা-বিলাসী মর্মের অপূর্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'আকন্দ' নামে গীতিকবির একটি সাধারণ মুহূর্ত কার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়েছে কে জানে? পূরবী থেকে মহুয়ায় এই ধরনের কবিতার সংখ্যা বেশি, এবং পরের কয়েকটি কাব্যে এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মহুয়ায় কতকগুলি ফরমায়েশি কবিতা এবং নিছক 'প্রসাধনকলা'র কতকগুলি কবিতা (যেমন 'নাম্নী' শ্রেণীর কবিতাগুলি) সম্পর্কে কবি স্বয়ং অতিশয় সচেতন (রচনাবলী, গ্রন্থ পরিচয় দ্রঃ)। কিন্তু বহিঃপ্রেরণার তাগিদেও এমন সব কবিতা সৃষ্ট হয়েছে যেগুলি পূর্বাপর মিলিয়ে এই দ্রষ্টা কবির পরিণত উপলব্ধির সঙ্গে একত্র আস্বাদন করা যায়; স্বতঃপ্রেরিত কবিতার তো কথাই নেই। এ সম্পর্কে কবি পূর্ব থেকেই আমাদের ধারণার অনুকূলে সায় দিয়ে রেখেছেন দেখতে পাই—'মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে গেছে।' এদের মধ্যে কবি-প্রতিভার স্বকীয়তায় উজ্জ্বল কবিতা-গুলিই বস্তুত আমাদের দর্শনীয় হবে।

পূরবী-কাব্যের সাধারণ লক্ষণ হ'ল বিচ্ছেদ-বিধুর অন্বেষণ-স্পৃহা এবং রোম্যান্টিক প্রণয় ও স্মৃতিচারণা। সমাজের প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্পর্শ থেকে পূরবী যেন বঞ্চিত। নিসর্গই হোক, আর প্রণয়ই হোক, ব্যক্তি-অনুষঙ্গ পূরবীর লক্ষণীয় ব্যাপার এবং সেই হিসাবে 'বলাকা' থেকে এ-কাব্যের রসগত পার্থক্য। 'পূরবী'র উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি পাঠ করলে কবির নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবণতার সঙ্গে পরিচয় হয়। এক, বিদায়-কল্পনা ও বিরহ-ভাবনা বিজড়িত মর্ত্যের প্রেম ও সৌন্দর্যের আস্বাদন, দুই, রূপ-রূপান্তর জন্ম-

জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কাব্যরসাস্বাদের জন্যে আগ্রহ প্রকাশ, তিন, মর্ত্যের রূপবাহুল্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন তথা মহাকাশে সৌর-জ্যোতিরূপে উদ্‌ভাসিত সৌন্দর্যের একটি মৌল সত্তাকে নিকটে পাওয়ার ব্যাকুলতা ও অসম্পূর্ণতাবোধে হতাশ্বাস। এসবের সঙ্গে কোথাও কোথাও বিজড়িত রয়েছে কবির পূর্বজীবনের বেদনা-মধুর স্মৃতি। গীতালি-বলাকা কালের নবউপলব্ধ আত্মপরিচয় ও বিশ্ব-পরিচয়ের মধ্যেই যাত্রী কবির উপরি-উক্ত প্রবণতাগুলির মূল হয়ত বা নিহিত রয়েছে, বৈপরীত্যে। অর্থাৎ অজানার যাত্রায় রোম্যান্টিক হর্ষের পালার পর এখন বিষাদের অবসন্নতা এবং পৃথিবীকে আরও মমত্ব দিয়ে ঘিরে রাখার প্রয়াস। আর, সম্ভবত যান্ত্রিকতাময় কর্মজীবন এবং সাময়িক অসুস্থতা প্রতিঘাত দিয়ে কবির চিত্তকে 'যৌবন বেদনারসে উচ্ছল' দিনগুলির স্মৃতিতে নিয়ে গেছে ও যাত্রার আনন্দের সঙ্গে বেদনা বিজড়িত করেছে। পূরবীতে কবি যে একেবারে সোনারতরী-যুগের রোম্যান্টিক স্বপ্নাবেশের ও মর্ত্য-প্রেম-বিহ্বলতার কবি হয়ে উঠেছেন তা নয়, পুরানো দিনের হারানো প্রেমের ও সৌন্দর্যের স্মৃতির প্রতি তাঁর ব্যাকুলতা জেগেছে মাত্র। বস্তুত পূরবীর প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত স্পৃহা চলার পথের মিস্‌টিকতা-জড়িত রসাস্বাদবিশেষ, যা একালের 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গে'ও ভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু পূরবীর ক্ষীণ বেদনাময়তার মূলে তৎকালীন ব্যক্তিগত বাস্তবতা অথবা পূর্বস্মৃতি যে-ধারণাই আরোপ করা যাক না কেন, পূর্বোক্ত অপূর্ণতাবোধের নিমিত্ত হতাশ্বাসের দিকটিকে একালের কবি-কল্পনার মধ্যবর্তী উল্লেখ্য ব্যাপার ব'লে প্রণিধান করতেই হবে। এই হতাশা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে কবির ধারণা বলাকায় উপলব্ধ পরিবর্তনবোধ ও বর্তমানের মমত্বের দ্বন্দ্ব থেকে উৎপন্ন। কবির যাত্রা-অনুভূতির সঙ্গেই কোনো গোপন অথচ নিতান্ত পরিচিত সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির প্রয়াস ও না-পাওয়ার বেদনা, সুতরাং পরিচয়ের অসমাপ্তিজনিত হতাশা, কবিকে আবিষ্ট করেছে। এই বেদনাই নানাভাবে কয়েকটি কবিতায় যাত্রার ক্ষীণ আনন্দের সঙ্গে একত্র প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি নভোবিজ্ঞানের সম্পর্ক-যুক্ত 'সাবিত্রী' ও 'আহ্বান' কবিতাতেও প্রণয়স্মৃতি ও অপ্রাপ্তির সুর মর্মরিত হয়েছে।

এই কাব্যটির ভূমিকারূপে উপস্থাপিত 'পূরবী' নাম্নী কবিতাটির মধ্যে কবি চলার সঙ্গে উপভোগের আন্তরিক সমন্বয় সাধন করেছেন। এ আনন্দ নিরাসক্ত, কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে চিরন্তন সঞ্চয়রূপে গ্রহণ করতে চায় না। 'এই যা দেখা, এই যা ছোঁয়া, এই ভালো, এই ভালো।' এ যেন বলাকার সেই শ্রেষ্ঠধন—'না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার, সেই তো তোমার।' এবং পরবর্তী মহুয়া-কাব্যের ''আমরা দু'জন চলতি হাওয়ার পন্থী'। আবার

খেয়া ও গীতাঞ্জলির প্রয়োজন-বাসনামুক্ত অরূপানন্দের এ যে সগোত্র তাতেও সন্দেহ নেই, যেহেতু 'বকুলবনের পাখি' কবিতায় কবি স্পষ্টভাবেই বৈরাগ্যময় কাব্যিক মুক্তির কথা জানালেন—

শোনো শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
মুক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খসে যাক নিঃশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক না ফেঁসে,
কীর্তি যাক না ঢাকি।

এই 'বকুলবনের পাখি' এবং পূর্বদিনের লীলাসঙ্গিনী একই কল্পনার অন্তর্গত। বিরহ-কাতর কবির এই ধরনের কাব্যিক নির্লিপ্ততা গোধূলি-পর্যায়ের শেষ সপ্তক, পত্রপুট প্রভৃতি কাব্যে যে আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা পরে দেখতে পাব।

'যাত্রা' কবিতাটিতে কথিত অজ্ঞাত পথিকদের পথে যদ্যপি বিষাদের কুহেলিকা এবং ভঙ্গিতেও 'চক্ষু ছলছল' তথাপি কবি নিজ প্রেরণায় অজানার পথে অবশ্যই চলবেন, কারণ কবির বিশ্বাস এ জীবনের পরিসমাপ্তিতেই আনন্দবোধের পরিণাম নয়। মর্ত্য-আনন্দরসে বিহ্বল কবি মর্ত্যজীবনের পরেও বঞ্চিত থাকবেন না এমন অভিলাষ প্রকাশ করেছেন। এই কবিতাটির নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গে ভাবে ও ভঙ্গিতে বলাকার তেরো সংখ্যক (যৌবনের পত্র) কবিতার অপূর্ব কবিত্বময় উপসংহার একান্তভাবে তুলনীয়—

যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধ শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে
ইন্দ্রাণীর স্বয়ংবরমাল্য-সাথে; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গন-দ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দনমন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকরপাঁতি
গেছে উড়ি মর্তের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি। (যাত্রা)

স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,

ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার। (যৌবনের পত্র)

মর্ত্যজীবনে অভিলষিত রমণীয়তার সত্যকে অপূর্ণভাবে পাওয়ার বেদনা পূরবীর কয়েকটি কবিতার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষভাবে কল্পিত ঐক্যসত্তার অনুসন্ধানমূলক কবিতাগুলির মধ্যে, কোথাও পরিস্ফুটভাবে, কোথাও অপরিস্ফুটভাবে। যেমন—ক্ষণিকা, তারা, আহ্বান, সাবিত্রী। 'বকুল-বনের পাখি' কবিতাটিতে যাত্রার নিশ্চয়তার সঙ্গে অনুরাগময় পূর্ব-স্মৃতি ও দূরে চ'লে যাওয়ার তীব্র বেদনা সঞ্চারিত হয়েছে—

শোনো শোনো ওগো বকুলবনের পাখি,
দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি।
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি,
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি।
কিছু কি থাকে না বাকি।
বালক গিয়াছে হারায়ে, সে-কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে?

এই অংশের সঙ্গে প্রথম যৌবনে লেখা 'বসুন্ধরা' কবিতার উপসংহারের বেদনার দিকটি 'তাহাদের প্রেমে কিছু কি রব না আমি' ইত্যাদি তুলনা ক'রে একালের নব-উপলব্ধির সঙ্গে বিজড়িত গতি-মনোভাবও বৈপরীত্যে স্মরণযোগ্য—

শোনো শোনো ওগো বকুলবনের পাখি,
মুক্তির টিকা ললাটে দাও'তো আঁকি।

* * *

ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।

এই শ্রেণীর বেদনা-মাধুর্যের সঙ্গে যুক্ত 'খেলা' ও বহুশ্রুত 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায় যে-নারীমূর্তি কবির গোচরীভূত হয়েছেন তিনি তাঁর পূর্ব কাব্য-জীবনের বিদেশিনী বা মানসসুন্দরী। কবির কল্পনা অনুসারে ইনি কবির সৌন্দর্য-অনুভূতি, সুদূরব্যাকুলতা ও অরূপের লীলার সঙ্গিনী মাত্র। 'পূরবী'তে অবরুদ্ধতার বেদনার সঙ্গে কবি যখনই মর্ত্যের বিশুদ্ধ আনন্দরস আস্বাদনের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছেন তখনই স্বভাবতই লীলাসহচরী তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছে। ইনি কবির ব্যক্তিগত বৈষয়িক জীবনের সংবাদ রাখেন না, বিশুদ্ধ কল্পনাগুলির পরিপুষ্টিতে সহায়তা করেন। তাই দেখা যায় এই সঙ্গিনীর চারিত্রবর্ণনার মধ্যে পূর্বেকার মানসসুন্দরীই দেখা দিয়েছেন,

যিনি কবির পুঁথিপত্র ফেলে দিয়ে কর্মমুক্ত ক'রে তাঁকে নিরুদ্দেশ সুদূরের সঙ্গে যুক্ত করতেন—

মনে আছে সে কি, সব কাজ, সখী,
ভুলায়েছ বারে বারে—
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার কঙ্কণঝংকারে।
...কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছে এবেলা
কাজের কক্ষকোণে।
সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলাপ্রাঙ্গণে।
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে—
অযাত্রাপথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে।

এর সঙ্গে প্রথম কাব্যজীবনের নিসর্গাশ্রিত সৌন্দর্যময়তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন মানসসুন্দরীর স্বভাবের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করতে হবে। কবিতাটির শেষাংশের 'গোপনরঙ্গিণী', 'রসতরঙ্গিণী', 'নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চ'লে', 'চিনি যে তোমারে চিনি' প্রভৃতি বর্ণনা থেকে বুঝতে বাকি থাকে না যে, ইনি কেবল কবির নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যেরই সঙ্গিনী নন, উৎসর্গের সুদূরের চকিত স্পর্শ এবং খেয়া ও শারদোৎসব প্রভৃতির প্রাথমিক অরূপানুভূতিরও অকথিত সহচরী। কবির অরূপ-ব্যাকুলতার বিস্তৃত অধ্যায়টির মধ্যে গোপন থেকে, বলাকার বৈরাগ্যমূলক তীব্র জীবনবোধে প্রতিহত হয়ে, পূরবীর ব্যাকুলিত প্রণয়-সৌন্দর্য-অনুভবের কালে ইনি স্বাভাবিকভাবেই কবির কাছে পূর্ব রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছেন। তাই কবি বলছেন—

সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।

কিন্তু কবির এখনকার চলার অনুভূতি ও সম্যক্-ধরা-না-দেওয়ার বা পুনঃপ্রাপ্তির অভাবজনিত বেদনার সঙ্গে বয়ঃসুলভ বিদায়ের মনোভাব মিশ্রিত হয়ে কবিতাটিতে করুণরস সঞ্চার করেছে—

দেখো না কি হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষরাগিণীর বীন।

তথাপি দেখা যায়, জীবন-উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত কবি মর্ত্য থেকে বিদায়ের

বেদনা অতিক্রম করতে চাইছেন এবং তাঁর সঙ্গিনীর এই অসময়ে আহ্বানের একটা অর্থও উপলব্ধি করতে চাইছেন—

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে।

এর সঙ্গে 'পদধ্বনি' কবিতার "ডাক মোরে কী খেলা খেলাতে আতঙ্কিত নিশীথ বেলাতে" এবং সানাইয়ের 'বিপ্লব' কবিতার 'হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিতকঙ্কণে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি তুলনার যোগ্য এবং এই 'লীলা-সঙ্গিনী' শেষ-সপ্তক, বীথিকা, সানাই প্রভৃতি শেষজীবনের কয়েকটি কাব্যে কবির কাছে পুনঃপুন কোন্ রূপে দেখা দিয়েছেন তাও লক্ষণীয়। কবিতাটি নিতান্ত-মধুর অনুপ্রাসের সৌন্দর্যে আদ্যন্ত করুণ-কোমল ভাব বিস্তারে সহায়তা করেছে।

লীলাসঙ্গিনীর কল্পমূর্তি কবির বিভিন্ন বিকাশশীল লীলানুভূতির যোগসাধয়িত্রী হ'লেও সৌন্দর্য, সুন্দর বা অরূপের সঙ্গে ইঁনি একাত্মও হয়ে পড়েছেন। কবির সমস্ত অনুভবই তীব্রভাবে কল্পনাশ্রিত ব'লে সুন্দর-রসের সঙ্গে ঐ রসেরই কল্পিত রূপের পার্থক্য কোথাও কোথাও স্বাভাবিক-ভাবেই লুপ্ত হয়ে গেছে। এইজন্য উৎসর্গের 'জ্যোৎস্নানিশীথে পূর্ণশশীতে দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে' প্রভৃতির মধ্যে রূপাশ্রিত রসানুভূতি বা রসাশ্রিত রূপদর্শন যেমন এক হয়ে পড়েছে তেমনি পূরবীর এই কবিতাটিতেও 'ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে, ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে' প্রভৃতির মধ্যে লীলা ও লীলার কল্পিত সহচরী এক হয়ে পড়েছে। 'মানস-সুন্দরী' বা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'তে অথবা চিত্রার 'জ্যোৎস্না রাত্রে', 'পূর্ণিমা' বা 'উর্বশী' কবিতাতেও কল্পিত রূপ ও উপলব্ধ রস সমবায়সম্বন্ধে উদ্ভূত হয়েছে। এইজন্যই পরের আলোচ্য 'পদধ্বনি' কবিতার যাত্রামূলক অরূপানু-ভূতি ও লীলাসঙ্গিনীর ইঙ্গিতের মধ্যে পার্থক্য নেই এবং 'আহ্বান' কবিতায় কবি যেখানে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত সৌন্দর্য-সত্তাকে সম্পূর্ণ-রূপে উপলব্ধি করার আগ্রহে অধীর হয়েছেন সেখানে সহজেই ঐ কল্পিত সত্তা রহস্যময়ী নারীরূপে দেখা দিয়েছে—'সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া।' সোনারতরী-চিত্রা-কালের সৌন্দর্যমূর্তির এই রূপান্তর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয়।

কবির একটি ব্যক্তিগত বাস্তব উপলব্ধি তাঁর রুগ্ণ অবস্থায় ঘটেছিল এবং কী প্রকারে তা (একটু পরের লেখা হ'লেও) 'পদধ্বনি' কবিতাটির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বিবৃত হয়েছে। 'পদধ্বনি' কবির নিবিড়তম উপলব্ধির একটি উত্তম কবিতা। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠ করলে মনে হয় যাঁর পদধ্বনি কবি শুনেছেন ব'লে কল্পনা করছেন সেই অরূপকে 'লীলাসঙ্গিনী' রূপে পূর্বেই লক্ষ্য করছেন—

ডাক মোরে কী খেলা খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথবেলাতে।
বারে বারে দিয়েছ নিঃসঙ্গ করি ;
এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে।

যে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার উৎসাহ কবি পূর্বে বার বার প্রকাশ করেছেন, অস্ফুট শঙ্কামিশ্রিত আনন্দে কবি কিভাবে তাকে অতি বাস্তব অনুভূতির মধ্যে গ্রহণ করছেন তা লক্ষ্য করার বিষয়—

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি।
অজানার যাত্রী কে গো। ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।

সঙ্গে সঙ্গে কবি উপলব্ধি করলেন এ সেই পূর্ব-পরিচিত অরূপের আহ্বান, পরিবর্তনশীলতাই যার রূপ, আসক্তিমোচনই যার অভিপ্রায়—

এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে
পদে পদে চিরদিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে।

কবি এই অনিশ্চিত সুতরাং ভয়ংকর যাত্রার মর্মে আত্মকথা বিবৃত করছেন—

ছিঁড়ি মোর
শয্যার বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলায়
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসানখেলায়।

কিন্তু এর লীলার স্বরূপ কবি পূর্বেই (অর্থাৎ বিশেষভাবে গীতালি-বলাকা-ফাল্গুনীতে) উপলব্ধি করেছেন, তাই উৎসাহ-সহকারে বলেছেন—

হোক তাই
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারংবার
জীবনে আমার।
জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন ক'রে তোলা ;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা।

এই আশ্বাসবাণীই যদিচ কবির চিরন্তন সহায় তথাপি বাস্তব উপলব্ধির ক্ষেত্রে কবিচিত্তে একদিকে বেদনার সঞ্চার হয়েছে এবং আর একদিকে বোধের অসম্পূর্ণতাও কবিকে পীড়িত করেছে।

পূরবীর কয়েকটি কবিতায় কবি একান্তভাবে আত্মমুখী হয়ে উঠেছেন। যে প্রজ্ঞানলোকে কবি এযাবৎ একটি সর্বহৃদয়-সংবেদ্য ভাব (তা অরূপ সম্পর্কেই হোক বা গতিশীলতা সম্পর্কেই হোক) আস্বাদন করেছিলেন

তাকে যেন ফিরিয়ে এনে এখন নিজের জীবনে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলেন। এগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিলাসও নেই, ঠিক পূর্বেকার অরূপ বা যাত্রা বা গতির কথাও নেই। এ যেন একটা বিশেষ আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ। এগুলিতে বরঞ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্তরালবর্তী তথা অন্তরে উপলব্ধ একটি সামঞ্জস্য বা ঐক্যের তত্ত্বকে উদ্ঘাটন ক'রে দেখার প্রয়াস এবং সেই সত্যকে না জানার বেদনাই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এরকম আত্মতত্ত্ব বা ঐক্যতত্ত্ব দর্শনের অভিলাষ অবশ্য প্রথম বলাকাতেই লক্ষ্য করা যায়, যেমন—

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।

—ইত্যাদি (২৯ সং)

অথবা—

হে ভুবন,
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন

—ইত্যাদি (১৭ সং)

বলা বাহুল্য, এগুলি যে পরিমাণে তত্ত্ববোধ-পরিচায়ক হয়ে উঠেছে সে পরিমাণে কাব্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পূরবীর আত্মদর্শনেচ্ছা ও আত্মবিশ্লেষণ উপযুক্ত ভাবাবেগের সহায়তায় কাব্যরূপ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এই একান্ত মর্মমুখীতার কথা পূরবীর 'আগমনী' কবিতাটিতে কবি প্রথম ব্যক্ত করেছেন—

অবুঝ তোরা, তাহারে বুঝি
দূরের পানে ফিরিস খুঁজি ;
বাহিরে আঁখি বাঁধা,
প্রাণের মাঝে চাহিস না যে, তাই তো লাগে ধাঁধা।

*　　*　　*

বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।

কবির এই মর্ম-বিচারের প্রকৃষ্ট পরিচয় 'আহ্বান' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে—'আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারংবার ফিরেছি ডাকিয়া।' কবি এখানে অনুভব করছেন যে বহির্বিশ্বে মহাকাশে তাঁরা নরুদ্দেশ-

সুন্দরীর জ্যোতিঃসৌন্দর্যময়ী সত্তার পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। জ্যোতিরূপে তিনিই কবির আত্মাকে বারবার আহ্বান করছেন—

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে ; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।

নারীরূপে কল্পিত বাইরের মহানিসর্গের ঐ বিচিত্রবর্ণের আলোকসত্তার পরিচয় জ্যোতির্বিদদের বর্ণালী পরীক্ষণে ধরা পড়েছে, তাই কবি বলেছেন 'আলোকের বর্ণে বর্ণে'। কবি-আত্মা পার্থিব প্রয়োজনের জীবনে জড়ত্বের আবরণে সর্বদাই আবৃত রয়েছে। যখন বাহিরের জ্যোতিঃসত্তা কবির অন্তরের সত্তাকে জাগিয়ে তোলে তখনই সম্ভবপর হয় কবির প্রজ্ঞানময় কল্পনা-মূলক আত্মদর্শন। আর তখনই নিশ্চল কবিমানস চঞ্চল হয়ে ওঠে, ভাবাবেগে স্পন্দিত হয় ; জন্ম হয় কবিতার। নৃত্যচ্ছন্দ-মুখর কবিতা বস্তুতপক্ষে কল্পনা-চালিত উদ্‌বোধিত আত্ম-প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি গান গেয়ে উঠি,—
"আছি, আমি আছি।"
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াসা ফেলে টুটি
বাঁচি, আমি বাঁচি।
তুমি মোরে চাও যবে অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে ;
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে আসে
নৃত্যকলরোলে।

রসবাদী আলংকারিকেরা রসচর্বণাবস্থার আবির্ভাবক্ষণের যে পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্র-বর্ণিত এই মানসিক অবস্থার বর্ণনা স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে দেখা যায়। তাঁদের কথিত 'চিদ্‌গত আবরণভঙ্গ', 'রজস্তমোগুণের মালিন্যের নিবৃত্তি' আনন্দ-চৈতন্যের জাগরণের বা আত্মসাক্ষাৎকারের অবস্থাই এখানে কবি নিজস্বভাবে বিবৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি থেকে ইটালীয় দার্শনিক ক্রোচের 'আত্মপ্রকাশই কাব্য' এই তত্ত্বও প্রমাণ করা যায়। অবশ্য বাহিরের এক প্রকৃতি কবিকল্পিত কোনো পদার্থ ক্রোচে স্বীকার করেননি। বাহিরের এক এবং অন্তরের একের মিলনে কবির জড়ত্বের আবরণমুক্ত চৈতন্য যে উন্মীলিত হয় এবং তখনই যে যথার্থ কাব্যোপলব্ধি ঘটে এই কথাটি সাহিত্যের বিচার প্রসঙ্গেও কবি পুনঃপুন উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে ঐ আত্মপ্রকাশ বা আত্মোপলব্ধি এবং ব্রহ্মোপলব্ধি অবশ্য এক, সহোদর নয়। সাহিত্যবিচারমূলক নানান্ প্রবন্ধে কবি আমাদের মানবীয় অস্তিত্বের

একেবারে মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন, সুতরাং সে সকল স্থানের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না ব'লে মনে করি। "আমি আছি" এর ব্যাখ্যা তাঁর ঐ সাহিত্যিক আলোচনাগুলিতেই পাওয়া যাবে—

'আমি আছি এবং আর-সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল-মিলন।···আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র করে তুলেছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানাভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে।···শাস্ত্রে আছে, এক বললেন বহু হব।······আমাতে যে এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তার বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।' (সাহিত্যতত্ত্ব—সাহিত্যের পথে)

'বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।' (ঐ)

'আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা-কিছু জানি, কোনো-না-কোনো ঐক্যসূত্রে জানি।···কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্প-কলায় গ্রীক শিল্পীর পূজাপাত্রে বিচিত্র রেখায় যখন আমরা পরিপূর্ণ একককে চরম রূপে দেখি তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন হয়।' (তথ্য ও সত্য—সাহিত্যের পথে)

'গোলাপ ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মরূপী এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে, তখন এর আর কোনো মূল্যের দরকার হয় না। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় ব'লে এর নাম দিই আনন্দরূপ।' (ঐ)

রবীন্দ্রনাথ কথিত এই দুয়ের, বহির্বাস্তব ও অন্তরের কবি-আত্মার মিলন হ'ল আলংকারিকদের কথিত রসাবস্থা। রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যের জড়ত্ব থেকে মুক্তি এবং আনন্দরূপের প্রকাশ হ'ল আলংকারিকদের পূর্বোক্ত 'চিদ্‌গত আবরণভঙ্গ' এবং সত্ত্বগুণের স্ফুরণে 'প্রকাশানন্দচিন্ময়' অবস্থা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের বাস্তবতার মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারেন এবং মানবীয় আনন্দবোধের মধ্যেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে পারেন ব'লে আলংকারিকদের দার্শনিক তত্ত্বটুকুর সঙ্গে কবির সম্পূর্ণ মিল নেই। কবির কাছে কাব্যরসানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এক, পরস্পর-সহোদর নয়।

বলা বাহুল্য, কবি 'আহ্বান' কবিতায় বিস্ময়সহকারে বিশ্বের সঙ্গে নিজ অস্তিত্বের নিবিড় যোগের স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন এবং সেইভাবে উপলব্ধ মিলিতসত্তাকেই কল্যাণী, দূতী, নারী প্রভৃতির পূর্বপরিচয়সূত্রে অনুভব করেছেন। একে জীবনদেবতা ব'লে মনে করা ভ্রমাত্মক হবে। জীবনদেবতা কবির অন্তর্লোকের অধিবাসিনী কল্পিত নিজ-চালক-শক্তি, যিনি কবির বহুবিধ উপলব্ধিকে সমঞ্জসীভূত ক'রে তাঁকে একটি পরিণামের পথে নিয়ে গেছেন। তিনি 'চিত্রা'র পর্যায়েই দর্শনগোচর, অন্যত্র নন, কারণ, কবি-প্রতিভা তার বিকাশের প্রারম্ভেই, বিস্ময়ের সঙ্গে, অগোচর এই আত্মশক্তিকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন বোধ করেছিল। তিনি একান্তভাবে কবির ব্যক্তিগত জীবনের চালক। অথচ এখানের এই কল্পিত নারী বহির্লোকবাসিনী, কবির অন্তরে অভিসারের জন্যে অবসর খুঁজছেন। অর্থাৎ ইনি কবির সৌন্দর্যসারসত্তা—অরূপসদৃশ, নিসর্গ যাঁর বহিরাবরণ, যিনি কাব্য-বপুঃ, অভিলষিত সুন্দরীর রূপে প্রতীক্ষিত হয়েছেন। কবির প্রথমকাব্যজীবনের মানস-সুন্দরী বিদেশিনী, এখনকার লীলাসঙ্গিনী-ই কবির অন্তরতম অভিলাষের মধ্যবর্তিনী হয়েছেন এবং বিশিষ্ট অরূপের সঙ্গে প্রায় একও হয়ে পড়েছেন। 'মানস-সুন্দরী'র "সর্বঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে করিয়া হরণ" প্রভৃতি প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। নিম্নলিখিত ব্যাকুলতাপূর্ণ আবেদনে কবি যা চেয়েছেন তার অধিক তাঁর কাছে এই কল্প-বিদায়-ক্ষণে আর কী চাইতে পারেন ?—

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপনার মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলিপরশ।

অর্থাৎ বাস্তবজীবনে মূর্ছিত-চৈতন্য কবি বহুকাল-বিস্মৃত আনন্দময় সৌন্দর্যলোকে উদ্বোধিত হতে চান। এইজন্য চেনা-অচেনার মধ্যবর্তিনী পূর্বেকার সৌন্দর্যময়ী নারীকেই কল্পিত একক সত্তারূপে আহ্বান করলেন। প্রণয়-বিরহের বিমিশ্রণে কবিতাটি পূর্ণ কাব্যের দীপ্তি লাভ করেছে।

কবির এই রূপময়ী সত্তাকে কাব্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে অন্তরের এক এবং বাইরের এক এই দুই রূপে ভাগ ক'রে দেখলেও এদের মধ্যে ভেদরেখা টানা কঠিন। বস্তুত অন্তরের এক বা কবি-ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই তিনি বাইরের একের কল্পনা এবং নিজ অন্তরের মধ্যে পুনশ্চ আত্মার জাগরণ কামনা করছেন। ক্রোচে কাব্যোপলব্ধি সম্পর্কে এইরকম ধারণাই পোষণ করেন, এবং রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যত্র যাই হোক এখানে আমরা ঐ তত্ত্বেই কবিকে মোটামুটি পেতে

পারি। আমরা আগেই বারংবার জানিয়েছি যে এই মহাগীতিকবির দর্শন কাব্য-দর্শন মাত্র।

অন্তরাত্মার জাগরণে কল্পিত বাইরের একের মধ্যস্থতায় কবি 'চরম আহ্বান' বা আত্মদর্শন লাভ করতে ইচ্ছুক, এবং যতক্ষণ না তা আসে ততক্ষণ কবির বেদনাময় ব্যাকুলতার সীমা নাই—

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরানে
চরম আহ্বান।

হয়ত গীতি-কবি মনে করেছেন এতদিনেও যথার্থ কাব্যিক আত্মসাক্ষাৎকার ঘটেনি। এরকম অসম্পূর্ণতার উপলব্ধি বিরহ-ভাবুক ও পরিণাম-অভিলাষীর পক্ষে স্বাভাবিক নিশ্চয়ই। কবি চান স্বার্থ বা অহং বলতে কিছুই না রেখে অর্থাৎ প্রয়োজন-সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে কাব্যিক মুক্তির জন্য নিঃশেষে আত্মদান। সেই অতি-প্রত্যাশিত মুক্তির চরম আনন্দ উপলব্ধ হয়নি ব'লেই কবিতাটির শেষে কবি বেদনায় অধীর হয়ে উঠেছেন। প্রিয়তম ও চরমতম সত্যকে কি মর্ত্যদেহে আবিষ্কার করা যায়? না, রসবাদী কবি তাই পারেন? কিন্তু যেহেতু তা-ই কবির অভিলাষ সেইহেতু তিনি শুধু ব্যাকুলতায় ও ইঙ্গিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। সেই জন্য একান্তভাবে আক্ষেপ করছেন—

জানি জানি, আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি। * *
অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হ'ল তুলে।

•

'ক্ষণিকা' কবিতাটিতেও সৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত এই প্রিয়তম সত্য-বস্তুকে দেখার ব্যাকুলতা ও না-পাওয়ার বেদনা অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে। সম্ভবত পূর্বউপলব্ধ সৌন্দর্য-বিহারী কল্পসত্তার (প্রথম জীবনের সৌন্দর্যের দূতী বিদেশিনীর) কথা মনে ক'রেই কবি বলছেন—

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।

কবি ভেবেছিলেন বস্তুতান্ত্রিক জীবনের মালিন্যের মধ্যে সেই রূপাশ্রিত অরূপের প্রেরণা লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কবি আশ্বস্ত হলেন এই দেখে যে তিনিই গোপনে কবির গানের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করছেন, তিনিই সমস্ত সংগীতের অভিপ্রেত বস্তু—

আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার;

কিন্তু যেহেতু কবি ইঙ্গিতে অনুমানে তাঁর পরিচয়ে সন্তুষ্ট নন, সেইহেতু

বহির্জগতের 'বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজাল' তাঁর কাছে সাময়িকভাবে এ বিষয়ে বাধাস্বরূপই প্রতিভাত হয়েছে। সৌন্দর্যের প্রতিমাগত সত্যকে নিঃশেষে জানার আগ্রহই কবিকে এবংবিধ কল্পনায় প্রবর্তিত করেছে। তাই আক্ষেপ সহকারে কবি এখানেও বলছেন—

গেল না ছায়ার বাধা ; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়মোহের নেশা ; সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে।

হতে পারে, এবং আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি যে কবির কাব্যজীবনের অধিষ্ঠাত্রী এবং সৌন্দর্যবাসনার ধ্রুবতারা বিগতা কাদম্বরী দেবীই অশরীরী মানসীরূপ পরিগ্রহ ক'রে তাঁকে পূর্বজীবনে যেমন রোম্যাণ্টিক বিরহকাতরতার পথে চালিত করেছেন, এখানেও তেমনি বিদায়ী মনোভাবের মধ্যে ধরা দিতে চাইছেন, কিন্তু সে ঐ অশরীরী সৌন্দর্যসত্তারূপে, বাস্তব কোনো মূর্তি নিয়ে নয়। অন্যদিকে, এই ছায়ার বাধা দূর করার প্রয়াসেই তো আবার ধর্মীয় সাধকেরও চিরন্তন সংগ্রাম। সাধক রামপ্রসাদ তাঁর দৃষ্টির অন্ধত্বের জন্যই ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন—'একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি দেখি শ্রীপদ মনের মত'। উভয় কবির অন্তরতম অভিলাষ তুলনার যোগ্য হতে পারে। উপলভ্য বস্তুতে হয়তো পার্থক্য, ভঙ্গিতে ঐক্য। 'শেষ', 'তারা' প্রভৃতি কবিতাগুলিও কবির এই ব্যাকুলিত প্রার্থনার বাণীতে মুখর—

ক্লান্ত আমি তারি লাগি, অন্তর তৃষিত—
কত দূরে আছে সেই খেলাভরা মুক্তির অমৃত। (শেষ)

আকাশ-ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই। * *
ফিরে যাবার সময় হ'ল, তাই তো চেয়ে রই—
আমার তারা কই। (তারা)

কবির অন্তরের প্রেয়সীসত্তাকে না-পাওয়ার এই ব্যথা অবশ্যই আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে। যে কাব্যিক অরূপকে কবি তাঁর কল্পনাবলে সৃষ্ট নিবিড় রসোপলব্ধির মুহূর্তগুলিতে পূর্বে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাকে এখন জীবনের মধ্যে আরো প্রত্যক্ষভাবে পেতে চান ব'লেই কি কবির চিত্তে এই বেদনাময় আক্ষেপের সঞ্চার হয়েছে? অথবা, তাঁর পূর্বজীবনের অভিলষিত মায়াময়ী এবং অশরীরী সৌন্দর্যমূর্তিকেই কবি একান্তভাবে পেতে চান তাঁর বিদায়-

অনুভব-মুহূর্তে, যেমন চেয়েছিলেন মানস-সুন্দরীকে—"সেই তুমি মূর্তিতে কি দিবে ধরা" প্রভৃতি কাতরোক্তিতে? অথবা, এই ধারণাই যথার্থ যে ঐ বিদেশিনীই সৌন্দর্য ও অরূপরসানুভূতিকে এক সূত্রে গ্রথিত ক'রে তাঁর কাছে শেষ বিরহব্যাকুলতার মূল্য লাভ করেছেন।

'সাবিত্রী' কবিতাটিতেও কবির সত্য-নিরীক্ষণের অভিলাষ বেদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ এই যে, এই সত্য বিজ্ঞান-ব্যাখ্যাত সূর্যের মধ্যেই রয়েছে ব'লে তিনি এখন মনে করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমের আত্মা ব'লে সূর্য উপনিষদে কথিত হয়েছেন। সৃষ্টির অন্তরতম রহস্য জ্যোতির কনক-পাত্রের আবরণে আবৃত রয়েছে—উপনিষদের ঋষির এই ধারণা বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তাঁদেরই মত ব্যাকুল এক কবিকে সূর্যের অভ্যন্তরে রহস্যানুসন্ধানের প্রেরণা দিয়েছে। এখানেও তীব্র অভিলাষটি কবির স্বকীয়। ঈশোপনিষৎ-এর হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বে পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥-মন্ত্রটি ভূমিকার অর্থাৎ ঐ অভিলাষের রূপকের কাজ করেছে। যথার্থভাবে কবি-কল্পনার সহায়ক হওয়ার দিক থেকে কিন্তু বেদ-উপনিষদ্ অপেক্ষা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণাকেই আগে স্থাপন করতে হবে। বস্তুত কবিতাটির নির্মাণ নভোবিজ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে। বেদের সূর্যপক্ষীয় তত্ত্বের সঙ্গে মূল প্রেরণাটি মিলে গেছে এইমাত্র। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে সূর্যের বুকে অতি প্রচণ্ড তাপের মধ্যে মূল হাইড্রোজেন গ্যাস-পরমাণু হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে চাইছে। এর ফলে অগ্নিময় জ্যোতি ও রশ্মির উচ্ছ্বাস ব্যাপ্ত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে। ঐ রশ্মিচ্ছটা নানাভাবে শোষিত হয়ে এসে তার আদি সন্তান ধরিত্রীর উপর বর্ষিত হচ্ছে, আর তারই ফলে পৃথিবীতে চলেছে প্রাণধারার উৎসব, সম্ভব হচ্ছে চিত্রিত নিসর্গচ্ছবি। বেদে বলা হয়েছে সূর্যমধ্যে রয়েছে ভর্গদেব বা লৌকিক ধারণার সরস্বতী, যা থেকে জীবজগতে চেতনা ও মানুষে জ্ঞান-বুদ্ধি। আধুনিক বিজ্ঞান দেখাচ্ছে জীব তথা মানুষের দেহে অণু-পরমাণুর অতি জটিল ভৌত-রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্রাণ, চেতনা ও বোধ। 'সাবিত্রী' কবিতাটির প্রারম্ভেই কবি সূর্যমধ্যবর্তী সরস্বতীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সৌরবিজ্ঞান অনুসরণে—

> বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে দীপ্তকেশে উদ্‌বোধিনী বাণী,
> সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।

অর্থাৎ বিজ্ঞান থেকে নিশ্চিতভাবে জেনেছি। সরস্বতীর এই বহ্নিবীণা ও প্রদীপ্ত কেশের বর্ণনা বেদে পুরাণে কোথাও নেই। সৌর অগ্নির উচ্ছ্বাসের ছবি থেকে কবি দীপ্তকেশ কল্পনা করেছেন। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কবি শুধু নিসর্গ ও মানুষের প্রাণধারাই নয়, তার মধ্যেকার কল্পনা-

শান্তি ও বিরহজ্বালাকেও জ্বলিতরশ্মির বিক্রিয়া ব'লে অনুভব করেছেন। "সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে" প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি নিচয় এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য। আর, 'আহ্বান' কবিতায় কবি এ বিষয়ে আরও বিস্তৃতভাবে জানিয়ে মহাকাশের জ্যোতির্লোকে তাঁর অভিলষিত নারী-রূপসত্তার অবস্থিতি অনুমান করেছেন—"কোন্‌ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে" ইত্যাদি। 'সাবিত্রী' কবিতায় কবি প্রবল আবেগ সহকারে বলছেন—

ঘন-অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।

এ দুর্যোগ শুধু তাৎকালিক বহিঃপ্রকৃতির নয়, কবির অন্তরেরও বটে। কবি তাঁর চেতনার জড়ত্ব ও অসাড়তা বোধ করছেন। কবিতাটি আন্তরিক ভাবের দিক থেকে কল্পিত বিদায়ক্ষণের অভিলষিত উপলব্ধির আগ্রহে পূর্ণ।

এই শ্রেণীর 'স্বপ্ন' কবিতাটিতে বিরহী সাধক এককে স্পষ্টভাবে জানার আগ্রহ থেকে বিরত হয়ে কবিসুলভ স্বপ্নের মধ্যেই আত্মনিয়োগ করেছেন। পূর্বে উল্লিখিত বেদনা-বিচ্ছুরিত কবিতাগুলিতে যদিবা রূপমধ্যবর্তী রূপাতীতকে জানার অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে, এই কবিতাটিতে পরিচিত পার্থিব স্বপ্নাবেশের মধ্যে সুদুর্লভ কাব্যিক মুক্তির আনন্দলাভে অপরিসীম সন্তোষের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। সাধনলভ্য সর্বদ্বৈত-বিনিমুক্ত এক হ'ল একটি দার্শনিক তত্ত্ব। তা কোনকালেই কবিমনের সঙ্গে সম্পর্ক দাবি করতে পারে না। তবে কল্পিত বা আভাসিত এক-এর—যেন, মনে হয়, বুঝি বা, এরকম বিতর্কের মধ্য দিয়ে কবির অন্বেষণের বস্তু হতে বাধা নেই। সে যাই হোক, ঐ একক সত্তা এবং তার লীলার অনুভূতির মধ্যে কবি স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয়টির প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেছেন। বাস্তবে একদা নিতান্ত পরিচিত এবং অধুনা অপরিচিত ছায়াময়ী ঐ বিদেশিনীকে লক্ষ্য ক'রে কবি তাঁর নিম্নলিখিত মনোভাব জ্ঞাপন করেছেন—

তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি,
তুমি আমায় বারে বারে শুধাও, "ওগো, সত্য সে কি।"

* * *

আমি বলি, স্বপ্ন যাহা তার চেয়ে কি সত্য আছে।
যে-তুমি মোর দূরের মানুষ সেই-তুমি মোর কাছের কাছে।
সেই-তুমি আর নও তো বাঁধন,
স্বপ্নরূপে মুক্তিসাধন—
ফুলের সাথে তারার সাথে তোমার সাথে সেথায় মেলা।

নিত্যকালের বিদেশিনী,
তোমায় চিনি, নাই বা চিনি,
তোমার লীলায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাগ কভু হেলা।

মানুষের মধ্যে যে অন্তরতম মানুষ রয়েছে তাকে বাস্তবে সম্পূর্ণ পাওয়া নাই বা গেল, তার লীলাস্বপ্নে কবি আনন্দময় মুক্তি পেতে চান। কিন্তু এখানে কবি ঐ লীলাসত্যের প্রত্যক্ষে অপ্রকাশের একটা কারণও নির্দেশ করতে চান এবং বলতে চান যে তাঁর স্বপ্নে আভাসে-ইঙ্গিতে এর যতটুকু প্রকাশ পায় তা-ই তাঁর সর্বস্ব—

অমৃত যে হয়নি মথন,
তাই তোমাতে এই অযতন,
তাই তোমারে ঘিরে আছে ছলনছায়ার কুহেলিকা।
নিত্যকালের আপন তোমায় লুকিয়ে বেড়ায় মিথ্যা সাজে—
ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে শুধু আমার স্বপন মাঝে।
আমি জানি, সত্য তাই—
মরণদুখে অমর জাগে অমৃতেরই তত্ত্ব তাই।

কবির কাছে নিত্যকালের সত্যবস্তু হ'ল সৌন্দর্য, কাব্যরস। বাস্তবে তা নানাভাবে খণ্ডিত হয়ে দেখা দেয়, স্বপ্নের মধ্যে আভাসেই তা স্পষ্টগোচর। বাস্তবের মানুষ মৃত্যুর ট্র্যাজেডিতে বাইরে লুপ্ত হয়ে বিরহ-স্বপ্নে সত্যতররূপে প্রতিভাত হয়। অভিলষিত রসানুভব বিভিন্ন হলেও সৌন্দর্য-সত্তার একত্ব এবং তার লীলার ধারণাতে কবি ভারতীয় ভাবসাধকের সগোত্র। কবি যথাভূত মানবীয় অনুভবের (এখানে কাব্যস্বপ্নের) মধ্যেই অরূপকে পেতে চান এই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এবিষয়ে অন্যত্র লেখা বহু কবিতা ও গানের সঙ্গে পূরবীর 'মুক্তি' কবিতাতেও 'লীলারস উপলব্ধির আনন্দে' মুক্তির তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন—

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে—
এক পন্থা নহে।

* * *

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গিতে,
মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সংগীতে।

সেদিন বুঝিব মনে, নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন ;
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন, —ইত্যাদি

এই মুক্তি জীবনকে যথার্থভাবে গ্রহণ করার মুক্তি, নিরাসক্তভাবে পথে চলার মুক্তি, নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দে যোগদানের মুক্তি, স্বার্থবিসর্জনময় মানবীয়তা-বোধের মুক্তি।

'লিপি' কবিতায় কবির বিরহ-ভাবনা ও অনুসন্ধানস্পৃহা ভিন্ন আধারে প্রকাশিত। এখানে সূর্য-বিরহিণী বসুন্ধরার প্রণয়পত্র রচনার কল্পনা করা হয়েছে নিসর্গচিত্রের রূপকে। কবিতাটির শেষাংশে কবি নিজ বিরহ-ভাবনা ও কাব্যরচনার সঙ্গে বসুন্ধরার অনাদি বিরহ ও পত্ররচনার সংযোগ ও সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন। এখানে 'বসুন্ধরা' সম্বন্ধে পূর্বেকার মত কোনো তত্ত্ব-কল্পনা নেই, বিরহিণীর ব্যবহার সমারোপ করা হয়েছে মাত্র। বিরহিণী বসুন্ধরার আচরণের যে চিত্ররূপ কবি এঁকেছেন তা আদ্যন্ত সামঞ্জস্য-যুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রেও সৌর-পার্থিব বিজ্ঞান-অনুষঙ্গ লক্ষণীয়।

পূরবীর মধ্যে গ্রথিত 'তপোভঙ্গ' কবিতাটি বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের, ব্যক্তির সুখ ও দুঃখের অন্তরালবর্তী আনন্দময় একের লীলা-উপলব্ধি বিষয়ক। 'পাগল' প্রবন্ধে, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে, ফাল্গুনী ও বসন্ত ঋতু-নাট্যে কবি পূর্বেই এই লীলারহস্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। 'পূর্ণ থেকে রিক্ত এবং রিক্তের থেকে পূর্ণ এরই মধ্যে ওর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা—এও যেমন এক খেলা, ও-ও তেমনি এক খেলা।' বস্তুত এ ধারণা বৈজ্ঞানিক সত্যের সহায়তায় পাওয়া কবির অরূপানুভূতির সঙ্গে যুক্ত মৌলিক ধারণা এবং উৎসর্গ-গীতাঞ্জলি থেকে নানাভাবে এই ধারণাটিই সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ঠিক এর পরেই কবি যে-নটরাজের চিত্র কল্পনা করেছেন এই কবিতাটিতে তার সূচনা রয়েছে। কবিতাটি রূপে ও রসে বস্তুত ফাল্গুনী ও নটরাজ-ঋতুরঙ্গ পর্যায়ের। কিন্তু যেহেতু এই গীতরসহীন অক্ষর-মাত্রিক ছন্দের কবিতাটিতে কেবল নটরাজের লীলার উপলব্ধিই বর্ণিত হয়নি, কবির আত্মবিবৃতিও বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে, সেইজন্যেই সম্ভবত এটিকে পূরবী-কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কবিতাটির প্রারম্ভে কবি ব্যক্তিগত বিষাদের প্রশ্নই তুললেন—

যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী ?

কিন্তু সুখ ও দুঃখ এই দুই আপাতদৃশ্য বিরোধের মধ্যে ঐক্যরূপ সত্যে প্রতিষ্ঠিত কবি দুঃখের চিরস্থায়ীত্বে অবিশ্বাস করলেন।

নহে নহে, আছে তারা ; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সংবরিয়া
রাখ সংগোপনে।

এ হ'ল মহেশ্বরের তপস্যার রূপ। নটরাজের বামপদক্ষেপের নৃত্য। এখন তিনি যোগী, রুদ্র, ভয়ংকর। বহিঃপ্রকৃতির শীতাতপের শুষ্কতা, ধূসরতা, দাহ, বজ্রপাত, প্লাবন এবং মানবসমাজের ক্ষতি, মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বিচ্ছেদ, সমাজবিপ্লব প্রভৃতি হ'ল তাঁর প্রকাশের বিশ্বগত মূর্তি। অন্য দিক থেকে দেখলে বসন্ত, শ্যামলিমা, সৌন্দর্য, মিলন, প্রেম, কল্যাণ-ও তাঁর আর এক মূর্তি। 'নটরাজ'-এর মতই ধ্বংস ও সৃষ্টি, মৃত্যু ও জীবনকে তিনি নৃত্যচ্ছন্দে আবর্তিত করছেন। সৃষ্টির মধ্যে অভিব্যক্ত এই দুই রূপের মাধ্যমে একক সত্তার উপলব্ধি কবির স্বকীয়, তা সব সময়েই কাব্যিক, এবং অন্যকর্তৃক অপ্রভাবিত। এইখানেই রবীন্দ্র কবিমানসের অপূর্বতা, তাঁর কল্পনাশক্তি ও প্রতিভার অনন্য দান। স্বত-উপলব্ধ এই রসতত্ত্বটি 'উৎসর্গের' সময় থেকে আরম্ভ ক'রে কী ক'রে জীবনবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর একটি সত্য-উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে তা বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করবার বিষয়। এখানে কবি আর মাত্র রোম্যান্টিক ভাববিলাসী নন, উচ্চতম স্বপ্নদ্রষ্টা ভারতীয় ভাব-রসিকদের সঙ্গে একাত্ম। পার্থক্য বোধ হয় এই যে, কবি তুরীয়তা ও বৈরাগ্যের পথবর্তী নন, অভিব্যক্তি-ধারায় প্রকাশিত মায়াসর্বস্ব। কবি তাঁর স্বপ্নের সত্যতা সম্পর্কে কতদূর নিঃসংশয় তা নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—

জানি, জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।

কবি এই মিথ্যা দুঃখমূর্তির মধ্যেকার ছলনা ধ'রে ফেলেছেন। এ যেন—

'আমি বুঝেছি, পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমার চাতুরি'
(রামপ্রসাদ)

কবি বলছেন—

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।

বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

সত্য উপলব্ধি সম্পর্কে কবির এই সন্দেহাতীত মানসিক অবস্থার পরিচয়

একালে সর্বত্রই পাওয়া যায়। সন্দেহাতীত এই কারণে যে আধুনিক নভোবিজ্ঞান জন্মমৃত্যুর দ্বৈত সত্যের বিশ্বাস্য পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ছলনা কেন? কেন মানুষের এই দুঃখভোগ? তার উত্তরে কবি বলছেন—লীলা। বলছেন, লীলারসের নিবিড় উপলব্ধিতে মুক্তির আনন্দলাভ করবার জন্যেই এই আয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ত বলতেন, 'নইলে রসের পোষ্টাই হয় না যে।' স্বরূপে বিভিন্ন, তবু কথা হয়ত একই। নিসর্গের মধ্যবর্তী এই লীলার কোন্ দিক কবির শেষ আস্বাদন ও ধারণের যোগ্য হবে? বাইরের আপাত দুঃখের মূর্তি অথবা সুখের চঞ্চলতা? অথবা এ দুয়ের অতীত অন্তরের আনন্দময়-সত্য-স্বরূপ? কবি বলছেন—

'তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী—
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।'

এবং,

'ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে-ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী—
আমি সেই কবি।'

তাই কবি তাঁর রসবোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রুদ্র-সুন্দররূপ সত্তার উপাসক।

কবি এই সত্যদর্শনকে বাঙ্ময় করতে গিয়ে যে ভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তা-ও অসামান্য এবং তা তাঁর পরিণত প্রতিভার উপযুক্তই হয়েছে। অক্ষরমাত্রিক ছন্দে দীর্ঘ পর্বের আশ্রয়ে ভাবোপযোগী ধ্বনিময় শব্দসংঘাতের মধ্য দিয়ে গোলাপের বাণী-ব্যাকুলতা থেকে যুগান্তের বিদ্যুদ্বহ্নি-বিকাশ পর্যন্ত সমান চাতুর্যের সঙ্গে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। শব্দার্থের এই অদ্ভুত মিলন কাব্যে ক্বচিৎ দেখা যায়। কবিতাটিতে কবির বিশিষ্ট উপলব্ধিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা দিয়েছে উমা-মহেশ্বরের রূপচিত্র, যা কুমারসম্ভব কাব্য থেকে কবি আহরণ করেছেন, এবং এর রূপকে আবেষ্টন করে আছে সংস্কৃতের মাধুর্য- ও গাম্ভীর্যময় বাগ্‌ভঙ্গি—'ন খরো ন চ ভূয়সা মৃদুঃ'।

রবীন্দ্রকাব্যের নানান্ ক্ষেত্রে রূপসৃষ্টিতে, বিশেষত বাণীরূপে সংস্কৃতের ঐতিহ্য বহন একটি লক্ষণীয় ঘটনা। এই প্রভাবের বিষয়ে 'সমগ্রগুণ-গুম্ফিতা' বৈদর্ভী রীতির নিয়ন্তা কালিদাসও আছেন, কোমলকান্ত-বাণী-বিলাসী জয়দেবও আছেন। এদের সঙ্গে একটি তৃতীয় শক্তি—বাঙ্‌লা লোক-সংগীতের চাতুর্যহীন প্রসাদগুণসম্পন্ন ভাষা মিলিত হয়ে তবেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় স্টাইলের সৃষ্টি করেছে। বিষয় এবং উপলব্ধি অনুসারে উপরি-উক্ত ভাষাভঙ্গিগুলির প্রকাশের অল্পবিস্তর তারতম্য এবং একতরের প্রাধান্য ঘটেছে মাত্র। যেমন বলা চলতে পারে যে গীতালি, ফাল্গুনী প্রভৃতির গানে বাউল

সুরের তথা ভাষার প্রকাশ, নটরাজ-ঋতুরঙ্গে ধ্বনিময় সংস্কৃত রীতির, মহুয়ার 'সাগরিকা' কবিতায় আদিরসের সঙ্গে জয়দেবীয় ভাষাবিলাসের অনুবর্তন। অবশ্য তৎসমশব্দ এবং অনুপ্রাসযুক্ত শব্দ ব্যবহারের অর্থ এই নয় যে তিনি বাঙ্‌লা ভাষার বিশিষ্ট রীতি (বাক্য-বাক্যাংশ-পদবিন্যাস) বাদ দিয়ে সংস্কৃত বাক্‌রীতিই গ্রহণ করেছেন। বাঙ্‌লা রীতির স্বকীয়তা রক্ষণ এবং এর শক্তিকে আশ্চর্যরূপে বাড়িয়ে তোলা রবীন্দ্রনাথেরই সুমহৎ কীর্তি।

ঋতুনাট্যগুলির ভূমিকা-অংশে এবং কথোপকথনের মধ্যে একটি প্রাচীন পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টিতে সংস্কৃত নাটকাদির ছাপ বিশেষভাবে পড়েছে। প্রসিদ্ধ কবিদের কাব্যে ও নাট্যে (বিশেষত কালিদাসের রচনায়) ঋতু-প্রকৃতিকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে। নিসর্গপ্রেরণাজাত ঋতুনাট্যগুলিতে পাঠকের মনকে প্রাচীন কালে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে আধুনিক ব্যবহারিক জীবন ভুলিয়ে কবি একপ্রকারের অনির্বচনীয় কাব্যরস সঞ্চার করতে চান। সেকালের রাজা, মন্ত্রী, রাজকবি, নাট্যাচার্য প্রভৃতি দর্শকের চিত্তকে এমনভাবে প্রাচীন কাব্যলোকে নিয়ে যায় যাতে নিসর্গ-রস-আস্বাদন অব্যাহতভাবে নিষ্পন্ন হয়। পরবর্তী কালে তপতী-নাটক রচনায় সংস্কৃতের আবহাওয়া কবি তাঁর অভিপ্রেত রসনিষ্পত্তির উপযুক্ত অলংকাররূপে অতিশয় নৈপুণ্যসহকারে ব্যবহার করেছেন। কবির প্রাচীনধর্মী মণ্ডনকুশলতা এইসব স্থানে এমন সর্বব্যাপী যে দর্শকের মনে হবে বাঙ্‌লা ভাষায় সংস্কৃত নাটক দেখছি। কিন্তু ঋতু-নাট্যগুলির বিষয়বস্তু ও গানের মধ্যে এবং কোনো কোনো চরিত্রের সংলাপে বাউল-সংগীতের ভাষারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। বাউল-সম্প্রদায়ের ভাবধারার সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের বিষয় আমরা কবির দার্শনিক মনোভাবের অনুসন্ধান পর্যায়ে উল্লেখ করেছি। ভারতীয় সাধনার কোনো স্তরের সঙ্গে যদি কবির আত্মিক মিল থাকেই তা এই বাউলদের জীবনসাধনার সঙ্গে, একথাও তৎকালে উল্লেখ করেছি। ঋতুনাট্যগুলিতে সুরে বাউল এবং রূপে সংস্কৃত কাব্যের ও বাঙ্‌লা যাত্রাগানের পদ্ধতির আশ্চর্য সম্মিলন পাঠকমাত্রকে চমৎকৃত করবে।

'পূরবী'র স্মৃতি-বিস্মৃতি-স্বপ্ন-কুহেলি-মিশ্র রস-জিজ্ঞাসার স্তর পেরিয়ে শেষের দিকে আতিথ্যময় গৃহবাসের অবকাশে লেখা কয়েকটি কবিতা কবির বাস্তব প্রণয়ব্যাকুল মনের পরিচয় বহন ক'রে পাঠককে মানসী-কল্পনার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এর মধ্যে 'কিশোর প্রেম' নিঃসন্দেহে কৈশোরের একটি প্রণয়-নিবেদন-ক্ষণের স্মৃতিচারণা। এই প্রেমিকা কি আনা তড়খড় ? কিন্তু পরিচয় জেনে কী লাভ ? শুধু এইটুকু দেখতে হবে যে বিশুদ্ধ কবিসত্তাকে সমাচ্ছন্ন রেখে তত্ত্বকথা গেঁথে গেঁথে এই কবি আমাদের প্রতারণা করেননি। কবির আর্জেন্টিনা-প্রবাসের গৃহকর্ত্রী ভিক্‌টোরিয়া ওকাম্‌পো বা 'বিজয়া'র

[illegible] লেখা কয়েকটি কবিতার মধ্যে 'শেষ বসন্ত'ই সবচেয়ে উল্লেখ্য। আর এটি কবির লেখা সর্বোত্তম কবিতাগুলির মধ্যেও একটি। কবির ব্যক্তিগত বাসনার সঙ্গে বিজড়িত মধুর মানসিক উত্তাপের পরিচয়বাহী কবিতা ও গানগুলির একত্র স্মরণে এই কবিতাটি অন্যতম বিশিষ্ট স্থান পাবে নিঃসন্দেহে এবং দেখাবে যে উত্তর-ঘাটের জীবনেও প্রণয়কে কবি প্রাপ্যের অতিরিক্ত মর্যাদাই দিয়েছেন। অপরিচিতা বিদেশিনীর সঙ্গে কয়েক দিনের ভাব-বিনিময়ের অন্তরঙ্গতায় কবিচিত্তে যে প্রেমব্যাকুলতার আবির্ভাব ঘটল কবি তাকে শেষ বসন্তের আবির্ভাব ব'লে চিহ্নিত করেছেন। শেষ জীবনের বসন্ত, এইজন্য এই প্রণয়-অনুভবের প্রকৃতিও যৌবনের প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র। প্রণয়-ভাবুকতায় রবীন্দ্রনাথ বাসনা ও আবেগের প্রবলতাকে সাধ্যমত পরিহার ক'রে চললেও এই কবিতাটিতে প্রেমিকার প্রতি আবেদনে যে নিষ্কামতার বা শুদ্ধ রোম্যান্টিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য প্রণয়ী কবির ক্ষেত্রেও সুদুর্লভ। বলা যায়, এতে প্রণয়ের কিংশুক রক্তগোলাপের বর্ণবিহ্বলতা নেই, আছে ঝ'রে-পড়ার সময়ে আরও কিছুক্ষণ আভাসিত থাকার করুণ মিনতি। প্রেমিকের বিনয়োক্তিশীলিত অধিকারবাসনাহীন আবেদনের ব্যঞ্জনাত্মক অপূর্ব পরিচয় ফুটেছে—

'তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারংবার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।'

এবং

'তোমার বিকচ ফুলবনে
দেরি করিব না মিছে;
ফিরে চাহিব না পিছে,
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।'

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে। কবিতাটি যেমন আদ্যন্ত ঘিরে রয়েছে বিষাদ-কাতরতা, বিদায়ী মনোভাব, তেমনি এর নিসর্গ-পরিবেশেও রয়েছে গোধূলি-সন্ধ্যার বিলীয়মান বেণুবনচ্ছায়া-ছবি ('নিরুদ্দেশ-যাত্রা' ও খেয়ার কবিতা তুলনীয়)। বিশেষভাবে চিত্রা-কাব্যের 'স্বপ্ন' কবিতাটির সঙ্গে মানসিকতার দিক দিয়ে এটি তুলনার যোগ্য। বিজয়া-সম্পর্কে প্রেমের এই অধ্যায়ে স্বার্থকামনাশূন্যতার উপর জোর দিয়ে লেখা অন্য দু'একটি কবিতাও রয়েছে, যেমন—

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে।

—ইত্যাদি 'মধু' কবিতা। কিন্তু এ প্রবৃত্তি স্বপ্নভাবুক কবির স্বভাবানুগতই।

'মহুয়া' কাব্যে এসে পথিক কবির যাত্রা-বোধের স্পর্শ পুনরায় পাওয়া গেল। এবারে কিন্তু কবি প্রেমকে যাত্রী মানুষের সঙ্গী করেছেন, তাকে 'পথের ধুলা'র মধ্যেই কালোচিত-ভাবে পেয়েছেন। মহুয়া-কাব্যে ঐ প্রেমের আবির্ভাব অবশ্যই 'আকস্মিক'। কারণ, জীবনাশ্রিত অরূপদর্শী বা নটরাজ-লীলাদর্শী কবির পরিণত প্রতিভায় বাস্তব প্রণয়ের সলাজ রক্তিমা বা নিজ ব্যক্তিকতার স্পর্শযুক্ত সাধারণ প্রেমবর্ণনার প্রত্যয় কোথায়? কিন্তু মহুয়ার প্রথমার্ধের কবিতানিচয় ফরমাশের দীনতা থেকেও মুক্ত (রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে কবির পত্রে আত্মসমালোচনা দ্রঃ), কারণ, ফরমায়েশি কবিতা এত সুন্দর হয় না, তা ছাড়া কবির কাব্য-সাধনার ধারা থেকে এ স্বতন্ত্র নয়। শৃঙ্গারস্বাদে অত্যন্ত অভিনব, সমাজ-মর্মানুসরণে অভিন্ন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে উত্তম কবিতামাত্রেই নূতন ও আকস্মিক। মহুয়ার নব-জাগরিত প্রেমবোধ বলাকার মতই রবীন্দ্র-প্রতিভার চঞ্চলতার অন্যতম উদাহরণ, কিন্তু রাবীন্দ্রিকতার মধ্যেই সার্থক। তাঁর প্রধান সমস্ত রচনা তাঁর প্রতিভার ঐক্যসূত্রে সমঞ্জসীভূত ব'লে জীবন-সমীক্ষাময় কাব্যার্থযোগে এত গভীরভাবে আনন্দদায়ক। কাব্যের মধ্যে বারবার একটি বিশিষ্ট কবি-বাণীকে লাভ করার পরমবৈচিত্রীও রবীন্দ্ররসিকদের আনন্দের অন্যতম কারণ। কিন্তু মূলতঃ তা হওয়া সত্ত্বেও মহুয়ার দৃষ্টি-কোণ যে পৃথক্, একথা অবশ্যস্বীকার্য।

কবি মহুয়ায় দুই জাতের কবিতার বিষয় লক্ষ্য করেছেন। একের মধ্যে প্রণয়ের প্রসাধনকলা, অপরের মধ্যে সাধনবেগ। বলা বাহুল্য, সাধনবেগের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কবিতাগুলিই মহুয়ার মুখ্য কবিতা, কারণ এগুলির মধ্যে প্রেমকে ও প্রেমিককে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে দেখা হয়েছে। প্রৌঢ় কবির পরিণত প্রতিভায় শৃঙ্গাররসের জাগরণ বাহ্যত আকস্মিক হ'লেও, আসলে আকস্মিক ও অসাধারণ হ'ল প্রেমকে জীবনের চলমানতার সঙ্গে এক ক'রে দেখা। চিত্রা-ক্ষণিকার প্রেমের কবি বর্তমানে একটি বিশিষ্ট সামাজিক আদর্শবোধের সঙ্গে কী ক'রে প্রেমকে যুক্ত করলেন তার রহস্য মহুয়া-পূর্ব কাব্যজীবনেই রয়েছে। মুখ্যত, 'নাম্নী' শ্রেণীর কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর কল্পিত চিত্রাঙ্কনের কবিতাগুলি প্রসাধনের কবিতা। এই নিছক আর্টের প্রেরণা কবির চিত্তকে এতখানি অধিকার করেছিল যে ভারত ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জের সাংস্কৃতিক মিলনরহস্যকেও তিনি একটি অপূর্ব ললিতকলা-বিলাসে মণ্ডিত করেছেন। নায়ক-নায়িকার চারিত্র্য আরোপ ক'রে জয়দেবীয় বাণী-চাতুর্যে কবি পরপর যে ক'টি অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন তাতে সাংস্কৃতিক মিলনের ঘটনাকে অতিক্রম ক'রে রূপদক্ষ কবির শিল্প-সৌন্দর্যগুণই আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পূর্বেও কবি শুধু প্রসাধন-চাতুর্যের প্রেরণাতেই কতকগুলি কবিতা রচনা করেছেন, যেমন কল্পনার 'দুঃসময়' কি ক্ষণিকার 'আবির্ভাব' 'বর্ষামঙ্গল'

—বেগগুলির বিষয় আগেই উল্লিখিত হয়েছে। 'সাগরিকা' এই শ্রেণীর হয়েও ইতিবৃত্তের বক্রবিন্যাসের গুণে অসাধারণ কবিতা হয়েছে।

মহুয়ার জীবনবেগ-স্পন্দিত ধূলি-ধূসর অ-কোমল বিলাস-সৌন্দর্যহীন প্রেম সাধারণের চিত্তে আদিরসের আনন্দ দিতে পারে কি? যে-প্রেম কোনো সঞ্চয় রাখতে চায় না, যা বাস্তব জীবনকে ত্যাগ ক'রে ইন্দ্রের অমরাবতী রচনায় তৎপর নয়, বন্ধনহীন পথিকের সর্বনাশা সেই প্রেম কার বরণীয় হতে পারে? 'প্রেমের অভিষেক' এবং 'স্বর্গ হইতে বিদায়ে'র* পাঠক মহুয়ায় এসে দম্পতির সতেজ কণ্ঠস্বর শুনলেন—

* উক্ত কবিতা দু'টির নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি 'মহুয়া'র উল্লিখিত 'সাধনবেগ' সম্পর্কিত কবিতার যে-কোনো অংশের সঙ্গে বৈপরীত্যে তুলনীয়:

হাত ধ'রে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান্‌
অক্ষয়যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী; সেথা মোর সভাসদ্‌
রবিচন্দ্রতারা, পরি নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব-অর্থ-ভরা। (প্রেমের অভিষেক)

দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূরস্বপ্নসম, যবে কোনো অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো—নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি শরমের, মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর। দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে। (স্বর্গ হইতে বিদায়)

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালন-ললিত যত্ন।

যে ভীরু বালিকা একদিন 'জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে, শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা' একটি আলোকোজ্জ্বল মিলনরাত্রির জন্যে উৎসুক থাকত, অথবা একক প্রণয়ীকে নিয়ে বেণুমতীতীরে ভূস্বর্গ রচনার স্বপ্ন দেখত, সে আজ কোন্ প্রেরণাবলে বলতে পারে—

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।/

আবার, "রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না তুমি, পথ ভরিয়াছে আলোকে, প্রখর আলোকে" প্রভৃতি পঙ্ক্তিতে যে নায়িকা রূঢ় বাস্তবের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে প্রণয়ের গোপন একাকীত্বকেই শিরোধার্য করতে চেয়েছে, সে আজ খররৌদ্রদগ্ধ ধূলি-মলিন জনসংঘাতমুখর রাজপথে কেমন ক'রে অভিসার বরণ করবে তা চিন্তনীয়। কবির এই নবপ্রত্যয়বোধের পূর্বসংস্কার সংস্কৃত কাব্য বা পদাবলী থেকেও আসেনি। গোবিন্দদাসাদির অভিসারিকার চিত্রে কৃচ্ছ্রসাধনের দিকটি যদিই বা মুখ্য হয়েছে, সেখানেও নায়ক-নায়িকা চলমান জীবনের সঙ্গে সংযোগ রাখছেন না। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এক, রবীন্দ্র-প্রতিভার গতিশীলতার মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্রে কাব্যরসাস্বাদ আর এক। বস্তুত পূর্বেকার রোম্যাণ্টিক স্বপ্ন-বিলাসও কাব্য, বর্তমানের সমাজবোধমিশ্রিত রসপ্রবণতাও কাব্য। অধুনা জীবন-যুদ্ধের তীব্রতার কালে প্রেম-বোধে মৌলিক পরিবর্তন না হোক, রীতিবদল হয়নি কি? সাম্প্রতিক কোনো কবির মুখে সংগ্রামের সম্মুখীন, উচ্চকিত অথচ স্বপ্নাতুর নরনারীর কাছে বিলাস-বিরতির প্রার্থনা অস্বাভাবিক শোনায় কি? বাঙ্‌লা প্রণয়কাব্যে এই নূতনত্ব রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটি অসামান্য দান।

বস্তুত যুগোচিত রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিবর্তনশীল এবং পরিণামী প্রকৃতির মধ্যেই এরকম রচনা সম্ভবপর হয়েছে, এবং এমনকি অনাগত কালের সার্বজনীন অনুভূতিও যেন এই শক্তিশালী দর্পণে ধরা পড়েছে। তাই কবি-প্রতিভার পরিণামের অবসরে প্রেমবৃত্তির উদ্বোধন যখন হ'ল তখন কবি গতিমুখর বাস্তব জীবনের মধ্যেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন; সংঘাতহীন আরাম, বিলাস ও স্বপ্নের শয্যাপার্শ্বে তাকে অনাদরে ফেলে রাখলেন না। বহির্জগতের গ্লানির স্পর্শে যে মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ, সমাজের অশোভন রূঢ় পরিপার্শ্বের মধ্যে যে মহৎশক্তি অহরহ লাঞ্ছিত হচ্ছে তারই জয়গান কবি (বা কোনো প্রেমিক) তার প্রেয়সীর প্রেমের মধ্যে চাইলেন—

হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা।
সেবাকক্ষে করি না আহ্বান;—

শুনাও তাহারি জয়গান
যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত। ('প্রতীক্ষা')

কবির এই জীবন-বোধ সুদৃঢ়, অরূপ-জীবন-সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তা কেবল সাধারণ আবেগনিষ্ঠার পরিচায়ক নয়। মহুয়ার সাধনবেগ-চিহ্নিত কবিতাগুলির সমাজ-ভাবনা-সম্পর্ক অনস্বীকার্য, এবং এখানে আমাদের কবিও পূর্ণভাবে সমাজবাদী।

তপতী নাটক রচনার সময় 'ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু' প্রভৃতির মধ্যে বিলাসীতার গ্লানি থেকে কবি যে-প্রেমকে মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন তার প্রারম্ভ যেহেতু মহুয়া-পর্বে সেইহেতু সম্ভবত তপতীর ঐ কবিতাটি 'উজ্জীবন' নাম দিয়ে মহুয়ার ভূমিকারূপে কবি স্থাপন করেছেন। পূর্বে কবি জীবনকে স্থূলতা ও বৈষয়িকতা থেকে মুক্ত ক'রে দেখেছেন, কারণ, কবির ধারণায় গতিই হ'ল জীবনের আত্মরূপ; আর এখন প্রেমকে স্বার্থমগ্ন শ্রেণীবিশেষের বিলাস থেকে মুক্ত ও সংঘাতময় জীবনের চলার সঙ্গে যুক্ত দেখতে চান—

যাহা রূঢ় যাহা মূঢ় তব
যাহা স্থূল দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

* * *

সুখদুঃখবেদনায় বন্ধুর যে-পথ
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।

মহুয়ার এই শ্রেণীর কবিতাগুলি পড়তে পড়তে বার বার পিছনে বলাকার দিকেই দৃষ্টিপাত করতে হয়। 'ঘরে ঘরে শূন্য হ'ল আরামের শয্যাতল', 'মা কাঁদিছে পিছে, প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে' প্রভৃতির যাত্রার চিত্রই মহুয়া-পাঠে ফুটে ওঠে। তফাত এই যে, এবারের যাত্রা প্রেমিক ও প্রেমিকার (পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি—); তখনকার যাত্রা নিঃসঙ্গ, এবারে মুক্তি-সাধনার সহায়ক প্রেম সঙ্গী, যদিও জীবন এবং পথের প্রকার উভয়ত্রই এক। 'নির্ভয়' কবিতাটিতে প্রণয়কে স্পষ্টভাবে ঐ উচ্চে কবি তুলে ধরেছেন—

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গমপথ-মাঝে
দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
না পাই শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।

'শেষের কবিতা'র শেষ কবিতাটিতে প্রেমের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি উপলব্ধি ক'রেই কবি তাকে মৃত্যুঞ্জয় আখ্যায় অভিহিত করলেন। জীবনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের অপূর্ব কাব্য বা উপন্যাস 'শেষের কবিতা'য় কবি শেষ পর্যন্ত জীবনের চলিষ্ণুতার মধ্যেই প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেখেছেন। যে-প্রেম একান্ত গোপনীয়তায় বন্ধ করে না, মুক্ত ক'রে দেয়, অর্থাৎ সমাজ-জীবনের অভিমুখী করে এবং স্বয়ং মুক্ত, কবি তাকেই 'শ্রেষ্ঠ উপহার' ব'লে অভিনন্দিত করেছেন। পরিবর্তনের মধ্যেই এই প্রেম সার্থক, অতএব তাকে চিরন্তনও বলা যায়, যেহেতু তা পথিকের হৃদয়ে মুক্তিরসের সঞ্চার করে—

কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো সে দিবে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মূরতি।

প্রেমের এই সক্রিয়তাই বলাকার 'ছবি', 'শাজাহান', 'তাজমহল' প্রভৃতি কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। এই শক্তিমান ও গতিবেগসহিষ্ণু প্রেমই মানুষের চলার সাথী হবার যোগ্য—'ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়', তাই তা একমাত্র অর্ঘ্য—অপরিবর্তন অর্ঘ্য—

সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে

অবস্থান্তরের যাত্রী লাবণ্যের দান এবং অমিতের গ্রহণের মধ্যে প্রেমের এই স্পর্শমণি-গুণের প্রকাশ হয়েছে।

এই গ্রন্থের ভূমিকাংশে এবং অন্যত্র, যুগের বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিকের বা সমাজের প্রতিঘাতেও যে রবীন্দ্র-প্রতিভা স্বীয় আকার পরিগ্রহ করেছে তা আমরা বলেছি। বলাকা-গীতালির ক্ষেত্রেও যেমন, এখানেও তেমনি, শিক্ষিত বাঙালির স্বার্থময় অসামাজিক জৈব জীবন-যাত্রাই কবিকে গতিবাদী আদর্শ কল্পনার প্রেরণা দিয়েছে। এখানে কবি যে আরো স্পষ্টভাবে বাস্তবজীবনে বিচরণ করছেন, তার বর্ণনা কয়েকটি কবিতায়ই পাওয়া যাচ্ছে। যেমন—

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটিনি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে—

অন্যত্র এই প্রেমকে জীবনের সঙ্গে এতই সহজ ক'রে তোলা হয়েছে যে সহসা

মনে হতে পারে, প্রেম তার সমস্ত গৌরব হারিয়ে ফেলেছে বুঝি। কিন্তু তা নয়, জীবনের সঙ্গে সহজ হওয়াতেই তার গৌরব সূচিত হয়েছে—

মনে করাব না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হ'লে যেয়ো সহজেই
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
তবু ভালোবাসো যদি বেসো।

জীবনের মধ্যে প্রেমের এই সহজ স্থান দেওয়াই কবির মতে সবচেয়ে কঠিন। অন্তরে দীন ব্যক্তিই মানুষকে সর্বতোভাবে অধিকারের দাবি করে—

সহজ-সাধন-লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন,
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।

পূর্বে-উল্লিখিত 'প্রতীক্ষা' কবিতাটির "ধূসর প্রদোষে আজি" প্রভৃতি দুই স্তবকে বুর্জোয়া সমাজের গ্লানির যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে কবির একালের সমাজবাদী মানসের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। এইসব প্রসঙ্গে কবির হীনীকৃত মানুষের সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প ও ক্রমবর্ধমান গ্রামপ্রীতি প্রভৃতি তুলনীয়।

প্রেমের এই অভিনব মূর্তি আঁকতে গিয়ে কবিকে যে-প্রাকৃতিক পটভূমি সৃজন করতে হয়েছে তা অপূর্ব এবং তা পরিণত কবি-প্রতিভার যোগ্যও হয়েছে। নূতন কল্পনাশক্তির সঙ্গে আলংকারিক অথচ চলিত শব্দে গ্রথিত নববাগ্‌ভঙ্গির মিশ্রণে উদ্দীপন-চিত্রগুলি পূর্বেকার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ হয়ে পড়েছে, যেমন—

'ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য'
'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন্-গুচ্ছ'

অথবা

'তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে'

এগুলি সুতীক্ষ্ণ সংকেতের সাহায্যে মহুয়ার অসাধারণ উদ্দীপন ফুটিয়ে তুলেছে। নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে অদৃষ্টপূর্ব কবি-কল্পনার বলে আনীত নব রূপনির্মিতির ফলে ঐ ব্যঞ্জনা সমধিক চমৎকার লাভ করেছে—

দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে;
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, "মর্তে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।"

সমুদ্রপাখির পক্ষে সেইক্ষণে উঠিবে হুংকার—
পশ্চিম পবন হানি
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি।

প্রগতিশীল সমাজ-জীবনের সংগ্রামী পদক্ষেপের সঙ্গে একাত্ম প্রেমের ধ্বনি-চিত্রময় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী একটি ছবি কবি এঁকেছেন 'পথের বাঁধন' কবিতায় গীতিকবিতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সর্বোৎকৃষ্ট রচনাগুলির এটি অন্যতম। ছ'মাত্রার মাত্রাবৃত্ত চা'লে অনুপ্রাসের রমণীয় মাধুর্যের মধ্যে, আবার মৌখিক শব্দালাপে প্রণয়ের বীররস কিভাবে ফুটল তাই আশ্চর্য। কবি যে স্থানে স্থানে কত বেশি আধুনিক, বা আধুনিকদের মধ্যে আধুনিকতম তা মহুয়া-কাব্যের এই ধরনের কবিতা বিশেষভাবে প্রমাণ করে।

মহুয়ার প্রারম্ভে প্রেমের উদ্বোধনস্বরূপ প্রথম-বসন্তের কবিতা এবং শেষে শেষবসন্ত চৈত্রের কবিতা। 'নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কাব্যের উপযুক্ত ভূমিকা' এই কথা ব'লে নটরাজ-ঋতুরঙ্গ শ্রেণীর হ'লেও তিনি কবিতাগুলি মহুয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু 'বোধন' বা 'বসন্ত' কবিতার মধ্যে এমন একটি নূতন ভাব রয়েছে যা নটরাজের সগোত্র হ'লেও সেখানে তা বিশেষভাবে প্রকাশলাভ করেনি। সেটি হ'ল শীতের জীর্ণতার মধ্যে নবীনের আবির্ভাবের চলমান বিদ্রোহী রূপ। বসন্তের আবির্ভাবের মধ্যে পুরাতনকে ভেঙে দেওয়ার একটা প্রবলতা দেখেছেন কবি। এই বসন্ত বস্তুত ফাল্গুনী, তাসের দেশ ও বলাকার বসন্ত, মহুয়ার জীবনচাঞ্চল্যময় প্রেমের যোগ্যতম ভূমিকা। বলাকার জীবনবেগের মত এই বসন্তও বলে—

পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।

এই বসন্ত 'নির্দয় নবযৌবন', সমাজের যাবতীয় পুরানো মানসিকতা ও সঞ্চয়কে অবহেলায় দূরে নিক্ষেপ ক'রে সে অগ্রসর হয়, বন্ধ থাকে না—

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা,
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।

সুতরাং 'বন্ধনহীন-গ্রন্থি'-যুক্ত 'চলতি হাওয়ার পন্থী'দের যাত্রার প্রেরণায় এই বসন্ত শুধু উপযুক্তই নয়, সার্থকতম একমাত্র উদ্দীপন। কিন্তু বসন্তের বিপ্লবী ভূমিকা আঁকতে গিয়ে কবি বসন্তকে যে-পর্যায়ে টেনে তুলেছেন তাতে কবির আধুনিকতার সমতলে পদক্ষেপ আমাদের পক্ষেও প্রায় অসাধ্যই হয়েছে বলতে হবে। যেমন—'জড় দৈত্যের সাথে অনিবার / চিরসংগ্রাম ঘোষণা তোমার' এবং "দক্ষিণ বায়ু মর্মর স্বরে বাজায় কাড়া-নাকাড়া।" অথবা—

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে।
যেন কোন দুর্দম বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে।

মহুয়ার মধ্যেকার 'লগ্ন' কবিতায় কিন্তু মিলনের ভূমিকারূপে কবি বসন্ত অপেক্ষা শরতের উপরেই অধিক গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। কারণ, এখানে, কবির মতে, বসন্তের মধ্যে রক্তিম আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ধৈর্যহারা স্বভাবের বীজ রয়েছে, অথচ শরতের মধ্যে রয়েছে অপ্রগল্ভ পূজারিণীর ছবি। হয়ত কবিতাটি লেখার সময় কোনো গৃহিণীর ও গৃহের শান্ত মাধুর্যের কথা কবির মনে জেগেছে। রবীন্দ্রনাথ কবি ব'লেই ক্ষণিক প্রেরণাকে সম্মানিত করাও তাঁর স্বভাবের মধ্যে সম্ভব হয়েছে।

'মহুয়া' নামক কবিতাটির ভাবানুসৃতিতে এবং মহুয়ার প্রধান কাব্যার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই কাব্যের চমৎকার নামকরণ। মহুয়া লতিকাও নয়, বল্লরীও নয়, বহুশাখান্বিত সুদৃঢ় বৃক্ষ। গঠনে অশ্বত্থ-শালের সমকক্ষ। কালবৈশাখীতে সে অসহায় পক্ষীর আশ্রয়স্থল। অথচ তার অন্তরে সুতীব্র যৌবনমদিরা। সবলা নারীর প্রতিনিধিত্বের জন্য তার গৌরব, আর কাব্যের নামকরণেরও সার্থকতা। 'সাগরিকা' কবিতায় কবি-কথিত প্রেমের সাধনবেগ ও প্রসাধনকলা দুয়েরই সম্মিলন হয়েছে। মধ্য-প্রাচীন যুগে ভারতের সঙ্গে পূর্বভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটেছিল তা-ই কবিতাটির রচনার প্রেরণামূল। এই ইতিহাস-অনুগত ভাবাত্মক মিলনকে প্রণয় ধ'রে এ-কে প্রেমের সাধন-বেগ, আর এই উপলক্ষ্যে নরনারীর মিলন-বিরহের যাবতীয় বিলাস রচনার ব্যাপারটিকে প্রসাধনকলা ব'লে ধরা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, বিষয়টিতে নায়ক-নায়িকার প্রণয়-সম্পর্ক আরোপ এত বক্র-চাতুর্যময় সুতরাং হৃদয়গ্রাহী হয়েছে যে, ভাব বা বিষয়কে স্পর্শ ক'রে মনোযোগ বারংবার কাব্যভঙ্গিতেই ফিরে আসে। 'এনেছি শুধু বীণা' প্রভৃতির প্রাচীন ও আধুনিক সূত্রগ্রন্থনের মধ্যে পাঠকের ইতিবৃত্ত-স্মৃতি ও সৌন্দর্য-সাক্ষাৎকারের বাসনা অবশ্য একত্রিত হয়ে তবেই পরিণাম লাভ করেছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভা যেন জীবনের মধ্যেই অনির্বচনীয়কে দেখার শপথ গ্রহণ ক'রে আবির্ভূত হয়েছে। তাই বলাকার ও ঋতুনাট্যগুলির ভাবময় পথের সাধনায় পরিতৃপ্তি না পেয়ে তৎকালীন বাস্তব জীবনের প্রবলতম একটি ধর্মকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয় আশ্রয়টি প্রথমটিরই অনিবার্য

পরিণাম, পূর্ণতর অভিব্যক্তি। কিন্তু মহুয়ার দুঃখদ্বন্দ্বময় জীবনের সমান্তরাল চলমান প্রেমের আদর্শে কবির সমাজ-সচেতনতার বিষয়টি কিন্তু বাস্তব আধারে রূপ পরিগ্রহ করেনি, অর্থাৎ কাব্যিকতার মধ্যে কিছুটা ম্লান হয়ে পড়েছে এমন বিতর্ক কেউ ওঠাতেও পারেন। কাব্যিক সংকেত যেন সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট হয় নি। আবার সেখানে এমন প্রশ্নেরও অবকাশ থাকা অস্বাভাবিক নয় যে মহুয়া-তপতীর প্রেমাদর্শ পূর্বেকার 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' কর্তৃক উদ্বোধিত ভোগবাসনাজয়ী প্রেমেরই বাস্তবতা-সম্পৃক্ত রসায়ন। আমরা তাঁদের মানসিক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য জানাই যে, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথযাত্রা বা কালের যাত্রা এই বিশিষ্ট নাটকগুলির মধ্যে বাস্তবাশ্রয়ী কবি-মহিমা পূর্ণাঙ্গ সমাজ-সচেতনতা নিয়ে মহুয়ার আগেই আত্মপ্রকাশ করেছে। অবলম্বন হিসাবে ভাবরূপ ত্যাগ ক'রে কবির অরূপ-বোধকে খাঁটি বাস্তব জীবন-সমস্যার নীড় আশ্রয় করতে হয়েছে। এতে কবির কাব্যিক অরূপ যথার্থতার মধ্যে উজ্জ্বলভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধ্যাত্মকে জীবন থেকে পৃথক্ ক'রে দেখা সম্পর্কে যে সাবধানবাণী বের্গস্ঁ উচ্চারণ করেছেন, দেখা যায়, বহু পূর্ব থেকেই কবি সেই সমন্বয়ের জন্যে পথ উন্মুক্ত ক'রে রেখেছিলেন। আর এই হ'ল এদেশের ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যুগোচিত বাণী—জীবনকে গ্রহণ ক'রেই এর স্থূল প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত হতে হবে, আচারের মহাশৃংখলজাল থেকে মানবাত্মাকে মুক্ত দেখতে হবে। একদিকে শাস্ত্র-প্রথার ও অন্যদিকে বিজ্ঞান-বাহিত যান্ত্রিকতার নিপীড়ন থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে হবে। যুগের আত্মিক-প্রয়োজনের এইসব দিক স্বামী বিবেকানন্দের তূর্যেও ঘোষিত হয়েছিল। পশুজীবনের উপর মানবজীবনের জয়, স্বার্থময় স্থূল বাসনার জীবনের উপর অরূপাশ্রিত মুক্ত জীবনের জয়। পশু কারা? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, যারা শুধু জীবনকেই দেখে, অরূপকে দেখে না, যারা স্বীয় বিষয়-বাসনার পূরণের জন্যে মানুষকে বলি দিতে দ্বিধা করে না, রাষ্ট্রীয় ও দলগত স্বার্থের জন্যে একটা জাতিকে ধ্বংস করতে চায়, যারা বস্তুর আয়োজনে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করছে, যাদের পণ্যবাহী দানবীয় যন্ত্রশক্তির পেষণে প্রাণরস যাচ্ছে শুকিয়ে—তারা। অধুনাদৃষ্ট এর জড়বিজ্ঞান-আশ্রিত শক্তিকে কবি নমস্কার জানিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এই যান্ত্রিকতা, লোভ ও শক্তির নিষ্পেষণের দিক এবং মানবাত্মার মুক্তির স্বরূপ মুক্তধারা ও রক্তকরবী নাটকদ্বয়ে দেখানো হয়েছে। পূর্বে প্রায়শ্চিত্ত এবং অচলায়তনে রাজশক্তির শাসন ও কপট প্রথার বন্ধনের দিকটি কবি নাট্যের বিষয়ীভূত করেছিলেন এবং উভয়কেই মিথ্যা ও দুর্বল প্রতিপন্ন ক'রে মানবীয়তার জয় ঘোষণা করেছিলেন। উভয়ত্রই কবি বিপ্লবাত্মক আত্মদানের মূল্যে মুক্তির উপায় নির্দেশ করেছেন। মুক্তধারা এবং রক্তকরবীতে সংগ্রাম ও

মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে মুক্তির দিকটি আরও পরিস্ফুট করা হয়েছে। 'বাঁচতে জানে তারাই যারা মরতে জানে'—এই মৃত্যুভয়-হীনতা এবং দীন জীবনের প্রতি বিরাগ কবির অরূপ-সাধনার প্রথম স্তর থেকে উপলব্ধ সত্য। যাই হোক, কবির মূল অভিপ্রায় উল্লিখিত নাটকগুলির মধ্যে প্রায় এক হলেও বাস্তবজীবন-নির্ভর মানবীয়তার বিষয় শেষের নাটক দু'টিতে বিশেষভাবে চিত্রিত হয়েছে।

এই নাটক দু'টির রচনামূলে যে বাহ্যবিষয়ের ক্রিয়া রয়েছে তা হ'ল পশ্চিমের মানুষ-বিদ্বেষী উগ্র রাষ্ট্র-সচেতনতা এবং মুখ্যত আমেরিকার বস্তুময় বা ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতা, যার প্রভাব বিশ্বের সর্বত্র অল্পবিস্তর পড়তে শুরু হয়েছিল। কবি লিখছেন, "কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বন্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম" (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি)। কবির বিশ্বাস, এই অকল্যাণকর বৃস্তুসভ্যতা টিঁকবে না—"পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ,—সে কিছু জমতে দেয় না; কেন না জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়,—সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল ক'রে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো ক'রে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি ক'রে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে। এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না" (ঐ)। সুতরাং মুক্তধারায় কবি বিপ্লবী অভিজিৎকে দিয়ে বস্তুসঞ্চয়ী ও পরপীড়ক যান্ত্রিকতার মূলে আঘাত করলেন, রক্তকরবীর ধনতান্ত্রিক শোষণকে প্রাণের কাছে পরাজয় স্বীকার করালেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, কবি রক্তকরবীতে শক্তিদানবের অন্তরেই তার শৃঙ্খলমুক্তির ঝংকার সঞ্চারিত করেছেন। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই বন্দীশালার চিত্র ও বৈপ্লবিক মৃত্যুবরণের আগ্রহ দেখানো হয়েছে। এবং পরিণামে শোষকের যান্ত্রিক শক্তিমত্তা ও নিষ্ঠুর প্রতাপের স্বভাব-পরাজয় ব্যঞ্জিত হয়েছে।

মুক্তধারার প্রবাহকে রোধ ক'রে একটা শস্যশ্যামল ভূখণ্ডকে মরুভূমি ও তার অধিবাসীদের পদানত করবার জন্যে আকাশচুম্বী যন্ত্রদানব নির্মাণ। 'যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসী প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষ বলি চায়।' এর নির্মাণের জন্যেও কত যুবককে প্রাণ দিতে হয়েছে। পথিকের মুখ দিয়ে কবি এই যন্ত্রের রূপ বর্ণনা করেছেন—'বাবারে! ওটাকে অসুরের মাথার মত দেখাচ্ছে, মাংস নেই চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের

কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে ; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।' এদিকে রক্তকরবীর গ্রহণ-লাগা যক্ষপুরীর আলোহীন আশাহীন জঠরের মধ্যে অগণিত মানুষ নিয়ে শবসাধনা চলেছে। এরও দানবীয় শক্তি ভয়ংকর। জড়বস্তুর শক্তিমত্তার সঙ্গে মানবীয় বেদনার দিকটিও কবি নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন—মুক্তধারায় পুত্রহারা মাতা অম্বার কাতর ক্রন্দনে এবং রক্তকরবীতে বিশু-পাগলের মর্মান্তিক যথার্থ-বাদীতায়। মুক্তধারা নাটকটির সমস্ত কোলাহলের পিছন থেকে পুত্রহারা জননীর বিলাপ প্রতিধ্বনিত হয়েছে—

'যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল।
এ পথের কি শেষ নেই? সুমন কি তবে এখনো চলেছে,
কেবলি চলেছে, পশ্চিমে গৌরীশিখর পেরিয়ে যেখানে
সূর্য ডুবছে, আলো ডুবছে, সব ডুবছে?'

রক্তকরবীতে অতি-করুণ কাতর বিলাপ শোনানো হয়নি, কারণ সেখানে শ্রমিকেরাও সংস্কারে আবদ্ধ যন্ত্রস্বরূপ হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই নিগড়বদ্ধ দাসদের জীবনের যথাযথ বর্ণনাতেই যক্ষপুরীর মধ্য থেকে মানুষের আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হয়েছে। 'একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক ; তারা জ্বালা ধরিয়েছে,—বলছে, কাজ করো।' 'আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ. তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসিগান সূর্যের আলো কড়া ক'রে চুইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে।' এই নিগড়ে আবদ্ধ জীবনে যারা আলো ও মুক্তির প্রার্থনা করে তাদের পরিণামও কবি নিতান্ত বেদনাময় বাস্তবতার সঙ্গে দেখিয়েছেন—

নন্দিনী। আহা পাগলভাই ওরা কি তোমাকে মেরেছে?
এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে!

বিশু। চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে।...

নাটক দু'টিতে কবির এই বাস্তবাসক্তি আমাদের বিস্মিত করে, কিন্তু তার চেয়েও বিস্মিত হই এই বাস্তবজীবনের মধ্যেই কবির মানবিকতাময় অরূপ-অনুসন্ধানের প্রয়াস ও অরূপ-প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য ক'রে। 'নন্দিনী' হ'ল এই অরূপ-রসের বা মানুষের প্রার্থিত জীবন-সৌন্দর্যের বাহক ও দূতী। অতএব কবির দৃষ্টিতে 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা'। যক্ষপুরীর কোনো কোনো শ্রমিকের কাছে সে অনির্বচনীয় রসেরই মূর্ত প্রতীক। রাজার কাছে তার আকর্ষণ দুর্নিবার, অথচ সে ভয়ংকরও বটে। হাতে রক্তকরবীর কঙ্কণ রসের দ্বৈত স্বরূপকেই ফুটিয়ে তুলেছে। তা শুধু সুন্দর নয়, ভয়ংকর সুন্দর, 'রাজা' নাটকের রাজার মত। সুতরাং একে লাভ করতে হ'লে বিষয়-জড়িত ভোগের জীবন পরিত্যাগ করতে হয়, ক্ষমতার লোভ ছাড়তে হয়, তার চেয়ে

কঠিন যে-সংস্কার তার বাধা ঘোচাতে হয়। জীবনদানের মধ্যেই তা লভ্য। রঞ্জনের চরিত্র কল্পনা ক'রে কবি জীবনের মধ্যে এই যথার্থ জীবন বা অরূপ-লাভের তত্ত্বটি ফুটিয়ে তুলেছেন। রঞ্জন নেপথ্যচারী। নন্দিনীরই ভাবাদর্শের রূপ, সাধারণের অগোচর। তাকে পাবার ব্যাকুলতাতেই নন্দিনীর আনন্দময় সত্তার বিকাশ। আবার এই নন্দিনীই রাজা, অধ্যাপক, বাউল বিশুর কাছে প্রেরণার কাজ করছে। এ যেন শেষের কবিতায় উক্ত 'মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি নির্ঝরিণী, তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায় নিজেরে চিনি'। কবি নাটকটিকে সম্পূর্ণ সাংকেতিক ক'রে সৃষ্টি করেননি। সাংকেতিক ও বাস্তবের মাঝখানে স্থাপন করেছেন। নন্দিনীর চরিত্র তার অন্যতম প্রমাণ। নন্দিনী ভাবে অরূপরসের দূতী, কবিরই পূর্বেকার মানস-সুন্দরী বা লীলাসঙ্গিনী। বাহ্য আকর্ষণের দিক থেকে তার মানবী কল্যাণী মূর্তি। অথচ অন্তরের দিক থেকে এত সরল, সহজ ও শুদ্ধ যে, সে যেন ঠিক লৌকিক জীবনের মানুষই নয়, যান্ত্রিক জীবনের ব্যাপার সম্বন্ধে তো সে দৃশ্যতঃ অজ্ঞই। সে অরূপরসমধ্যবর্তিনী হলেও যেহেতু এই রস মানবজীবনের বাইরের অপ্রাকৃত লোকের নয়, তা সম্পূর্ণ মানবীয়ই, সেইহেতু সে মানবীও বটে, আবার অরূপানুপ্রাণিত একটি সত্তাও বটে। কবি অরূপকে জীবনাশ্রিত ভাবে দেখার ফলেই এমনটি ঘটেছে। যে পারিপার্শ্বিকে নন্দিনীর আবির্ভাব তার একান্ত বাস্তবতায় সন্দেহের অবকাশ কবি রাখেন নি। আর ঐ বাস্তব-জীবনের মধ্যে নন্দিনীর ও রঞ্জনের আবির্ভাব এবং বাস্তবতার সঙ্গে তাদের নিগূঢ় সম্পর্কের রহস্যই একালের কবিমানসের অন্যতম আকর্ষণীয় বস্তু। তাই অধ্যাপক যখন নন্দিনীর আনন্দময় সত্তাকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন—

> 'নন্দিনী এ-সমস্ত থেকে তুমি একেবারে চলে এসো। শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নিচে হরণ-শোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্ত-করবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোলা দেখব ব'লে তাকিয়ে আছি।'

তখন নন্দিনী অধ্যাপকের কথায় কর্ণপাত করেনি। কবি বাস্তবজীবনের মধ্যেই অরূপরসকে অর্থাৎ আদর্শ জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কবির পরিণত প্রতিভার অরূপ-জীবন সমন্বয়ের এই দিকটি লক্ষ্যে রাখলে নন্দিনী ও রঞ্জনের চরিত্র তথা রক্তকরবীর কাব্যতত্ত্ব বুঝতে বেগ পেতে হয় না। বলা বাহুল্য, জীবনাশ্রয়-ত্যাগ নন্দিনীর স্বভাবের মধ্যেই নেই, তাই নাটকে বাস্তব বিপদজালের মধ্যবর্তিনী হয়েও সে অটল। আর নন্দিনীর ভাবাদর্শ 'রঞ্জন' মুক্তির প্রতীক হ'লেও তাকে দশজনের মধ্যেই প্রাণ দিতে হয়েছে। বস্তুত 'বন্ধন এবং অবন্ধনের' মধ্যেই এই নাটকটি সার্থক হয়ে উঠেছে, কবির

অন্তরতম ভাবাদর্শও সম্যক্ প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের মধ্যেই অরূপরসের আস্বাদন করতে হবে, জীবনকে সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ ক'রে অথচ স্থূল বাসনাকলুষ ত্যাগ ক'রে জীবনকে সার্থকভাবে পেতে হবে। পূর্বেকার ঠাকুরদা-চরিত্রের মত বাউল ধনঞ্জয় এবং বিশু এই মুক্তিসাধনায় সিদ্ধ। বিশু দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে অভিলষিত বস্তুকে লাভ করেছে। সুতরাং রবীন্দ্রকাব্যে পুনঃপুন প্রাপ্ত একটি বোধকেই এখানে বাস্তব আকার দিয়ে দেখানো হয়েছে। আর শক্তিধর ভয়ংকর রাজাও তার প্রতাপ ত্যাগ করতে করতে পরিশেষে মুক্তিপথের পথিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজা ও রঞ্জনকে অভিন্ন মনে করলে নাট্যরস এবং কাব্যরস উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষভাবে রাজার উপর নন্দিনীর পক্ষপাতের কারণ হ'ল এই চরিত্রটির মধ্যেই লোভ, প্রতাপ, সংস্কারের মালিন্য সবচেয়ে প্রবল। আর এইটিই নাট্যের কেন্দ্রবিন্দু বা আকর্ষণীয় প্রধান চরিত্র, নন্দিনী নয়। তা ছাড়া এখানে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় হ'ল—শক্তি এবং শোষণের যে আধার সে নিজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করছে। এই অদ্ভুত ব্যাপারটি না থাকলে রক্তকরবী মালিক-শ্রমিক স্বার্থ-সংঘর্ষের নিখুঁত বাস্তব নাটক হয়ে পড়ত। ফলত রাজ-চরিত্রের মূলভাবটিই সমস্ত নাট্যের নিয়ন্তা। মুক্ত-ধারার অভিজিৎ এবং রক্তকরবীর রঞ্জন কবির আত্মবিসর্জনময় রোম্যাণ্টিক এবং বৈপ্লবিক আদর্শের ভাবমূর্তি; পূর্বতন পঞ্চক, অমল, চতুরঙ্গের শচীশ প্রভৃতির স্থানোপযোগী রূপান্তরিত চিত্র। অভিজিৎ যদিচ মানুষ, রঞ্জন অনেকাংশে অভিপ্রেত মুক্তজীবনের ভাবময় অরূপরসমূর্তি।

রক্তকরবী সংকেত-বাস্তব মিশ্র নাটক। এর রাজা স্বয়ং ধনতন্ত্র। ধনতন্ত্র নিজের জটিল জালে আবদ্ধ হয়ে পরিণামে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনবে, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ধারণা। সেই ধারণা অনুযায়ী রাজা এবং তার পরিবেশ বাস্তব সংকেত বিমিশ্র। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একথা বলছেন না যে ধনবাদকে হটাতে শ্রমিক-বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। তা তিনি দেখিয়েছেন। আর লক্ষণীয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের সমাজবাদী চিন্তাধারার মধ্যে কৃষক মুখ্যভাবে স্থান পেলেও, যুদ্ধোত্তর ভারতে ধনতন্ত্রের আভাস দেখা দিতেই তিনি তারও অমানবীয় ছবি তুলে ধরেছেন। প্রগতি-ভাবুকতায় মহাকবি সর্বাগ্রে চলেন, এই তাঁর বৈশিষ্ট্য। প্রায় একই সময়ে লেখা রথযাত্রা (পরে 'কালের যাত্রা') নাটকে কবি দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করলেন যে হীনবর্ণের মেহনতী মানুষের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছাড়া রাষ্ট্র অচল হবে। এখন থেকে শেষজীবন পর্যন্ত কবি উত্তরোত্তর অবহেলিত মেহনতী মানুষের পক্ষপাতী হয়েছেন।

'নটীর পূজা' নাটিকায় মানবধর্মের জন্য শ্রীমতীর প্রাণদান কবির এই বাস্তবজীববোধকেই একটু ভিন্ন আধারে প্রকটিত করেছে। সেখানেও কবি শক্তি ও প্রথার বন্ধনে অবরুদ্ধ মানব-আত্মার করুণ ক্রন্দন শুনতে পেয়েছেন এবং

মৃত্যুবরণের দ্বারাই মুক্তির সন্ধান এনে দিয়েছেন। নিষ্ঠুর রাজধর্ম ও আনুষঙ্গিক উগ্র স্বার্থকোলাহলের মধ্যেকার অতৃপ্তির সুরটি কবি বিখ্যাত 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গানটিতে প্রতিধ্বনিত করেছেন—

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়বিষবিকার-জীর্ণ দীর্ণ অপরিতৃপ্ত।

এবং হিংসাশূন্য ত্যাগময় মুক্তজীবনের জয়গান করেছেন। রক্তকরবীতে পৌষের ডাকে প্রকৃতির ও শস্যময়ী ধরিত্রীর আহ্বান জানিয়ে কবি পূর্বজীবনে মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষগুলির অতিপ্রিয় আকর্ষণ উদ্‌বোধিত করতে চেয়েছেন।

পথিক কবির যাত্রা পরিণামে এসে পৌঁছল। অথবা আরও যথার্থভাবে বলতে গেলে পরিণামী কবিপ্রতিভার রহস্যময় গতিধর্ম অভিপ্রেত পূর্ণতা লাভ করলে। বলাকা থেকে মহুয়া পর্যন্ত পথের সীমানায় এই পরিণামের ইতিবৃত্ত কিরকম বিচিত্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা আমরা যথাসাধ্য দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং অরূপাশ্রিত চলমান মানবীয়তাবোধের মধ্যেই যে কবির অভিলাষের পরিসমাপ্তি তাও নির্দেশ করেছি। অতঃপর কবির লেখনী যদিও রুদ্ধ হয়নি, প্রায় সর্বত্রই তা আগেকার ও একালের মানবীয়তাবোধ-যুক্ত জীবন-স্মৃতিকে আরও পরিস্ফুট করেছে, আত্মস্মৃতির মধ্যেও বিচিত্রভাবে পরিভ্রমণ করেছে এবং বিদায়ের পরিচয়কে নানাভাবে জানিয়েছে। কিন্তু আমাদের এরূপ মন্তব্যের অর্থ এই নয় যে অতঃপর কবির কাব্যরচনার ক্ষমতা একেবারে হ্রাস পেয়েছে। একালেও তিনি এমনতর বহু কবিতা রচনা করেছেন যা নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণীর এবং তাঁর লেখনীর যোগ্যও বটে। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই গীতিমহাকবির অলোক-সামান্য প্রতিভার একটি নির্দিষ্টসূত্রে চলমানতা তার বহুকালের অভিলষিত পরিণাম লাভ করেছে। জীবনের মধ্যেই সর্বতোভাবে অরূপলীলারস আস্বাদনের আগ্রহ তার সমাপ্তি পেয়েছে। গীতাঞ্জলিতে যখন কবি নিসর্গ-প্রেরিত অরূপরসে প্রায় নিমগ্ন সেই সময়কার একটি গানে তিনি বিহ্বলাবস্থায় এই সমাপ্তি প্রার্থনা করেছিলেন—

বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে।
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা।
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

কিন্তু তা হয়নি, জীবনের মধ্যে অরূপকে সর্বপ্রকারে উপলব্ধি ক'রে সাধারণ মানুষের মহিমার মধ্যে সত্যদর্শন ক'রে তবেই প্রতিভার বশ্যতা থেকে কবির

মুক্তি ঘটেছে। সুদূর ও অনির্বচনীয়ের সঙ্গে ধূলিমলিন বাস্তব জীবনের পরিণয় ঘটিয়ে তবেই রবি যেন তাঁর প্রতিভা-রশ্মি সংবরণ করেছেন।

কাব্যজীবনের শেষ অধ্যায়ে ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি কাব্যের বাহনরূপে গদ্যচ্ছন্দের প্রবর্তন। গদ্যচ্ছন্দের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্ভবত আধুনিক ইংরেজি কাব্য থেকে প্রেরণা, সংস্কৃত কাব্য থেকে শক্তি এবং রূপকথা জাতীয় গদ্য থেকে প্রাণের প্রবর্তনা লাভ ক'রে তিনি কাব্য রচনার পরিসরকে কতদূর বাড়িয়ে তুলেছেন তা সাম্প্রতিক কবিদের আগ্রহ থেকে কতকটা অনুমিত হতে পারে। এই ক্ষণজন্মা মহাকবির শেষ জীবনের বিস্তৃত পরিচয়ের পূর্বে দু'একটি কথা এই পরিণামপর্বে স্মরণ করতে চাই।

আমরা দেখলাম মুক্তধারা-রক্তকরবী প্রভৃতির মধ্যে কবিপ্রতিভা সার্থকভাবে সাম্প্রতিক জীবনকে গ্রহণ করেছে। ঊনিশ শতকের প্রবল রোম্যান্টিক কল্পনার মধ্যে যার জন্ম, তা উচ্চতম ভাবলোকে অধিষ্ঠিত হয়ে পরিশেষে জীবনকে ভাবের সঙ্গে পরিচিত এবং ভাবকে জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত ক'রে দেখেছে। যুগের মধ্যে ব্যাপ্ত সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলেও যে কবিপ্রতিভার এরূপ পরিণাম সম্ভব হয়েছে তা আমরা নানাভাবে লক্ষ্য করেছি। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালির তথা ভারতীয়ের প্রতিনিধি যুগকবিও বলা চলে। রবীন্দ্রের সৃষ্টিকার্য দীর্ঘকালব্যাপী। ঊনিশ শতকের আচার-সর্বস্ব শ্রেণীস্বার্থে আবিল অকর্মণ্য বাঙালি-জীবন থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ শতকীয় বিশ্বের প্রায় সর্বত্র প্রসারিত উগ্র-দেশস্বার্থময় ও যান্ত্রিক জীবন পর্যন্ত সমস্তই অলক্ষিতভাবে তাঁর প্রেরণার সহায়ক হয়েছে। বিশ শতকের নিপীড়িত মানবের বেদনার দিকটি তাই তাঁর কাব্যে গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। অবশ্য কবি তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভায় স্বকীয়ভাবেই এই জীবনকে গ্রহণ করেছেন। এবং স্বকীয়ভাবেই জীবন-সমস্যার সমাধান নির্দেশ করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ কাব্য-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে যে বিশিষ্ট জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতার আন্দোলন বর্তমান ছিল তার প্রভাব কবিমানসে কী পরিবর্তন সঞ্চার করেছিল তা গাণিতিকভাবে নির্দেশ করা যায় না। শুধু এই বলা যায় যে মৌখিক-প্রতিবাদসম্বল ভাববাষ্প-সমাকীর্ণ রাজনীতিক আন্দোলনের চেয়ে গঠনমূলক সক্রিয় দেশহিতচেষ্টাকেই তিনি যথার্থতর পথ ব'লে নির্দেশ করেছেন। তাঁর স্বদেশী-সমাজ সংগঠনের অধ্যায়ে—সামাজিক উদ্‌যোগে অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান, চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন, গ্রামের পথঘাট সংস্কার, সালিশী বিচার ব্যবস্থা, সমবায় অবলম্বনে কৃষি ও যান্ত্রিক শিল্প, সামাজিক মিলনের দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য অপসারণ এবং নিম্নহিন্দুদের সামাজিক অধিকারের বোধ জাগ্রত করা—এই ছিল তাঁর স্বাদেশিকতা। মধ্য-উত্তর বাঙলায় তাঁর জমিদারিতে এবং পরে শ্রীনিকেতনে

এ বিষয়ে তাঁর উদ্যোগ আদর্শ-স্থানীয় হয়ে রয়েছে। যান্ত্রিক পদ্ধতির রাষ্ট্র-গঠন তাঁর প্রিয় ছিল না, উন্নত গ্রাম-সমাজ ও গ্রাম-স্বরাজই ছিল তাঁর আদর্শ। রবীন্দ্র-কবিমানসে ভারতীয়তার জাগরণ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের বহুপূর্ব থেকেই ঘটেছিল (বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় দ্রঃ) এবং ঐ আন্দোলনের সমসাময়িক কয়েকটি গান বা 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার' কবিতা প্রত্যক্ষভাবে তৎকালীন সাময়িক চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করা গেলেও 'খেয়া'র উপলব্ধ অরূপের দুঃখময় রূপ বা কবির বিশিষ্ট অরূপ-দর্শনের তথা জীবন-দর্শনের মূলে, তার কতখানি তাৎকালিক আন্দোলনের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছিল তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ যে অন্তরের দিক থেকে স্লোগান-সম্বল আন্দোলন সমর্থন করতেন না, 'খেয়া'র পশ্চাদপসরণই তার প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পূজারী ছিলেন, সমাজ-সাম্য-মূলক জাতীয়তাকে সর্বতোভাবে সংবর্ধনের প্রয়াসী ছিলেন, নানা প্রবন্ধে ও অন্তত কয়েকটি কবিতায় তিনি প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্মম নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং ফ্যাসিবাদী নরহত্যালীলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু তিনি আত্মশক্তি-উদ্বোধনের এবং গঠনমূলক স্বাদেশিকতারই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন এবং ফিরে এসেছেন, গুপ্তহত্যামূলক বিপ্লবপন্থার সাহসের এবং বিপ্লবী চরিত্রের দিকটির প্রশংসা করেছেন, সংকীর্ণতার দিকটির নিন্দা করেছেন, মহাত্মাজীর বয়কট, অসহযোগ ও অহিংসার সঙ্গে মনেপ্রাণে সহযোগীতা করতে পারেননি।* বস্তুত রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম ক্ষণগুলির মধ্যেও আমাদের বহুকাল থেকে আগত ভীরুতা, প্রথা ও কুসংস্কারের বশ্যতা, ঐহিকতা ও ভেদবুদ্ধির ক্ষুদ্রতা ('শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি')—জনজীবনের ও সেই মর্মে অবহেলিত শোষিত মানবসমাজের গুরুতর নিপীড়নের দিকটিই যুগ-চেতনারূপে তাঁর মনে কাজ করেছিল। এই বিষয়টিই আবার বিস্তৃত হয়ে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয়তা ও যান্ত্রিকতার দ্বারা প্রাণের নিপীড়নরূপেও কবির কাছে দেখা দিয়েছে।

গীতাঞ্জলি-বলাকা রচনার কালে প্রথম মহাযুদ্ধ কবির চিত্তকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল সত্য, কিন্তু কবি স্বকীয় ভাবরূপের মধ্যেই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর বহুপরিচিত 'সর্বনেশে' বা 'দুঃখরাতের রাজা'র বা 'ইতিহাস-বিধাতা'র পদধ্বনি তাঁর শ্রুতিগোচর হয়েছিল। মহাযুদ্ধকে কবি অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এই ভেবে যে, এতে পণ্যবাহী

* প্রবন্ধ-সংকলন 'কালান্তর' দ্রষ্টব্য

সাম্রাজ্যবাদ বিধ্বস্ত হবে এবং মানুষের মুক্তি ঘটবে। সেই সঙ্গে স্বদেশেও মানব-ঘৃণা ও শ্রেণীস্বার্থের বিলোপ ঘটবে। পশ্চিমের সম্পর্কে আগত যুদ্ধোত্তর সাহিত্যিক বাস্তবধৌতা রবীন্দ্র-মানসে স্বাভাবিকভাবেই স্থান গ্রহণ করতে পারেনি। তাঁর পরিবর্তে কল্পলোকের সঙ্গে বাস্তবের পরিণয়বন্ধনে তাঁর প্রতিভা একটি চিরন্তন মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে। ভারতীয় ভাব-সাধনার উত্তর-সাধক হয়েও রবীন্দ্রনাথ মানুষের মুক্তির সন্ধান কালোচিতভাবেই দিয়েছেন।

যুদ্ধের মত ঘটনা ও তার পশ্চাদ্বর্তী দানবীয় মনোভাব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে তৎকালে লেখা তাঁর কয়েকটি কবিতা রয়েছে। ঠিক এরকম কবিতার মধ্যে বোধ হয় সর্বপ্রথম রচনা বুয়র যুদ্ধকে লক্ষ্য ক'রে লেখা—'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে অস্ত গেল' ইত্যাদি (নৈবেদ্য দ্রঃ)। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভের কয়েক দিনের মধ্যেই বলাকাব 'পাড়ি' ও কিছু পরে লেখা হয় 'ঝড়ের খেয়া' কবিতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বাভাস এবং ফ্যাসিস্ট হিংসা-লীলা সম্পর্কে কবি 'প্রান্তিক' থেকে আরম্ভ ক'বে পরপব কয়েকটি কবিতা লেখেন যার মধ্যে যুদ্ধেব প্রতি বিরক্ত এবং কল্যাণকামী মানবপ্রেমিক কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি রাজবন্দীদের প্রতি নির্মম অত্যাচারেব প্রেরণায় লেখা 'পরিশেষে'ব দুটি কবিতা ('নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন' এবং 'ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত') এবং সেই সঙ্গে 'মৃত্যুঞ্জয়' রাজশক্তির বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহী মানসের এবং মানব-প্রেমের পরিচয় অবশ্য বহন কবে। কিন্তু এই সাময়িক ঘটনার প্রেরণার বশে লেখা কবিতাগুলি হয়ত বা বেশী স্পষ্ট ব'লেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাপ্যের অতিরিক্ত মর্যাদা পেযে থাকে। আমাদের মনে হয়, এরকম কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কবিতার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী ও মানবপ্রেমিক কবিসত্তাকে দেখতে যাওয়া এবং একজন চিরন্তনের অতি প্রবল বিপ্লবীর আংশিক পরিচয় লাভ ক'রে সন্তুষ্ট থাকা একই কথা। অর্থাৎ ডাকঘর, অচলায়তন, গীতালি বলাকা, ফাল্গুনী, মুক্তধারা প্রভৃতির মধ্যে যাবতীয় আচারসর্বস্বতা, সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থপরতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে কবি যে-সংগ্রামের মনোভাব পোষণ করেছেন এবং সমাজতান্ত্রিক মানবীয়তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন—বাঙ্‌লা সাহিত্যে আজও যার তুলনা নেই, সেগুলির দিকেই লক্ষ্য বিশেষভাবে নিবন্ধ না করা বিমূঢ়তার পরিচয়। উল্লিখিত বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি কবির সেই সমগ্র ও প্রবল চেতনার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এই কয়েকটি বিক্ষিপ্ত রচনায় যে প্রকট প্রত্যক্ষতা পাওয়া যায় তা উক্ত বিখ্যাত রচনাগুলিতে পাওয়া যায় না ব'লে ঐগুলির নিগূঢ় জীবনবোধ এবং তার সঙ্গে জড়িত অসাধারণ কবিপ্রতিভা যদি লক্ষ্যের

বাইরে থেকে যায় তাহ'লে আমাদেরই দুর্ভাগ্য। সুতরাং ঐগুলিকে কবির ব্যাপকতর ও প্রবলতর সামাজিক অভিব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। আসলে বাস্তবজীবন ও যুগ কবির বিশাল কল্পনাশক্তিতে ও চৈতন্যে গৃহীত হয়ে যে-রসমূর্তি পরিগ্রহ করেছে তাতেই তিনি মহাকবি, বিশিষ্ট জীবন-দার্শনিক, এবং সেই কবিকে যদি লাভ করতে পারি তাহ'লেই আমাদের চরম প্রাপ্তি ঘটবে; নতুবা অল্পকেই আপন ব'লে স্বীকার করব এবং বৃহৎকে হারাব।

এই নিবিড় জীবন-চেতনার মধ্যেই কবির শাশ্বত মানবীয়তার পরিচয়। রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের শেষভাগে তাঁর বিভিন্ন মুহূর্তের নানান্ পূর্বপরিচয়ের মধ্যে যদি কোনো একটি ধারা পাঠকের মনে স্বতন্ত্র চমৎকারীত্বের সৃষ্টি ক'রে থাকে তা ঐ পরিণামের যুগের অবহেলিত মানবসমাজের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতির ধারা যা কবির শেষ রচনা ক'টিতে একটু বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ ক'রেই আবির্ভূত হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কাব্যজীবনের প্রায় শেষ বৎসরে লেখা কয়েকটি কাব্যে, বিষয় ও ভঙ্গি উভয় দিক থেকেই একটা পরিবর্তন এসেছে। বিদায়ের ঠিক পূর্বে কবি যেন সর্বদিক থেকেই একান্ত সহজ হয়ে উঠতে চেয়েছেন। কবির বক্তব্য যাই হোক, এই সময় একটি সহজ অনুরাগ ও স্বচ্ছ অকপট আন্তরিকতা তাঁর কবিতাগুলিতে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। একেবারে শেষ লেখা ক'টিতে পাঠক অনুভব করবেন যে কবিপ্রতিভা কল্পনাশ্রয়ী হলেও একান্ত সহজ অনুরাগ ও সহজ অনুভূতি যেন সেখানে কল্পনাবেগকে সংযত করতে চায়। মনেপ্রাণে সহজ হওয়ার প্রেরণাবশতই কবির উদার মানবপ্রীতি বাস্তবভাবে সেখানে নিতান্ত সাধারণ মানুষকে অবলম্বন করেছে; এমনকি দুঃখজীবী মানুষকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিকভাবে শোষণ করার বিষয়টি কবির লক্ষ্যের বাইরে যায়নি (জন্মদিনে ২২ সং কবিতায় 'মহা-ঐশ্বর্যের নিম্নতলে' ১০ সং 'ঐকতান' প্রভৃতি দ্রঃ)। কয়েকটি কবিতায় কবি স্পষ্টত শ্রমিক ও কৃষকের জীবনের প্রতি সকরুণ অনুরাগের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। বুঝতে হবে, এ অনুরাগ তাঁর ক্রম-উদ্ভিন্ন মানুষপ্রীতি-সঞ্জাত, এর উৎস তাঁর বিশিষ্ট মানস-প্রকৃতি। তৎকালীন রাষ্ট্র ও সমাজ কবির এ মনোভাবকে উদ্দীপিত করেছে মাত্র, যেমন করেছে পূর্ব পূর্ব বিভিন্ন রচনায়। ১৯৩০ খ্রীঃ কবির রাশিয়া পরিদর্শন একটি উল্লেখ্য ঘটনা হলেও বলা যায় এর অভিজ্ঞতা তাঁর পূর্বেকার মানুষ-প্রীতি, সমাজবোধ ও সংগঠনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। একথা তিনি নিজেও বলেছেন। তিনি যা যা দেখলেন তাতে বিস্মিত হয়ে তিনি স্বকীয় সীমিত গ্রামসংগঠনের উদ্‌যোগকেই স্মরণ করেছেন। তবে ঐ পরিদর্শন তাঁকে বিস্মিত, ভাবিত ও তাঁর পূর্বেকার বিশিষ্ট মানুষ-প্রীতিকে আরও বাস্তবায়িত করেছে এমন হতে পারে। ফলে কবিমানস ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব থেকে

উৎপন্ন 'ওরা কাজ করে'র মত উল্লেখযোগ্য মেহনতী মানুষের অভিমুখী কবিতা কবি লিখেছেন এবং 'ঐকতান' কবিতায় তিনি একদিকে যেমন কৃত্রিমতা-সম্পন্ন ভঙ্গিমাত্রসম্বল বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকদের অসারতা দেখিয়েছেন, সেই-সঙ্গে নিজের মেহনতী মানুষকে না জানার আক্ষেপ অসংকোচে বিবৃত করতে পেরেছেন। আর এই একান্ত সহজ অনুরাগের বশেই অনাগত ভাবী কালে 'অখ্যাতজনের নির্বাক মনের' বেদনার সঙ্গী যথার্থ সাধারণ মানুষের কবির আবির্ভাবও প্রার্থনা করেছেন, যে-কবি, তাঁর ধারণায়, তাঁর কৃষক ও শ্রমিক জীবনের সঙ্গে আন্তরিক পরিচয়ের অসমাপ্ত অধ্যায় সমাপ্ত করবে।

রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের পরার্ধে কবির অধিকতর সমাজ-আশ্রয় ও মেহনতী কৃষক-শ্রমিকের প্রবল সপক্ষতা আজকের কোনো কোনো সমালোচককে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিরিখে তাঁর কবিকৃতির মূল্যায়নে উদ্বোধিত করেছে। যুক্তিতর্ক সমন্বিত যে-কোনো দার্শনিক মতের আলোকে সাহিত্য-বিচারে বাধা নেই, যদি সাহিত্যিক নির্মিতির মৌল শর্তগুলি বিচারে উপেক্ষিত না হয়। আধুনিক গীতিকাব্য, সাংকেতিক নাটক প্রভৃতি বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে দর্শনীয় বিষয় হ'ল স্রষ্টার স্বকীয় প্রায়-স্বাধীন মানসবৈশিষ্ট্য বা কবিস্বভাব, তারপর সেই মানসে পরিবেশ বা সমাজের অভিঘাতে সৃষ্ট চঞ্চলতাময় দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি, যা বিভিন্ন সাহিত্যিকের চিত্তে বিভিন্ন প্রকাশরূপ গ্রহণ করে। সমাজ ও পরিবেশ বা যুগধর্ম যদিচ বিচারকের করায়ত্ত থাকে, কবিস্বভাব, যা কবির অন্তরঙ্গ, যা তাঁর স্বাধীন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একত্র সমন্ভূত হয়, তার স্বরূপ নির্ণয় করার কোনো গণিতিক মাপকাঠি আজও নির্মিত হয় নি। এরই ফলে যুগধর্ম ও সমাজ-পরিবেশ বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হলেও সমীক্ষক আভাসধর্মী কাব্যের বিচারে কোবিদ্ নাও হতে পারেন। কবিমানসের সমধর্মা ও কবিকল্পনার যথার্থভাবে অনুগামী না হতে পারলে উক্ত দ্বান্দ্বিক চঞ্চলতার প্রকৃত স্বরূপ তাঁর অনায়ত্ত থাকবে, যার ফলে কাকতালীয় কার্য-কারণ দর্শন ও দূরান্বয়ের কৃত্রিমতায় তাঁর কাব্য-কবি-সমীক্ষা বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়বে। যেমন বলা যেতে পারে, আমাদের কবির অনন্যসাধারণ সুদূর-স্পৃহা ও অকারণ-বিরহ-কাতরতাকে যদি সমাজ-দুঃখের প্রতিমা হিসাবে চিন্তা ক'রে সহজ সমাধানের পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় (অথবা জীবন-দেবতা শ্রেণীর কয়েকটি কবিতার মূলে আগে যেমন কবিচিত্তে অধ্যাত্ম-ভাব আরোপিত হয়েছিল), তাতে অন্তরঙ্গ কবিপ্রকৃতি বিষয়ে বিচারকদের অন্তর্দৃষ্টির দৈন্যই পরিস্ফুট হয়।

উনিশ শতকের শিক্ষিত বুর্জোয়া গোষ্ঠী-মানস একদিকে যেমন স্বপ্ন-কল্পনার আকাশ-কুসুম উপভোগ করতে চেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সর্ব-হারাদের আরও বঞ্চিত ক'রে আরাম ও সুখের ভাণ্ডার পরিস্ফীত করতে চেয়েছে। কাব্যজীবনের প্রথমার্ধে এই সংকীর্ণ সমাজেরই ঘনিষ্ঠ কবি উল্লিখিত প্রথম প্রবণতার যদিবা সামিল হয়েছেন, দ্বিতীয় মানসিকতার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করেছেন। এই বিদ্রোহে রবীন্দ্র-কবিসত্তার মৌল স্বাতন্ত্র্যই বিজয়ী হয়েছে। কবি যে ক্রমশ বুর্জোয়া বিলাসসুখের আবেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছেন তার কারণ তাঁর চিত্তে সমাজ-অভিঘাত গোষ্ঠী অতিক্রম ক'রে ব্যাপকতর মানুষের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এমনটি যে হতে পেরেছে তারও কারণ নিহিত রয়েছে তাঁর কবিব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তাঁর চলিষ্ণু রোম্যান্টিক স্বভাবের মধ্যে। কোনো ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম নন। কাব্য-নাট্য-গল্প-চিত্রশিল্পে বিশুদ্ধ আর্টের সপক্ষতা যেমন স্বাভাবিক বাস্তব ব্যাপার, ধূলিমলিন জীবনের প্রতি আকর্ষণও তেমনি কোনো কোনো কবিচিত্তের স্বভাবসিদ্ধ বিক্রিয়া। দুই-ই কালিক সমাজ-সত্য। রবীন্দ্রনাথে ঐ দুয়ের একটি দিক বা নিসর্গ-স্বপ্নের দিক কেমন ক'রে কমে এসেছে এবং অন্য দিক অর্থাৎ মানুষ-সংসর্গ ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে তা একটি রেখাচিত্রের সাহায্যেও দেখানো যায়। কবি তাঁর 'অন্তর্যামী' কবিতায় (চিত্রা-কাব্য) স্বপ্ননিলীনতা থেকে বাস্তব বিশ্বে উৎক্রমণের বিষয়টি নিজেই অনুভব করেছেন। অতএব দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে সামনে রেখেও এই ভাববাদী ও উগ্র স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত মহাকবির কৃতিসমূহকে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে এবং কতদূরই বা স্বাভাবিকভাবে ও সহজে মেলানো যায় সেই কথাই ভাবতে হবে। আপাতবিরোধী কবিকর্ম ও মননশীলতার দিকগুলি (যেমন শিক্ষা-সংস্কারের আগ্রহে প্রাচীনে প্রয়াণ, আবার বাস্তব মাটিতে ফিরে আসা, যেমন চার-অধ্যায় উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের সংঘটন প্রভৃতি) তাঁর মৌল ব্যক্তিস্বভাব ও সাময়িক অভিঘাতের প্রতিক্রিয়ার বিচারে সামগ্রিকতায় সমন্বিত করা যেতে পারে কিনা তাও সমীক্ষককে বিবেচনা করতে হবে।

গোধূলি-পর্যায়

'পরিশেষ' থেকে 'শেষ লেখা'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের মূল্যবান্ গোধূলিক্ষণটিকে নানাভাবে স্মরণ করেছেন, যেমন—

এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; (পরিশেষ)

যাত্রা হয়ে আসে সারা, আয়ুর পশ্চিমপথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে। (ঐ)

দিনান্তের প্রান্তে এসেছি
গোধূলির ঘাটে, (শেষ সপ্তক)

রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
গোধূলিধূসর আবরণে, (বীথিকা)

পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো,
গানের বেলা আজ ফুরালো।
কী নিয়ে তবে কাটিবে তব সন্ধ্যা (ঐ)

শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে (পত্রপুট)

বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে
শেষ ধাপের কাছটাতে। (ঐ)

এই পর্যায়ে একদিকে রয়েছে তাঁর পূর্ব কাব্যজীবনের বিচিত্র স্মৃতি, ফাল্গুনী-বলাকা-পূরবী কালের গতিশীল মুক্ত জীবনবোধ ও আত্ম-অনুসন্ধানের প্রসার এবং ঐ পরিণামী কালের চলমান শাশ্বত মানবীয়তার ব্যাপক অনুবৃত্তি,—আর একদিকে রয়েছে বিষয়বস্তুর ও স্বীয় মানসের বিশ্লেষণ-তৎপরতা এবং ভাষা ও ভঙ্গিতে নূতনতর পথনির্মাণের অশ্রান্ত উৎসাহ। কবির একালের মানসিক প্রবণতায় আরো বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় বহির্জগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে তাঁর অধিকতর সচেতনতা। মানুষ

ও জীবন সম্পর্কে শেষ দিন পর্যন্ত কবির কৌতূহলের ও উৎকণ্ঠার বিরাম নেই। আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, এমনকি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখদুঃখের মুহূর্তগুলি, কী শহর কী পল্লীর অধিবাসী মানুষের আধুনিক মনের বিচিত্র বেদনার স্থানগুলি একালে কবিকে অধিকতরভাবে ও অনায়াসে আকর্ষণ করেছে। এইসব জাগতিক বিচিত্র বিষয় ও ঘটনাকে কবিমানস যেভাবে আত্মস্থ করেছে তার প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় হ'লেও এবং একালে আমরা বার বার তাঁর পূর্বেকার পরিণত জীবন-উপলব্ধির পরিচয় লাভ ক'রে চমৎকৃত হ'লেও, তাঁর জাগ্রৎ চেতনা ও গ্রহণোন্মুখ শক্তিটিরই বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। এই দিকটিকে তাঁর গতিশীল প্রতিভার বহিমুখ দিক বলা যেতে পারে। কিন্তু এই শক্তির জন্যই তিনি পুরাতন হয়েও আধুনিক এবং গোধূলিকালের স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূলিজালে জড়িত হয়েও দীপ্তিমান্। এই জন্য কাব্যে প্রকাশিত তাঁর দিনাবসানের অনুভবকে স্মরণে রেখেও এবং সমসাময়িক 'পথে ও পথের প্রান্তে'র চিঠিতে লেখা 'শক্তির গোধূলি', 'প্রকাশ করবার শক্তি পরিশিষ্টে এসেছে', 'আমার যাত্রা একান্ত ডুবে যাওয়ার দিকে, সামনে ছুটে যাওয়ার দিকে নয়' প্রভৃতি বাক্যকে পরমার্থে গ্রহণ ক'রেও তাঁর বহিমুখী সচলতার পরিচয় লাভে বিস্ময়বোধ করতে হয়।

শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখার সময় তিনি কোন্ দিক থেকে অগ্রসর ও আধুনিক এবং কোন্ বিষয়ে তাঁর চিরন্তন স্বরূপের অন্তর্গত তা বুঝতে হবে। পূর্বেকার অধ্যায়ে আমরা তাঁর প্রতিভার পরিণাম নির্দেশ ক'রে উপসংহারে এই মন্তব্য করেছি যে তাঁর গতিশীল প্রতিভা অন্তরধর্মের দিক দিয়ে আর অগ্রসর হয়নি, যদিও বিষয়বৈচিত্র্যে এবং প্রকাশভঙ্গির নবীনতায় শেষ পর্যায়েও কবিমানসের সচলতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত কবির একালের সৃষ্টিতে বলাকা-ফাল্গুনীর 'জীবনকে সর্বতোভাবে গ্রহণ ক'রেই জীবন্মুক্তি'র বাণী এবং মুক্তধারা-রক্তকরবীর 'শাশ্বতভাবে আধুনিক' গভীর মানবীয়তার সুরই মৌলিক প্রেরণারূপে নানাভাবে বিরাজ করছে, আর গতিধর্মে সবকালেই পুরোবর্তী এই কবি কাব্যের বহিরঙ্গনে যে নূতন বস্তু ও রূপের খেলায় আত্মনিয়োগ করেছেন তারও পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে।

মহাকবির শেষ পর্যায়ের কাব্য অলোচনা করতে গিয়ে কাব্যজীবনের সকল-ক্ষেত্রে সকলকালেই তাঁর 'আধুনিক' কবিমানসের কথা বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। 'কড়ি ও কোমল' থেকে আরম্ভ ক'রে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত দীর্ঘ ষাট বৎসরের রচনায় তিনি নূতন থেকে নূতনতর দানে বাঙ্লা সাহিত্যকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ ক'রে পাঠক ও সমসাময়িকদের চিত্ত, কাব্যরসে যেমনই হোক (কারণ, এতে রসপ্রমাতার ভূমিকাও নগণ্য নয়), অপ্রত্যাশিত তীব্র বিস্ময়ে স্পন্দিত করেছেন, আবার নূতনত্বের জন্যই তিনি কালে কালে ভ্রান্ত বিচারকের

কঠোর সমালোচনার পাত্র হয়েছেন। দুঃখ বোধ হয়, যখন মনে করি যে আমরা তাঁর নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-স্পৃহার কালে জন্মাইনি, ভাবময় বিলাস-স্বপ্নের জড়ত্ব থেকে মানুষের রাজপথে বাহির হওয়ার মুক্তি-মহামন্ত্র যখন শুনিয়েছিলেন তখন মজ্জার মধ্যে কম্পনবোধ করার সৌভাগ্যলাভ করিনি, আবার, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে উজ্জ্বল এবং সত্যোপলব্ধিতে স্থির প্রজ্ঞান নিয়ে যখন বৈপ্লবিক সংস্কারমুক্তির কর্তা, মানুষধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, বজ্র-বিদ্যুৎ-পথসঞ্চারী ভৈরব-সুন্দরের দুর্জয় আহ্বান শুনিয়েছিলেন তখনও অনুপস্থিত ছিলাম, এমনকি গীতালি-ফাল্গুনী-বলাকার মোহমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় যাত্রার পদধ্বনিও আমাদের কাছে নিঃশেষে অশ্রুত ছিল। যখন মহুয়া ও শেষের কবিতায় পথচারী প্রেমকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিচ্ছেন তখন আমাদের জ্ঞানও হয়নি। বস্তুত আমরা জন্মেছি তাঁর 'ভাঙা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরো'র কালে তাঁর 'মাধুর্য-যুগের ভগ্নশেষ' যখন বিতরণ করেছেন তখন—কণিকাপ্রত্যাশী হয়ে। বেশ মনে পড়ে, তখনকার কৈশোরের স্বপ্নাবেশপ্রিয়তার মধ্যে এবং হয়ত বা অনভ্যস্ত কাব্যবুদ্ধিতে তাঁর গদ্যকাব্যকে সানন্দে স্বীকার করতে পারিনি।

সেই সময় সাহিত্যিকসমাজে একদিকে যেমন রবীন্দ্রবিহ্বলতা, আর এক-দিকে তেমনি হিমালয় লঙ্ঘনের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। 'কল্লোল' থেকে 'কবিতা'য় এসে আধুনিক উৎসাহের মধ্যে ঐ পূর্বপ্রয়াসেরই বাস্তব রূপ দেখা গিয়েছিল। বস্তুতে, ভাষায়, ভঙ্গিতে বাঙালির রবীন্দ্র-অতিক্রমের এই দিকটি কাব্যমূল্যে যাই হোক, অভিযানের দিক থেকে অবিস্মরণীয়, কারণ, সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরনের উৎসাহ ও প্রস্তুতির দৃষ্টান্ত বিরল। আর এই সাম্প্রতিক সাহিত্য-পটভূমিই সায়াহ্নের রবীন্দ্রনাথের রূপকে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে, দেখিয়েছে যে তিনি শুধু সে-যুগেরই আধুনিক নন, সর্বকালের আধুনিকতার মূর্তি। প্রমাণ করেছে যে ভিক্টোরীয় যুগের কল্পনাবিলাসী ও গতানুগতিকতা-পরিতৃপ্ত তৎকাল থেকে আরম্ভ ক'রে বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক ও সাম্যধর্মী আধুনিক পর্যন্ত একই প্রতিভা প্রাচীনের অনুবর্তী হয়েও আশ্চর্যরূপে কালের গতির সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে নিজেকে মিলিয়ে পদক্ষেপ ক'রে চলেছে।

এমনটি যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ আমরা পূর্বেই নির্দেশ করেছি, যে, এই মহাকবির একটি জীবন-দর্শন রয়েছে—যাকে মোটামুটি বলা যেতে পারে 'নিসর্গ সত্য, জীবন সত্য, মানুষ অধিকতর সত্য'* এই ধারণা। এই

* চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' সহজিয়াদের এই উক্তিটির ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রভাবুকতার মিল নেই, যদিও একথা বলা যায় যে ঐ উক্তিটি অর্থান্তর নিয়ে রবীন্দ্রনাথের হ'লেই যুক্তিযুক্ত

অতিব্যাপক জীবন-দর্শনের বশীভূত ব'লেই কোনো-কালের অন্তর্নিহিত মানবীয় কামনাগুলির সঙ্গে তাঁর অন্তরের বিরোধ ঘটেনি, যদিও স্বার্থমলিন জীবনের সঙ্গে তিনি অনিবার্যভাবে সংঘাত অনুভব করেছেন। আর, সত্যোপলব্ধিজাত একটি সুবৃহৎ মানবীয়তা তাঁর কাব্যে শেষ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ব'লেই সাম্যধর্মী আধুনিক কালের সাধারণ মানুষের প্রতি প্রেমের দিকটি তাঁর কাব্যে উপেক্ষিত তো হয়ই নাই, প্রবলভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে, অবশ্য রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুগত হয়ে। যেমন বলা যেতে পারে যে পত্রপুট, নবজাতক, আরোগ্য বা জন্মদিনে কাব্যে কর্মী ও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবনস্পন্দন কবি প্রগাঢ় সহানুভূতির সঙ্গেই যদিচ অনুভব করেছেন, তাদের দেখেছেন দেশকালমুক্ত একটি চিরন্তন জীবনপ্রবাহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উত্থান-পতনের ও তার পরিচালকদের ক্ষণিকতা ও নশ্বরতার পটভূমিতে দুঃখজীবী, মৃত্যুঞ্জয় এবং কল্যাণব্রত সাধারণ মানুষই তাঁর কাছে চিরকালের ব'লে প্রতিভাত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক হ'লেও বিশিষ্টভাবে আধুনিক, চিরন্তন মানবমহিমার মূল্যদাতা।

তাঁর দেশকালনিরপেক্ষ মুক্ত কবিমানস সাময়িক প্রেরণায় সচেতন হ'লেও সাময়িকভাবে কোনো ঘটনাকে গ্রহণ করতে পারেনি। আমরা ইতিপূর্বে বলাকার আলোচনায় কবির এই প্রকৃতি লক্ষ্য করেছি। তাঁর একালের প্রান্তিক, সেঁজুতি, নবজাতক এবং জন্মদিনে কাব্যে কয়েকটি রচনায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা তাঁর চিরকালের মানবপ্রেমিকতাকেই উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। তাঁর একালের কোনো একটি কাব্যে আদ্যন্ত-বিস্তৃত কোনো একটি বিশিষ্ট কল্পনাপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায় না, বিভিন্ন কাব্যগুলির মধ্যে কবির মনোধর্মের স্বল্প পার্থক্য অনুভব করা যায় মাত্র। একেই অবলম্বন ক'রে আমরা একালের স্মরণীয় রচনা থেকে যথাসম্ভব তাঁর মানসিক প্রবণতা-গুলির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব।

মহুয়া কাব্যের রচনাকালের ও তারপর মোটামুটি চার বৎসরের কতকগুলি কবিতা 'পরিশেষ' কাব্যে গৃহীত হয়েছে। এতে বলাকা, পূরবী ও নটরাজের

হ'ত। মানুষী প্রেমাস্বাদের মধ্য দিয়ে নিষ্কামত্বে আরোহণ ক'রে শুদ্ধ প্রেম বা কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করা যায় ব'লেই সহজিয়া সাধকেরা মানুষের উপর জোর দিয়ে কথা বলেছেন। দেবতার নরলীলার সত্যতাও পূর্বেকার সাধকদের মানুষ-বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছে। নতুবা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মানুষধর্মেই মানুষের শ্রেয় এ ধারণা তাঁদের ছিল না। আমরা পূর্বেই গীতাঞ্জলির আলোচনা-কালে এ বিষয়ে আভাস দিয়েছি।

অনুবৃত্তিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়,—পরিণত রসচেতনারই ভগ্ন খণ্ড রূপ। 'বিচিত্রা' ও 'তুমি' কবিতায় কবি পূরবী-কালের লীলাসঙ্গিনীকে স্মরণ করেছেন এবং তাঁর দিনাবসানের কালেও প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি তাঁর স্থির অনুরাগের ব্যত্যয় হবে না এই অনুভব জানিয়েছেন। কবির কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতিচিত্র সায়াহ্নের রচনায় সর্বত্রই কিছু-না-কিছু পাওয়া যায়, যেমন পাওয়া যায় তাঁর কাব্য-জীবনের ও কবিমানসের ইতিবৃত্ত, কিন্তু যে-কল্পিত নারীমূর্তি কৈশোরে ও যৌবনে কবিচিত্তে রসের প্রেরণা দিয়েছে, পূরবীতে বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের আলোকে মুগ্ধনেত্রে যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, কবি তাকে নানাভাবে স্মরণ করেছেন বীথিকা ('কৈশোরিকা' তু°), শেষ-সপ্তক এবং সানাইয়ে। পরিশেষের 'পান্থ' কবিতায় 'নটরাজে'র মুক্তি-সংগীত আমাদের শ্রুতিগোচর হয়েছে। 'অপূর্ণ' কবিতায় কবি বলাকা-পূরবী স্তরের দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রকাশমান জীবনরহস্যের সার্থকতার প্রশ্ন পুনরায় তুলেছেন এবং পুনরায় আমাদের আশা ও আশ্বাস দিয়েছেন। যে সাধকসুলভ আত্মজিজ্ঞাসা বলাকার দু'একটি কবিতায় ক্ষীণভাবে এবং পূরবীতে ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা এখন থেকে শেষসপ্তক, পত্রপুট প্রভৃতির মধ্যে ব্যাপকতর হয়ে চলেছে। এর কতকগুলি কাব্যাংশে উপাদেয় এবং কতকগুলি আত্মবিবৃতিমাত্র হ'লেও রবীন্দ্র-কবি-আত্মাকে জানার দিক থেকে এগুলির মূল্য অপরিসীম। পরিশেষের 'আমি' কবিতায় কবি দেশকালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন তাঁর অন্তর্নিহিত সত্তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সাধকের প্রজ্ঞানমূলক উপলব্ধির সঙ্গে স্বীয় উপলব্ধি মিলিয়ে দেখেছেন—

যে-আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেরেছে জানিতে।

মহাগীতিকবি এবং সাধকের আত্মদর্শন যে অভিন্ন, কেবল প্রকারে পৃথক্, এ কথা পূরবীতে এমনকি গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য প্রভৃতিতেও আমরা পূর্বেই বুঝেছি। এখানকার 'বর্ষশেষ' কবিতাটিতে কবি জীবনবিবৃতির উপসংহারের দিকে মৃত্যুর মাধ্যমে পূর্ণতাকে দেখার অভিলাষ প্রকাশ করেছেন। 'দুর্দিনে' কবিতায় ('দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি কর্মে জড়ায় গ্রন্থি') কবি তাঁর সুলভ স্বকীয়তায় দুঃখদুর্যোগের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন ও অবিচলিত শ্রেয়-অনুরাগের মধ্যে আত্মমুক্তির বাণী প্রকাশ করেছেন। 'লেখা', 'নূতন শ্রোতা' প্রভৃতির মধ্যে কবি অনায়াসেই নূতন কালের কবি ও রসিকদের

আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, কারণ, তিনি জানেন, পুরাতনকে গ্রহণ ক'রেও কাল নূতনের পথে পদক্ষেপ ক'রে চলেছে।

'বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' ('নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন') কবিতাটি আমাদের তৎকালের স্বাধীনতাযুদ্ধের কবিমানসে প্রতিঘাতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু এগুলি, বিশেষভাবে 'প্রশ্ন' কবিতাটি কবির বিশিষ্ট জীবনবোধের দিকটিকে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করার পথ নির্দেশ করেছেন এবং দুঃখ, বিপদ ও মৃত্যুকে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম ক'রে চলেছে যে-মানুষ তার শক্তিকে অভিনন্দিত করেছেন বারংবার। তিনি শ্রেয়োবোধের কবি হ'লেও সর্বস্ব পণ ক'রেই শ্রেয়কে জয় করার বাণী শুনিয়েছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কায়িক শক্তিমত্তার দিকটি তাঁর কাছে নিন্দিত হয়নি। কবির এই জীবনবোধ যে কতদূর বাস্তব তার প্রমাণ তাঁর এই উপলব্ধি থেকেই পাওয়া যাবে। তিনি জীবনকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন ব'লেই দেহ, মন ও আত্মা তাঁর কাছে একই আধারে স্থাপিত হয়েছে এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর কায়িক শক্তির প্রয়োগ তিনি সমর্থনই করেছেন। কাপুরুষতার চেয়ে নিষ্ঠুরতাই তাঁর কাছে বরণীয় ব'লে মনে হয়েছে। তা ছাড়া, মানুষের মুক্তির আর একটি দিক তিনি কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন। আমরা পূর্বেকার পর্যায়গুলিতে, অচলায়তন রাজা এবং গীতালি প্রভৃতির আলোচনায় দেখেছি যে কবির উপলব্ধ অরূপ, যিনি সৃষ্টির দ্বৈতলীলার মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করছেন, যিনি যুগ-পরিবর্তনের মুখে অন্যায় ও পাপকে নিঃশেষে দূর করবার জন্যে গুরুর বা ঠাকুরদার মাধ্যমে অবতীর্ণ হন—তিনি বাস্তব সংগ্রামের মধ্যে যোদ্ধৃবেশেই আসেন। সুখ ও আরামের বন্দীত্ব এবং প্রথা ও আচারের বন্ধন ও নিপীড়ন থেকে মানুষকে উদ্ধার করবার জন্যে সংগ্রাম ও বিপ্লবের সার্থকতা উপলব্ধি কবির আর একটি বিশিষ্ট উপলব্ধি এবং সেই হিসাবে তাঁর অরূপ বা ঈশ্বর কেবল-সুন্দর নন, ভয়ংকর-সুন্দর। আর 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' মনে ক'রে অমানুষিকতাকে কঠোর হস্তে দমন করবার জন্যে যারা অগ্রসর হয় ও অকাতরে আত্মবিসর্জন দেয়, কবি মুক্তির মূল্যে তাদেরই অভ্যর্থিত করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের জীবন-উপলব্ধির সঙ্গে গান্ধীজীর জীবনদর্শনের পার্থক্যও তুলনা ক'রে দেখবার বিষয়। গান্ধীজী সংগ্রামের ক্ষেত্রে ব্যবহারিকভাবে সত্যাগ্রহ ও অহিংসা প্রয়োগ ক'রে আধুনিক কালকে বিস্ময়ান্বিত করেছেন। কবি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে সর্বপ্রথম এই আদর্শমূলক চরিত্র নিয়ে পরীক্ষা করেন। পরে পরিত্রাণ ও মুক্তধারার মধ্যে

একই চরিত্রের অনুবর্তন করেন। দেখা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের মুক্তিসংগ্রাম এবং গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন (১৩১৪-১৫ সাল) ঐ সময় স্বাধীনতাকামী সমস্ত ভারতবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করেছিল। এই আদর্শের সঙ্গে কবি তৎকালসুলভ স্বকীয় বাউল-ভাবাদর্শ মিশ্রিত ক'রে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র এঁকেছিলেন (১৩১৬ বৈশাখ), যদিও ঐ নাটকে রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের কোনো পন্থা তিনি ঐদিক থেকে নির্দেশ করেন নি, আর সাহিত্যের ব্যাপারে তা হয়ত করার কথাও নয়। কিন্তু আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই ধরনের চরিত্র পরে একেবারে বাউলধর্মী হয়ে পড়েছে (রক্তকরবীর 'বিশুপাগল' দ্রঃ) এবং কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধতার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন নি। মহাযুদ্ধই হোক আর আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামই হোক, কবি তাঁর বিশিষ্ট জীবনাদর্শের আলোকেই সব প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন এবং বাস্তব সংগ্রাম তাঁর কাছে মানবীয় মুক্তির বাণী বহন ক'রে এনেছিল, তুং—'ওরে দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ' প্রভৃতি (খেয়া), বলাকার সর্বনেশে, শঙ্খ, পাড়ি প্রভৃতি এবং শান্তিনিঃ ভাষণমালার পাপের মার্জনা, মা মা হিংসীঃ প্রভৃতি। দেখতে হবে, কার্যতঃ যে-কোনো অন্যায়কেই কবি হিংসা ব'লে মনে করেছেন, অন্যায়ের কঠোর বিরোধীতাকে হিংসা ব'লে স্বীকার করেন নি। নটীর পূজার 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' প্রভৃতি গানে অতিরিক্ত স্বার্থলিপ্সা বা বিষয়তৃষ্ণাকেই (জিঘাংসা ও মানবনিপীড়ন যার ফল মাত্র) কবি হিংসারূপে দেখেছেন। সুতরাং অন্যায়মূল হিংসার নিন্দা করলেও এবং ত্যাগধর্মের জয়গান করলেও মানবীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাস্তব সংগ্রামকে তিনি অভিনন্দিত করেছেন। এইখানেই গান্ধীজীর অহিংসাবাদের সঙ্গে কবির জীবনদর্শনের মিল দেখা যায় না। কবির মনোভাব কতকটা এই রকম : অহিংসা বৈরাগ্যমূলক ; জীবনধর্মে মানবীয়ত্বের সঙ্গে পূর্ণ বৈরাগ্যমূলক আদর্শ একাধারে স্থান পেতে পারে না ; যাঁরা জীবনকে গ্রহণ ও ত্যাগ ক'রে জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকেন তাঁরাই অহিংসার যথার্থ অধিকারী, সাধারণ মানুষ নয়। 'প্রশ্ন' কবিতাটিতে কবি এই মনোভাব সংশয়ের আকারে প্রকাশ করলেও কারো উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেন নি। জীবন-সংঘর্ষের এই মানবীয় বাস্তব দিকটিকে উপেক্ষা ক'রে যাঁরা কেবল ত্যাগের বাণী প্রচার করেছেন, তিনি স্বভাবতই তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মুখ্যত আশাবাদী কবি সামান্য যে-কয়েকটি ক্ষেত্রে সংশয় ও নৈরাশ্যের পথিক হয়েছেন তার মধ্যে 'প্রশ্ন' একটি উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত। বিপ্লবী তরুণদের উপর কবির গভীর সহানুভূতিই এর কারণ।

কবির এই জীবন-দর্শনের অনুসরণ করতে গিয়ে গীতার কর্মযোগের কথা মনে পড়ে এবং বারংবার উচ্চারিত কবির বাণীর সঙ্গে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের

সেই বাণীর একান্ত মিল দেখতে পাওয়া যায় যা দিয়ে মোহগ্রস্ত সংশয়াত্মা অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করছেন—

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

বলা বাহুল্য, স্বামী বিবেকানন্দ জীবন-দর্শনে বৈদান্তিক গোত্রের হ'লেও এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কবির অনায়াসেই মিল ঘটেছে। জীবনের সর্বতোমুখী বলিষ্ঠতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সাহসিকতা সন্ন্যাসীর মুখেও বারংবার প্রকাশিত হয়েছে। বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে অভিমতের সাদৃশ্যের কারণ বোধ হয় এই যে বিবেকানন্দ কার্যতঃ হেগেলীয় দর্শন অনুযায়ী জীবনাশ্রিত অরূপবাদী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নব্য হেগেলীয় ভাবুকদের অন্তরঙ্গতার কথা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে উপনিবেশবাদীদের বিপক্ষে স্বাধীনতাসংগ্রামের যে দিকটি উপস্থাপিত করেছিলেন তা-ও জীবনধর্মী সর্বতোমুখী বলিষ্ঠতার দিক।

কবি 'প্রশ্ন' কবিতায় যে-উত্তর দিয়েছেন পরবর্তী যুদ্ধ-সম্পর্কিত কবিতাগুলিতে ব্যঞ্জনায় তা জানিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে তা লিপিবদ্ধ করেছেন প্রান্তিকের পরিচিত 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস' প্রভৃতিতে।

পরিশেষের অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'ধাবমান' ('যেয়ো না যেয়ো না বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন'), 'মৃত্যুঞ্জয়' ('তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও। আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে, যাব আমি চলে'—শেষাংশ) এবং 'বিস্ময়' ('জানি এ দিনের মাঝে কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে'—শেষাংশ), 'যাত্রী' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় ফাল্গুনী-বলাকার পরিণত জীবনবোধের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কবির যে-উদার-মানবীয়তাবোধ তাঁর জীবনদর্শন থেকে পুষ্টিলাভ করেছে,—যা গীতাঞ্জলি, অচলায়তন থেকে আরম্ভ ক'রে মুক্তধারা রক্তকরবীতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েছে, তার পরিচয় অস্পৃশ্যতার প্রতিবাদে লেখা একালের কয়েকটি কবিতার মধ্যে রয়েছে। 'পুনশ্চ'র কাহিনী-আশ্রয়ী কয়েকটি কবিতায় মানবীয়তার এই দিকটির বিশেষ প্রকাশ। 'পরিশেষ'-এ এই শ্রেণীর একটি কবিতা ('জলপাত্র') স্থান পেয়েছে। সমকালে লেখা 'চন্ডালিকা' নৃত্য-নাট্যও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথ এদেশের পুরোহিততান্ত্রিক-সামন্ত-তান্ত্রিক জাতিবর্ণভেদের ঘোর প্রতিবাদী। এই সময় ইংরেজ সরকার

প্রস্তাবিত হিন্দু-মুসলমান ও বর্ণ-নিম্নবর্ণ-হিন্দু ভেদের ভিত্তিতে রাজনীতিক অধিকারদান কবিকে এদেশের মোল দুর্বলতা বিষয়ে পুনরায় সচেতন করে। 'অগোচর' কবিতাটির মধ্যে যাত্রী মানুষের অন্তর্বর্তী রহস্যের অপরিচয় কবিকে উতলা করেছে। মানুষের এই রহস্যময়তার কথা পরবর্তী কাব্যগুলিতে কয়েকটি কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে।

একালের উল্লেখ্য দু'টি নাট্যসৃষ্টি হ'ল 'কালের যাত্রা' ও 'তাসের দেশ'। 'কালের যাত্রা' সাহিত্যমূল্যের দিক থেকে নগণ্য, কিন্তু সমাজে ও রাষ্ট্রে শোষিত মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার গৌরবে অসামান্য। এতে ধনতান্ত্রিকতা ও সৈন্যসহায় রাষ্ট্রের অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়ে গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্ন প্রকাশ করেছেন কবি। 'এবার ফিরাও মোরে' রচনার সময় থেকে কবির যে মানসিকতার প্রারম্ভ, ১৯০৬-৭ খ্রীঃ থেকে প্রারব্ধ গ্রাম ও কৃষক সংগঠনে যার বাস্তব রূপ, মুক্তধারা-রক্তকরবীতে যার কাব্যময় পরিণাম, তারই সরলরেখায়িত স্পষ্ট প্রচারের রূপ ফুটল 'কালের যাত্রা'য়। আমাদের বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সপ্ততি বৎসরেও কবিচিত্তে রক্ষণশীলতার স্পর্শ তো নেই-ই, বরং ভাবীকালের আহ্বানে তিনি সবার থেকে অগ্রগামী। 'তাসের দেশ'কে অচলায়তনের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখতে হবে ভাবসংকেতের দিক দিয়ে। ভারতীয় চিত্তের বিমূঢ়তা এবং চিরাচরিত প্রথা-আনুগত্যের কলঙ্ককে তিনি এখানে শেষ কশাঘাত দিয়েছেন এবং উচ্চকণ্ঠে ভাঙন ও নবজীবনের বীরত্ববাণী শুনিয়েছেন। যদি রবীন্দ্রনাথের পরিণামী উপলব্ধিকে মন্ত্রের মত কোনো একটি বাণীতে সংগ্রথিত ক'রে শোনাতে হয়, তাহ'লে তা উপনিষদের কোনো মন্ত্র হবে না, হবে এই নাটকেরই উপসংহারে উদাত্তকণ্ঠে গীত—

জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্।

'পরিশেষ' এবং বিশেষভাবে 'পুনশ্চ'তে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি কবিতার রসের দিক থেকে যেমন হোক, রূপারোপের অভিনবতা। এ হ'ল অনুভূতির বাহনরূপে গদ্যছন্দের প্রবর্তন।

এ বিষয়ে কবি আধুনিক ইংরেজি কবিতার বন্ধনহীন ছন্দ (Vers libre বা cadenced prose) থেকে দৃষ্টান্ত এবং প্রেরণামাত্র পেয়েছিলেন, কিন্তু এর আদর্শরূপটি দেখেছিলেন বাঙলা কাব্যময় গদ্যে অর্থাৎ রূপকথার গদ্যে এবং কিছুটা বোধ হয় সংস্কৃত গদ্য-কাব্যে।

সংস্কৃতের কথাই প্রথম ধরা যাক। কবি তাঁর কাব্যজীবনের যৌবনে, বিশেষতঃ 'কল্পনা' রচনার সময়ে, সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রাকৃত বাঙলার মধ্যে উপযুক্ত শব্দালংকারময় সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণে রসানুকূল অপূর্ব ভাষাশৈলী গঠন করেছিলেন। তখন থেকে কী কবিতায় কী

সংগীতে যে ঐশ্বর্য ও রমণীয়তা পরিস্ফুট হ'ল বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যে তার তুলনা নেই। আর এখন গদ্যচ্ছন্দের পরীক্ষায় কবি যেন সংস্কৃত ভাষার গতিভঙ্গিমার আদর্শ স্মরণ করলেন।

হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের ও লঘুগুরু অক্ষরের পতন-উত্থান সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য এবং তা সংস্কৃত পদ্যচ্ছন্দের প্রাণস্বরূপ। সংস্কৃত পদ্যে যতির স্থান গৌণ হ'লেও তার সমাবেশের বৈচিত্র্যে স্বল্পমাত্রার লঘুচপল ছন্দ থেকে অধিকমাত্রার মন্থরগতি ও গাম্ভীর্যময় বিভিন্ন প্রকার ছন্দ আকার লাভ করেছে। সংস্কৃত গদ্যে অবশ্য যতির স্থান গৌণ নয়, প্রায় বাঙ্‌লা গদ্যের মতই প্রধান। উচ্চস্তরের সাহিত্যিক সংস্কৃত গদ্যে যতি-বিভক্ত নানা পর্বের সঙ্গে ভাবানুযায়ী বাক্যের সংকোচন-প্রসারণ, হ্রস্বদীর্ঘ স্বরবিন্যাসের কৌশল এবং অনুপ্রাসের উপযুক্ত ব্যবহার ভাষার রূপকে কিরকম রমণীয় ক'রে তুলতে পারে এবং সেই সঙ্গে কাব্যরসেরও সহায়ক হতে পারে তা সুকবি বাণভট্টের রচনা পড়লেই বোঝা যায়। বাহুল্য-ভয়ে সংস্কৃত পদ্য বর্জন ক'রে গদ্য থেকেই উদাহরণ উদ্ধার ক'রে সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গির স্বরূপটি দেখাতে চাই। বাণভট্ট প্রায়শঃ সমাসবদ্ধশব্দযুক্ত অতিদীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করলেও যতি ও ভাব-যতির নিপুণ ব্যবহারে বাক্যকে এমনভাবে নিয়মিত করেছেন যে শুধু পড়তেই একটি বিশেষ আনন্দবোধ হয় এবং স্টাইলের গুণে অর্থও দুর্বোধ্য থাকে না। সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যও যে কাব্য তা অনেকাংশে এই রূপচাতুর্যের জন্যে। যেমন ধরা যাক 'কাদম্বরী'র নিম্নলিখিত অংশ—

> একদা তু / প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলে / কমলিনীমধুরক্তপক্ষ-সম্পুটে / বৃদ্ধহংস ইব মন্দাকিনীপুলিনা // দপরজলনিধিতটমবতরতি চন্দ্রমসি / পরিণতরঙ্কুরোমপাণ্ডুনি / ব্রজতি বিশালতামাশাচক্রবালে।...

এই কবির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাক্যে স্বরবৈচিত্র্য এবং অভিপ্রেত যতি ও ছেদের সামঞ্জস্য দেখা যাক্—*

> শূন্যমিব মে / প্রতিভাতি জগৎ ॥ অফলমিব পশ্যামি / রাজ্যম্ ॥
> অপ্রতিবিধেয়ে তু বিধাতরি / কিং করোমি ॥ তন্মুচ্যতাময়ং দেবি /
> শোকানুবন্ধঃ ॥ আধীয়তাং / ধৈর্যে ধর্মে চ ধীঃ ॥ ধর্মপরায়ণানাং হি / সদা
> সমীপসঞ্চারিণ্যঃ / কল্যাণসম্পদো ভবন্তি ॥

কম মাত্রার পর যতিসমাবেশের দৃষ্টান্ত 'দশকুমারচরিত' থেকেও নেওয়া যাক—

> অনন্তরং চ কশ্চিৎ / কর্ণিকারগৌরঃ / কুরুবিন্দসবর্ণকুন্তলঃ /
> কমলকোমলপাণিপাদঃ /

---

* কেবল যতি স্থানে / এবং যতি ও ছেদের মিলন স্থানে ॥ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

সংস্কৃত গদ্যকাব্যের বা কবিত্বময় গদ্যের রূপ দেখা গেল। যতিপ্রধান বাঙ্‌লা গদ্যের সঙ্গে সংস্কৃতের এই ভঙ্গিটি তুলনা ক'রে দেখবার বিষয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যিক বাঙ্‌লায় যথাসম্ভব সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গির সাহায্য নিয়েই বাঙ্‌লা গদ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ছন্দোযুক্ত সংস্কৃত পদ্য কিন্তু বাঙ্‌লা পদ্যের সঙ্গে আত্মিক মিল ঘটাতে পারেনি। বাঙ্‌লায় সংস্কৃত বিভিন্ন পদ্যের অবিকল অনুকরণ সবক্ষেত্রেই কৃত্রিম হয়েছে। তবে সংস্কৃত ও প্রাকৃত গুরু বা দীর্ঘ অক্ষরের দু'মাত্রা উচ্চারণের রীতি প্রয়োজনমত বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রাচীন কাল থেকেই অনুসৃত হয়েছে এবং এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' থেকে উত্তরোত্তর চমৎকারত্বের সঙ্গে ক'রে এসেছেন। গদ্যচ্ছন্দের ক্ষেত্রেও ভাবের প্রকার ও আবেগের মৃদুতা বা তীব্রতা অনুযায়ী কবি কখনো কখনো গুরু ও দীর্ঘ অক্ষর সন্নিবেশ ক'রে তাদের অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছেন ঃ ফলে সংস্কৃত গদ্যের অন্তর্নিহিত ভঙ্গিটি ছাড়া রূপ-কৌশলও গদ্যচ্ছন্দে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে এ বিষয়ে একটু পরেই আমরা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

রবীন্দ্র-প্রদর্শিত গদ্যচ্ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল অনেক ক্ষেত্রে পদ্যের মতই ক্রিয়াপদকে বাক্যের শেষে না দিয়ে মধ্যে স্থাপন করা। গদ্যে বাক্যের মধ্যেই এইভাবে ক্রিয়াপদ স্থাপন করার আদর্শ আমাদের প্রাচীন রূপকথার ভঙ্গিতে রয়েছে। 'এক যে ছিল রাজা। তার ছিল সাত রানী' থেকে আরম্ভ ক'রে সুখদুঃখময় বিচিত্র আবেগের বর্ণনাগুলিতে ক্রিয়াকে মধ্যে রেখে বলার ভঙ্গি রূপকথার রসকে কিরূপ ফুটিয়ে তুলেছে তা সকলেরই সুবিদিত। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রূপকথাশ্রেণীর কয়েকটি রচনায়, এমনকি শিল্প-বিষয়ক লেখার মধ্যেও বাক্যের এই রূপকথা-ঢঙের প্রবর্তন করতে চেয়ে-ছিলেন। এইভাবে ক্রিয়াপদ সন্নিবেশের ফলে ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তি অবশ্যই বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ লিপিকার অনুভূতিময় গদ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম এইরূপ বাগ্‌বিন্যাস অবলম্বন করেছিলেন, যার ফলে সহজেই তা কাব্য হয়ে উঠেছে, যেমন—

এখানে নামল সন্ধ্যা ॥ (সূর্যদেব) কোন্ দেশে কোন্।
সমুদ্রপারে। তোমার প্রভাত হ'ল ॥
অন্ধকারে এখানে। কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা ॥
বাসরঘরের। দ্বারের কাছে। অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো ॥
কোন্‌খানে ফুটল। ভোরবেলাকার কনকচাঁপা ॥
জাগল কে ॥ নিবিয়ে দিল। সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ ॥
ফেলে দিল। রাত্রে গাঁথা। সেঁউতি ফুলের মালা ॥

লিপিকার এই ধরনের রচনাগুলি খাঁটি গদ্যচ্ছন্দই, কবির মতে, তখনকার ভীরুতার জন্যে তিনি কাব্যের অন্তঃপুরে এদের (অথবা, গদ্যের রাজপথে কাব্যকে) নিয়ে আসতে পারেন নি। ফলতঃ ধরে নেওয়া যায় যে রূপকথা-স্টাইলই গদ্যচ্ছন্দের মর্মমূলে রয়েছে।

মুখ্যত রূপকথার এবং গৌণভাবে সংস্কৃত কাব্যের আদর্শে গদ্যচ্ছন্দ গঠিত মনে করা গেলেও এখন প্রশ্ন হবে এর খাঁটি রূপটি কী বা গদ্যের থেকে এর পার্থক্য কোথায় ? মনে রাখতে হবে মিল বা অন্ত্যানুপ্রাসের অবিদ্যমানতাই যে এই ছন্দকে গদ্যধর্মী করেছে তা নয়, কারণ, মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রচ্ছন্দও তাহ'লে গদ্যচ্ছন্দ হ'ত। পয়ারের আট-ছয় মাত্রার নিয়মিত রূপকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত অমিত্রচ্ছন্দ বস্তুতঃ পদ্যচ্ছন্দই। খাঁটি গদ্যচ্ছন্দে মোটামুটি চার থেকে এগারো, এমনকি, তেরো পর্যন্ত সম-বিষম সমস্ত মাত্রার পর্বই ভাবানুযায়ী বিন্যস্ত থাকে দেখা যায়। এই সমস্ত অসমান মাত্রার পর্ব ও পঙ্‌ক্তিকে সমঞ্জসীভূত করছে একটি বিশেষ শক্তি যা কবিতার অন্তর্নিহিত রসের সঙ্গে একাত্ম। একে গদ্যে আরোপিত নূতন সুরধর্ম ব'লেও আমরা মনে করতে পারি।

কিন্তু যতিস্থাপনের বা পর্বের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সামঞ্জস্যের যে সুরটি গদ্যচ্ছন্দের প্রাণ, তা কবির অনুভূতিতে প্রথমে পরীক্ষামূলকতার কালে ধরা দেয়নি। কারণ, গদ্যচ্ছন্দে গোড়ার দিকে রচিত কয়েকটি কবিতার মধ্যে দেখা যায় যে যুগ্মমাত্রার এবং বিশেষভাবে ছয় আট মাত্রার পর যতিস্থাপনের ও ছেদস্থাপনের উপরেই কবির ঝোঁক বেশি। পরিশেষ কাব্যের 'আগন্তুক', 'জরতী', 'সাথী' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা লক্ষ্য করলেই একথা বোঝা যাবে। আমরা দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি, এদের চরণের শেষে ছেদ থাকুক বা না থাকুক যতি আছেই ; চরণের মধ্যে যতি থাকলে তা নির্দেশ ক'রে দিচ্ছি—

হে জরতী মহাশ্বেতা,	৮
দেখেছি তোমাকে	৬
জীবনের শারদ অম্বরে	১০
বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুভ্র / লঘু স্বচ্ছ মেঘে	৮+৬
(নিম্নে) শস্যে ভরা খেত দিকে দিকে,	১০
নদী ভরা কূলে কূলে,	৮
পূর্ণতার স্তব্ধতায় / বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সুগম্ভীর।	৮+১০
	(জরতী)
তখন বয়স সাত।	৮
মুখচোরা ছেলে,	৬

একা একা আপনারি / সঙ্গে হত কথা	৮+৬
মেঝে বসে	৪
ঘরের গরাদেখানা ধরে	১০
বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে	১০
বয়ে যেত বেলা।	৬

(সাথী)

এ যেন পয়ারের বা অমিত্রচ্ছন্দেরই নূতন আকারে চরণবিন্যাস। কবি তাঁর কাব্যজীবনের প্রথম যৌবনে 'মানসী' রচনার কালে 'নিষ্ফল কামনা' নামক একটি কবিতায় পয়ারকে প্রথম এইভাবে সাজাবার চেষ্টা করেছিলেন, পরে বলাকায় এই শিল্পরীতিকে পূর্ণতম অভিব্যক্তি দিয়েছেন। 'নিষ্ফল কামনা'র প্রারম্ভ দেখা যাক—

রবি অস্ত যায়।	৬
অরণ্যেতে অন্ধকার,/আকাশেতে আলো।	৮+৬
সন্ধ্যা নত-আঁখি	৬
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।	১০
বহে কি না বহে	৬
বিদায়বিষাদশ্রান্ত/সন্ধ্যার বাতাস।	৮+৬
দুটি হাতে হাত দিয়ে/ক্ষুধার্ত নয়নে	৮+৬
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে॥	১০

ছেদস্থাপন বিষয়ে কবির একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল। মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে অ-যুগ্ম মাত্রার পরেও ছেদ বিন্যস্ত হয়েছে, কিন্তু পাঠকেরা জানেন, পয়ার-জাতীয় প্রবহমান ছন্দে যুগ্মমাত্রার পর ছেদবিন্যাসের দিকেই রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা বিদ্যমান।

যাই হোক, প্রকৃত গদ্যচ্ছন্দে ছেদ ও যতির স্থাপনে কবিকে নিজের এতদিনের অভ্যস্ত রীতিও শীঘ্র উল্লঙ্ঘন করতে হয়েছে। এখন কবি ৪, ৬, ৮ এর সঙ্গে ৫, ৭, ৯, ১১, এমনকি ১৩ পর্যন্ত মাত্রাকে মুখোমুখি স্থাপন ক'রে যেন এক নূতন মন্ত্রে নকুল ও অহিকে একসঙ্গে খেলিয়েছেন। লক্ষ্য করতে হবে, অমিত্রচ্ছন্দের মত কবি ছেদকে সহসা কখনো পর্বের মধ্যে স্থাপন ক'রে বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেন নি, সচরাচর যতিপাতের সঙ্গেই ছেদ টেনেছেন, অথবা এমন বলাই অধিকতর সংগত যে, ছেদের ক্ষেত্রে যতিকে ছেদের বশবর্তী রেখেছেন; যেমন হয়ে থাকে সাধারণ গদ্যে। এই দিক থেকে ইংরেজি Free Verse এর Cadence বা এক একটি অর্থবিভাগের শেষের স্বরবিরতির সঙ্গে গদ্যচ্ছন্দ তুলিত হতে পারে। এখানেও ছেদযুক্ত অর্থ-বিভাগের অনুসারে বিন্যস্ত রীদমই ছন্দের নিয়ামক। যতি বা পর্ব-পর্যায়

বিভাগ রীদ্‌ম্‌-এরই অঙ্গ হয়েছে। ধরা যাক 'পুনশ্চ'র 'নাটক' কবিতার নিম্নলিখিত অংশ—

নাটক লিখেছি একটি।	৯
বিষয়টা কী বলি।	৭
অর্জুন গিয়েছেন স্বর্গে,	৯
ইন্দ্রের অতিথি তিনি/নন্দন বনে	৮+৫
উর্বশী গেলেন/মন্দারের মালা হাতে	৬+৮
তাঁকে বরণ করবেন বলে	১০

অথবা, ঐ কবিতায় যেখানে নিজের ছন্দ সম্পর্কে বলছেন—

বাইরে থেকে এ/ভাসিয়ে দেয় না/স্রোতের বেগে	৬+৬+৫
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ	১০
গুরুলঘু নানা ভঙ্গিতে।	৯
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,	১৩
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে,	১২
আর চলতিকালের চাঞ্চল্য।	১০

দেখা যায়, আমরা সাধারণ গদ্যের উচ্চারণে সম-বিষম মাত্রাভেদ না ক'রে যেমন যতি দিয়ে থাকি, সেই ভঙ্গিকেই কবি কলাকৌশলের দ্বারা বিশেষত্ব দিয়েছেন। প্রত্যাশিত স্বল্পমাত্রার পর্বকে একটু বিলম্বিত ক'রেও কবি তাঁর রসোদ্দেশ্য সাধন করেছেন। কিন্তু মনে হয়, দু'টি উপযতিযুক্ত ১৩ মাত্রার পর্বই সবচেয়ে বড় পর্ব হিসাবে গদ্যচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে গদ্য প্রয়োজনীয়তা-মুক্ত হয়ে রূপরসাত্মক যথার্থ কাব্যের অঙ্গীভূত হয়েছে। কবির মনোভাব অনুসারে যতি নিয়মিত হয়েছে ব'লেই গদ্যচ্ছন্দের যতি সম্পর্কে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম প্রণয়ন করা অসম্ভব। পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য কী পরিমাণ হবে তা-ও নির্ভর করছে কাব্যার্থের সংগতির উপর। কবিভাবনার সঙ্গে একচিত্ত হতে পারলে তবেই যেহেতু এর বিভিন্ন পঙ্‌ক্তির যতিস্থাপন এবং উত্থান-পতন ধরা সম্ভব, সেইহেতু, গদ্যচ্ছন্দের পাঠ সাধারণের পক্ষে পদ্যের মত সহজ হয় না। গদ্যচ্ছন্দের রচনাও শক্তিহীন কবির পক্ষে সহজ নয়, কারণ এর জন্য বাঙ্‌লা উত্তম গদ্যের উপর অধিকার থাকা চাই। 'শিশুতীর্থ' কবিতা যদি সুরধর্মী প্রবহমান গদ্যে লেখা প্রথম কবিতা হয় তাহলেও বুঝতে হবে, ভালো গদ্য লেখার নৈপুণ্যের উপর এই ছন্দোরীতি কী পরিমাণ নির্ভর-শীল। গদ্যচ্ছন্দের পাঠে যতি ঠিক কোথায় পড়বে এ বিষয়ে কবি পাঠকের রুচির উপরেও হয়ত বা যৎকিঞ্চিৎ অধিকার অর্পণ করেছেন। অনিয়মিত

বিভিন্ন পর্বের চলনে অভ্যন্তরীণ নিয়মের সুর কেমন সুন্দর ধ্বনিত হয়েছে তা অপেক্ষাকৃত কলাকৌশলপূর্ণ একটি অংশ থেকে দেখা যাক—

এতকাল আমার লীলা এই দেহে, ১৩
এর অণুতে অণুতে আমার নৃত্য, ১৩
নাড়িতে নাড়িতে ঝংকার, ৯
মুহূর্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙে, ১২
২
দীর্ণ হয়ে যাবে বাঁশি, ৯
২
চূর্ণ হয়ে যাবে মৃদঙ্গ, ১০
ডুবে যাবে এর দিনগুলি ১০
অতল রাত্রির অন্ধকারে। ১০

(চিররূপের বাণী)

কোন্ মন্ত্রে কবি এই বিশৃঙ্খল পদক্ষেপকে ঐক্যবদ্ধ করলেন, সাধারণ গদ্যকে কাব্যের গদ্যচ্ছন্দে উত্তীর্ণ ক'রে দিলেন, যার জন্যে এই শিল্পী কবির সম্পর্কে এ মন্তব্য চলল না যে, 'Prose is verse and verse merely prose' যার ফলে বলা হ'ল 'এ গদ্য, কিন্তু ঠিক গদ্য নয়'? কবির অনুভূতিই যদি গদ্যকে কাব্য ক'রে তুলেছে, একে নিয়মিত করেছে কোন্ শিল্পগুণে? কবি তাঁর গদ্যচ্ছন্দ সম্পর্কে আলোচনায় একে গতিলীলা বা মোটামুটি রীদ্‌ম্ ব'লে উল্লেখ করেছেন, যা শব্দার্থের অভ্যন্তরে অদৃশ্যভাবে সঞ্চরণশীল এবং কবিভাবনার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। বস্তুতঃ সাধারণ বাঙলা গদ্যের মধ্যেও যে রীদ্‌ম্ আছে, যা আমাদের কথা বলার সময় বিশেষ বিশেষ ভাবমুহূর্তে মাত্র উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তীক্ষ্ম অনুভূতিতে যার সাধারণ রূপটি সর্বপ্রথম ধরা পড়েছিল, গদ্যচ্ছন্দে তারই বিশেষ প্রকাশ। গদ্যচ্ছন্দ গদ্যই, সুরধর্মী গদ্য।

গদ্যচ্ছন্দের ভাব ও বৈচিত্র্য অনুসারে এই গতি কখনো সোজা পথ ধ'রে অগ্রসর হয়েছে, কখনো সম-বিষম ছোটবড় বিভিন্ন মাত্রার পর্বের বা পঙ্‌ক্তির আশ্রয়ে আন্দোলিত হয়েছে, আবার কখনো বা হলন্ত গুরু অক্ষর এবং আ, ঈ, উ প্রভৃতি স্বরকে দু'মাত্রার পর্যায়ে উন্নীত ক'রে রসানুকূল ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। একটা সাধারণ ভাগ ক'রে বলা যেতে পারে যে, কাহিনী বা আখ্যানআশ্রয়ী অথবা তত্ত্ববিবৃতিমূলক কবিতায় অলংকারহীন সরল কথ্য গদ্যের ভঙ্গি অবলম্বিত হয়েছে, আর যেসব কবিতায় কবির গভীর বিস্ময়বোধ বা অন্তর্নিহিত কোনো জিজ্ঞাসা বা নিগূঢ় আকূতি প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলিতে অলংকারময় চাতুর্যপূর্ণ বাগ্‌ভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে।

কবির ভাবাবেগই সর্বত্র মূল নিয়ন্তা শক্তিরূপে বিরাজ করছে। আমরা পূর্বেই ইংরেজি Free Verse বা Cadenced prose এর সঙ্গে এর সাদৃশ্যের কথা বলেছি। এখন বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট শক্তির দিক থেকে এর স্বরূপ নির্ণয় করলাম।

ভাষায় সাধারণের অতিরিক্ত সৌন্দর্যসম্পাতে গদ্যকাব্য কতদূর রমণীয় হতে পারে তা মোটামুটিভাবে মাত্রা নির্দেশ ক'রে (কারণ, এ বিষয়ে রুচি-অনুসারে একটু ইতর-বিশেষ হতেও পারে) দেখাতে চাই। মনে রাখতে হবে, কবি গুরু-অক্ষরকে সর্বত্র (অর্থাৎ কেবল মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অবশ্য-করণীয়তার স্থলেই নয়, অক্ষরমাত্রিক পয়ারজাতীয় ছন্দেও) একমাত্রার অধিক মূল্যের মর্যাদা দিতে চান। কবির এই খেয়াল পদ্যচ্ছন্দনীতির দিক থেকে বিভ্রাটের সম্মুখীন করলেও, দেখা যায়, অলংকারবহুল গদ্যচ্ছন্দে তাঁর ঐ ধারণার পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছেন। ঐ হিসাবে শব্দমধ্যবর্তী হলন্ত অক্ষরগুলিতে এবং অনেক সময় আ, ঈ প্রভৃতি স্বরগুলিতে একমাত্রার বেশি টান দিলে শ্রুতিমধুর হয়। আমরা মাত্রারক্ষণনীতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখেও শুধু পাঠের সৌকর্যের দিকটি দেখাচ্ছি। ঐ স্থানগুলিতে কেবল স্বরের ক্ষেত্রে মাত্রানিরূপণের জন্য ২ সংখ্যা ব্যবহার করছি। কোনো শব্দের শেষে হলন্ত ব্যঞ্জন থাকলে তার আশ্রয়ী অক্ষরটি সর্বত্র স্বভাবতঃ দীর্ঘ উচ্চারিত হয় ব'লে ঐ স্থানগুলিতে ২ সংখ্যা নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি। এই ছন্দের কাঠামোতে পঙ্‌ক্তির শেষে সর্বত্র যতি আছেই, মাত্র মধ্যেকার যতি নির্দিষ্ট হচ্ছে। যেমন—

দেখেছি / কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস ;

দেখেছি কম্পিত অধরে / নিমীলিত বাণীর
বেদনা ;
শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের / চকিত ঝংকার।

অথবা ধরা যাক, পত্রপুটের বিখ্যাত 'পৃথিবী' কবিতার নিম্নলিখিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

২ ২

অচল-অবরোধে আবদ্ধ / পৃথিবী, / মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,

২

গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে / ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,

২ ২

নীলাম্বুরাশির অতন্দ্ররঙ্গে / কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,

২ ২

অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, / অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা

পড়লে মনে হয় সংস্কৃত ভাষার কোনো বিখ্যাত কবি পৃথিবী সম্পর্কে বন্দনা-স্তোত্র রচনা করেছেন। এইরূপে অক্ষরমাত্রিক ছন্দেও কবি সংস্কৃত কাব্যের অনুরূপ ধ্বনিসৌকর্য ও লীলাভঙ্গিমাময় গতির সঞ্চার করতে পেরেছেন এবং কতকগুলি গভীর আত্মজিজ্ঞাসার কবিতায় উপনিষদের অনুরূপ গম্ভীরতাও এনেছেন।

মহাকবির যে শিল্প-প্রতিভা সংগীতে বিচিত্র কথা ও সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে, কাব্যে সংস্কৃত ধ্বনিগাম্ভীর্যের সঙ্গে কোমলা বঙ্গবাণীর পরিণয় ঘটিয়েছে, সংস্কৃত নাট্যরীতির সঙ্গে বাঙলা যাত্রারীতি মিশিয়ে নাটককে অভীষ্ট ভাবসংকেতের উপযোগী ক'রে তুলেছে, বিভিন্ন পদ্ধতির নৃত্যের সঙ্গে সংগীত ও কথার মিশ্রণে অথবা মূকাভিনয়ে বাঙালীকে অভিনব আর্টের আস্বাদন দিয়েছে, সেই প্রতিভাই কাব্যজীবনের সায়াহ্নে গতানুগতিকতার বিরোধী এই নূতন রূপসৃষ্টিতে কবিকে নিয়োজিত করেছে। তবে এর ব্যাপ্তির সীমা নির্ণয় বা মূল্য নিরূপণ করার দিন ঠিক আজও আসেনি। কারণ, এখনও দেখা যায় যে বিশ্বের উচ্চতম কাব্যসৃষ্টিতে গদ্য অপেক্ষা ছন্দেরই অধিকার এবং রবীন্দ্রের সুমহৎ সৃষ্টিগুলির স্বাক্ষর পদ্যচ্ছন্দেই নিহিত হয়েছে।

'পুনশ্চ' একালের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে এক হিসাবে পৃথক্। এর অনেকগুলি কবিতায় কবি সাধারণ মানুষের আনন্দ-বেদনাকে কাব্যের বিষয়ীভূত করতে চেয়েছেন—যার বাইরে আছে ক্ষুদ্র কাহিনী, সর্বত্র বিজড়িত আছে বাস্তবতাময় সহানুভূতি। রবীন্দ্রনাথের যে-কবিমানস অতুলনীয় ছোটগল্প-গুলির সৃষ্টি করেছে, তা-ই গদ্যচ্ছন্দের সুবিস্তৃত বাহন অবলম্বন ক'রে সহজেই কাব্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং বাস্তবতার মধ্যে বিচরণ করেছে। ছোটগল্পের নাটকীয় পরিণামও কয়েকটি কবিতায় লক্ষণীয়। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলি কাব্যাকারে ছোটগল্প হয়নি, এগুলির মধ্যে ঘটনার

বৈচিত্র্য এবং ঘটনার আঘাতকে বশীভূত ক'রে নায়ক-নায়িকার মনোবেদনা ও কবির কাব্যরস উচ্ছলিত হ'য়ে উঠেছে, যেমন ঘটেছে 'সাধারণ মেয়ে' বা 'বাঁশি' কবিতায়। প্রথমটিতে কবি একালের সমাজের অবহেলিত সেই নারীর বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন, যে শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লেই তার ন্যায্য অধিকার পায় নি, আর দ্বিতীয়টিতে বাইরের জীবনে ক্লিষ্ট অভাবগ্রস্ত সাধারণ মানুষের চির-অপূর্ণ মিলনস্বপ্নের অভিলাষ জানিয়েছেন—

এ গান যেখানে সত্য
'অনন্ত গোধূলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া,
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে তার
পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর।

শেষ চিঠি, ক্যামেলিয়া, ছেলেটা প্রভৃতি কবিতায় ঘটনার পরিসর অপেক্ষাকৃত বেশি হ'লেও এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শেষের দিকে ছোটগল্পের পরিণামী আঘাত অনুভব করা গেলেও, কাব্যরূপ বিচার ক'রে বলা যায়, কবি এগুলিকে কাব্যই করতে চেয়েছেন, গল্প নয়। এই দিক দিয়ে পূর্বেকার 'পলাতকা' রীতিমত কাব্য, প্রথার অবরোধে বেদনাময় অথচ নিসর্গাশ্রিত জীবন-উপলব্ধির বাসনায় কাতর—যে-বাসনা কবির নিজেরও, পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা হয়েছে মাত্র।

কবির সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে দেখার এই আগ্রহ মানুষকে অতিক্রম করে ইতর প্রাণী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অব্যবহিত পূর্বে 'বন-বাণী'তে কবির আত্মীয়তা প্রকৃতির ক্ষুদ্র জীব পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। একালে তারই প্রসার এবং তাদের জীবনরহস্যের মধ্যে প্রবেশ করার আগ্রহ দেখা যায়। পরবর্তী 'আকাশপ্রদীপ' এর পাখির-ভোজ ও বেজি, 'আরোগ্য'-এর চড়ুই পাখি, এবং আলোচ্য 'পুনশ্চ'র শালিখ, মাকড়সা, পিঁপড়ে, রাস্তার কুকুর, এমনকি গুবরে পোকা পর্যন্ত বিস্তৃত কবির সহানুভূতি একত্র মিলিয়ে একালের প্রীতিপ্রবণ ও তুচ্ছের প্রতি আগ্রহী কবি-মানসটিকে বুঝতে হবে। মাকড়সা ও পিঁপড়ে সৃষ্টির চৈতন্যপ্রবাহের সঙ্গে অবশ্য যুক্ত হ'লেও ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষাময় অন্তর কবির কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল, পুনশ্চতে কবির এই আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। জীবজগতের প্রতি যে-আত্মিক আকর্ষণের পরিচয় সোনার তরী, চৈতালি কাব্যে বহুপূর্বেই কবি অনুভব করেছিলেন তা পূর্বে-কার তীব্র ব্যাকুলতা ও কল্পনামূলকতা অতিক্রম ক'রে বনবাণীর মধ্য দিয়ে

এখানে এসে সহজ সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সঙ্গে নূতনভাবে প্রকাশ পেয়েছে মনে হয়, যখন শুনি এই কীটপতঙ্গের জীবনধারাকে লক্ষ্য ক'রে কবি বলেছেন—

ওদের নীরব নিখিলে এখনি উঠেছে কি
স্পর্শে স্পর্শে সুর, ঘ্রাণে ঘ্রাণে সংগীত,
মুখে মুখে অশ্রুত আলাপ,
চলায় চলায় অব্যক্ত বেদনা।

অথবা একক বিচরণশীল শালিখকে দেখে ভাবছেন—

জীবনে ওর কোন্‌খানে যে গাঁঠ পড়েছে
সেই কথাটাই ভাবি।

লক্ষণীয় বিষয় যে এই সময় কবির চিত্তে খাপছাড়া, অসাধারণ বা অদ্ভুতের প্রতি একটা আগ্রহ জেগেছে। তাঁর ছবি-আঁকার উৎসাহের মধ্যে এই ভাবটি সমধিক পরিস্ফুট হয়েছে। ছেলেটা, জাহাজের সেই অদ্ভুত লোক, বটেকৃষ্ট প্রভৃতির বর্ণনায় কবির এই মনোভঙ্গির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

কবির এই সময়কার উদার মানবীয় ভাবের মধ্যে যে বাস্তবতা বিদ্যমান তা তাৎকালিক অস্পৃশ্যতা-সমস্যা অবলম্বন ক'রে রবিদাস, রামানন্দ প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে প্রকাশলাভ করেছে। 'কালের যাত্রা' ও 'চণ্ডালিকা' নাটিকায় কবি এবিষয়ে তাঁর মনোভাবের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ চিত্রিত করেছেন। পরিণত জীবনবোধ থেকে উৎসারিত এই সহজ বাস্তব মানবপ্রীতির দিকটি সায়াহ্নের বিদায়ী কবির চিত্তকে স্বাভাবিকভাবেই আবিষ্ট ক'রে রেখেছে। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের অভিঘাত উল্লিখিত অস্পৃশ্যতা বিষয়ক কবিতাগুলিতে লক্ষণীয়। এই শ্রেণীর মানুষপ্রীতির কবিতানিচয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'প্রথম পূজা'। কবি তাঁর গভীর সহানুভূতি ও সমাজ-অধ্যয়ন নিয়ে লক্ষ্য করেছেন আর্যশ্রেণীগত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি কিভাবে অনার্য ও হীনবর্ণের সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ ক'রে ঐ হীনীকৃত মানুষগুলিকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করেছে তাদের নিজস্ব সম্পদ্‌ থেকে।

এ ছাড়া পুনশ্চতে আত্মজীবন অনুভবের কয়েকটি কবিতাও রয়েছে, যা থেকে পাঠক কবির বিশিষ্ট জীবনানুরাগ ও অবিচলিত প্রকৃতিপ্রীতির নিশ্চিত পরিচয় পাবেন। এই শ্রেণীর কবিতাগুলি কোনো কোনো অংশে তত্ত্বমূলক ও বিবৃতি-প্রধান হয়েও স্থানে স্থানে অনুভূতির স্পর্শে রমণীয় হয়ে উঠেছে। অনুভূতির প্রকাশ ও অনুভূতির বিবৃতির মধ্যে কবিধর্মের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রভেদ সামান্য থাকে এবং এক আধারে বিদ্যমান থেকে সহজেই একটি অপরটিকে বশীভূত ক'রে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারে। শেষ সপ্তক ও পত্রপুট

আলোচনায় আমরা এই দিকটির বিশেষ পরিচয় পাব। পুনশ্চের 'নূতন কাল, খোয়াই, বাসা' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা এই শ্রেণীর, এবং এগুলির মধ্যে 'নূতন কাল'এ কবি যদিও খ্যাতি-অখ্যাতির প্রশ্ন তুলেছেন, পুরাতন দিনের এবং নূতন দিনের কবিমানসের মধ্যে একটা সেতু স্থাপন করতে চেয়েছেন এবং তাঁর কাব্যের নূতন পালার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, যেমন—

দিনের শেষে নোতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে—

প্রভৃতি, তবু 'খোয়াই'-এ কবিমানসের চিরন্তন নিসর্গ-প্রীতি বিদায়ের কারুণ্যের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—

আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ
নিশীথরাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশের ওপার থেকে—
তার পরে?
তার পরে রইবে উত্তর দিকে
ঐ বুকফাটা ধরণীর রক্তিমা,
দক্ষিণ দিকে চাষের খেত,
পুর্বদিকের মাঠে চরবে গোরু। —ইত্যাদি

কবিতাটি স্বভাবোক্তিময় প্রকৃতির বর্ণনায় এবং চিত্রসৌন্দর্যের পরিবেশনে উল্লেখযোগ্য হয়েছে। 'বাসা' কবিতায়ও ময়ূরাক্ষীর কল্পনার মধ্য দিয়ে ('Yarrow Unvisited' তু°) প্রকৃতি ও মানব-প্রীতির সঙ্গে কবির চিরন্তনের ভাবনাহীন স্বপ্নবিলাস অর্থাৎ রোম্যান্টিক বাসনাই স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিওনি কোনো দিন।—
ওর নামটা শুনিনে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—
মনে হয় যেন ঘননীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।
আর মনে হয়,
আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

'কোপাই' কবিতায় কবির বর্তমানের সাধারণ-মানুষ-প্রীতি এবং 'খোয়াই'-এর সদৃশ নিসর্গসৌন্দর্যস্পৃহা মিলে গেছে। কবি একালের গদ্যচ্ছন্দের সঙ্গে কোপাইয়ের গতির ছন্দকে মিলিয়ে নিয়েছেন—

জলস্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।

আত্ম-মানস-বিবৃতির সঙ্গে যুক্ত কবির এই দার্শনিকতাবিহীন অনুভূতিময় কবিতাগুলি সহজেই কাব্যলোকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। 'ছুটির আয়োজন' তুচ্ছ ও অবহেলিত ইতর জীব ও দৃশ্যকে নিয়ে লেখা পুনশ্চর একটি অনবদ্য কবিতা। একদিকে পূজোর ছুটির হাওয়ায় মধ্যবিত্ত মানুষের রঙীন স্বপ্ন, অন্যদিকে ঘাতকের হাতে উৎসৃষ্ট ছাগকুলের আর্তকণ্ঠ, দুটি বিপরীত দৃশ্যের অবতারণা ক'রে কবি অনায়াসে করুণ রসে পাঠককে আবিষ্ট করেছেন।*

'পুনশ্চ'র ঐ রোম্যান্টিক মনোভাবের এবং তুচ্ছ নিসর্গবস্তু বা সাধারণ মানুষ নিয়ে লেখা কবিতা ছাড়া কবির ভাবাদর্শের প্রকাশক কয়েকটি কবিতাও এতে রয়েছে। যেমন 'বিচ্ছেদ' অথবা বিশ্বশোক' অথবা 'চিররূপের বাণী'। 'বিচ্ছেদ' কবিতায় 'মেঘদূত' কাব্যের ভাববস্তুকে নূতন আদর্শে ব্যাখ্যা করছেন যাত্রী মনোভাবের দিক থেকে। বিরহই মানুষের চিত্তে গৃহত্যাগের ও গতির প্রেরণা দিচ্ছে। বিরহী যক্ষ যেন অপূর্ণ। আর অলকাপুরীর মধ্যবর্তিনী বা সৌন্দর্যের পূর্ণতার প্রতীক নারী ঠিক অপূর্ণ নয়, তবু সেও প্রতীক্ষার বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। যক্ষের বিরহকে কবি অভিনন্দিত করছেন এইজন্য যে, বিরহে সে যাত্রী, তার মনকে প্রসারিত ক'রে দিয়েছে সুদূর বিশ্বে নদনদী-জনপদের মধ্য দিয়ে-রামগিরি থেকে অলকায়। প্রথম জীবনের রোম্যান্টিক সৌন্দর্যক্ষুধার সময় লেখা 'মেঘদূত' কবিতার সঙ্গে এই কবিতার পার্থক্য এবং সেই সঙ্গে গোধূলি-পর্যায়ের রবীন্দ্রমানসটিকে বুঝে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে 'সানাইয়ে'র যক্ষ কবিতার আলোচনাও দ্রষ্টব্য। 'বিশ্বশোক' কবিতায় আত্মজীবনবিবৃতির সঙ্গে কবি বলতে চাইছেন যে নিজ-দুঃখে বিমূঢ় অবস্থায় তাঁর বা কারোর পক্ষে কাব্য রচনা সম্ভব নয়। অভিলাষ জানাচ্ছেন যাতে বিশ্বদুঃখ তাঁর মধ্যে রূপ ধরে। এ না হ'লে কাব্য জন্মাতে পারে না। এটি কাব্যরচনা-তত্ত্বের আমাদের পরিচিত কথা। 'চিররূপের বাণী' কবিতায় ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ বস্তু বা জড় বা স্থূলের নশ্বরতা এবং ভাব বা চেতনা বা সূক্ষ্মের চিরন্তনতা প্রতিপন্ন করেছেন। সূক্ষ্ম যদিও স্থূলের মধ্যেই আবদ্ধ, যেমন সৌন্দর্য নৈসর্গিক বস্তুর মধ্যে, অথবা রূপ দেহের মধ্যে, তবু

* এ সব কবিতার শব্দ কাব্যসৌন্দর্যের পরীক্ষা করা হয়েছে "চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী" গ্রন্থে।

দেহের সঙ্গে অধিকারের সংগ্রামে রূপের জয় হচ্ছে, কণ্ঠের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হচ্ছে বাণী। রূপের সঙ্গে বাণীর মিলন হচ্ছে কাব্যকল্পলোকে।

'মানবপুত্র' এবং 'শিশুতীর্থ' কবিতা দুটিতে মানবতার মূর্তবিগ্রহ খ্রীস্টের আগমনকথা বলা হয়েছে। 'শিশুতীর্থ' (তাঁরই ইংরেজি রচনার অনুবাদ) কবিতাটিতে দেখানো হয়েছে যে ঐ মানুষশ্রেষ্ঠের আবির্ভাবের জন্য আপামর জনসাধারণকে তপস্যা করতে হয়েছে; অজ্ঞান, সংশয়, অবিশ্বাস, আত্মকলহ প্রভৃতির বাধাবিঘ্ন কঠোরতম দুঃখের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। কবিতাটিতে মানুষের এই দুঃখবরণের চিত্রটি বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং অভিযাত্রী মানুষের চরম প্রাপ্তির গৌরব প্রদর্শিত হয়েছে। বাধার সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের জয়যাত্রার বিষয়টি 'বলাকা'র 'ঝড়ের খেয়া' প্রভৃতি কবিতায় ও 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধের সমসূত্রে কল্পিত। 'মানবপুত্র' কবিতায় নিপীড়িত আর্ত মেহনতী মানুষের অকৃত্রিম বান্ধব এই কবির অশ্রুসজল বেদনার ছবি পাঠক পাবেন।

'তীর্থযাত্রী' এলিঅটের কবিতার অনুবাদ হলেও এর সঙ্গে রবীন্দ্রমনোভাবের একটা মৌলিক সাদৃশ্যও রয়েছে। প্রথাজর্জর শৃঙ্খলিত স্থিতিশীল জীবনযাত্রার চেয়ে দুঃখময় মৃত্যুতাপদগ্ধ জীবনই যাত্রীদের কাছে বরণীয় হয়েছে।

অল্প পূর্বে আমরা নির্দেশ করেছি যে গীতিকাব্যে আত্মজীবনবিবৃতি এবং ক্ষণিক মুহূর্তের আত্ম-অনুভূতির মধ্যে ব্যবধানের সীমা টানা দুষ্কর। এ ধরনের কবিতার একটি বিশেষ মূল্য আছে, তা এই যে, এগুলির সহায়তায় পাঠক অতি সহজে এবং প্রায় নির্ভুলভাবে কবিমানসের রহস্যলোকে প্রবেশ করতে পারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাব্যরসের অপ্রতুল ঘটলেও সৃষ্টি-ক্রিয়ানিপুণ কবির মনোরাজ্য দর্শনের বিস্ময় থেকে বঞ্চিত হয় না। 'শেষ সপ্তক' পাঠের পূর্বে আমাদের এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আমরা 'পুনশ্চ'তে কবির নিরাসক্ত নিসর্গপ্রীতি ও জীবনপ্রীতি পেয়েছি, বাস্তব ও অনাদৃতের প্রতি অনুরাগ পেয়েছি এবং বিদায়কালে উদাসীন মহাকালের লীলার সঙ্গে কবির নিজ জীবনকে মিলিয়ে নেওয়ার আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। এ সমস্তই শেষ সপ্তকে আত্ম-জীবনবোধের সঙ্গে আরো প্রবলভাবে, চড়া সুরেই প্রকাশ পেয়েছে। সায়াহ্নেও রসতৃষায় অধীর, কামনাহীন বিশুদ্ধ আর্টের উপভোগে আগ্রহশীল নির্লিপ্ত কবিমানসকে এতটা সমগ্র ও ব্যাপক-ভাবে সহজে জানার অবকাশ ইতিপূর্বে আর হয়নি। জীবনস্মৃতির বাহক অথচ পরিণত জীবন-উপলব্ধিতে স্থির ও মহাকাশ-রহস্যানুসন্ধানী কবিসত্তার নিঃশেষ পরিচয়ও একমাত্র শেষসপ্তক, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

সমকালের লেখা 'বীথিকা'তেও কবির জীবনচিত্র রয়েছে, কিন্তু তা

প্রায়শই বহু পূর্বেকার রোম্যান্টিক কাব্য-স্মৃতিতে পূর্ণ। এর কয়েকটি কবিতায় সোনার-তরীর অমানবী বিদেশিনীর পদধ্বনিও শোনা যায়। 'কৈশোরিকা' কবিতাটিতে স্পষ্টতই পূর্বতন নিরুদ্দেশ-যাত্রার সহচরী এবং শেষ জীবনের লীলাসঙ্গিনীর চিত্র এঁকে কবি একালেও আমাদের অপ্রত্যাশিত বিস্ময় এনে দিয়েছেন। কিন্তু পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন, এই সময়কার শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলি পদ্যের চেয়ে গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশের জন্যই অধিকতর আগ্রহশীল। বীথিকার প্রথম মুদ্রিত কবিতাটিতে আমরা একালের কবিচিত্তের একটা মোটামুটি পরিচয় লক্ষ্য ক'রে শেষ সপ্তকের বিশ্লেষণমুখী বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রবেশ করব। কবিতাটির নাম 'অতীতের ছায়া', আত্মজীবন-অনুভূতি এর রসবস্তু।

> মহা-অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি—
> দিবালোক অবসানে তারালোক জ্বালি
> ধ্যানে যেথা বসেছে সে
> রূপহীন দেশে ;

'সে' আখ্যায় অভিহিত বৃহত্তর মানবজীবনের বা সমগ্র সৃষ্টির শিল্পী এখানে কবির লক্ষ্যীভূত হয়েছে। পূর্বে কবি যাকে মহাকাল বলেছেন, বলাকা-পুরবীতে জীবনের অবিরাম গতির মুখে যাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, স্বকীয় বিদায়ের যাত্রা-মনোভাবের মধ্যে সেই নিরাসক্ত কালকেই বার বার লক্ষ্য করেছেন—

> শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়
> নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়,

এবং অধুনা নিজ জীবনে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করেছেন—

> তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে
> আমার আয়ুর ইতিহাসে।

তা ছাড়া চিররূপাসক্ত কবি অতীতের বিশ্বোপলব্ধির সঙ্গে বর্তমানের আত্ম-সংবৃত অবস্থার পার্থক্য জানাচ্ছেন—

> রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
> গোধূলিধূসর আবরণে,
> অতীতের শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।

'শেষ-সপ্তকে'র কয়েকটি কবিতা একই সময়-পরিসরে লেখা পুরানো ছন্দোবন্ধ কবিতাগুলিরই গদ্যচ্ছন্দময় রূপান্তর মাত্র, এমন কথা বললে ভুল হবে। পাঠক তুলনা ক'রে দেখবেন এগুলি পুরাতনের নবীকরণ নয়, প্রায় নূতন এবং সুন্দরতর সৃষ্টি। যেমন ২, ৩, ৪, ৭, ২১, ২৬, ২৭

প্রভৃতি। এর থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে কবিমানসের শিল্পগত প্রকাশ একালে অলংকৃত এবং সুরধর্মী গদ্যবিন্যাসের মধ্যে যেমন সমাহিত হতে চেয়েছে তেমন পুরাতন ঢঙে নয়। গদ্যচ্ছন্দের আকর্ষণ উত্তম গদ্যনির্মাণের উপর কী পরিমাণে নির্ভরশীল তা এই কবিতানিচয়ের পাঠক স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারবেন। তা ছাড়া এও পরিস্ফুট হয়েছে যে অনুভূতি বা ভাবের উপরেই কাব্যস্বরূপ নির্ভর করে না, কবিকৃতির বৈশিষ্ট্যেই কাব্য অপরূপ হয়ে ধরা দেয়। শেষ সপ্তক সেই অপরূপত্বের ঐশ্বর্যে মণ্ডিত কবির গোধূলিবেলার স্বপ্ন-উপহার কবিকৃতির দিক থেকে পূর্বেকার যে-কোন কবিতাগ্রন্থের সমকক্ষ।

'শেষ সপ্তকে'র কয়েকটি কবিতাতেই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত কালচক্রকে কবি সত্যদ্রষ্টার মত প্রত্যক্ষ করছেন, যেমন করেছেন 'বলাকা'র কালে। বিশেষ এই, এর সঙ্গে কবি বর্তমানে তাঁর জীবন-বীণাকে নিঃশেষে মিলিয়ে নিতে চান। কবি দেখেছেন তাঁর চারদিকে প্রয়োজনের এবং খ্যাতির উপকরণ জড় হয়েছে। লোকে তাঁর অন্তর্নিহিত মুক্ত নির্লিপ্ত কবি-প্রতিমাকে না দেখে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই চিনেছে। এর ফলে লৌকিক জীবনে 'বাইরের আমি' নানা জালে জড়িত হয়ে পড়েছে। প্রয়োজন-সম্পর্কে যুক্ত ব্যক্তিত্বের এই দিকটি কবি পূর্বেও বহুবার বেদনার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। যখনই অভ্যাসের জীবনে তাঁর চৈতন্য সংকুচিত হয়েছে তখনই আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করেছেন—যে-আত্মার পরিচয় শুধু কবিত্বে, শুধু অনুভূতিতে বা প্রজ্ঞানমূলক উপলব্ধিতে।

শেষ সপ্তকের বিজ্ঞান-নির্ভর সাত সংখ্যক কবিতায় সৃষ্টি ও প্রলয়ের ইতিবৃত্তের কল্পনার মধ্যে কবি প্রার্থনা করছেন, "হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।" এই মনোভাবই বৈজ্ঞানিকতা-যুক্ত কবিকল্পনার সঙ্গে একুশ সংখ্যক কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাটি নভোবিজ্ঞান-ভিত্তিক, বিশেষতঃ আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব-নির্ভর। এতে মহাকাশ-পরিস্থিতির সঙ্গে পার্থিব পরিস্থিতির তুলনা করা হয়েছে। অসীম মহাকাশের অসীম দেশকালের মধ্যে পার্থিব সৃষ্টি ও পার্থিব কীর্তিকে স্থাপন ক'রে কবি দেখলেন মহাকাশীয় নিমেষ-মধ্যে এখানে কত কাল ধ'রে ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার পরিচয় বারে বারে লুপ্ত হয়ে গেছে—

ভেঙে পড়েছে যুগের জয়স্তম্ভ,
নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য,
বিলীন হয়েছে আত্মগৌরবে স্পর্ধিত জাতির ইতিহাস।

সেই অসীমকালের মধ্যে অধুনা-আত্মবিচারক কবি নিজেকে মুহূর্তের জন্য প্রতিফলিত ক'রে বুঝলেন যে কাব্যকীর্তির দ্বারা নিঃশেষ অমরত্ব লাভ করা

অসম্ভব এবং তার আশা মূঢ়, অর্থহীন। কিন্তু আত্ম-অনুভূতির মধ্যে যে পাওয়ার সত্য রয়েছে তা মুহূর্তের হ'লেও নিজ জীবনের দিক থেকে তার মূল্য চিরন্তন, তা অমর, যেহেতু তা সীমার অতীত। কবি বলছেন—

অমরতার আয়োজন
শিশুর শিথিল মুষ্টিগত
খেলার সামগ্রীর মতো
ধূলায় প'ড়ে বাতাসে যায় উড়ে।
আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে ?
কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার ক'রে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।

পরবর্তী পত্রপুট কাব্যে দেখা যাবে জীবনবিবৃতির সঙ্গে কবি কখনো স্তব্ধ হয়ে নিরাসক্তভাবে ঋতুপর্যায়ের আবর্তন প্রত্যক্ষ করছেন এবং স্বীয় বৈরাগী চিত্তের মধ্যে কালের পদক্ষেপ গ্রহণ ক'রেও রসোপলব্ধি এবং যাত্রাকে একত্র মিলিয়ে নিতে পেরেছেন। সেখানেও প্রকৃতি-রসবিহ্বলতার উপসংহারে কবি বলছেন—

সেই সুরে তাম্রবরণ তপ্ত আকাশে
বাতাস হুহু ক'রে ওঠে,
সে যে বিদায়ের নিত্যভাঁটায় ভেসে-চলা
মহাকালের দীর্ঘনিঃশ্বাস,
যে কাল, যে পথিক, পিছনের পান্থশালাগুলির দিকে
আর ফেরার পথ পায় না
একদিনেরও জন্য

এ হ'ল চলার সঙ্গে যুক্ত কবির বাসনাহীন মর্ত্য-উপলব্ধি—ফাল্গুনীর কাল থেকে প্রসারিত, সার্বজনীনত্ব থেকে ব্যক্তিত্বে আবদ্ধ বিষাদময় প্রত্যক্ষ সত্য। যাত্রা ও স্থিতির, বৈরাগ্য ও ভোগের যে অদ্ভুত সমন্বয় কবি তাঁর পরিণত কল্পনায় ঘটিয়েছেন, শেষ জীবনে ব্যক্তিগত পাথেয়রূপেও তাঁকে সেই মনোভাব অবলম্বন করতে দেখি। বিষণ্ণ কবিকে মুগ্ধ করছে যাত্রার মধ্যেকার রসোপলব্ধি, অনিত্যের মধ্যে যা নিত্য—

এই নিত্য-বহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল

শেষ সপ্তকে কবি বিশেষ জোরের সঙ্গে তাঁর কবিস্বরূপটি পাঠকদের গোচর করতে চান। নাম নয়, কীর্তি নয়, এমনকি অসংখ্য রচনার মধ্যে বিজড়িত তাঁর খণ্ড ছিন্ন নানা রূপ নয়, কেবল তাঁর অনুরাগের দিকটিই যে একান্ত সত্য সেই কথা জানাতে চান। ছয় সংখ্যক কবিতায় খ্যাতি, অখ্যাতি, প্রয়োজন, অভ্যাস, সমস্ত কিছু বাইরের বস্তুকে তিনি কালের ধূলির নিকটে নিঃশেষে সমর্পণ করেছেন, শুধু করেননি তাঁর অনুভূতির স্বপ্নময় সত্য-মুহূর্তগুলিকে। যে মুহূর্তে—

সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল
চকিত পদে।

তাঁর এই কবিস্বরূপকে লৌকিক প্রয়োজন-কোলাহল থেকে মুক্ত অবস্থায় দেখার আগ্রহ এই কাব্যে বার বার প্রকাশিত হয়েছে। তাই যে-সব মানুষ তাঁর সাময়িক ও অস্থির বাইরের ব্যক্তিত্বকেই বড় ক'রে দেখেছে, চিরকালের কবি-স্বরূপকে দেখার বাসনা বোধ করেনি, তাদের কাছে কবি শেষ নিবেদনে জানিয়েছেন—

সেই ধুলোর উদাসীন বেদীটার সামনে
রেখে যেয়োনা তোমার নৈবেদ্য ;
ফিরে নিয়ে যাও অন্নের থালি,
যেখানে তাকিয়ে আছে ক্ষুধা,
যেখানে অতিথি বসে আছে দ্বারে,
যেখানে প্রহরে প্রহরে বাজছে ঘণ্টা
জীবনপ্রবাহের সঙ্গে কালপ্রবাহের
মিলের মাত্রা রেখে।

অন্য একটি কবিতায় সাধকের মতই কবি দেহ ও লৌকিক মনের সঙ্গে তাঁর কবি-আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি করেছেন—যে কবি-আত্মা চিরন্তন, নির্লিপ্ত এবং বিশুদ্ধ আনন্দলোকে উত্তীর্ণ। কবিতাটি তত্ত্বমূলক হ'লেও উপসংহারে কবির আত্ম-অনুভবের উৎসাহ স্টাইলের গুণেই কাব্যরাজ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে—

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।

নয় সংখ্যক কবিতাতেই কবির আত্মরহস্য-অনুসন্ধানের দিকটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সে রহস্য কবির নিজের কাছেই পরিস্ফুট হ'ল না,

বাইরের মানুষের কাছে কেমন ক'রে হবে ? কারণ, কবি অনুভব করছেন, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে সীমাহীন অব্যক্ততা রয়েছে আর সেই মর্মমূল থেকেই বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপরিমেয় বাসনা, অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা। বাইরের সমালোচক ও জীবনীকারদের এ রাজ্য অনধিগম্য—'যারা বলছে 'জানি' তারা জানে না।" কবিতাটি আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রভাবিত। পুরবীর আহ্বান, কণিকা প্রভৃতি কবিতার সঙ্গেও ভাবের দিক থেকে এই কবিতাটি তুলনার যোগ্য। শুধু তাই নয়, এই কবিতাটি পূর্বোক্ত কবিতাগুলির বা কবির আত্মরহস্য-অনুসন্ধান বিষয়ক সমস্ত কবিতার পরিপূরক ব'লেও গৃহীত হতে পারে। পূরবীতে কবি অপূর্ব কাব্যানুভূতির মধ্যে আক্ষেপ জানিয়েছিলেন—

জানি জানি, আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতিলগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিনি।……
অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।

ঐ আক্ষেপকেই অবচেতন মানসিকতার সঙ্গে মিলিয়ে প্রকারান্তরে প্রশ্নরূপে এই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন—

সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হ'ল ?
ভাষার অঞ্জলিতে
কে ধরতে পারে তাকে ?

অথবা,

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে ?

বিশেষ এই যে, এই কবিতাটিতেই কবি পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করলেন যে আত্ম-রহস্যের সম্যক্ পরিচয়লাভ অসম্ভব, কারণ, হয়ত বা স্রষ্টার নিষেধ আছে--

অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী ;
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুন্ঠনে,
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে ;
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।
আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি,

তাই আমাকে বেষ্টন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা ;

তা হ'লে কি একে বিজ্ঞানসত্যেরও উর্ধ্বেকার সেই বহুকথিত 'মায়াশক্তি' বলা যাবে ? কিন্তু প্রশ্ন যাই হোক না কেন, কবির এই জিজ্ঞাসা যে দার্শনিক আত্ম-জিজ্ঞাসার সগোত্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শেষ সপ্তকের এই কবিতাগুলিকে আত্মজীবনবিবৃতি ব'লে দূরে রাখলে চলবে না, কারণ এগুলিতে কবি তাঁর নিজ সত্তাকে জানতে চান ও জানাতে চান। বোঝাতে চান যে তিনি শুধু কবি, তিনি কোনো ধর্মের অনুসরণ করেন না, কোনো শাস্ত্রেরও নয় এবং তিনি কোনো বিশেষ যুগের নন, এমন কি আধুনিক কালেরও নন। আর এগুলিতে তত্ত্ব যা আছে তা কবির অনুভূতির বা অনুভূতিমিশ্রিত চিন্তার, অর্থাৎ কাব্যতত্ত্ব, মানসিকতার স্বরূপ সন্ধান ; নীতিতত্ত্ব নয়। কবি তাঁর আত্মবিবৃতিতে এই সংস্কারমুক্তির দিকটি পত্রপুটের পনেরো সংখ্যক কবিতায় (কবি আমি ওদের দলে,—আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন—ইত্যাদি) পরিস্ফুট ক'রে ব্যক্ত করেছেন, কবির ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত আলোচনায় যে বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

শেষ সপ্তকে কবি বারংবার তাঁর রহস্যালোলুপ আস্বাদমুখী চিত্তের কথা বিবৃতিতে জানিয়েছেন, কবিতার মধ্যেও প্রমাণ করেছেন। চোদ্দ সংখ্যক কবিতায় অনুভবের মুহূর্তটিকে চরম মূল্য দিয়ে কবি বলেছেন—

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
তা গৌণ।

একদিকে তাঁর ভারবহুল অসাড় লৌকিক মনকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন—

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত ;
চারিদিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল ;
অসীমের অবকাশকে খণ্ড খণ্ড ক'রে
ভিড় করেছে তারা
উৎকণ্ঠ কোলাহলে (২৬ সং)

আর একদিকে তাঁর সুদূরের পিপাসু আত্মার কালহীন চিরন্তনতাকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন—

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন ক'রে নিয়ে যায়
সুদূরে ;
বর্তমানের মুহূর্তগুলিকে
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়। (ঐ)

অথবা নিজের চিরন্তনের কবিরূপ দেখে দেশকালের অতীত পথিক জীবন-সায়াহ্ন এবং আধুনিক কালকে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়ে চলেছেন—

আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি, দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য। (২৩ সং)

কবি পরিপার্শ্বের অনিত্যতা ও উপলব্ধির নিত্যতা স্মরণ ক'রে বলছেন—

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।

দেখা যায়, সায়াহ্নকালে মহাকাশ-রহস্যমুখী কবির এই আত্ম-অধ্যয়নে অবস্থায় প্রয়োজনের জগৎ তাঁর কাছে অনিত্য বা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। গোধূলি-পর্যায়ে কবির এটিও একটি বিশিষ্ট রূপ।

এই কাব্যগ্রন্থে কবির তত্ত্বস্পর্শহীন, স্বাধীন কবিমনের উপলব্ধিগত মুহূর্তের কয়েকটি অবিনশ্বর পরিচয় রয়েছে জলভরা, শুকতারা, অনেক কালের একটিমাত্র দিন প্রভৃতি সম্পর্কিত কবিতায়। বলা বাহুল্য, ভাবুকতা ও স্বপ্নচারীতার পরিচয়ে এগুলির আকর্ষণ নয়, কারণ তা পূর্ববর্তী রবীন্দ্র-কবিতায় বহুল পরিদৃষ্ট। এগুলির মূল্য নির্ভর করছে শব্দার্থের আশ্চর্য রমণীয় গ্রন্থনের উপর, গদ্যচ্ছন্দে রচনার উৎকর্ষের উপর। 'জলভরা' কবিতায় কবি প্রকৃতিকে স্ব-ভাবে গ্রহণ ক'রে একালেও পূর্বেকার মত অহেতুক-আনন্দের মুক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন দেখে তাঁর কবিমানসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংশয়রহিত হওয়া গেল। আরো আনন্দ পাওয়া গেল ফাল্গুনীর বাউলের সঙ্গে কবির এখানেও একাত্মতা লক্ষ্য ক'রে (৪১ সংখ্যক দ্রঃ)। ৪৩ সংখ্যক 'পঁচিশে বৈশাখ' নামক কবিতায় কবি তাঁর কাব্যজীবনের নিঃশেষ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি একদিকে বিশুদ্ধ আনন্দে জীবন্মুক্তির প্রয়াসী, আর একদিকে জন্মজন্মান্তরের যাত্রী। এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে। 'শুকতারা' কবিতায় আধুনিক বিজ্ঞানের সত্য বিবৃত ক'রে এর সঙ্গে আমাদের লৌকিক সম্পর্কের মনোজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। একালের প্রণয়-স্মৃতি-চারণার কবিতা পরিবেশনেও শেষ-সপ্তকের দান খুব সামান্য নয়। এবং বলতে গেলে কাব্যিক আকর্ষণের দিক দিয়ে এগুলিই শেষ সপ্তকের সহজ রম্যতার কবিতা। যেমন প্রথম তিনটি এবং তেরো-চোদ্দ-একত্রিশ প্রভৃতি সংখ্যার। এর কোনোটিতে ক্ষণিকের প্রণয়-স্পর্শে চিরন্তন দোলার অনুভব, কোনটিতে বা রোম্যান্টিক রহস্যের অনুসন্ধান। এগুলির কোন্‌টি কাকে লক্ষ্য ক'রে লেখা তার আলোচনায় লাভ নেই, শুধু এতেই আমাদের পরিতৃপ্তি, যে, কবি বিচিত্র অনুভবময় তত্ত্বজিজ্ঞাসার যবনিকার একটা কোণ অপসারিত ক'রে আমাদের পরিচিত করেছেন তাঁর একান্ত লৌকিক

অনুরাগের কাহিনীর সঙ্গে। নিবিষ্ট করেছেন খুব-গভীর-নয় এমন বিরহ-বিষাদে জড়িত কোনও স্মৃতিস্বপ্নে—'অনেক কথার মধ্যে মনে পড়ছে ছোট একটি কথা।'

কিন্তু শেষ সপ্তকের কাব্যগত আকর্ষণের মূলে শব্দার্থের প্রকাশময় চারুতা, এর প্রৌঢ়িময় বাগ্‌ভঙ্গিমাই কাজ করেছে এমন কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। বলা যেতে পারে সীমিত, সংহত, সংক্ষিপ্ত, অলংকৃত—বাঙলার সর্বোত্তম গদ্যের নিদর্শন এর অধিকাংশ কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে। যথাযথ এবং বক্র বিশেষণ প্রয়োগ গদ্যের সৌষ্ঠববর্ধনে সাহায্য করেছে এবং সব মিলিয়ে দীপ্তি-কান্তিময় যে ক্লাসিক্যাল ধর্ম ফুটে উঠেছে তার তুলনা গদ্যছন্দের অন্য কোনো কাব্যে একত্র দেখা যায় না। একালে গদ্যছন্দের মধ্যেই তাঁর স্টাইলের সম্যক্ স্ফূর্তি-প্রবণতার জন্য তিনি প্রথমে পদ্যচ্ছন্দে লেখা কয়েকটি কবিতাকে গদ্যচ্ছন্দে রূপান্তরিত করেছেন একথা পূর্বেই আমরা বলেছি। কবির নূতন প্রৌঢ়-উক্তির নিরবকাশ মাল্যগ্রন্থন থেকে কিছু পাপড়ি উদ্ধার করলে দেখানো যায়—'প্রাণের আধখোলা জানালায়' 'কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক' 'বিস্ময়-উন্মনা নিমেষটিকে' 'ধ্বনিহীন বীণার' 'অব্যক্তের অনালোকে' 'স্বপ্ন-মৌমাছি' 'শস্যশেষ প্রান্তরে সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে' 'বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত এই আমার সমগ্র সত্তা' 'তারিখ-হারানো লোকালয়ের বিরাট কঙ্কাল' 'ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য' 'অসূর্যম্পশ্য নিভৃতে' 'সদ্য বর্তমানের অন্নপূর্ণার পরিবেশন এড়িয়ে যেয়ো না, মোহান্ধ' 'উড়তি ধুলোয় আকাশের নীলিমাতে ধূসরের আভাস' 'নিত্য-বহমান অনিত্যের স্রোতে' 'কাঙাল কল্পনার মরীচিকায়' 'আর এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে' 'যুগান্তরের ভস্মশেষের ভিত্তিছায়ায় ছায়ামূর্তি বাজিয়ে তুলছে রুদ্রবীণায়' 'দুঃসহ দুঃখের স্মরণতন্তু দিয়ে গাঁথা' 'আকাশে ভাসা বসন্তের নৌকায়'—ইত্যাদি। কবির শেষকালের লেখা কয়েকটি কাব্যের মধ্যে শেষ সপ্তককেই শ্রেষ্ঠ বলতে হয়। পুনশ্চতে কবির আকর্ষণ লৌকিক সহজ বাঙলায়, এখানে লৌকিক ইডিয়মকে ত্যাগ না করেও metaphor-মুখ্য অলংকরণ-সমৃদ্ধ বাঙলায়। মনন এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির এহেন সামঞ্জস্যও অন্যত্র দুর্লভ।

শেষ সপ্তকের আত্মবিশ্লেষণের দিকটি 'পত্রপুটে' প্রকটতর হয়েছে এবং কবি তাঁর বিশেষ উপলব্ধির মুহূর্তগুলির একটা মানসিক চিত্র উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। সাহিত্য-তত্ত্ব সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে কবি রসচেতনা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার যোগ্য। কবির নিসর্গ-অনুভূতি যে একটি সত্যের উপলব্ধি তা জানাতে গিয়ে কখনো বলেছেন—

এই রসনিমগ্ন মুহূর্তগুলি
আমার হৃদয়ের রক্তপদ্মের বীজ,

রসবিহ্বলতায় কবিমানসে যে লৌকিকতা-মুক্ত আনন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ হয় কখনো তার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। এ হ'ল কবির অনির্বচনীয়কে বচনীয় করার চেষ্টা—

যেন চলে গেলেম পৃথিবীর কোনো প্রতিবেশী গ্রহে
তাকে দেখা যায় দূরবীনে।
যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হ'ল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ ক'রে।
ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হ'ল, বিরাট হ'ল, সম্পূর্ণ হ'ল
আমার চেতনায়।

পূর্বেকার সোনার-তরী চিত্রা চৈতালির নিসর্গসম্পর্ক কাল্পনিক হয়েও কত-দূর আন্তরিক ("মর্ম তারে সত্য বলি জানে") তা এখানকার বর্ণনা মিলিয়ে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। আমরা তখনই ইঙ্গিত করেছি যে শিলাইদহ-অবস্থানে মাটি ও কৃষকের সঙ্গে একাত্মতার বাস্তব অভিব্যক্তি ও তাঁর কবিকল্পনা ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। এখন আরও বলা যায় যে তাঁর সৃষ্ট শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন সংগঠনও তাঁর মর্মগত আন্তরিকতার সূত্রেই নিবিড় সম্বন্ধ। তেরো সংখ্যক কবিতায় দেখা যায়, কবি তাঁর আনন্দানুভূতির আধাররূপ অন্তরিন্দ্রিয়গুলিকেই পত্রপুট আখ্যায় অভিহিত করছেন এবং ব্যাখ্যায় বলছেন—

আমি-বনস্পতির এরা কিরণপিপাসু পল্লবস্তবক,
এরা মাধুকরী ব্রতীর দল।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পনেরো-সংখ্যক কবিতায় আত্মবিবৃতিতে তিনি তাঁর সর্বসংস্কারমুক্ত কবি-স্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বলেছেন যে তিনি পৌরাণিক বা শ্রেণীস্বার্থমূলক ধর্ম, শাস্ত্র, আচার বা নীতির প্রভাবের ঊর্ধ্বে। এখানে স্পষ্টভাবে বাউল-শ্রেণীর সাধকদের সঙ্গে কবি নিজের মিল দেখিয়েছেন—

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
কবি আমি ওদের দলে,—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,

এই কবিতাটির কথা আমরা প্রয়োজনবশে বার বার উল্লেখ করেছি। মহাকবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও ব্যক্তিক সত্তার সামঞ্জস্য নির্ধারণকল্পে কবিতাটির মূল্যায়ন প্রয়োজনীয়।

পত্রপুটের আর একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে মানুষ-দেবতার প্রতি কবির শ্রদ্ধা অর্পণে। মানুষের প্রতি অনুরাগ, মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নর-দেবতার উপলব্ধি গীতাঞ্জলির কালে কবির অরূপ-উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়েছিল। তৎকালীন 'অচলায়তনে' কবির নবজাগরিত সমাজবোধ ও পরিস্ফুট মানবানুরাগের বাস্তব প্রকাশ মুদ্রিত রয়েছে। বলাকায় গতি ও অভিব্যক্তির অনুভবের মধ্যে দুঃখব্রত মানুষের জয়যাত্রার কল্পনা কবিকে কিরূপ অনুপ্রাণিত করেছিল তা 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার আলোচনাকালে আমরা দেখেছি। বাউলদের জীবন-সাধনার প্রতি কবির অনুরাগও ঐকালেই পূর্ণতালাভ করেছে। তা ছাড়া এই অনন্যসাধারণ মানবীয়তা **The Religion of Man** এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ দু'টিতে কবি তত্ত্বাকারে এবং আত্মজীবনবিবৃতির সহায়তায় পূর্বেই উপস্থাপিত করেছেন।

শেষ-পর্যায়ে মানব-মহিমার উপলব্ধি কখনো গতিধর্মমূলক জীবনবোধের প্রেরণায় কখনো বা বাস্তব সামাজিক চেতনার প্রেরণায় নানাভাবে প্রায় সর্বত্র অনুবৃত্ত হয়েছে। পত্রপুটের বারো সংখ্যক কবিতায় কবি দুঃখের পথে ধাবমান কর্মী মানুষকে উচ্চে তুলে ধরেছেন এবং কলাশিল্পী হয়ে তিনি তাদের সংগ্রামক্ষুব্ধ জীবনের স্বাদ পাননি ব'লে আক্ষেপ করেছেন—

যে মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলেনি তার।
মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পান্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

তিনি আরো বলেছেন, যারা দুর্গম ও ভীষণকে বাস্তব পথে জয় করেছে, তারাই অমৃতের অধিকারী। যেহেতু নিরাপদ নিশ্চেষ্ট কবিজীবন তিনি শুধু স্বপ্নেই কাটিয়েছেন, সেইহেতু, তিনি সাধারণ মানুষের বাইরেই রয়ে গেছেন—

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়-জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়।

কবির এখানকার এই বেদনার উক্তির সঙ্গে পরবর্তী বিখ্যাত 'ঐকতান' কবিতার 'এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি তুলনার যোগ্য এবং কবির এই অসম্পূর্ণতা-কল্পনার কারণরূপে তাঁর প্রবলভাবে আন্তরিক এবং একালে প্রত্যক্ষ মানবানুরাগের দিকটি বিবেচ্য। এই গ্রন্থে কবির মানব-প্রেমিকতার বিশিষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে (ষোল সংখ্যক) নিপীড়িতা আফ্রিকা

সম্বন্ধে কবিতায়। ইটালি কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকার এই কবিতাটির রচনার প্রেরণা দিয়েছিল। কবিতাটির শেষে এই 'যুগান্তরের কবি' ঐ 'মানহারা মানবী'কে যে মর্যাদা দান করেছেন তাতে পশ্চিমের রাষ্ট্রীয় সভ্যতার জঘন্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমের দিকে ইংরেজ-শাসন ও ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে কবির চিন্তা স্মরণীয়। এদেশের রাজনীতিকেরা যখন ইংরেজ শাসনের পক্ষভুক্ত হয়ে যৎকিঞ্চিৎ অধিকার লাভের জন্য ব্যাকুল তখন রবীন্দ্রনাথই প্রায় এককভাবে উপনিবেশ-বাদের বিরুদ্ধতা করেছেন এবং বারংবার বলেছেন যে—ও-পথে হবার নয়।

পত্রপুটের বিখ্যাত পৃথিবী-প্রণামের কবিতাটি কবি-প্রতিভার সায়াহ্নের আশ্চর্য বাণীচাতুর্য ও উদার কল্পনার উল্লেখ্য নিদর্শন। 'পৃথিবী'র কবি যদিচ প্রথম যৌবনের 'বসুন্ধরা'রই কবি, তথাপি পরিণত উপলব্ধির মহৎ প্রকাশে নূতন এবং সার্বজনীন মানবিক সত্যদৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল। গোধূলির ধূসরতা ও বিদায়ের সজলতার মধ্যেই যে কবি পৃথিবীকে শেষ প্রণতি জানাচ্ছেন, কবিতাটির শেষের 'হে উদাসীন পৃথিবী, আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে তা পরিস্ফুট। কিন্তু 'বসুন্ধরা'র কল্পনাসর্বস্ব পৃথিবী-প্রীতি এবং বিচ্ছেদ-ভীরু ব্যাকুলতা এখানে নেই। তার পরিবর্তে আছে বলিষ্ঠ জীবনবাদ এবং 'Sublime'-এর প্রতি আকর্ষণ। বসুন্ধরাকে এখানে কবি কেবল একটি পৃথক্ সত্তারূপেই দেখছেন না, কর্ত্রী শক্তিরূপে অনুভব করেছেন এবং দুঃখজয়ী মানুষের মহিমার জনয়িত্রী ব'লে অভিনন্দিত করছেন। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে মানুষের মূল্যেই কবি পৃথিবীর মূল্য পরীক্ষা করেছেন। কবিতাটির মধ্যে ক্রমোৎকর্ষের পথে যাত্রী মানুষের গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে এবং যেহেতু দুঃখকে বরণ, মৃত্যুকে অস্বীকার তথা প্রেম ও সৌন্দর্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে মানুষের সার্থক জীবনযাপনের সুযোগ এই ভয়ংকরী ও সুন্দরী, রুদ্রাণী ও কল্যাণী পৃথিবী থেকে সম্ভব হয়েছে, সেইহেতু কবি সৃষ্টি-সংহারের সমস্ত দায়ীত্ব পৃথিবীর উপরেই অর্পণ করেছেন এবং তাকেই প্রণাম জানিয়েছেন। সুতরাং এই কবিতাটিও তাঁর সুদৃঢ় মানবানুরাগ ও মানবমূল্যবোধ থেকে উদ্ভূত বলা যেতে পারে।

এই কবিতাটির পৃথিবী-বন্দনায় ব্যবহৃত ঐশ্বর্যময় ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের দেবতা-বন্দনার রূপ অনুভব করা যায়। গদ্যচ্ছন্দে অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির শক্তি কতদূর প্রসারিত হতে পারে কবি ধ্বনিসংঘাতসৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার চূড়ান্ত পরীক্ষা করেছেন। পূর্বে ছন্দের আলোচনায় এখান থেকে উদাহরণ গ্রহণ ক'রে এর শক্তির দিকটি দেখাতে চেষ্টা করেছি এবং উৎকৃষ্ট গদ্যরচনার নিপুণতাই যে শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতার ভিত্তিস্বরূপ তা-ও দেখিয়েছি। দীর্ঘ পর্বে গ্রথিত ছন্দোভঙ্গির সঙ্গে সুনির্বাচিত শব্দের প্রয়োগনৈপুণ্য এবং শব্দার্থের

মিলন-রচনার অত্যদ্ভুত শক্তি কবিকে গোধূলির ম্লানিমা থেকে উদ্ধার ক'রে ক্ষণকালের জন্যে যেন পরিণত যৌবনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। একদিকে যেমন,

ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা—
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,—
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে

অথবা,

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী তুমি নিত্যনবীনা,

প্রভৃতির মধ্যে শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই বন্দনা পূর্ণাঙ্গ ও রমণীয় হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি 'নীলাম্বুরাশির অতন্তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা' প্রভৃতির মধ্যে পৃথিবীর স্নিগ্ধ-গম্ভীরতার, এবং 'আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য' প্রভৃতিতে ভয়ানকের বর্ণনা অপূর্ব হয়েছে। বস্তুতঃ এমন উদার কল্পনা এবং ভীষণ-মধুর রূপের এমন সুন্দর বর্ণনা রবীন্দ্রকাব্যেও বেশি নেই। পৃথিবী-বন্দনার এই রীতি পাঠককে তাঁর উর্বশী-বন্দনার স্মৃতিতে অনিবার্যভাবে নিয়ে যাবে।

প্রকাশভঙ্গির অপরিসীম নৈপুণ্যে মণ্ডিত হ'লেও স্থানবিশেষে কয়েকটি মৌখিক শব্দ প্রয়োগের জন্য কবিতাটি কোনো কোনো সুধী কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, সৃষ্টির আদিকালের পরুষ বিশৃঙ্খলতা বর্ণনার পঙ্‌ক্তি দুটি—

তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।

অথবা, ঝড়ের বর্ণনার স্থানটি—

সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে।

কিন্তু ভাষার সমালোচনাকালে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা গদ্য-ছন্দের কবিতা পড়ছি। এক্ষেত্রে সাধারণ কথাবার্তার ভঙ্গিও কবি অনুসরণ করতে চেয়েছেন। সাধারণ গদ্যে যেমন আমরা অসংখ্য তদ্ভব ও দেশী শব্দের সঙ্গে প্রয়োজনবশে সংস্কৃতের ব্যবহারে দ্বিধা করি না, সেইরকম স্বাধীনতাই কবি এখানে অবলম্বন করেছেন। পদ্যে যদিও ভাষা ব্যবহারের একটা সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব, গদ্যকাব্যে ভাবানুযায়ী বাগ্‌বিন্যাসে কবির স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করলেই নয়। দেখা যায়, কবি অন্যত্রও সহজেই যে ভাষা এসেছে তাই ব্যবহার করেছেন, জোর ক'রে কোনো পরিবর্তন করেননি। যেমন, 'জীবপালিনী আমাদের পুষেছ' এর স্থানে 'জীবপালিনী আমাদের পালন করেছ' অথবা 'শতশত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ' একে পরিবর্তন

ক'রে 'শতশত ভগ্ন ইতিহাসের' এমন কথা বলেননি। তা ছাড়া মনে হয়, এখানে 'পুঁছে' শব্দের ব্যবহারে পৃথিবীর বিরাটত্ব ও আমাদের ক্ষুদ্রত্ব এবং 'ভাঙা' শব্দে তুচ্ছতার ব্যঞ্জনা দিতে চান। ছিন্নপত্রে বর্ষার পদ্মার জলস্রোতকে কবি 'লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো তাজা বুনো ঘোড়া'র সঙ্গে এক জায়গায় উপমা দিয়েছেন এবং তা চমৎকারও হয়েছে। গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে কবি সেই সহজভঙ্গিই যেখানে প্রয়োজন অবলম্বন করতে চেয়েছেন। ঐ কবিতায় এক-দিকে পৃথিবীর আদিমতার ও নৃশংসতার চিত্র, আর একদিকে মধুর-গম্ভীর রূপের ও কল্যাণময়তার চিত্র। যেমন বর্ণনায় তেমনি ভাষাতেও কবি একটা বৈপরীত্য রাখার চেষ্টা করেছেন। কবিতাটির রূপনির্মাণ তার অভ্যন্তরীণ বর্ণনাবৈপরীত্যের ও আবেগ-অতিরেকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবু আবেগের আতিশয্য এবং ফলতঃ অতিরেকী বর্ণনাই কবিতাটির ত্রুটি ব'লে লক্ষিত হতে পারে।

নয়সংখ্যক কবিতাতেও কবি ঝড়ের বর্ণনায় মৌখিক ভাষার শক্তি পরীক্ষা করেছেন—

বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘের থেকে মেঘে,
চালাচ্ছে ঝকঝকে খাঁড়া ;
বজ্রশব্দে গর্জে উঠছে দিগন্ত ;

অথবা,

এসে পড়ল পাটকিলে রঙের অন্ধকার,
শুকনো ধুলোর দম-আটকানো তুফান।
ছুঁড়ে মারে টুকরো ডাল শুকনো পাতা,
চোখে-মুখে ছিটোতে থাকে কাঁকরগুলো ;

এ সকলের সঙ্গে 'দোসরহারা আষাঢ়ের ঝিল্লিঝনক' রাত্রির বর্ণনাকে কবি একত্র স্থাপন করতে চেয়েছেন। ভাষায় শক্তিসঞ্চারের চেষ্টা কবির একালের বিভিন্ন সাহসিক প্রচেষ্টার অন্যতম। কিন্তু এজন্যে তিনি বিদেশী ভাষার ও সাহিত্যের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি, লৌকিক বাঙ্‌লার সুপ্তশক্তি জাগরিত করার চেষ্টা করেছেন। উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে এ বিষয়ে আতিশয্য লক্ষিত হলেও নিম্নে উদ্ধৃত চলিত ভাষায় লেখা মানুষের দুঃসাহসিক যাত্রার বর্ণনা বলাকার অনুরূপ স্থানের চেয়ে খুব কম শক্তি-সম্পন্ন এমন মনে হয় না—

সীমানাভাঙার দল ছুটে আসছে
বহুযুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে,
পার হয়ে পর্বত,

আকাশে বেজে উঠেছে নিত্যকালের দুন্দুভি—
'পেরিয়ে চলো,
পেরিয়ে চলো।' ('চিরযাত্রী'—শ্যামলী)

আবার, পুরাতনের সৌন্দর্যরসপিপাসু কবি যখন একালের যন্ত্রচালিত ত্বরা-তাড়িত নানা দ্বন্দ্বে পূর্ণ জীবনকে লক্ষ্য ক'রে নিম্নলিখিত সংকেতময় রূপের আশ্রয়ে তার বর্ণনা দেন—

তুমি কি পাশে বসে শোনাবে
সেদিনকার কানে-কানে কথার উদ্বৃত্ত।
কিন্তু ঢেউ করছে গর্জন,
শকুন করছে চীৎকার,
মেঘ ডাকছে আকাশে,
মাথা নাড়ছে নিবিড় শালের বন।
তোমার বাণী হবে খেলার ভেলা
খেপাজলের ঘূর্ণিপাকে। ('মিলভাঙা'—শ্যামলী)

তখন একথা স্বীকার করতে হয় যে কবির ভাবসংকেত ছন্দায়িত লৌকিক ভাষার কৌশলেই সিদ্ধিলাভ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে এও মনে রাখা কর্তব্য যে আধুনিক প্রতীকী-পদ্ধতির বিশেষতঃ সুর্রিয়্যালিস্ট্ কবিসম্প্রদায়ের মত চিত্রবিন্যাসে ও ভাষাভঙ্গিমায় প্রায় যথেচ্ছ পরিভ্রমণের প্রবৃত্তি শাসিত হয়েছে তাঁরই মহাকাব্যিক প্রতিভায়, যা একাধারে আধুনিক ও ক্লাসিক্যাল, ব্যক্তিক ও সামাজিক।

এই অভিনব ছন্দঃকৌশল ও ভাষাভঙ্গির সঙ্গে একালে কবির দৃষ্টিও যে বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষের আশ্রিত হয়নি এমন নয়, কিন্তু অতি পরিচিত বস্তুকে গ্রহণ ক'রেও রহস্যদ্রষ্টা কবি কখনো-সখনো অজ্ঞাতেরই অনুসন্ধান করেছেন, যেমন ঘটেছে পত্রপুটের হাটের বর্ণনাময় পাঁচ সংখ্যক কবিতাটিতে—

নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠে বাটে,
মহাজনের টিনের ছাদে,
শাকসবজির ঝুড়ি চুপড়িতে,
আটি-বাঁধা খড়ে,
হাঁড়ি-মালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে;
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল
মহানিম গাছের ফুলের মঞ্জরিতে।

মুক্ত কবিমানসের নির্বিশেষ নিসর্গ-অনুরাগের পরিচয়ই এখানে ফুটে উঠেছে। এর সঙ্গে তালি-দেওয়া আলখাল্লা-পরা বাউল একসঙ্গে মিশে গিয়ে হাটের

ছবি যথার্থই পূর্ণ করেছে। এই রূপ কবির মনে যে বাস্তবতা বা স্বভাব-রসের সৃষ্টি করেছে তা ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি বলেছেন—

হাসলেম, দেখলেম অদ্ভুতেরও সংগতি আছে এইখানে,
এও এসেছে হাটের ছবি ভর্তি করতে।

নির্বিচারে সমস্ত বস্তুর মধ্যেই যে রহস্য লুকানো আছে পরিশেষে কবি নিজের সেই কথাটিই বাউল-সংগীতের উদ্ধৃতিতে ব্যক্ত করেছেন—

হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে,
সবাই ধরে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে।

সাম্প্রতিক কাব্য-অনুভবের ধারায় সামান্যের মধ্যে অসামান্যতা-দর্শনের তত্ত্বে কবিও যে আস্থাবান্ তার প্রমাণ একালের এরকম বহু কবিতাতেই মিলবে।

পত্রপুটের তত্ত্ববিলাস থেকে 'শ্যামলী'তে এসে স্বভাবকাব্যের উদারতা অনুভব করা যায়, যদিও শ্যামলীর সর্বত্রই 'নারিকেলবন-পবন-বীজিত নিকুঞ্জ' দেখা যায় না। কারণ, এখানকার আত্মরতিযুক্ত 'আমি' ('আমারি চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ' ইত্যাদি) বা 'কালরাত্রে' কবিতায় আত্মমানস-বিবৃতি ও তত্ত্বাবভাসের পরিচয় রয়েছে (তু°—চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।...ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া, পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা—ইত্যাদি)। আবার স্বপ্ন, বাঁশিওয়ালা, অকাল ঘুম, তেঁতুলের ফুল প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় কবির চিরকালের বিস্ময়বিমিশ্র অজানার অনুভূতি এবং আখ্যান-বাহিত কয়েকটি কবিতায় ক্ষণিকের ও অপ্রত্যাশিতের আবেগও প্রকাশিত হয়েছে। 'চিরযাত্রী' কবিতাটির মধ্যে গতিধর্মী মানুষের মহিমা হয়েছে কীর্তিত। তবু 'শ্যামলী' কাব্যের আকর্ষণ ওর বিক্ষিপ্ত আত্মতত্ত্বে নয়, মানবিক মিলন-বিরহ-বেদনায়। সেদিক থেকে শ্যামলী একালের বীথিকা সানাই এবং পূর্বকালের মানসী-কল্পনা-ক্ষণিকার কিছুটা সগোত্র। এর সম্ভাষণ, হারানো মন, অকাল ঘুম, শেষ পহরে এবং হঠাৎ দেখা কবিতাপঞ্চকে কবির বার্ধক্য-রচিত প্রণয়স্বপ্ন স্থান পেয়েছে। পূর্বেকার সঙ্গে পার্থক্য এই যে, এগুলি ভাবাবেগ বা সেন্টিমেন্ট থেকে প্রায় মুক্ত এবং ভঙ্গিমায় ও পরিবেশ গ্রন্থনে সহজ স্বতন্ত্র। এর মধ্যে 'সম্ভাষণ' কবিতার সঙ্গে বীথিকার 'নিমন্ত্রণ' কবিতার ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়। সামান্যের মধ্যে যে অসামান্যতা রয়েছে বা আটপৌরের মধ্যে রোম্যান্টিকতা, বাস্তবকে স্বীকার করেই কবি যেন তার প্রতি আগ্রহী হয়েছেন। নারীকে ঘিরে কবির যে রূপাসক্তি ও স্বপ্নচারী মনোভাব প্রসিদ্ধ, বয়সের পরিবেশকে মান্য ক'রেও কবি কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত হতে চান না। 'হঠাৎ দেখা'র 'রাতের সব তারা'ই আছে দিনের

আলোর গভীরে' যদিচ ঐ একই সেণ্টিমেন্টের আবৃত্তি, তবু এর সুগোচিত স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়েছে ঠিক পরবর্তী বাক্যে—'খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম না কি।' এই সংশয়বাক্যই কবিতাটিকে রোমান্স থেকে মুক্ত ক'রে দিনের আলোর সহজে নিয়ে এসেছে। 'হারানো মন' কবিতায় প্রেম নিয়ে প্রৌঢ়-বার্ধক্যে রোমান্সের অনিবার্য অবলুপ্তির বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট ক'রে তোলা হয়েছে। কবি নায়িকাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন কোনো অভিমানবশে বা কাজের তাগিদে নয়, প্রণয়ের সেণ্টিমেন্ট এককভাবে আর প্রাধান্য পাচ্ছে না বলেই, অসংখ্যের ভিড়ে এবং দাবিতে বাসনার কেন্দ্রবিন্দু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাই। কবি এই বর্ণবিরল বিমূঢ়তাকে আদিপ্রকৃতির কাজ বলেছেন এবং যে রক্তিম স্বার্থপ্রেরণা এর সঙ্গে যুক্ত তার অভাব বোধ ক'রে বলছেন—

আগেকার চিহ্নগুলো সব গেছে মুছে,
আমাকে এক ক'রে নিতে পারবে না কোনোখানে
কোনো বাঁধনে বেঁধে।

'শেষ পহরে' এবং 'অকালঘুম' কবিতা দু'টি দাম্পত্য প্রণয়ের। প্রথমটিতে প্রৌঢ়ের অভিমানের মানসচিত্র, দ্বিতীয়টিতে প্রিয়তমার ঘুমন্তরূপ-বর্ণনা। দুটিতেই চিত্ররচনার নৈপুণ্য এবং সাধারণ মধ্যবিত্তজীবনের বাস্তবের প্রতি আগ্রহ বৈশিষ্ট্যজনক হয়েছে। প্রিয়ার অকালঘুমের ছবিতে অতিপরিচিতের মধ্যেও অপরিচয়ের বিস্ময়দর্শন যৌবনের কবি ও বার্ধক্যের কবিকে রোম্যান্টিক সূত্রে আবদ্ধ করেছে। এতে যে-ছবি ও যে-অনুভবকে কবি স্মরণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর শিলাইদহবাসের। 'মিলভাঙা' কবিতায় পূর্বেকার প্রণয়অনুভবের স্মৃতিচারণা ক'রে তাঁর একালকার পরিবর্তিত ও জটিল মানসিকতার সঙ্গে যৌবনকালের বৈপরীত্য দেখিয়েছেন, বলতে চেয়েছেন—তে হি নো দিবসা গতাঃ। 'কনি', 'অমৃত', 'বঞ্চিত', 'অপরপক্ষ' এই চারটি কবিতা প্রণয়মূলক ঘটনাবৈচিত্র্য নিয়ে। বঞ্চিত এবং অপরপক্ষ একই ঘটনার দু'পক্ষের দিক, আধুনিক যান্ত্রিক যুগের বিধাতার কৌতুক, পরিবেশ ও ঘটনা-সৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ট্র্যাজেডি, যা কখনও হার্ডির ট্র্যাজেডিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'কনি' এবং 'অমৃত' আখ্যানবাহী প্রণয়কথা, পুনশ্চ'র শেষ চিঠি, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, ক্যামেলিয়ার সঙ্গে রূপনির্মাণের দিক দিয়ে একাত্ম।

অবহেলিত সাধারণকে মর্যাদা দেওয়ার মনোভঙ্গি কবির 'তেঁতুলের ফুল' কবিতার রচনামূলে। বিস্ময় লাগে, যে-কবি পূর্বে 'সাহিত্যধর্ম', 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধে সাহিত্যে শ্রেণীবিচার মূল্যবিচারের রীতিকে অনেকটা মেনে নিয়ে সজনে-ফুল, কুমড়ো-ফুল প্রভৃতিকে সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে অপাঙ্‌ক্তেয় ব'লে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে তেঁতুলের ফুলকে মহিমা দিয়ে তখনকার মানিত বিধিকে আজ উল্লঙ্ঘন করতে চাইছেন—

সেদিন কে জেনেছিল—
ঐ রূঢ় বৃহতের অন্তরে সুন্দরের নম্রতা,
কে জেনেছিল বসন্তের সভায় ওর কৌলীন্য।

সুতরাং অন্যত্র ভাষিত কবির কাব্যদর্শনকেই বরণীয় ব'লে মনে না ক'রে গত্যন্তর নেই। তা এই যে—"রসমার্গের পথিককে পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে চলতে হয়।"

শ্যামলীর 'আমি' কবিতাটি ('আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ') এই কবির এবং সেই সঙ্গে সব সাহিত্যিকেরই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সোচ্চার ঘোষণা হিসাবে কোনো কোনো মহলে কল্পিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে প্রথম যা লক্ষণীয় তা হ'ল, এই অনুভব কবিভাবনা মাত্র, কোনো তত্ত্ব নয়। সে কথা কবি নিজেই কবিতাটির মধ্যে বলেছেন। কবির চেতনায় পৃথিবী রঙীন হ'ল একথা সাধারণভাবে আমাদেরও বলতে আপত্তি নেই, এরকম ভাববাদী দৃষ্টি-ভঙ্গি গীতিকবির পক্ষে স্বাভাবিক এবং কোনো কোনো মুহূর্তের মেজাজে একে পরমভাবেও কল্পনা ক'রে দেখা যেতে পারে। এ থেকে যদি কেউ এমন যুক্তি তোলেন যে আমি আছি ব'লেই বিশ্ব আছে, আমি না থাকলে কিছুই নেই, তাহ'লে সে যুক্তিতে হেত্বাভাস দোষ থেকে যায়। বিজ্ঞানবাদীরাও এরকম কথা বলেন না। নিসর্গই কাব্যের উপাদান, কবি নিসর্গকে নিজ কল্পনা ও ভাবনা দিয়ে নূতন ক'রে সৃষ্টি করেন, সে সৃষ্টি বাস্তবের উপর মায়াবিস্তার, বাস্তবকে অস্বীকার নয়। ব্যক্তি ও নিসর্গ, ব্যক্তি ও মানবসমাজের দ্বন্দ্ব ও সমাধানের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি চলছে। তত্ত্বতঃ আমরা কেউ কারো থেকে নিঃশেষে পৃথক্ নই, প্রতিভাসিত পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক একের প্রকাশ চলছে দেশে ও কালে। এই 'আমি' কবিতাটির কয়েকদিন আগে লেখা 'দ্বৈত' কবিতাটিতেও এই কবিদৃষ্টি-কবিসৃষ্টির পরিচয় রয়েছে, যেমন—

আমি তোমার কারিগরের দোসর,
······দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে। ইত্যাদি।

সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজের যে দ্বান্দ্বিক লীলা চলছে তার কবি অন্তর্মুখ স্বপ্নচারী হ'লে তিনি কখনও কখনও স্বপ্ন-সত্যকেই বড় ক'রে দেখতে চান। তুলনীয়—'আমি বলি স্বপ্ন যাহা তার চেয়ে কি সত্য আছে'—ইত্যাদি পূরবীর 'স্বপ্ন' কবিতা। এসব থেকে সাহিত্যে ব্যক্তিই বড়, সমাজ নয়, নিসর্গ নয়—এমন তত্ত্ব উপস্থাপিত করা অনুচিত হবে। দেখতে হবে কাজি নজরুলের মত প্রত্যক্ষ সমাজবাদী কবির কবিতাতেও অহংভাবনার প্রকাশ কম নেই। নজরুল কায়েমী প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে 'মানুষ আমি'র মহিমা ঘোষণা করেছেন, আর রবীন্দ্রনাথ করেছেন ভাব ও স্বপ্নের আশ্চর্য ক্রিয়ায় মুগ্ধ হয়ে।

১৩৪৪-এর রোগমুক্তির পরেই লেখা 'প্রান্তিক' কয়েকটি লক্ষণে একালের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এখন থেকে গদ্যচ্ছন্দের একটা পালা প্রায় শেষ হয়েছে বলা যেতে পারে এবং প্রান্তিকে কবি অষ্টাদশাক্ষর অমিত্রচ্ছন্দেই ভাববিন্যাস করেছেন। তবু আমরা প্রান্তিকের অষ্টাদশাক্ষরের মিতযতি-অমিত্রবন্ধনের কবিতাগুলিকে কবির পূর্বতন গদ্যচ্ছন্দে আসক্ত স্বভাবেরই শৃঙ্খলিত প্রকাশ ব'লে মনে করি। পার্থক্য এই যে, পূর্বে স্থানবিশেষে যেসব সহজ লৌকিক শব্দার্থগ্রন্থনের অবসর ঘটেছিল বর্তমানে তার নিতান্ত অভাব। এখানকার বাক্য গদ্যচ্ছন্দেরই অন্য নানান্ স্থানের মত সমুন্নত, সংহত, পরুষাক্ষরসংঘাতে গম্ভীর, আর বিশেষণে সবিশেষ। চরণপাতের সজাতীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় তিন-চার বছর আগেকার লেখা মিলযুক্ত প্রবহমানরীতির কয়েকটি কবিতাও এতে একই সঙ্গে গ্রথিত করা হয়েছে। প্রান্তিকের ভাষা ও ভঙ্গিতে যেমন বলাকা-পূরবী কালের, এমনকি তারও পূর্বেকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি আত্মদর্শনেও ঐ কালের সত্যাদিদৃক্ষা, অরূপানুভূতি এবং নবজীবনের পথে যাত্রার আগ্রহ সূচিত করে। প্রান্তিকে কবি আগেকার মত স্বার্থবাসনাহীন মুক্ত জীবনের অভিলাষী হয়ে উঠেছেন। এইজন্যে প্রান্তিকের কবিকে সহজেই জীবন-মৃত্যুর রহস্যদ্রষ্টা, পরিণত উপলব্ধিতে স্থির পূর্বেকার কবির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। বলা যেতে পারে, পূর্বেকার রচনায় কবি যে সার্বজনীন সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, অধুনা বাস্তব অভিজ্ঞতায় সেই সত্যে নিজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রান্তিকের আলো-ছায়া স্পষ্ট-অস্পষ্ট মিশ্রিত অনুভবগুলি বিশেষণ-বক্রতা ও রূপক প্রভৃতির আরোপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

এক সংখ্যক কবিতায় মৃত্যুর স্পর্শ, তন্দ্রা ও জাগরণ, আলোক ও আঁধারের মিশ্রণের অস্পষ্টতা এবং পরিশেষে নবজীবনে নিষ্ক্রমণের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুস্নানে যে জীবন শুচি, শুভ্র, অনন্ত হয়ে ওঠে তা জানাতে গিয়ে কবি বলছেন—

> পুরাতন সম্মোহের
> স্থূল কারাপ্রাচীরবেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
> কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
> স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অভ্যুদয়ে।
> * * * বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
> সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
> অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

দুই চার পাঁচ প্রভৃতি সংখ্যার কয়েকটি কবিতায় মৃত্যুর সহায়তায় স্থূল জৈবজীবনের বাসনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বর্ণিত হয়েছে। কবি মনে

করছেন, 'সংসারের বিচিত্র প্রলেপ, বিবিধের বহু হস্তক্ষেপ, অযত্নে অনবধানে' তাঁর জীবনের আদিমূল্য হারিয়ে গেছে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সেই অকলঙ্ক জীবন তিনি ফিরে পাবেন—

আদিম সৃষ্টির যুগে
প্রকাশের যে আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্ণ বুভুক্ষার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যুস্নানতীর্থতটে সেই আদিনির্ঝরতলায়।

তিন সংখ্যক কবিতার 'জানিলাম একাকীর ভয় নাই, ভয় জনতার মাঝে; একাকীর কোন লজ্জা নাই' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে নৈবেদ্য বা গীতাঞ্জলির অরূপনিষ্ঠ কবিকেই মনে পড়ে। আবার—

পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়—

প্রভৃতি উক্তিতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনলাভের জন্যে উৎসুক ফাল্গুনী-বলাকার বৈরাগী যাত্রী কবিই যেন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন।

পার্থিব জীবনে নামের মোহ বা অহংকারের প্লানি থেকে মুক্তির আগ্রহ কবির একালের মননময় বহু কবিতায় যেমন, তেমন প্রান্তিকেও প্রকাশ পেয়েছে —'কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে' প্রভৃতি তার প্রমাণ। ছয় ও সাতের কবি সেই আমাদের চিরপরিচিত পার্থিব সৌন্দর্য ও প্রীতিরসের দূত হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মাথার উপর বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশ, নিম্নে স্ফুটানোন্মুখ পুষ্পসভা, পাশে বনস্পতির শাখায় পাখিদের কলকণ্ঠের আমন্ত্রণ। নিঃসঙ্গ যাত্রায় উৎসাহিত বৈরাগীর জপমন্ত্র পতঙ্গ-গুঞ্জনে পরিণত হয়েছে। অতএব, কবির কামনা জেগেছে 'জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি'। আট, নয়, দশ প্রভৃতি কবিতায় পুনরায় পারের যাত্রী অথচ মর্ত্যপ্রেমিক কবির নামহীন খ্যাতিহীন 'অব্যক্তের অনালোকে' যাত্রার সাহসিকতা সূচিত হয়েছে। এর মধ্যে নয় সংখ্যক কবিতায় কবি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন কেমন ক'রে তাঁর ইন্দ্রিয়গত অনুভূতিগুলি ক্ষীণ হতে হতে ক্রমশ বিলীন হয়ে পড়ছে, অপরূপা পৃথিবী ছায়াময়ী হতে হতে তাঁর নিজদেহ নিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে—তার অনুভব।

মনে রাখা ভালো, এরকম কবিতায় এবং সেই সঙ্গে সমাজ-অভিঘাতমুখর যাবতীয় কবিতায় কবির সংশয়কুণ্ঠিত নৈরাশ্যমুখী দৃষ্টিকোণ সাধারণভাবে প্রত্যাশিত ছিল হয়ত-বা, কিন্তু তা ঘটেনি, মাঝে-মধ্যে দ্বিধা, সংশয়, বিতর্ক

১৩৪৪-এর রোগমুক্তির পরেই লেখা 'প্রান্তিক' কয়েকটি লক্ষণে একালের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এখন থেকে গদ্যচ্ছন্দের একটা পালা প্রায় শেষ হয়েছে বলা যেতে পারে এবং প্রান্তিকে কবি অষ্টাদশাক্ষর অমিত্রচ্ছন্দেই ভাববিন্যাস করেছেন। তবু আমরা প্রান্তিকের অষ্টাদশাক্ষরের মিতযতি-অমিত্রবন্ধনের কবিতাগুলিকে কবির পূর্বতন গদ্যচ্ছন্দে আসক্ত স্বভাবেরই শৃংখলিত প্রকাশ ব'লে মনে করি। পার্থক্য এই যে, পূর্বে স্থানবিশেষে যেসব সহজ লৌকিক শব্দার্থগ্রন্থনের অবসর ঘটেছিল বর্তমানে তার নিতান্ত অভাব। এখানকার বাক্য গদ্যচ্ছন্দেরই অন্য নানান্ স্থানের মত সমন্বিত, সংহত, পরুষাক্ষরসংঘাতে গম্ভীর, আর বিশেষণে সবিশেষ। চরণপাতের সজাতীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় তিন-চার বছর আগেকার লেখা মিলযুক্ত প্রবহমানরীতির কয়েকটি কবিতাও এতে একই সঙ্গে গ্রন্থিত করা হয়েছে। প্রান্তিকের ভাষা ও ভঙ্গিতে যেমন বলাকা-পূরবী কালের, এমনকি তারও পূর্বেকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি আত্মদর্শনেও ঐ কালের সত্যাদিদৃক্ষা, অরূপানুভূতি এবং নবজীবনের পথে যাত্রার আগ্রহ সূচিত করে। প্রান্তিকে কবি আগেকার মত স্বার্থবাসনাহীন মুক্ত জীবনের অভিলাষী হয়ে উঠেছেন। এইজন্যে প্রান্তিকের কবিকে সহজেই জীবন-মৃত্যুর রহস্যদ্রষ্টা, পরিণত উপলব্ধিতে স্থির পূর্বেকার কবির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। বলা যেতে পারে, পূর্বেকার রচনায় কবি যে সার্বজনীন সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, অধুনা বাস্তব অভিজ্ঞতায় সেই সত্যে নিজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রান্তিকের আলো-ছায়া স্পষ্ট-অস্পষ্ট মিশ্রিত অনুভবগুলি বিশেষণ-বক্রতা ও রূপক প্রভৃতির আরোপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

এক সংখ্যক কবিতায় মৃত্যুর স্পর্শ, তন্দ্রা ও জাগরণ, আলোক ও আঁধারের মিশ্রণের অস্পষ্টতা এবং পরিশেষে নবজীবনে নিষ্ক্রমণের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুস্নানে যে জীবন শুচি, শুভ্র, অনন্ত হয়ে ওঠে তা জানাতে গিয়ে কবি বলছেন—

> পুরাতন সম্মোহের
> স্থূল কারাপ্রাচীরবেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
> কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
> স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অভ্যুদয়ে।
> * * * বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
> সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
> অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

দুই চার পাঁচ প্রভৃতি সংখ্যার কয়েকটি কবিতায় মৃত্যুর সহায়তায় স্থূল জৈবজীবনের বাসনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বর্ণিত হয়েছে। কবি মনে

করছেন, 'সংসারের বিচিত্র প্রলেপ, বিবিধের বহু হস্তক্ষেপ, অযত্নে অনবধানে' তাঁর জীবনের আদিমূল্য হারিয়ে গেছে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সেই অকলঙ্ক জীবন তিনি ফিরে পাবেন—

আদিম সৃষ্টির যুগে
প্রকাশের যে আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্ণ বুভুক্ষার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যুস্নানতীর্থতটে সেই আদিনির্ঝরতলায়।

তিন সংখ্যক কবিতার 'জানিলাম একাকীর ভয় নাই, ভয় জনতার মাঝে; একাকীর কোন লজ্জা নাই' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে নৈবেদ্য বা গীতাঞ্জলির অরূপনিষ্ঠ কবিকেই মনে পড়ে। আবার—

পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়—

প্রভৃতি উক্তিতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনলাভের জন্যে উৎসুক ফাল্গুনী-বলাকার বৈরাগী যাত্রী কবিই যেন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন।

পার্থিব জীবনে নামের মোহ বা অহংকারের গ্লানি থেকে মুক্তির আগ্রহ কবির একালের মননময় বহু কবিতায় যেমন, তেমন প্রান্তিকেও প্রকাশ পেয়েছে —'কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে' প্রভৃতি তার প্রমাণ। ছয় ও সাতের কবি সেই আমাদের চিরপরিচিত পার্থিব সৌন্দর্য ও প্রীতিরসের দূত হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মাথার উপর বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশ, নিম্নে স্ফুটানোন্মুখ পুষ্পসভা, পাশে বনস্পতির শাখায় পাখিদের কলকণ্ঠের আমন্ত্রণ। নিঃসঙ্গ যাত্রায় উৎসাহিত বৈরাগীর জপমন্ত্র পতঙ্গ-গুঞ্জনে পরিণত হয়েছে। অতএব, কবির কামনা জেগেছে 'জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি'। আট, নয়, দশ প্রভৃতি কবিতায় পুনরায় পারের যাত্রী অথচ মর্ত্যপ্রেমিক কবির নামহীন খ্যাতিহীন 'অব্যক্তের অনালোকে' যাত্রার সাহসিকতা সূচিত হয়েছে। এর মধ্যে নয় সংখ্যক কবিতায় কবি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন কেমন ক'রে তাঁর ইন্দ্রিয়গত অনুভূতিগুলি ক্ষীণ হতে হতে ক্রমশ বিলীন হয়ে পড়ছে, অপরূপা পৃথিবী ছায়াময়ী হতে হতে তাঁর নিজদেহ নিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে—তার অনুভব।

মনে রাখা ভালো, এরকম কবিতায় এবং সেই সঙ্গে সমাজ-অভিঘাতমুখর যাবতীয় কবিতায় কবির সংশয়কুণ্ঠিত নৈরাশ্যমুখী দৃষ্টিকোণ সাধারণভাবে প্রত্যাশিত ছিল হয়ত-বা, কিন্তু তা ঘটেনি, মাঝে-মধ্যে দ্বিধা, সংশয়, বিতর্ক

দেখা দিলেও তা স্থায়ী হয়নি। কারণ, রবীন্দ্রস্বভাব হ'ল আশা-ও-প্রত্যয়-বিলাসী। পুরানো প্রথার আধ্যাত্মিকতার পথিক তিনি ছিলেন না এ আমরা দেখেছি। তবু নিসর্গরম্যতা এবং মানুষী প্রীতির সূত্রে উপলব্ধ রহস্যময় কাব্যিক এককসত্তার সন্ধানী তিনি ছিলেন। এরই সঙ্গে তাঁর প্রবল আশাবাদের ঘনিষ্ঠতা। ফলত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পশ্চিমের সমকালীন নৈরাশ্যবাদী কবিগোষ্ঠীর তুলনা টানা কোনো কাজের কথা হবে না। ১৬ সংখ্যক কবিতা দেখুন, ইতিহাস অনুসরণে কবি মানবজীবনের ও কীর্তির ধ্বংস লক্ষ্য করলেও "তবু করি অনুভব বসি এই অনিত্যের বুকে, অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।"

প্রান্তিকের শেষের দিকের সর্বজনপরিচিত "সেদিন চৈতন্য মোর" প্রভৃতি কবিতায় কবির সমাজসচেতন মনোভাবের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। এতে তিনি কেবল সাধারণভাবে যুদ্ধবিরোধীই নন, ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে সংগ্রামের পক্ষপাতী। মানববিরোধী যান্ত্রিক রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের চক্রান্ত ও কৌশল, রাষ্ট্রনেতাদের কূট চারিত্র্য কবির তীব্রতম ঘৃণার বিষয়ীভূত হয়েছে এই কবিতায়।

তিন-চার বছর আগে লেখা সমিল অষ্টাদশাক্ষর কয়েকটি কবিতা স্বভাব-সিগ্ধ মর্ত্য-অনুরাগের ও অস্তিত্ব-বন্দনার বিস্ময়ে বাণীময়।

প্রান্তিকের পূর্বে এবং রুগ্‌ণাবস্থার পূর্বে লেখা 'সেঁজুতি'র কয়েকটি কবিতায় নিরাসক্ত কবি-সাধকের যাত্রামুখী বৈরাগী মনের পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। জীবনের পথপ্রান্তে এসে কবি পার্থিবের মধ্যে অনুভূত অপার্থিব রসসম্পদকে শেষমূল্য দিয়েছেন। মৃত্যুতে তাঁর যে বেদনাবোধ নেই তার কারণ দেখিয়ে বলছেন যে নিসর্গের সঙ্গে একাত্মতায় তাঁর মুক্তি অনায়াসে ঘটে গেছে এবং তিনি দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম ক'রে নিজেকে বিশ্বের সঙ্গে একীভূত করতে পেরেছেন, অতএব মৃত্যুচিন্তা অনর্থক—

> অসীম আকাশে যে প্রাণকাঁপন অসীমকালের বুকে
>
> নাচে অবিরাম তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে।
>
> যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
>
> তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।

লোভীর মত তিনি জীবনকে আঁকড়ে থাকতে চান না। যে দেহ ভঙ্গুর এবং যে পার্থিব খ্যাতি ও কীর্তি নশ্বর তার প্রতি কবির প্রবল বিরাগ পূর্বেকার অন্য বহু কবিতার মত 'যাবার মুখে' কবিতাটিতেও প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের ঐ অপার্থিব রসাস্বাদের বর্ণনা দিয়ে উপসংহারে কবি বলছেন—

> যায় যদি তবে যাক,
>
> এল যদি শেষ ডাক,—

অসীম জীবনে এ ক্ষীণ জীবন শেষ রেখা এঁকে যাক,
মৃত্যুতে ঠেকে যাক।
যাক নিয়ে, যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লুটে ধূলি 'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক—
যাক নিয়ে তাহা, যাক এ জীবন, যাক ॥

'পলায়নী' কবিতায় কবি নিখিলের অন্তরশায়ী মহাকালের নৃত্য স্মরণ ক'রে আসক্তিবিহীন চিত্তে তাকে অন্তরে গ্রহণ করার চিরপ্রিয় অভিলাষের কথাই প্রকাশ করেছেন। 'নতুন কাল' কবিতায় কবি ক্রমবর্ধমান জীবন-কোলাহলের দিক লক্ষ্য ক'রেও বিশ্বের আনন্দরসের চিরন্তনতাই উপলব্ধি করেছেন।

যে হোক রাজা, যে হোক মন্ত্রী, কেউ রবে না তারা—
বইবে নদীর ধারা—
জেলেডিঙি চিরকালের, নৌকা মহাজনি,
উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি।
প্রাচীন অশথ আধা ডাঙায় জলের 'পরে আধা।
সারারাত্রি গুঁড়িতে তার পানসি রইবে বাঁধা।

নবজাতকের 'সাড়ে নটা' কবিতায়ও বিদেশিনীর সংগীত ও 'মেঘদূতের বিরহ-গাথাকে বিশেষ কাল ও জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন চিরপ্রবাহিত আনন্দ-স্রোতরূপে লক্ষ্য করেছেন—

রণক্ষেত্রে নিদারুণ হানাহানি,
লক্ষ লক্ষ গৃহকোণে সংসারের তুচ্ছ কানাকানি,
সমস্ত সংসর্গ তার
একান্ত করেছে পরিহার
বিশ্বহারা
একখানি নিরাসক্ত সংগীতের ধারা।

'চলতি ছবি'তে অদৃশ্য কেন্দ্রে সমাসীন সেই বিশ্বজীবননাট্যের সূত্রধারের কার্য কবি অনুভব করেছেন—চলমানতা যার বাইরের রূপ মাত্র। সুতরাং আগেকার কালের মত এখানেও জীবনদ্বন্দ্ব সম্পর্কে কবির বক্তব্য—

সে কথা স্মরিয়ো, চলে যেতে দিয়ো তারে,
লজ্জা দিয়ো না নিঃস্ব দিনের নিঠুর রিক্ততারে।
—ইত্যাদি।

বিখ্যাত 'স্মরণ' কবিতাটিতে কবি তাঁর সমস্ত সংস্কার এবং প্রয়োজনের ক্ষুধা

থেকে মুক্ত অবিমিশ্র কবিস্বরূপের কথা বিদায়ের কালে পুনরায় আবেগময় কণ্ঠে জানালেন। জগৎ এবং জীবনের সঙ্গে এই কবির কী সম্পর্ক এবং তাঁকে কী ভাবে বোঝা উচিত তা তাঁর নিম্নলিখিতরূপ উক্তিগুলি থেকে জানা যেতে পারে—

বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে-আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার,
সে-আমারে কে চিনেছ মর্তকায়ায়, —ইত্যাদি।

সেঁজুতির দ্বিতীয় 'জন্মদিন' কবিতাতেও কবি নাম-খ্যাতির কোলাহল থেকে পলায়মান নিজ স্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন এবং 'চিত্রা'র কাল থেকে বিস্তৃত প্রকৃতিমুগ্ধ অরূপহারা চিত্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। 'পত্রোত্তর' কবিতায় পূর্ণের উপলব্ধিতে স্বপ্রতিষ্ঠ কবি নিরাসক্তের সবল মন নিয়ে মর্ত্যকে উপভোগ করতে চান, এবং ছেড়ে যেতেও কাতর নন। এখানে ব্যক্তিগত ভাবে কবির মৃত্যুকে বরণ করার যে উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে তার কারণ নির্দেশ ক'রে তিনি বলছেন—

পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে
রূপে রসে সেইক্ষণে যে-গূঢ় রহস্য দিনে দিনে
হ'ত নিশ্বসিত, আজি মর্তের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি।

কবিতাটিতে কবি প্রয়োজন-সম্পর্ক-রহিত বিশুদ্ধ আর্টের নিরাসক্ত উপভোগের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বর্তমানের সেই মানুষের কথায় এসেছেন যাদের স্থূল জীবনাসক্তি প্রবল, যারা পৃথিবীকে স্বার্থময় ভোগের অধিকারে আনবার জন্যে ব্যগ্র। স্বভাবতই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিকে তাকিয়ে বিক্ষুব্ধ কবি তাঁর মানসিক বেদনার ও সেই সঙ্গে পুরাতন বলিষ্ঠ আশাবাদের কথা আমাদের শুনিয়েছেন—

ব'লে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'

'পত্রোত্তর' কবিতার জীবন-দর্শনেও তদানীন্তন যুদ্ধকোলাহলের মুখে আশাবাদী কবির পরিচয় পাওয়া যায়—

পুরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী।

বলা বাহুল্য, এই মনোভাব রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রের পরিচয় দেয়।

'আকাশপ্রদীপ' সাধারণভাবে কবির বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতিচিত্র, বার্ধক্যের মমত্ব দিয়ে আঁকা। দেখা যায়, পূর্বেকার স্বপ্নদ্রষ্টা নূতন মূর্তিতে ফিরে এসেছেন। এখনকার প্রকৃতিতে একদিকে কবি নিরাসক্ত, আর একদিকে অনুরাগী; যথাদৃষ্ট চিত্র অংকনে নিপুণ, অন্যদিকে বয়ঃসুলভ বাহুল্যের প্রতি আগ্রহী, আবার, বিষয়-বস্তু বা প্রাণীর সংগে অন্তরের অকপট সুনিবিড় সৌহার্দ্যে সাধারণও। এরই ফাঁকে কোনো কোনো কবিতায় কবির মনন-শীলতা প্রকাশ পেলেও (জল, নামকরণ, তর্ক প্রভৃতি দ্রঃ) মোটের উপর আকাশপ্রদীপ মধুর স্বপ্নের আলোছায়ায় দোলায়িত। এই রোম্যান্টিক কল্পনার শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বধূ' চিরবিরহী মানুষের অজানা বিদেশিনীর প্রতি আকর্ষণের দিকটি একালেও প্রকাশ করছে—

সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।
ফিরিছে সে চির-পথভোলা
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।

কিন্তু আকাশ-প্রদীপের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল বাল্যস্মৃতিচারণার সংগে ছড়া ও রূপকথার কল্পচিত্রের উদ্বোধন। ছড়ায় ধ্বনি এবং অপরিস্ফুট অর্থ মিলে শিশুচিত্তে যে-মায়ালোক গ'ড়ে তোলে তার প্রভাব পরিণত বয়সের কবির কল্পলোক-সৃজনের ক্ষেত্রে যৎসামান্য নয়। পূর্বকালেও রবীন্দ্রের অজানা, অচেনা, সুদূরদেশ ও রহস্যময়ী বিদেশিনীর কল্পনায় উন্নততর নব রূপকথাই নির্মিত হয়েছে। ছড়ার সংগে রূপকথার পার্থক্য এই যে, ছড়ার ছবি কাছের জগতের, রূপকথার অজানা লোকের। ছড়া ধ্বনিময় অসংলগ্ন, আর রূপকথা অর্থে ও চিত্রে প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু দুয়েরই রসবস্তু কল্পলোকের ইঙ্গিতবহ। পরিণত কবিচিত্তে এরই সংগে শৃংগার, করুণ, বীর, অদ্ভুত প্রভৃতি রস যুক্ত হয়ে অস্পষ্ট পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। 'মানস-সুন্দরী'র কল্পচিত্র-সমূহ স্মরণ করলে, কি 'উর্বশী'র 'আঁধার পাথারতলে' প্রভৃতি অথবা "নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ"-এর মত বহু চিত্র মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে ছড়া ও রূপকথার সাজাত্যের পরিচয় পুনঃপুন পাওয়া যাবে। এসবকেই আমরা এককথায় রোম্যান্টিক শব্দে চিহ্নিত করতে চেয়েছি। আকাশপ্রদীপের এই জাতীয় রচনাগুলি অবশ্য ছড়াসৃষ্টি নয় ('ছড়া' বা 'ছড়ার ছবি' কিছুটা ঐ জাতীয়) কবির ছড়ার রাজ্যে বিচরণের পরিচয়-বাহী মাত্র। এর মানসিকতাকে কবির বার্ধক্যের বাল্য ব'লে মনে করা যেতে পারে। বাল্যে শোনা ছড়ারাজ্যের ভাব ও স্বপ্ন সংঘাতক্ষুব্ধ বাস্তব জীবন পেরিয়ে বার্ধক্যে ফিকে হয়ে এলেও এগুলির মূল্য যে কমে যায়নি তার প্রমাণ কবির এই

রবীন্দ্রনাথ যে মর্ত্যে শুধু শান্ত শিবের মূর্তিই প্রত্যক্ষ করেননি, সৃষ্টির দুঃখময়তা ও কুশ্রীতা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন তা পূর্বে 'বলাকা' কাব্যে স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন ('দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে ; অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে'—ইত্যাদি, 'ঝড়ের খেয়া' দ্রঃ)। পরবর্তীকালে আমাদের ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার গ্লানি কবিকে যে এ বিষয়ে অধিকতর সচেতন ক'রে তুলেছে তার প্রমাণ বহু কবিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলিকে তিনি স্বীয় আদর্শলোকের মধ্যেই স্থান দিয়েছেন। যেমন ঘটেছে 'জয়ধ্বনি' কবিতায়। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবি এই বাস্তব জীবনের গ্লানি প্রত্যক্ষ করছেন—

যাহা রুগ্‌ণ, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে
আত্মপ্রবঞ্চনাছলে
তাহারে করি না অস্বীকার।

কিন্তু কবির বক্তব্য হ'ল—

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।

'রোম্যাণ্টিক' কবিতায় কবি আরো স্পষ্ট ক'রে বললেন যে বাস্তব রূঢ়তার স্পর্শ তাঁর চিত্তে এসেছে, কর্মের পথে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু তিনি তাকে গ্রহণ করেছেন একটি উদার সর্বগ্রাসী মায়াময় কবিস্বভাবের মধ্যে। সেখানে অভিজ্ঞতাহীন শুধুমাত্র কথার শৌখিন বাস্তব তিনি হতে পারেন নি—

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি— সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম,
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ,
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।

অর্থাৎ কবি সেরূপ ক্ষেত্রে কর্মের আহ্বান এবং দুঃখকে বরণ করার উৎসাহ অনুভব করেন, দূর থেকে পরিচয়হীন বিবৃতি মাত্র দিয়েই ক্ষান্ত হন না। 'জন্মদিনে' কাব্যের 'ঐকতান' কবিতাতেও 'সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি'কে কবি নিন্দা করেছেন। কিন্তু আলোচ্য কাব্যের অন্তত একটি কবিতায় কবি তাঁর কেবল কল্পনাবিলাসী চিত্ত এবং তদনুসারী লেখনীর সমর্থন করেন নি এবং বাস্তব লেখনীর জন্যে আক্ষেপ করেছেন—

সুকুমারী লেখনীর লজ্জাভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা করেনি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে ;
তার সংগীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হল তাই,
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই।

বলা বাহুল্য, কবির আধুনিকতার প্রতি আগ্রহ এবং অতিরিক্ত মানবীয়তাই ক্বচিৎ তাঁকে এহেন আক্ষেপে প্রবর্তিত করেছে, যেমন করেছে, 'ঐকতান' কবিতায়। এবং মনে রাখতে হবে সকল ক্ষেত্রেই কবির সর্বত্র প্রকাশিত মনোভাব হ'ল—

যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষ বাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

কবি লিখেছেন যে নবজাতক তাঁর মননজাত অভিজ্ঞতার ফসল। কিন্তু এ কেবল নবজাতকের পক্ষেই সত্য নয়, সত্য তাঁর শেষ সপ্তকের মত কবিত্বময় প্রৌঢ় কাব্য এবং পত্রপুট সম্পর্কেও। একথা ঠিক যে 'হিন্দুস্থান' বা 'রাজপুতানা' বা 'রোম্যাণ্টিক' কবিতায় পূর্বপরিচিত সেণ্টিমেন্টের স্থানে বুদ্ধিবিচারময় দৃষ্টিকোণের প্রাধান্য ঘটেছে, তবু ভাগ্যরাজ্য, আহ্বান, অস্পষ্ট প্রভৃতি অধিকাংশ কবিতাতেই "দুরাশার দূরতীর্থ আজো নিত্য করিছে ইশারা" এবং 'এপারে-ওপারে'র স্পষ্টবাদী অনুভবের মধ্যেও সেণ্টিমেণ্টের 'আদিম রক্তরাগ' পরিমাণে কম নেই।

একালের মধ্যে সমগ্রভাবে 'সানাই' কাব্যেই আমরা রোম্যাণ্টিক অথচ পরিণত রবীন্দ্রনাথের পুরাতন পরিচিত কবিমানসের সঙ্গে পুনরায় পরিচিত হয়েছি। এ কাব্যে কোথাও পুরানো দিনের অনুরাগের স্মৃতি, কোথাও সুদূরের অন্বেষণ, কোথাও বিহ্বল মন নিয়ে প্রকৃতির ক্ষণিক মাধুর্যরস আস্বাদন, কোথাও তাঁর বহুবর্ণিত লীলাসঙ্গিনীর পরিচয় বিভিন্নকালের কয়েকটি কবিতার মধ্যে প্রকাশ লাভ করেছে। 'সানাই' বহুল পরিমাণে কবির মননশীলতা থেকে মুক্ত, আর এখন থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত উজ্জ্বল সহজ

কাব্যরসের পালী একথা বলা যায়। সানাইয়ের প্রথম মুদ্রিত কবিতাটি সুদূরের পিপাসা দিয়ে আরম্ভ—'সুদূরের পানে চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি'। বাউল-সাধকদের কল্পনাভঙ্গি আশ্রয় ক'রে কবি পূর্বেকার সুরে বলছেন—

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে ;
আজিও চলেছি তার টানে।
বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।

তাঁর সানাইয়ের মূলসুরের কথা বলতে গিয়ে কবি প্রকৃতিগত রসলোকের বা বিরহের অরূপলোকের কথাই উল্লেখ করলেন যা পূর্বে ধীরে ধীরে উৎসর্গ-খেয়াতে পরিস্ফুট হয়ে গীতাঞ্জলি-গীতালির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এই সুর বাস্তব মর্ত্যকে অবলম্বন ক'রেও অতিমর্ত্যের জন্যে ব্যাকুল হয়—

চেনার সীমানা হতে দূরে
যার গান কক্ষচ্যুত তারা
চিররাত্রি আকাশেতে খুঁজিছে কিনারা।

এই 'সৃষ্টির প্রথম গূঢ়বাণী' রূপের মধ্যেই অরূপের অনুসন্ধানে তৎপর হয় ও মহাকাশের সৃষ্টির বিস্ময়ে স্পন্দিত হয়—

তারায় তারায় শূন্যে হল রোমাঞ্চিত,
রূপেরে আনিল ডাকি
অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃসীমা আঁকি।

বিশ্বের বহুবিচিত্রতার ও অসংগতির মধ্যে যে একটি অনির্বচনীয় ঐক্যের সুর প্রচ্ছন্ন রয়েছে, কবির এই বহুশ্রুত উপলব্ধির কথা 'সানাই' কবিতার মধ্যে নূতন ক'রে কবি আমাদের জানালেন—

অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।

* * *

অমর্তলোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।

এই রোম্যাণ্টিক সুরের প্রকৃতি নির্দেশ করতে কবি সৃষ্টির মহাকাশ-রহস্য-লোকে প্রবেশ করতে চেয়েছেন এবং সায়াহ্নেও তাঁর সেই অপরিবর্তন কবি-

মানসের কথা আমাদের গোচর করেছেন। বিজ্ঞান-প্রদত্ত জ্ঞানকেও কবি মায়া রচনার কাজে লাগিয়েছেন—

কতবার মনে ভাবি, কী যে সে কে জানে।
মনে হয়, বিশ্বের যে মূল উৎস হতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে,
এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল —ইত্যাদি।

এই রসোপলব্ধির মুহূর্তের বিস্ময়-বিহ্বল কবিমানসের স্বরূপ বিবৃত করতে গিয়ে কবি লৌকিক বাস্তবের সীমা থেকে মুক্তির কথাই জানিয়েছেন—

নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে

এ কাব্যে রোম্যান্টিক মন নিয়ে কবি কখনো কল্পিত প্রিয়ার সন্ধানে প্রাচীন-কালে ফিরে গেছেন, কখনো খেয়া-গীতাঞ্জলির কালের মত কঠোর আঘাতে প্রবুদ্ধ হবার বাসনা করেছেন, কখনো বা অপরিচয়ের বিস্ময়ে ও নিজ অসম্পূর্ণতার বেদনায় অধীর হয়েছেন। বিশ্বের বস্তু ও মানুষের স্বরূপ অনুভব করার আগ্রহ এবং অপরিচয়ের বিস্ময়মিশ্রিত বেদনা রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষের কাল থেকেই দেখা যায়।

এই অজানার বেদনা ও বিচ্ছেদবিরহ নিয়েই রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাব। চৈতালির প্রকৃতি ও মানবপ্রীতির মধ্যে মানুষকে না জানার বেদনা বাস্তব আধারেই পরিস্ফুট হয়েছে।

পরম আত্মীয় ব'লে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।

এই ভাবটি চৈতালির কয়েকটি কবিতার মধ্যে নানা রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এর পর ধীরে ধীরে কবির নিজ অজানা স্বরূপের বিষয়ে প্রশ্ন জেগেছে এবং একাল পর্যন্ত তা প্রসারিত হ'লেও মানুষ সম্পর্কে রহস্য অন্বেষণের শেষ হয়নি। পুনশ্চর 'সাধারণ মেয়ে', 'একজন লোক', শেষ সপ্তকের উনিশ সংখ্যক ('ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী, যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে') কবিতা, সানাইয়ের 'জ্যোতির্বাষ্প' ('হে বন্ধু, সবার চেয়ে চিনি তোমাকেই, এ কথায় পূর্ণ সত্য নেই'), শ্যামলীর 'অকালঘুম' প্রভৃতি এই শ্রেণীর। পূর্বে উল্লিখিত সেঁজুতির 'পত্রোত্তর' কবিতার 'চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক রহে বিরাট নিরুত্তর' প্রভৃতির মধ্যে এই প্রশ্নকেই কবি ব্যাপকভাবে গ্রহণ ক'রে

নিজস্ব একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। নবজাতকের 'ভাগ্যরাজ্য' কবিতায় কবি যে পুরাতন হতে পারেন না তার কারণরূপে এই চিরন্তন অসম্পূর্ণতা ও অসন্তোষের কথা তুলেছেন—

সেই শেষ না-জানার
নিত্য নিরুত্তরখানি মর্মমাঝে রয়েছে আমার,
স্বপ্নে তার প্রতিবিম্ব ফেলি
সচকিত আলোকের কটাক্ষে সে করিতেছে কেলি।

এই সকল এবং শেষ সপ্তকের "যারা বললে 'জানি', তারা জানল না" এবং শেষ লেখার 'কে তুমি। মেলেনি উত্তর।' প্রভৃতি এক সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের অতাত্ত্বিক যথার্থ কবিমানসকে বুঝতে হবে।

সানাইয়ের মুক্ত কবিস্বভাবের মধ্যে বহুপূর্বেকার বিস্মৃত ভাব-ব্যাকুলতায় প্রত্যাবর্তনের পরিচয় সর্বত্রই রয়েছে। 'মানসী' কবিতায় কবি তাঁর পূর্ব-জীবনের পদ্মাতীরের নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যপ্রেরণা বা অজ্ঞাত সুদূরের আকর্ষণ —'অগোচর চরণের স্বপ্নে আনাগোনা'র কথা উল্লেখ ক'রে বলছেন যে সেই শ্রান্তিহীন অনুসন্ধান অধুনা বাণীরূপের মধ্যে প্রকাশক্ষমতা হারিয়ে ফেললেও চেতনার মধ্যে এখনো লুপ্ত হয়ে যায়নি—

বাহিরেতে বাণী মোর হল শেষ,
অন্তরের তারে তারে ঝংকারে রহিল তার রেশ।

'মায়া' কবিতায় যুগান্তরের প্রিয়ার অনুসন্ধানে কবির পুরাতন বিরহী মনোভাবই প্রকটিত হয়েছে এবং মানসী নামে অপর এক কবিতায় কবি তাঁর অচেনা প্রেয়সীর কথাই বলতে চেয়েছেন। মোটের উপর 'সানাই' কাব্যে 'ক্ষণিকা-কল্পনা' কালের মত সৌন্দর্য ও প্রণয়-স্মৃতির মধ্যে বিচরণের আগ্রহ স্পষ্ট।

কবিকল্পিত রহস্যময়ী মানসসুন্দরী বা কবির কৈশোর-যৌবনের মুক্তির সঙ্গিনী, দীর্ঘ অরূপানুভূতির পর্যায়ের মধ্যে গোপনচারিণী হয়ে পুরবীর লীলাসঙ্গিনীরূপে দেখা দিয়েছিলেন। এই বিদেহী নারীমূর্তি এখনো কবিকে কী পরিমাণ প্রেরণা দিচ্ছেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি 'শেষ অভিসার' কবিতায় তাঁর কৈশোর ও শেষ কাব্যজীবনের সঙ্গে এর সংযোগ বর্ণনা করছেন—

দুর্যোগের ভূমিকায় তুমি আজ এলে
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে।
জন্মের আরম্ভপ্রান্তে আর একদিন
এসেছিলে অম্লান নবীন
বসন্তের প্রথম দূতিকা,
এনেছিলে আষাঢ়ের প্রথম যূথিকা

অনির্বচনীয় তুমি।
মর্মতলে উঠিলে কুসুমি'
অসীম বিস্ময়-মাঝে, নাহি জানি এলে কোথা হতে
অদৃশ্য আলোক হতে সৃষ্টির আলোতে।
তেমনি রহস্যপথে, হে অভিসারিকা,
আসিয়াছ তুমি ; ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের শিখা
কী ইঙ্গিত খেলিতেছে মুখে তব,
কী তাহার ভাষা অভিনব।

এই পূর্বেকার স্বপ্নলোকবাসিনী কামনার মূর্তিকে দেখবার আগ্রহ অধুনা কী প্রবল তা বোঝা যায় বাস্তব নারীর মধ্যেও ঐ সত্তাকে প্রত্যক্ষ করার অভিলাষে। 'নারী' কবিতার নারীস্তুতির মধ্যে এই ভাবের প্রকাশ দেখা যায়—

উদ্ভাসিত ছিলে তুমি, অয়ি নারী, অপূর্ব আলোকে
সেই পূর্ণলোকে—
সেই ছবি আনিতেছে ধ্যান ভরি
বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্যসহচরী।

এমনকি 'অধীরা' 'অনসূয়া' প্রভৃতি কবিতাতেও নারীরূপের মধ্যে কবি কল্পিত আদিম সৌন্দর্যময়ীর পরিচয়ই ব্যক্ত করেছেন—

মুক্তবেণীতে, স্রস্ত আঁচলে,
উচ্ছৃঙ্খল সাজে
দেখা যায় ওর মাঝে
অনাদিকালের বেদনার উদ্বোধন—
সৃষ্টিযুগের প্রথম রাতের রোদন।

সানাইয়ের এই শ্রেণীর একটি কবিতায় ('বিপ্লব') কবির বাস্তব জীবন-বরণের মনোভাব মিশ্রণে অপূর্ব কাব্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। কবিতাটিতে কবি তাঁর ঐ কল্পনার সহচরী, অমর্ত্য-আনন্দের দূতীরই অত্যন্ত ভিন্ন রূপ অনুভব করেছেন। এখানে আর তিনি সৌন্দর্যময়ী রহঃসখী নন, ভীষণের সংকেতদাত্রী। আমাদের মনে হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কবি-কল্পলোকে যে বন্ধনমুক্তির ও দুঃসহকে বরণ করার উৎসাহ জাগিয়েছিল এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতেও পারে। তবে কবির কল্পনা-শক্তির সংবরণ এবং প্রকাশ-শক্তির ক্ষীণতা অনুভবের প্রতিঘাতেই কবিতাটির জন্ম সন্দেহ নেই। রূপে, কল্পনায় ও ব্যঞ্জনাগুণে এটি তাঁর প্রথম শ্রেণীর রচনা। কবি তাঁর কল্পনারীমূর্তিকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন,—নটরাজের তাণ্ডবের ছন্দে তোমার অপরূপ সৌন্দর্যের উপকরণ বিস্রস্ত হ'ল, আভরণশূন্য ভীষণরিক্ত রূপ এখন সৌন্দর্যপিপাসুকে অবজ্ঞা করছে, তোমার মোহমত্ততার পালা এখন উদ্‌যাপিত হ'ল।

সুতরাং, কবি জানেন, এখন তাঁর চিরকালের বিরহস্বপ্নের জালবোনাও ক্ষান্ত হ'ল—

প্রান্তে তার ব্যর্থ বাঁশিরবে
প্রতীক্ষিত প্রত্যাশার বেদনা যে উপেক্ষিত হবে।

তিনি স্পষ্টভাবে বুঝলেন, এ ঔদাসীন্য বা ছলনা নয়, এ যথার্থ ভীষণতা, এ নির্মম সংকেত, এ কাব্যসঙ্গিনীর আত্যন্তিক বিচ্ছেদ—

এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি, নহে বিস্মরণ,
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্যের প্রচণ্ড মরণ,

কবির কাব্যস্বপ্নের কর্ত্রীর, সৌন্দর্যের দূতীর যখন এই অভিলাষ, তখন কবিও তাকে ফিরিয়ে আনার সাধনা আর করবেন না, কাল্পনিক সৌন্দর্যের মোহরাজ্য ত্যাগ ক'রে পরুষজীবন ও তার প্রতি অনুরাগের বাণীই বহন করবেন—

তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল বিনতি,
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণতলে ক্রূর বালুকারে।

পূর্বেকার মত এখানেও অবশ্য কবিচিত্তের দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় রয়েছে,—একদিকে অমর্ত্য রসবাসনা, আর একদিকে বাস্তব জীবন-চেতনা। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে স্বপ্নাতুর কবির কাল্পনিক বেদনাও স্বতই যুক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু কবি ছলনাময়ীর ছলনার স্বরূপ বুঝতে পেরে সাহসিকতার সঙ্গে অনায়াসেই রূপরসহীন জীবনকে গ্রহণ করবেন, তাই বলছেন—

আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ
আমার ব্যথার কেন্দ্র করিছে সন্ধান।
সেই লক্ষ্য তব
কিছুতেই মেনে নাহি লব,

কবিতাটির শেষে অজ্ঞাত-স্বরূপ রহস্যময়ীর নির্দেশ অনুধাবনের কথা কবি অপূর্ব সাংকেতিকতার মধ্যে ব্যক্ত করেছেন—

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথগগনে—
হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিত কঙ্কণে।

সায়াহ্নের কবির ভাষার কী অপরূপ শক্তি! এই অনবদ্য রূপ-নির্মাণে এবং অভিপ্রেত ব্যঞ্জনার কার্যেই রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত শক্তিশালী কবি। বিশিষ্ট

সংকেত-ধর্মের উপযোগী বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গির জন্যই রবীন্দ্রনাথ অননুকরণীয় রবীন্দ্রনাথ।

বহুপূর্বে কল্পনাশীলতার মধ্যে কবির কর্মমুখর বাস্তবতায় উত্তরণের একটি বিশেষ চিত্র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় আমরা পেয়েছিলাম। তারপর একটি নিগূঢ় উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত কবির সংগ্রামী জীবন বরণের সাংকেতিক রূপ দেখেছি বলাকায়। এখনও দেখি, গোধূলিতে অবতীর্ণ হয়েও কবি স্বপ্নবিলাস থেকে মুক্তির বলিষ্ঠ মনোভাব জানাতে বিরত হননি। এমনকি তাঁর কাব্যজীবনদীপ নির্বাপিত হবার অব্যবহিত পূর্বেও—

রূপনারানের কূলে,
জেগে উঠিলাম ;
জানিলাম, এ জগৎ
স্বপ্ন নয়—

প্রভৃতির মধ্যে জীবন, কর্ম ও দুঃখবরণের একই সুর প্রবাহিত ক'রে আমাদের বুঝিয়েছেন যে তাঁর জীবনদর্শন একটি স্থায়ী স্বকীয় উপলব্ধির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এ কবিতা ভঙ্গিতে নূতন এবং স্বাদে পুরাতন হয়েও যে স্বরূপ পৃথক্ তা বলাই বাহুল্য। 'রূপনারানের কূলে' এই গূঢ় সংকেত-চিত্রে এই নবীনতা পরিস্ফুট হয়েছে।

একালে স্থানে স্থানে প্রকাশিত রোম্যান্টিক বিরহের মধ্যে স্বভাবতই মেঘদূতের যক্ষের কথা কয়েকবার কবির মনে হয়েছে। কবি যদিও তাঁর যৌবনের কল্পিত চিরবিরহের কথাই এখানে বলেছেন, তথাপি বিশেষ এই যে, বিরহের মধ্যে এখন কবি মুক্তির আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। পুনশ্চর 'বিচ্ছেদ' কবিতায় বিরহীকে গতির আনন্দে উৎসুক ব'লে কবি কল্পনা করেছিলেন। যক্ষকে কোনো অপূর্ণ সত্তার সঙ্গে তুলনা ক'রে ঐ অপূর্ণের পূর্ণতার পথে নিত্য চলমান অবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে মিলনে তার আনন্দের উদ্ভব হয় ব'লে কবি এখানে ধারণা করেছেন এবং এই গতির আনন্দকেই তিনি মূল্য দিয়েছেন—

অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্যায়।

আবার পূর্ণকেও কবি অচল ব'লে মনে করতে পারেন নি। যক্ষপত্নীকে পূর্ণ সৌন্দর্য-সত্তা কল্পনা ক'রে তার প্রতীক্ষমাণ অস্থির অবস্থাকে মানসিক গতিধর্মে মূল্যবান্ ক'রে দেখেছেন। যক্ষ-সম্বন্ধে লেখা শেষ-সপ্তকের আটত্রিশ সংখ্যক কবিতায় কবি বিরহের জয়ধ্বনি দিয়েছেন প্রেমকে ব্যাপক করার শক্তির দিক থেকে—

এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে।'
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাপড়িগুলি,
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।

এখানে কবির যে-মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে শ্যামলীর 'বাঁশিওআলা' কবিতার বিরহজনিত সৃষ্টির উপলব্ধি তুলনীয়।

সানাইয়ের 'যক্ষ' কবিতায় 'বিরাট দুঃখের পথে আনন্দের ভূমিকা'-রূপ এই বিশ্বসৃষ্টির কল্পনা ক'রে কবি স্বর্গলোকবাসিনী বিরহিণী পূর্ণার দুঃখানন্দবঞ্চিত দুঃসহাবস্থা অনুমান করেছেন—

নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড়ো শোক
নাই মর্ত্যভূমে

তুলনায় স্বর্গ অপেক্ষা মর্ত্যকে কবি গৌরবান্বিত করেছেন এবং কল্পনা করেছেন, প্রভুর শাপ বর হয়ে যক্ষের বিরহরূপে ঐ পূর্ণার দ্বারে করাঘাত করছে—মর্ত্যের মাটিতে তাকে নামিয়ে এনে মর্ত্যের প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত ক'রে যদি তার ঐ অসহনীয় বিরহকে আনন্দরসে সম্পৃক্ত করা যায়। এই কবিতাটির মূলে বলাকার গতি ও আনন্দের তত্ত্ব, বহু পূর্বেকার বিরহ-কল্পনা এবং মর্ত্য ও স্বর্গের পার্থক্য সম্পর্কিত বিশিষ্ট কল্পনা নিহিত রয়েছে।

'নবজাতকে'র মত উল্লেখযোগ্য না হ'লেও সানাইয়ের কয়েকটি কবিতায় চরণক্ষেপ স্থানে স্থানে অসমান হয়েছে।

'জন্মদিনে' কাব্যের নয় সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর অতি সহজ কাব্যচেতনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সাংকেতিক বর্ণনা দিয়েছেন—

মোর চেতনায়
আদিসমুদ্রের ভাষা ওংকারিয়া যায়;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।
শুধু ছলছল কলকল;
শুধু সুর, শুধু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল;

ঐ কবিতাটিতে কবির স্বরূপগত বক্তব্য যাই হোক, শেষ চারটি কাব্যের

সহজ ও স্পষ্ট অনুভূতিতে এবং ততোধিক সহজ প্রকাশ-ভঙ্গিমায় সায়াহ্নের কবি যেন যথার্থই অনায়াস কাব্যবাণীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। 'রোগশয্যায়' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত চারটি কাব্য ওদের প্রকাশভঙ্গির সারল্যে ও সংযমে পাঠকের মনকে প্রথমেই বশীভূত করে ফেলে, আর সেই সঙ্গে বিদায়গ্রহণোৎসুক কবিমানসের স্বচ্ছ ও নির্লিপ্ত প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ এবং সংকোচহীন আত্ম-বিচারণায় অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে আন্দোলিত করে। এই ক'টি কাব্যে পূর্বেকার কল্পনার বিশালতা, অজ্ঞাত রহস্যের তীব্র অনুসন্ধানস্পৃহা, অসম্পূর্ণতায় প্রবল আক্ষেপ বা নবতর জীবনকে গ্রহণ করার দার্শনিক অভিলাষ কোথাও কোথাও প্রকাশিত হয়নি এমন নয়, যাত্রার ক্ষুধাও হয়ত কয়েকটি কবিতায় লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু এ সকল এমন নিরলংকার সহজতায় মণ্ডিত হয়েছে যে কবির সঙ্গে পাঠকের মিলন হতে মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। আর, একাধারে কবির ঐকান্তিক মানবানুরাগ, তুচ্ছতম বস্তু বা দীনতম মানুষের প্রতি অকুণ্ঠিত সহানুভূতি এবং বারংবার পৃথিবী ত্যাগ করার কথা পাঠককে বিদায়ী কবির প্রতি মমত্বেও পূর্ণ করে তোলে। বস্তুত একেবারে শেষের এই লেখাগুলিতে আমরা একজন সত্যনিষ্ঠ ও সমবেদনাপূর্ণ স্বভাবকবিকে পেয়েছি।

রোগশয্যায় লেখা চার-সংখ্যক কবিতাটিতে কবিমানসের বিদায়বোধ এবং আকর্ষণের দ্বন্দ্বের দিকটি কারুণ্যে উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশিষ্ট জীবন-উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত স্বপ্নপ্রিয় মর্ত্যপ্রেমিক কবি কালের দাবি স্বীকার ক'রেও প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

> যেথা তব রথ
> শেষ চিহ্ন রেখে যায় অন্তিম ধূলায়
> সেথায় রচিতে দাও আমার জগৎ।
> অল্প কিছু আলো থাক্,
> অল্প কিছু ছায়া,
> আর কিছু মায়া।

আবার কোনো ক্ষেত্রে যাত্রার আগ্রহ যখন প্রবল হয়েছে, তখন সাধকের মতই নাম ও কীর্তির বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হতে চেয়েছেন এবং নবজন্ম ও নব-চৈতন্যের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। তিনি যথার্থ কবি ব'লেই তাঁর স্বভাবের একদিকে এই দ্বৈত চিরকালই প্রকাশ পেয়েছে। পঁয়ত্রিশ সংখ্যক কবিতায় আত্মসচেতন কবি 'বলছেন—

> তেমনি জীবন মোর মুক্ত হোক
> অতীতের বাষ্পজাল হতে,

সদ্যনবজাগরণ দিক্ শঙ্খধ্বনি
এ জন্মের নবজন্মদ্বারে।

*　　*　　*

আয়ুস্রোতে ভাসি যবে আঁধারে আলোতে,
তীরে তীরে অতীত কীর্তির পানে
ফিরে ফিরে না যেন তাকাই ;

কখনো কবির বাস্তব অভিজ্ঞতায় জীবন ও মৃত্যুর রহস্যসম্পর্কটি যেন তাঁর কাছে পরিস্ফুট দিবালোকে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। ইতিপূর্বে অরূপোপ-লব্ধির কালে কবি কল্পনায় মৃত্যুকে জীবনের সঙ্গে যে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত দেখেছিলেন এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনের পূর্ণতার যে ইঙ্গিত লক্ষ্য করে-ছিলেন, এখন সেই রহস্য তাঁর কাছে যেন আরও সহজ ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এই মনোভাবের পরিচয় রয়েছে সাঁইত্রিশ সংখ্যক ক্ষুদ্র কবিতাটিতে—

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত,
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা ;
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ ;

দুই সংখ্যক কবিতায় জীবন-মৃত্যুর, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের, পাওয়া ও ফাঁকির রহস্যসম্পর্কটি বলাকার কালের মত এখনকার কবির মনেও জিজ্ঞাসার উদয় করেছে—

চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা,
খোলা আর ঢাকা,
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্বপ্রবাহে—
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।

রুগ্ণাবস্থায় লেখা কয়েকটি কবিতার কল্পনায় ও ভাষাভঙ্গিতে তাপদগ্ধ অথচ দুঃখজয়ী কবিমানসের সাংকেতিক পরিচয় বিন্যস্ত হয়েছে। কবির রোগাক্লিষ্ট মন সহজেই তাঁর পূর্ব-উপলব্ধ সার্বজনীন বিশ্বগত দুঃখের কল্পনায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর ভঙ্গিটি রুগ্ণমানসের স্বকীয়, যেমন—

পীড়নের যন্ত্রশালে
চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে

কোথা শৈলশূলে যত হতেছে কংকৃত,
কোথা ক্ষতরক্ত উৎসারিছে।
এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া
রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লাবিত।

একালের অসংকোচ সারল্যের মধ্যে এই ধরনের কয়েকটি কবিতায় প্রয়োজনবশে কবিকে প্রচ্ছন্ন রূপকের এবং শব্দগত লাক্ষণিকতার ও ব্যঞ্জনাশক্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে। রাত্রি সম্পর্কে লেখা নয় সংখ্যক কবিতায় রাত্রির মধ্যে কবি যে-অসম্পূর্ণতা ও বিকৃতির কল্পনা করেছেন তা তাঁর 'অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস' তারই প্রতিফলিত মূর্তি। এ 'রাত্রি' কল্পনাযুগের অবগুণ্ঠিতা রহস্যময়ী শ্যামাসুন্দরী নয়, এবং এর মধ্যে সৃষ্টির আনন্দও সঞ্চিত হয়নি,—সৃষ্টির অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা, অপূর্ণতার যাবতীয় দুঃখ ও হাহাকার পুঞ্জীভূত হয়েছে—

পঙ্গু উঠিতেছে কাঁদি নিদ্রার অতল-মাঝে,
আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা বিগলিত লৌহগর্ভ হতে
গোপনে উঠিছে জ্বলি শিখায় শিখায়।

বলাকা রচনার কালে গতিধর্মী কবি স্থিতির বাধাকে বীভৎস ও ভয়ংকর ব'লে বর্ণনা করেছেন। এখানে রাত্রির বর্ণনাতেও অনুরূপ মনোধর্মের প্রকাশ দেখা যায়—

আদি মহার্ণব-গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে

একালের কয়েকটি কবিতায় আলোকের প্রতি কবির তীব্র আকর্ষণ, ফলত আলোক-বন্দনা লক্ষ্য করা যায়। তিনি স্বভাবতই জ্যোতিঃ বা আলোকের প্রার্থী হ'লেও রুগ্ণাবস্থার বিশেষ দৈহিক ও মানসিক কারণে আলোকের অধিকতর অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। অন্ধকারের প্রতি বর্তমানের তীব্র বিরাগও এই কারণে ঘটেছে এমন ধারণা অসংগত নয়। নবজাতকের 'রাত্রি' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে মিলিয়ে দেখার যোগ্য। পূরবীর 'সাবিত্রী'ও লক্ষণীয়।

বিশ্বগত দুঃখ ও বিপ্লবের মধ্যে যে কালের কল্যাণকর শান্তিবিধান প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তদানীন্তন যুদ্ধের পটভূমিতে এবং অসুস্থতার আঘাতে কবি তা নূতন ক'রে উপলব্ধি করলেন—

জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা
সুতীব্র অক্ষমা।

এবং এর মধ্যেই যে পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত রয়েছে সেই বহুকালপূর্বের উপলব্ধিকে নূতন ভাষায় অনায়াসে প্রকাশ ক'রে বললেন—

গুঁড়াবে অবাধ্য মাটি, বাধা হবে দূর,
বহিয়া নূতন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর।
হে অক্ষমা,
সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা;

একালে আধুনিক সাহিত্যের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রোম্যাণ্টিক কবিমানসের সংঘাত দেখা দিয়েছে। 'রোগশয্যায়' কাব্যের কয়েকটি মননধর্মী কবিতায় কবি তাঁর কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করেছেন, যেমন করেছেন একালে লেখা ঐ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধে বা আলোচনায়। একুশ সংখ্যক কবিতায় কবি গোলাপ ফুলকে দেখে প্রশ্ন করছেন যে সৃষ্টিতে যদিচ নিরঞ্জন সত্যই প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেখানে সুন্দর বা কুৎসিত-এর বৈষম্যের মাপকাঠি নেই এমন বলা হয়,—তা জ্ঞানের দিক থেকে বিবেচিত আপেক্ষিক সত্য মাত্র, বোধের দিক থেকে প্রমাণিত পূর্ণ সত্য নয়। ঐ সময়কার আধুনিক কবিরা ভিক্‌টোরীয় যুগের কবিদের তথা রবীন্দ্রনাথকেও সেণ্টিমেণ্ট সহ বাছাই-করা সুন্দরের উপাসক ব'লে নিন্দা করেন। রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই এবিষয়ে প্রবন্ধাকারে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে ছিলেন (সাহিত্যের পথে দ্রঃ)। এখানে আত্মগত ভাবে ঐ বিষয়ে চিন্তা করেছেন। কবি প্রশ্ন করছেন, যে-শক্তি বিশ্বের সমস্ত কিছুর প্রকাশের মূলে—

সে কি অন্ধ, সে কি অন্যমনা,
সেও কি বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর মতো
সুন্দরে ও অসুন্দরে ভেদ নাহি করে—

শেষে সমস্ত সংশয়ের নিরসন করেছেন জ্ঞানের তর্ককে অধিকদূর অগ্রসর না হতে দিয়ে—

আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—

দেখা যায়, সানাইয়েও কবি কয়েকবারই এই অস্তি ও নাস্তি, আশা ও নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে তাঁর কল্পনাশীল কবি-মানসকেই সম্মুখে স্থাপন করেছেন ('অনসূয়া' ও 'অত্যুক্তি' দ্রঃ)। বস্তুত প্রত্যক্ষদৃষ্ট সৃষ্টির সুন্দর-অসুন্দর দুঃখ ও সুখ কবির কল্পলোকে একটি বিশেষ ঐক্যানুভূতিগত সৌন্দর্যের রূপেই প্রতিভাত হয়েছে। তাই সৃষ্টির কেবল রুগ্‌ণতা ও কুশ্রীতার রূপকেই তৎকালে যাঁরা অঙ্কিত করতে চেয়েছেন, কবিকুলগুরু তাদের মৃদু ভর্ৎসনা ক'রে যথার্থ কাব্যের পথ নির্দেশ করেছেন, যেমন—

আজিকার অরণ্যসভারে

অপবাদ দাও বারে বারে ;
বল যবে দৃঢ়কণ্ঠে অহংকৃত আপ্তবাক্যবৎ
প্রকৃতির অভিপ্রায়, 'নব ভবিষ্যৎ
করিবে বিরলরসে শুষ্কতার গান'—
বনলক্ষ্মী করিবে না অভিমান। (একত্রিশ)

অথবা, কণ্ঠ আর একটু উচ্চ ক'রে—

সে যদি অমান্য করে বিদ্রূপের বাহক সাজিয়া
বিকৃতির সভাসদ্‌রূপে
চিরনৈরাশ্যের দূত,
ভাঙা যন্ত্রে বেসুর ঝংকারে
ব্যঙ্গ করে এ বিশ্বের শাশ্বত সত্যেরে,
তবে তার কোন্ আবশ্যক।

* * *

রুগ্‌ণ যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা ব'লে জানি। (চব্বিশ)

এই কারণে সাধারণ মানুষের কবি হয়েও এবং মানুষের দুঃখের দিকটিকে স্বীকার ক'রেও দুঃখ উত্তরণের আদর্শমূল্যেই তিনি মানুষকে মহিমান্বিত করেছেন। উনত্রিশ সংখ্যক কবিতায় তাঁর এই মূল্যবোধ পরিস্ফুট হয়েছে—

দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে
মানবেরে দেখি যবে নিরুপায়,
ভাবিয়া না পাই মনে,
সান্ত্বনা কোথায় আছে তার।

* *

মানবচিত্তের সাধনায়
গূঢ় আছে যে সত্যের রূপ
সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত

যে-কবির কাব্যে রূঢ়তম পারিপার্শ্বিকের মধ্যবর্তী দীনতম মানুষের জীবন চিত্রিত হয়েছে,—শালিখ, চড়ুই পাখি, বেজি, এমনকি রাস্তার কুকুরটাও যাঁর কাব্যগত সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি, তিনি কোন্ রসবিচারের মানদণ্ডে যথার্থ কাব্যের চিরন্তন সৌন্দর্যমূল্য সম্পর্কে নিঃসংশয় তা পাঠকের চিন্তনীয়।

রুগ্‌ণাবস্থার পর 'আরোগ্যে' যেন কবি তাঁর পুরাতন অথচ চিরনবীন কাব্য-জীবন নিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি বহির্জীবন সম্পর্কে সমস্ত সংশয়,

সত্য-অসত্য সম্পর্কে অবশিষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব ত্যাগ ক'রে কবিহৃদয়ের অনুরাগ অথচ কবিসুলভ নির্লিপ্ত মন নিয়ে পৃথিবী, তাঁর পারিপার্শ্বিক ও বিশেষভাবে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আরোগ্য কাব্যে সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু হ'ল আদিম ও সহজ চেতনার সঙ্গে জড়িত আস্বাদনবিশেষের আনন্দ। 'জন্মদিনে' কাব্যে যদিও এই অনাবিল আনন্দস্পর্শ ও সারল্য থেকে কবি আমাদের বঞ্চিত করেন নি, তথাপি ঐ কাব্যটি মোটামুটি সৃষ্টি-সত্তার বিস্ময় ও জীবনস্মৃতি বিষয়ক এবং ওতে তীব্র মানবীয়তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কবির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মননশীলতাও প্রকাশ পেয়েছে।

আরোগ্যের প্রথম তিনটি কবিতা কবির আলোকে মুক্তির অবারিত আনন্দোচ্ছ্বাসে স্পন্দিত এবং সত্য ও জ্যোতির সেই কল্পনায় মিশ্রিত যা একান্তভাবে রবীন্দ্রানুগত। এখানকার অনায়াসলব্ধ ভাষার প্রসাদগুণে কবিমানসের অকৃত্রিম সহজ অনুভূতির সূচক—

মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।
আকাশের হৃৎস্পন্দন
পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।
প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি
বন হতে বনে।

নিসর্গ-বিমুগ্ধ কবিচিত্তের সহজ অনুভবের এর চেয়ে অবারিত প্রকাশ আর কী হতে পারে? লক্ষ্য করতে হবে এই শেষ তিনটি কাব্যে কবি গদ্যকবিতায় ছয়, আট, দশমাত্রার পর্বকেই তাঁর অনুভূতির উপযুক্ত বাহক ব'লে গণ্য করেছেন অর্থাৎ মিলহীন পুরাতন প্রবহমান ছন্দেই কাব্যরচনা করেছেন। কবিচিত্তের এই অনুভব মন্ত্র, আনন্দ প্রভৃতি শব্দ সহযোগে প্রকাশ পেলেও কবিকে উপনিষদের বাণীবাহক ব'লে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না, কারণ উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টারা ব্রহ্মানন্দ চেয়েছিলেন, কবি চান মর্ত্যরসানুভূতি।

বিশুদ্ধ প্রকৃতিরসানন্দের পরিচয় আরোগ্যের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত রয়েছে। তিন সংখ্যক কবিতায় পুরাতন প্রীতিরসে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত পদ্মাতীরের স্বভাববর্ণনা এবং উপসংহারে কবির প্রকাশের দৈন্য-খ্যাপন একালেও তাঁর অন্যনিরপেক্ষ প্রকৃতি-মাধুর্য আস্বাদনের গভীরতা প্রমাণ করে—

ভাষা নাই, ভাষা নাই;
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।

'ঘণ্টা বাজে দূরে' এই শ্রেণীর অবিমিশ্র প্রকৃতি-প্রীতির অন্যতম কবিতা

পড়লে সন্দেহ জাগে ছিন্নপত্র-চিত্রার যুগে কবি আবার ফিরে গেলেন কিনা। কবিতাটির শেষে কবি বলছেন যে এই তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষণিকের প্রতি অনুরাগ তাঁর বিচ্ছেদবেদনার সঙ্গে জড়িত। আবার এরই সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাঁর মানবানুরাগ, শেষ প্রীতির প্রার্থনায় করুণ—

যারা কাছে এসেছিল, যারা চলে গিয়েছিল দূরে,
তাদের পরশখানি রয়ে গেছে মোর কোন্‌-সুরে।
অন্যমনে কারে চিনি নাই,
বিদায়ের পদধ্বনি প্রাণে আজ বাজিছে বৃথাই,
হয়তো হয়নি জানা ক্ষমা ক'রে কে গিয়েছে চলে
কথাটি না ব'লে।
যদি ভুল ক'রে থাকি তাহার বিচার
ক্ষোভ কি রাখিবে তবু যখন রব না আমি আর।

এই প্রসন্ন সহজ মানবপ্রীতির বশেই 'ওরা কাজ করে' কবিতাটি লেখা হয়েছে। কবি তাঁর বহু কবিতার মধ্যেই কালের গতির সঙ্গে রাষ্ট্রের উত্থান-পতন পর্যবেক্ষণ করেছেন। দেখেছেন, বিশ্বজোড়া প্রতাপের খেলা যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি ক্ষমতালোভী ও যান্ত্রিকতাগ্রস্ত মানুষ ব্যর্থ। কিন্তু যারা মাটির কাছাকাছি আছে, যাদের সুখে দুঃখে প্রবাহিত জীবনধারা ও কাজ পৃথিবীকে মধুর ক'রে রেখেছে, সেই ত্যাগী প্রেমিক ও সহিষ্ণু মানুষই সত্য ও চিরন্তন। দ্বিতীয় যুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতায় ব্যথিতচিত্ত কবি স্বাভাবিকভাবেই দুঃখজীবী সাধারণ মানুষের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন—যে-মানুষ অন্যায্য ও নিষ্ঠুর ভাঙনের খেলায় উন্মত্তভাবে যোগ দেয় না, যারা নির্বিবাদে দুঃখ সহ্য করে, অকাতরে প্রাণ দেয়, অথচ বিশ্বের কল্যাণরূপ রচনা ক'রে চলে। ক্ষমতা ও লোভের প্রতীক ধনতান্ত্রিক ও যান্ত্রিক রাষ্ট্রীয়তার পটভূমিতে মেহনতী মানুষকে কবি নিম্নলিখিতরূপ অংশে বিশ্বের স্থায়ী শক্তিরূপে উজ্জ্বলভাবে দেখেছেন—

রাজচ্ছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র-হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে।

পূর্বে রক্তকরবী, মুক্তধারা প্রভৃতিতে কবি যে-সহানুভূতি ও সত্যদৃষ্টির বলে রাষ্ট্রীয় ও যান্ত্রিক নিপীড়ন থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন, তা কবির

শেষজীবন পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে একালের উৎকৃষ্ট মানবীয়তার প্রকাশক কবিতাগুলির জন্ম দিয়েছে। আলোচ্য কবিতাটিতে কবির যে মনোভাব দেখছি, 'জন্মদিনে' কাব্যে তা-ই বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এহেন মানবপ্রীতি ও নিসর্গ-সঙ্গ-অভিলাষ যে-কবির তাঁকে ব্রহ্মানন্দবাদী ব'লে চিহ্নিত করা অসম্যক্ দৃষ্টির পরিচায়ক। দু'চারটি কবিতায় (৮, ৩০, ৩১ প্রভৃতি দ্রঃ) চিরপথিকের যাত্রী-মনোভাবের স্পর্শ পাওয়া গেলেও তার সঙ্গে মায়াবাদী বৈরাগ্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। এই কাব্যিক রোম্যাণ্টিক বৈরাগ্য পূর্বেও দেখা গেছে। নয় সংখ্যক কবিতায় অদৃশ্য সৃষ্টি ও মহাকাশের ভূমিকায় পৃথিবী ও মানুষের রঙ্গশালার ছবি কবি দেখছেন। এও কোনো তত্ত্ব নয়, বিস্ময়-বিমিশ্র বিশুদ্ধ অনুভব মাত্র। আঠারো সংখ্যক কবিতাটি পূর্বেকার 'সময়হারা' কবিতার হালকা সুর ও মেজাজে লেখা ভাষারসিক কবিচরিত্রের পরিচয়বাহী।

'জন্মদিনে' কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবির জীবনকে বিবৃত করেছে। এর কোনোটিতে দুঃখদুর্যোগের অন্তে নূতন সৃষ্টির মধ্যে নবজীবনের আশার কথা, কোনোটিতে বা শুধু কাব্যজীবনের পরিচয়। কবি তাঁর নিগূঢ় আত্ম-জীবনকে বা কাব্যজীবনকেই যথার্থ জীবন ব'লে মনে করেন। আটাশ সংখ্যক কবিতায় তাঁর নদীস্রোতোবাহী বহিজীবন ও অন্তর্জীবনের সমন্বয় দেখেছেন এবং নিজেকে বন্ধনহীন পথিক, সুতরাং জাতিহারা ব্রাত্য ব'লে উল্লেখ করেছেন।

দশ সংখ্যক বিখ্যাত 'ঐকতান' কবিতাটিতে কবি তাঁর কবিকীর্তির অসংকোচ নিরপেক্ষ বিচার করতে চেয়েছেন ও জানিয়েছেন যে সে-কীর্তি অসামান্য হলেও অসম্পূর্ণ, যেহেতু তা অবহেলিত নিরক্ষর মানুষগুলির আনন্দবিধান করতে পারেনি। কবি প্রায় শেষবারের মত ঐ কৃষক ও মেহনতী মানুষগুলির দিকে সীমাহীন মমতা নিয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন, এবার বিশেষভাবে—তাদের জীবনের দুঃসহ দুঃখ কথঞ্চিৎ প্রশমিত ক'রে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করতে পারে এমন—সাহিত্যিক আনন্দ-আয়োজনের নিতান্ত অভাব লক্ষ্য ক'রে। দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম এই অসহায় মানুষগুলির চিরসাথী হলেও অধুনা-পূর্ব কালে এরা কাব্যানন্দ থেকে বঞ্চিত ছিল না। তাদের অবসর সময়ের নিত্যসঙ্গী ছিল পদ-কীর্তন, বাউল-গীত, বেউলা-লখীন্দর, কালকেতু-ফুল্লরা প্রভৃতি নিয়ে সকরুণ পাঁচালি-গান, ও নানান্ হাস্যরসের আয়োজন। যাত্রা-গীত-সমৃদ্ধ সেই মধ্যযুগ বিলুপ্ত হয়েছে, বর্তমান কেবল উচ্চমঞ্চের শিক্ষিতদের জন্য লিখিত সাহিত্যের প্রসারের কাল। ফলে সভ্যসমাজ কর্তৃক অবহেলিত এই নিরক্ষর মানুষগুলি কেবল উদরেই নয়, মনের দিক থেকেও শুষ্ক হয়ে পড়েছে। কবি দীর্ঘকাল ধ'রে লক্ষ্য ক'রে এসেছেন, অধুনা এরা আধপেটা খেয়ে কোনো প্রকারে প্রাণ বাঁচিয়ে চলে,

আর, অবসর সময়টুকু মুখ গুঁজে নির্বাক হয়ে ভাবনা-চিন্তায় কাটায়। এই অসহায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলির মুখে ভাষা দেওয়ার ও তাদের ঋণভার দূর ক'রে অর্থসংগতি বিধানের উদ্দেশ্যে সেই ১৯০৬ খ্রীঃ থেকে কবির আত্যন্তিক প্রয়াস—শিলাইদহ-পতিসরে গ্রাম-সংগঠন এবং শেষ জীবনে সুরুল-শ্রীনিকেতনেও তার অনুবর্তন—যে-সব উদ্‌যোগ আজ ইতিহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কবিতায় কবি তাঁর এই অনুভব জানিয়েছেন যে সভ্য-সমাজের অবহেলিত মানুষগুলির আপন কবির উদ্‌ভব প্রয়োজন, যে-কবি 'মাটির কাছাকাছি' থেকে তাদের অন্তরের বিশেষ প্রবণতা ও বিশিষ্ট সূক্ষ্ম স্বপ্ন-সংঘাতগুলির সঙ্গী হয়ে কবিতা-গল্প-নাটক লিখবেন। তাঁর নিজের পক্ষে তা সম্ভবপর হয়নি, কারণ—

> সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
> মাঝে মাঝে গেছি আমি ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
> ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

সুতরাং, তাঁর ধারণায়, যত সমুচ্চ কল্পনাশীল কবিই তিনি হোন না কেন, তাঁর কাব্যকবিতা অসম্পূর্ণ, অর্ধসত্যভাষণ মাত্র। আমরা পূর্বেও দেখেছি, দুঃসহ সংগ্রামী মানুষের জীবন তাঁর হয়নি ব'লে তিনি আক্ষেপ করেছেন (পত্রপুট, বারো সংখ্যক)—

> সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
> ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
> অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

এখানে, যে-বঞ্চিত মানুষগুলিকে কবি আজীবন ভালোবেসে এসেছেন, তাদের জীবনের কবি হতে পারলেন না ব'লে আক্ষেপ, এই তফাত। অথচ যাবতীয় সাম্প্রতিক কাব্য-কবিতার মানচিত্রের দিকে তাকিয়েও কবি আশ্বস্ত হতে পারলেন না। দেখলেন, আধুনিক শিক্ষিত কিছু গল্পকার-কবি এই ভিতরে-বাইরে শূন্য মানুষগুলির জীবন নিয়ে সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু তাতে ওদের মর্মকথা ব্যক্ত হচ্ছে না। আর সে-লেখা ওদের তৃপ্তির কারণও হচ্ছে না। ওদের মধ্য থেকেই ওদের কবির উদ্‌ভব ঘটাতে হবে। মহাকবি নিজে যা দিতে পারলেন না, আগামী দিনের সেই লোককবির প্রত্যাশায় তিনি থাকছেন এবং পূর্বাহ্নেই তাঁকে বারংবার নমস্কার জানিয়ে রাখছেন। নিরক্ষর নিরন্ন অসহায় মানুষগুলির মুখে হাসি ফোটানোর জন্য রবীন্দ্রের সকরুণ মিনতি নিম্নলিখিত আবেগময় ভাষায় ব্যক্ত হয়ে 'ঐকতান' কবিতাটিকে পরিণামে করুণরসমণ্ডিত করেছে—

> অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
> রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।...

মূঢ় যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

অসংকোচ সারল্য এবং স্পষ্টোক্তিময় মনন ও আবেগ বিমিশ্র রচনা হিসাবে এই কবিতাটির স্থান কবির সমুন্নত সৃষ্টিগুলির মধ্যে এবং 'এবার ফিরাও মোরে'র মতই এটি বৈপ্লবিক।

এই আত্মজীবনবিবৃতি ও স্বীয় অসম্পূর্ণতার দৈন্য জ্ঞাপনের সঙ্গে অশীতিপর কবির চিরবিদায়ের করুণ উপলব্ধিও একত্র বিবেচ্য। কবিকে তাঁর তুচ্ছ নাম ও কীর্তি ত্যাগ করতে হচ্ছে ব'লে নয়, আন্তরিক প্রীতির সমস্ত বন্ধন যে পিছনে ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে তার জন্যে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বেদনা অনুভব করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ত্যাগের বেদনার সঙ্গে চলার প্রেরণাও কবি সমানভাবে গ্রহণ করেছেন। কবির চিরকালের সুদূরস্পৃহাই তাঁর চিত্তে এহেন উৎসাহের সঞ্চার করেছে। 'রোগশয্যায়'-এর একটি কবিতায় নাম-খ্যাতির স্মৃতিময় পূর্বজীবনকে অবহেলা ক'রে কবি সুদূরের জন্য বেদনার কথাই জানিয়েছেন—

যা-কিছু হারাল মোর
সবচেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।
সে মোর অতীত নহে
যারে লয়ে সুখে-দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন।
সে আমার ভবিষ্যৎ
যারে কোনো কালে পাই নাই, ইত্যাদি।

'আরোগ্য'-এর একটি কবিতায় দেখা যায়, সুদূরের জন্যে চঞ্চল, তীর্থযাত্রার পথিক পথসমাপ্তির আগ্রহেই উৎসুক—

স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালা-দ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে
শেষতীর্থমন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী—
যার মূর্ছনায় মেশা এ-জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘযাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে—নহে দূর, নহে বহু দূর।

'আরোগ্য' 'জন্মদিনে' কাব্যে কবি কখনো নিজেকে পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে অভিনেতারূপেই দেখেছেন এবং নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিত্রা-চৈতালি-নৈবেদ্য

পর্যায়ের বিস্ময় পুনশ্চ অনুভব করেছেন। কিন্তু বারো সংখ্যক কবিতায় তাঁর সর্বত্যাগী বৈরাগী মনের পরিচয় নিবেদন ক'রে যাত্রার পথকেই অকাতরে বরণ ক'রে নিয়েছেন দেখা যায়—

সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম,
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

* * *

দিনশেষে কর্মশালা ভাষা রচনার
নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার।
পড়ে থাক পিছে
বহু আবর্জনা বহু মিছে।
বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম—

* * *

প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি পাই যদি দেখা।
পশ্চাতের কবি
মুছিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি

—ইত্যাদি।

'রক্তমাখা দন্তপঙ্‌ক্তি হিংস্র সংগ্রামের' অথবা 'শ্মশান-বিহার-বিলাসিনী ছিন্নমস্তা' প্রভৃতি স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির উপর রচিত সাময়িক যুদ্ধ-প্রতিবাদী কবিতায় কবি মানবীয়তার মানদণ্ডেই স্বার্থলিপ্সু মুষ্টিমেয় সভ্যাভিমানীদের তীব্র নিন্দা করেছেন। বাইশ সংখ্যক ('সিংহাসনতলচ্ছায়ে') কবিতায় সাধারণ মানুষকে অবহেলা করার পাপের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের পতন ঘোষণা করেছেন। কবিতাটি মননমূলক এবং ঋষিতুল্য অনুভবের পরিচয়বাহী। কিন্তু কেবল ইংরেজ-শাসন লক্ষ্য ক'রেই কবিতাটি রচিত নয়। কৌশলী শোষণ-স্বার্থে নিহিত মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত যাবতীয় রাষ্ট্রের প্রতিই কবির সাবধানবাণী এতে উচ্চারিত হয়েছে। এই কবিতাটি লেখার কিছু পরেই লিপীকৃত 'সভ্যতার সংকট' ও কবির প্রয়াণের ঠিক একমাস আগে লেখা র‍্যাথ্‌বোনের ভারতনিন্দার জবাবী পত্রও এই সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। যদি প্রশ্ন করা যায় যে কবিজীবনের শেষ কয়েক বৎসরে কোন্ ভাবনা কবিকে সব থেকে বেশী পর্যাকুল করেছে, তাহলে তার জবাব একটাই হবে—বঞ্চিত নিরক্ষর কঙ্কালসার মানুষগুলির উন্নয়ন। এই কবিতাতেও তাই তাদের বিষয়

বলতে গিয়ে কবির কণ্ঠ বাষ্পাকুল হয়ে উঠেছে—

মহা-ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার
শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত—

আমরা মহাকবির কবিকৃতি বিষয়ে আলোচনা করছি। কিন্তু নির্যাতিত ও পশুকৃত এই মানুষগুলির জন্য তাঁর আন্তরিক বেদনা ও কর্মের উদ্যোগ দৃষ্টে তাঁকে স্বচ্ছন্দে মহামানবও বলা যাবে। কারণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্য আর্ত মানুষের দুঃখ প্রশমন প্রয়াসের জন্যই সকলের প্রণম্য। বাঙলারই শ্রীচৈতন্যের নীতি ছিল—যারা তৃণের চেয়েও সুনীচ, তরুর মতই যারা সহিষ্ণু, যারা নিজেরা মানহীন অথচ অন্যকে মান প্রদর্শন করতে ব্যগ্র, এমন অবহেলিত মানুষগুলিই নামমন্ত্র পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু আজকের ভাববার কথা এই যে, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাওয়ার চল্লিশ বছর পরেও সমাজ-বৈষম্য থাকবে কেন। আর, কেনই বা ধর্ম নিয়ে সম্প্রদায়-বিদ্বেষ, যা মধ্যযুগেও ছিল না এবং যা নিয়ে এই কবিরও মাথাব্যথা কম ছিল না? কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীতে এসে পড়ছি। ফেরা যাক্।

ছড়ার ছন্দের পদপাতে স্থানে স্থানে একটু বিশৃঙ্খল হয়েও ষোল ও চব্বিশ সংখ্যার কবিতা দুটির মেজাজ একটু ভিন্ন শ্রেণীর। প্রথমটিতে পুরাতনের ধ্বংসের মধ্যে নোতুনের সংকেত, আর দ্বিতীয়টিতে সুর-বেসুরের, আলো-কালোর সংঘাতে রূপকারের শিল্প-সিদ্ধির বিষয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভাষা চমকপ্রদ মৌখিক, রূপক ও ইমেজ অনুরূপে ভিন্নরীতির। হাওয়ার হাঁপানি, চিক-ঢাকা ঝাপসা আকাশ, ভাসান-খেলা, দাঁড়ের ঝাপট, পালিশ-করা জীর্ণতা প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত।

এইভাবে 'জন্মদিনে' কাব্য কেবল কবির আত্মস্বরূপ পরিস্ফুটনেই চমৎকার নয়, উন্মুখ তদ্‌গত দৃষ্টির প্রকাশনেও স্মরণীয়। নয় সংখ্যক কবিতার বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই কবিতা এবং কুড়ি সংখ্যক 'যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি' প্রভৃতি কবিচিত্তে অনির্দেশ্য সংকেতময় আদিম ধ্বনির প্রভাব দ্যোতনা করছে। বার্ধক্যে কবির অন্তরে চিরকালের শিশু ফিরে আসতে চায়। শুধু ধ্বনি, অস্পষ্ট অর্থহীন অসংলগ্ন বোবা ধ্বনি, আর সেই সঙ্গে ধাপ-ছাড়া কলাহীন বর্ণবৈচিত্র্যের বিহ্বল প্রকাশ কবিচিত্তে অধিকার চাইছে। এই

প্রসঙ্গে আকাশপ্রদীপের কয়েকটি কবিতা, খাপছাড়া, ছড়ার ছবি, এমনকি তারও পূর্ব থেকে শুরু কিম্ভূত ছবি রচনায় আগ্রহ প্রভৃতিও বিবেচনা করতে হবে। এসবের মধ্যে আমরা পাচ্ছি কবির অবচেতন মনের সঙ্গ। ফলে কল্পনাবাহিত যে-অন্তর্দৃষ্টি তির্যক ভাবুকতা ও আতংকাারক শব্দাথ রম্যতার কারণ, কবিচিত্ত থেকে তার অপসরণ ঘটছে। 'জন্মদিনে'র কুড়ি সংখ্যক কবিতায় কবি চেতনার অতলে সেই নিভৃত অবচেতনলোকে ডুব-সাঁতার দিয়েছেন, আহরণ করেছেন 'স্ফোট' শক্তিকে, যার উপর ভিত্তি ক'রে মনোমত শব্দার্থ নির্মাণ করছে মানুষ। দর্শন-বিজ্ঞান-অর্থনীতির যুক্তিতর্কে লোকযাত্রা সচল হচ্ছে, আর কবির স্বপ্নরাজ্য ছন্দের বন্ধনে মুক্তি পাচ্ছে। আধুনিক সভ্যতার মূলীভূত সেই বাক্‌শক্তিকে শিশুকবি তার বিশৃঙ্খল আদিম স্বরূপে ধরেছেন। এ গেল ধ্বনি অর্থাৎ শ্রুতির দিক। রঙ্ ও রেখায় অনভিজ্ঞ আদিম চাক্ষুষ অনুভব বিষয়ে কবি মনোযোগ দিয়েছেন তাঁর শৈশব-স্মৃতিচারণার কবিতায় (১৯ সং)—

> যেন সে রচয়িতার হাতে
> পুঁথির প্রথম শূন্য পাতে
> অলংকরণ আঁকা, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কী লেখা,
> বাকি সব আঁকাবাঁকা রেখা।

এই মহাকবি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতে কোন্ উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন তা জানতে চাওয়া পাঠকের পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক আধুনিক যুগের নানান্ সাহিত্যাদর্শের সংঘাতে তিনি কোন্ পন্থা সত্য ব'লে মনে করেছেন তা জানার ঔৎসুক্য। বলা বাহুল্য, লোকান্তরিত হওয়ার স্বল্প কয়েকদিন পূর্বপর্যন্তও তিনি যথাশক্তি তাঁর কবিমানসকে সাধারণের গোচরে এনেছেন এবং তাঁর পরিণত প্রতিভার দার্শনিকসুলভ উপলব্ধিও শেষ পর্যন্ত বিবৃত ক'রে এসেছেন, যার সংক্ষেপ করলে এইভাবে বলা যায় যে—সৃষ্টি সত্য, জীবন সত্য, মানুষ অধিকতর সত্য, কারণ দুঃখের মূল্যে এবং ত্যাগময় সামাজিক সামঞ্জস্য স্থাপনে তার আত্মলাভরূপ চরম প্রাপ্তি ঘটে। এই উপলব্ধি 'এবার ফিরাও মোরে' থেকে আরম্ভ ক'রে পরিস্ফুটভাবে শতাধিক স্থানে উত্তরোত্তর দৃঢ়তার সঙ্গে কবি ব্যক্ত করেছেন, এবং মৃত্যুর প্রায় দেড়মাস আগে লেখা—'রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে ঐ বিশেষ জীবন-দর্শন যেমন পরিস্ফুট করেছেন, তাঁর একেবারে শেষ রচনা দু'টিতেও তেমনি—

যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস্
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।

এবং

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;

সৃষ্টির অন্তরে যে একটি বিশেষ নৈসর্গিক ও মানবিক শক্তির লীলা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, দুঃখ ও সুখ, আঘাত ও আনন্দ সমানভাবে যার দান, তাকে সম্যক্-রূপে স্বীকার ও বরণ ক'রেই মুক্তির আনন্দ লাভ করা যায়—অরূপানুভূতির পর্যায়ে উপলব্ধ এই সত্যটি বিচিত্রভাবে কবি শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন। এই কাব্য-দার্শনিক উপলব্ধির পূর্বসূত্ররূপে কবির সুগভীর মর্ত্যপ্রীতি, মানব-প্রীতি ও সমাজ-জীবনের মূল্যবোধ গ্রথিত।

কবি শেষকথা বলার অবসরে তাঁর দু'টি মূল্যবান্ উপলব্ধির সঙ্গে আমাদের পুনঃপরিচায়িত করতে চেয়েছেন। একটি হ'ল এই যে, রাষ্ট্র তথা পৃথিবীকে গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্য শীঘ্র এবং নিশ্চিতভাবে 'মহামানবে'র প্রকাশ ঘটবে ('ঐ মহামানব আসে')। কবির উপলব্ধ এই 'মহামানব' অলৌকিক কিছু নয়। আর ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হলেও তা পরিবর্তনসত্যের মধ্যে চালিত বন্ধুর পথের যাত্রী নিখিল মানুষের গণতান্ত্রিক অন্তরসত্তা। ব্রাত্য জাতিহারা বাউলমনোধর্মী কবি পূর্বেই এই মানবিক অধ্যাত্ম-শক্তিকে নানাভাবে আমাদের লক্ষ্যগোচর করেছেন, বিশেষে বলাকায় ও 'মানুষের ধর্ম' পুস্তিকায়, মানবমহিমার মূল্যায়নে। অন্য কবিতাটি সৃষ্টির মূল রহস্য অনুসন্ধানে অকৃতার্থ কবির বিস্মিত ব্যর্থতার স্পষ্টোক্তি—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।…
দিবসের শেষ সূর্য
শেষপ্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—

কে তুমি।

পেল না উত্তর।

কবি বলতে চান সৃষ্টির মূল সত্তাকে তিনি অনন্ত, অসীম, অরূপ, নটরাজ প্রভৃতিরূপে কল্পনা ক'রে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু স্পষ্ট সত্য হিসাবে ধরতে পারেন নি। অজানা তেমনি অজানা, সুদূর তেমনিই সুদূর থেকে গেছে। কবিতাটিতে অন্তর্নিহিত রোম্যাণ্টিক বিস্ময় ও অতৃপ্তিবোধের সঙ্গে সংহত ক্লাসিক্যাল প্রকাশভঙ্গিমার সম্মিলন লক্ষণীয়। অর্থতঃ এ-বিষয় পূর্বেও কয়েকবার উচ্চারিত হলেও নিরলংকার ও ধ্রুপদী প্রকাশভঙ্গিমায় কবিতাটি অস্তায়মান সূর্যকে মুহূর্তের জন্য সমুজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। কিন্তু কবি যে কবিই অর্থাৎ শেষ পর্যন্তও রূপাসক্ত প্রণয়কাতর কাল্পনিক, তার পরিচয় রেখে গেলেন 'শেষ লেখা'র পাঁচ সংখ্যক কবিতায়, তাঁর আর্জেন্টিনা প্রবাসের সঙ্গিনীকে স্মরণ ক'রে পুনঃসঙ্গলাভের বাসনায়—

আঁখি যার কয়েছিল কথা,
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।

পরিশেষে রবীন্দ্র-কবিচিত্তে বিজ্ঞান-বরণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত জানানোর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। মহাকাশ-বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান প্রভৃতির আন্তরিক স্বীকরণের বিষয়টিকে কবির অগ্রগামী মনের আশ্চর্য উন্মুখতা ও ব্যাপ্তি-ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। আর দেখতে হবে, তাঁর সমকালে যেমন, আজও তেমনি, তিনিই সবচেয়ে বেশী আধুনিক ও প্রগতিপথচারী।

'জন্মদিনে' কাব্যের পাঁচ-সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর শেষ আত্মপরিচয় ব্যক্ত করতে গিয়ে নিজেকে মহাকাশ-সমন্বিত পৃথিবীর অভিব্যক্তিধারার অন্তর্গত একটি সামান্য প্রকাশ ব'লে চিহ্নিত করেছেন। কবিতাটি মহাকাশ-বিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞানে কবির সুগভীর আস্থার পরিচায়ক এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান-নির্ভর আত্মদর্শনের প্রকাশকও বটে। কবিতাটি এই ঃ

জীবনের আশিবর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে—
লক্ষকোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,

তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্থলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান—
এসেছি সে-পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি'
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।......
মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়াছিল পশুলোক দীর্ঘকাল ধরি'।
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রির অবসানে
মন্থরগমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে।......
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা,—
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।......

ঐ কবিতাটি লেখার চল্লিশ বছর আগে, নৈবেদ্যের কবিতাগুলি লেখার সময়, ইয়োরোপে পরমাণু-বিজ্ঞানের রুদ্ধদ্বার খুলে যায়। আমাদের বিশ্বগ্রাসী ও কৌতূহলী কবি বহু পূর্ব থেকে গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা ও অভিব্যক্তি বিষয়ে তাঁর বিস্ময়ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করলেও (সোনার-তরী চিন্তা পর্যায় দ্রঃ), খ্রীঃ ১৯০০-এর পর থেকে, যখন মহাকাশীয় সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসের মূলচক্রটি নভোবিজ্ঞানীদের আয়ত্তে এল, তখন তিনিও বিকারহীন নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না। নিসর্গ-রহস্য-সন্ধানী নিজ স্বভাবেই বিস্ময়কর নূতন অধ্যয়নের সঙ্গী হলেন। দেখা যায়, কবির যখন থেকে জ্ঞানোন্মেষ হয়েছে, ধরা যাক ১৮৮০-৮২, তখন থেকে ষাট বৎসর ধ'রে পৃথিবীতে যে-সব লক্ষণীয় ঘটনা ঘটেছে এবং বিবিধ সাংস্কৃতিক আয়োজন হয়েছে তাঁর কবিচিত্তে সেগুলির অভিঘাত প্রকাশের স্বাক্ষর রেখে গেছে। পরমাণু-বিজ্ঞান এবং তার ভিত্তিতে নোতুন ক'রে মহাকাশ-দর্শনও সেইরকম একটি উল্লেখ্য ঘটনা যা কবি কোনোমতেই অবহেলা করতে পারতেন না। মহাকাশ-বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক আবিষ্কারগুলিকে কবি কিভাবে অন্তরের মধ্যে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন, নৈবেদ্য থেকে আরম্ভ ক'রে 'শেষ

লেখা' পর্যন্ত তাঁর চল্লিশ বছরের কাব্যরচনার মাঝে মাঝেই সেবিষয়ে রশ্মিপাত ঘটেছে। এগুলি বহিরঙ্গ বিজ্ঞান-বর্ণনা নয়, কবি-কল্পনার অনুকূল বিজ্ঞান-উদ্‌বোধিত অন্তর্লোকেরই স্বাক্ষর।

নক্ষত্র-নীহারিকার আলোক ও তাপ সম্বন্ধে এবং পৃথিবী পর্যন্ত সৃষ্টির স্বরূপ সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদের কাছে যা অস্পষ্ট ও অজ্ঞেয় ছিল, পরমাণু-বিজ্ঞান তা পরিষ্কার ক'রে দিলে। দেখালে যে সূর্যে-নক্ষত্রে অকল্পনীয় উচ্চতাপে গ্যাসীয় পরমাণু ভাঙছে, মিলছে, রূপান্তরিত হতে চাইছে। সূর্যের মধ্যেকার তাপবিক্ষুব্ধ হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং তা হতে গিয়ে প্রচুর রশ্মিকণা ও জ্যোতি বিকিরণ করছে। নক্ষত্রলোকেও ঐরকম অবস্থা। তবে সেখানে বিভিন্ন নীহারিকা-মধ্যবর্তী কোটি-কোটি নক্ষত্র গ্যাসাগ্নি-দহনের একই পর্যায়ে নেই। কোথাও হাইড্রোজেন-প্রাধান্য, কোথাও হিলিয়াম, কোথাও বা কার্বন—এইভাবে লঘুতম গ্যাসাণু থেকে অপেক্ষাকৃত ভারী গ্যাসাণুতে রূপান্তর চলেছে সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে। আবার কোনো কোনো নক্ষত্র গ্যাসাবস্থা ত্যাগ ক'রে আরও ভারী ধাতব অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ছে। সেগুলির মধ্যে আবার কোনো কোনোটি গ্যাসীয় শেষ অবস্থাতেই বিস্ফুরিত হয়ে প্রচুর জড়রশ্মিকণিকা বিকীর্ণ ক'রে প্রচণ্ড ভারী ও অন্ধ ধাতব অবস্থার মধ্যে নির্বাণ লাভ করছে। মহাকাশে এইভাবে তারকার জন্মমৃত্যুর খেলা অহরহই চলছে। আমাদের দূরবীন-দৃষ্টি থেকেও তা এতই দূরে যে আমরা এসবের কিছুই অনুভব করতে পারি না। অধুনা শক্তিশালী বেতারযন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন রশ্মির সংকেত পেয়ে এবং দূরবীন-ফোটোতে প্রতিফলিত রঙ্ দেখে কিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারি মাত্র। লক্ষ লক্ষ নীহারিকার মধ্যে একটি হ'ল আমাদের পরিচিত ছায়াপথ। তারই একান্তে একটি মাঝারি নক্ষত্র আমাদের এই সূর্য। আমাদের কালের মাপে আনুমানিক পাঁচশ' কোটি বছর আগে ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা থেকে জন্মলাভ ক'রে এখন তার যৌবনে পদার্পণ করেছে। তার গ্রহ উপগ্রহগুলি নিয়ে সেও অবিরাম চলায় ছায়াপথ-কেন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে ছুটেছে। তার মধ্যে এখন জ্বলছে মুখ্যভাবে হাইড্রোজেন গ্যাস, যা আণবিক সংশ্লেষের নিয়মে তা থেকে দ্বিগুণ ভরের হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে গিয়ে প্রচুর তাপ এবং আলো বিচ্ছুরিত করছে। তার কেন্দ্রে জ্বলছে দু'কোটি সেন্টিগ্রেড্ তাপাগ্নি আর তার পৃষ্ঠ থেকে ছ'হাজার সেণ্টিগ্রেড্ তাপের অগ্নি-উচ্ছ্বাস ছুটেছে লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপ্ত ক'রে। তার দেহ থেকে একদা ছিটকে-পড়া এই পৃথিবীতে তার তীক্ষ্ণ রশ্মিকণাগুলি আবহমণ্ডলে শোষিত হয়ে এমনতর স্নিগ্ধভাবে আসছে যাতে পৃথিবীতে প্রাণের অভ্যুদয় ও সংরক্ষণ সম্ভব হয়। এরই ফলে তরুলতায় ফুলে সৌন্দর্য, এরই কর্তৃত্বে কীট-পতঙ্গ জীব-জন্তু ও মানুষের জীবনধারা।

মহাকাশ-গবেষণায় যুগান্তর এনেছিল ইলেকট্রন-প্রোটন সম্পর্কের জটিল পরমাণু-তত্ত্ব—খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের পর বৈজ্ঞানিক পুনঃপুন পরীক্ষা এবং পূর্বপূর্ব মত সংশোধনের দ্বারা যে-বিষয়ে নিঃসংশয়িত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তাঁদের গবেষণায় পরমাণু-মধ্যবর্তী শক্তির স্থিরতার আধার প্রোটন ও ঘূর্ণ্যমান চঞ্চল ইলেকট্রনের চারিত্র্য ও দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, চঞ্চল বৈদ্যুতীর নির্দিষ্ট কক্ষে আবর্তন ও বিচ্যুতির স্বরূপ এবং বিকিরণ, শোষণ ও উৎক্ষেপের শক্তি-পরিমাণ স্থিরীকৃত হ'ল এবং আরও পরে নিউট্রন পজিট্রন, মেসন প্রভৃতির অস্তিত্বও নির্ণীত হ'ল। এরই সঙ্গে যে-গাণিতিক অভিমত মহাকাশ-পরিস্থিতির বিবেচনায় যুগান্তর এনেছিল তা হ'ল আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অর্থাৎ দেশকাল-সম্মিলনের সত্য, বস্তুকণার বহুগুণিত শক্তিতে রূপান্তরের তত্ত্ব এবং কিছু পরে মহাকর্ষের রহস্য উদ্ঘাটন।

বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্র-পত্রিকার ও গ্রন্থের কৌতূহলী পাঠক রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে এসব তত্ত্বের প্রতিপাদ্য মূল বিষয়গুলি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করেন। ফলতঃ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর স্বকীয় নিসর্গ-দর্শনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সেগুলি তাঁর কাব্য-কবিতায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯০০ খ্রীঃ নোতুন পরমাণু-বিজ্ঞান অনুযায়ী অতিসূক্ষ্ম ঋণাত্মক বৈদ্যুতী কণিকার সঙ্গে বিজড়িত সমসংখ্যক ধনাত্মক পরমাণুর যাবতীয় মৌল পদার্থে সন্নিবেশের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেখা নৈবেদ্যের একটি কবিতায় কবি এর প্রতিধ্বনি শোনালেন—

> আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে……
> এই স্তব্ধতায়
> শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়
> মোর অঙ্গে রোমে রোমে লোকে লোকান্তরে
> গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
> অণু পরমাণুদের নৃত্যকলরোল
> তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল। (নৈবেদ্য, ২৩০)

অন্য একটি কবিতায় নভোবিজ্ঞান অনুসরণে কবি জ্যোতির্লোক সৃষ্টি এবং সূর্যের জন্মমৃত্যুর বিষয় এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—

> সে ধ্যানাভ্রভেদী শৃঙ্গ, যেথা স্বর্ণলেখা
> জগতের প্রাতঃকালে দিয়েছিল দেখা
> আদি-অন্ধকার-মাঝে, যেথা রক্তচ্ছবি
> অস্ত যাবে জগতের শ্রান্ত সন্ধ্যারবি,
> নব নব ভুবনের জ্যোতির্বাষ্পরাশি

পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকা যার বক্ষে আসি
ফিরিছে সৃজনবেগে মেঘখণ্ডসম
যুগে যুগান্তরে।— (নৈবেদ্য, ৮)

আবার আর একটি কবিতায় প্রাণরহস্যে নিমগ্ন কবির চিত্তে নিজ প্রাণ-চৈতন্যের সঙ্গে তৃণতরুলতা পর্যন্ত সেই একই প্রাণের অনুভব ব্যক্ত হয়েছে—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গ-মালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে; সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে— ইত্যাদি (নৈবেদ্য, ২৬)

এই বিস্ময়বোধ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের দ্বারা অনুপ্রাণিত এমন মনে করা যায়। বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কারের পর থেকে বিস্মিত কবির এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচয়-স্থাপন, তাঁকে কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যে উল্লেখ্য কয়েকটি কবিতা-রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রবল বিজ্ঞান-আসক্তির প্রমাণ বহন করে।

যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মোটামুটি ১৮৬০ খ্রীঃ থেকে দূরবীন-ফোটোচিত্র সহায়ে সৌরদেহের বর্ণালী নিয়ে পরীক্ষাশালায় বিবিধ গ্যাসের অস্তিত্ব ধরতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিক হদীস পাচ্ছিলেন না, ১৯০০ খ্রীঃ এর কিছু পরেই সে সব দুর্বোধ্য পরিস্থিতি তাঁদের আয়ত্তে এল। তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন যে আদি পরমাণু-শক্তির শোষণ-বিকিরণাদি বিক্রিয়া থেকেই তাপ ও জ্যোতি উদ্ভূত হয়েছে এবং পরমাণুর বিশিষ্ট চারিত্র্য অনুসারে বিবর্তনক্রমে গঠিত হয়েছে যাবতীয় মৌল ও যৌগ গ্যাসীয় ও ধাতব পদার্থ। স্তিমিত হিমাবস্থা থেকে এসেছে চঞ্চলতা, তাপ ও বিকিরিত জ্যোতি। পরমাণু-পুঞ্জ অভিকর্ষ-বলে সংহত হয়েছে, আবার কেন্দ্রাতিগ বিকর্ষের ফলে বিচ্যুতও হয়েছে। সংহতির সঙ্গে জেগেছে ঘূর্ণন ও এইভাবে নীহারিকা থেকে রূপ পরিগ্রহ করেছে অগণিত নক্ষত্র। তারপর কৌণিক গতিতে ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্রদেহের কেন্দ্রাতিগ বেগে ছিটকে-পড়া গ্রহ-উপগ্রহ। বিস্মিত কবি জানাচ্ছেন—

আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই
কিসের বাতাস লেগেছে—
জগৎ-ঘূর্ণি জেগেছে।

একই সঙ্গে কবি অনুভব করেছেন, পার্থিব নিসর্গের যে বর্ণ-গন্ধ-গীতে তিনি আবিষ্ট অভিভূত হয়েছেন তারও মূল নিহিত রয়েছে সৌররশ্মির দাক্ষিণ্যে। সৌরপৃষ্ঠ থেকে উচ্ছ্বসিত তাপযুক্ত রশ্মি পৃথিবী স্পর্শ করছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় পরমাণুতে শোষিত হয়ে নিতান্ত ক্ষীণরূপে। এমনভাবে, এমনতর পরিমাণে, যাতে ধরাপৃষ্ঠে প্রাণ ও সৌন্দর্যের বিকাশ অবারিতভাবে সম্ভব হয়—

তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে ;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।

কবি এই রশ্মিজালকে "আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক" এবং "কল্যাণী দেবতার দূতী" রূপে লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু কেবল বহিরঙ্গ নিসর্গের ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর কল্পনাময় কাব্য-নির্মাণ-শালার মধ্যেও কবি ঐ রশ্মির প্রভাব অনুভব করেছেন স্বচ্ছন্দে। কবি যেন আরও গভীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ক্রিয়াশীলতার পরীক্ষা করেছেন, প্রাণকে অতিক্রম ক'রে মনোরাজ্যেও সৌররশ্মির নিগূঢ় প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। 'সাবিত্রী' কবিতায় কবি তাঁর চিত্তের রোম্যান্টিক বিরহবহ্নিজ্বালার সাদৃশ্যময় উৎস অনুভব করেছেন সৌরবহ্নির মধ্যে। কবি বলছেন—

মোর জন্মকালে,
প্রথম প্রত্যূষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে।
সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে
অগ্নির প্রবাহ,
উচ্ছ্বসি উঠিল মন্দ্রি বারংবার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ। (—ইত্যাদি, সাবিত্রী)

বিজ্ঞান-উদ্‌বোধিত কবি জেনেছেন সৃষ্টির আদি জ্যোতির গ্যাসীয় পরমাণুই সংহত হয়ে পরিণত রূপ নিয়েছে নক্ষত্রে, সূর্যে। তাঁর সূর্য-বন্দনার মধ্যে তাই আদি জ্যোতিকেও নমস্কার জানিয়ে তার সঙ্গে নিজ কবিস্বপ্নের সংলগ্নতা ব্যক্ত করেছেন—

তমিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও আদিকবি
ধ্বংস করি তম
সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তার উঠিছে গুঞ্জরি
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরী
নির্ঝরে কল্লোল।……

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমারে দিয়েছ যে ভার
কেই বা সে জানে ?
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে। (সাবিত্রী)

বনবাণীর বৃক্ষবন্দনার কবিতাগুলিতে সূর্যরশ্মির জীবনদানের বিষয় বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। আর, কবির আশ্চর্য নভোবিজ্ঞানসখ্যের ঝলক ফুটে উঠতে দেখা গেছে একই সময়ে লেখা নটরাজ-কল্পনার 'নৃত্যের তালে-তালে—' কবিতা বা গানটির মধ্যে। এটি বিশ্লেষণ করলে যাবতীয় সৃষ্টি ও বিনাশের মূলে কেন্দ্রে অবিরাম ক্রিয়াশীল প্রোটন-ইলেকট্রনের চারিত্র্য যেমন দৃষ্টিতে পড়বে, তেমনি অনুভব করা যাবে—কল্পনাতেও ধরা যাচ্ছে না এমন অতিজটিল ও বিরাট কোনো এক সত্তার লীলায় অনিবার্যভাবে কবির পৌঁছানো। আদি গ্যাসধূলির পৃথক্ পৃথক্ সংহতি ও ঘূর্ণন থেকে জীবজগৎ পর্যন্ত অতি সূক্ষ্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশের ও সেই সঙ্গে বিলয়ের যান্ত্রিক ইতিবৃত্তকে কবি উদাসীন নটরাজের নৃত্যরূপে কল্পনা করেছেন—

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।

অর্থাৎ তোমার নৃত্যের সূক্ষ্ম স্বরূপ ধরা পড়েছে প্রোটন-কেন্দ্রিক ইলেকট্রনের খেয়ালী আবর্তন বিচ্যুতি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। ইলেকট্রন বা চল-বৈদ্যুতী স্থির প্রোটন ও নিরপেক্ষ নিউট্রনের চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষে আবর্তন করতে গিয়ে যেন বিদ্রোহিণী হয়ে নিজ কক্ষ ছেড়ে কেন্দ্রের কাছাকাছি কোনো কক্ষে তেজ বিকীর্ণ করতে করতে লাফিয়ে পড়ে। আবার, বাইরের কক্ষে ঘুরতে থাকলে নিজ তেজ সংহরণ ক'রে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভিন্ন পরমাণুর এলাকায় চ'লে যায়। এরই কারণে তেজের উদ্‌ভব, আবার এরই জন্য মাত্র কয়েকটি মৌল থেকে সংখ্যার অতীত যৌগ উপাদানের সৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডের গঠন-প্রবাহ। এত সব হচ্ছে যান্ত্রিকভাবেই, কিন্তু মানুষের চৈতন্য ও চিত্ত পর্যন্ত বিকাশে এই নিয়মিত সূত্রের কোনো উদ্দেশ্য নেই, এতসব সুনির্দিষ্ট ও সু-সম নিয়মধারার কোনো নিয়ন্তা নেই, এমনটা ধারণার মধ্যে আনা যায় না। অথচ ঐশ্বরিক ব'লে ধারণা করলে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষতা লঘু হয়ে পড়ে, বস্তু ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তরতত্ত্বের গুরুত্বে আঘাত পড়ে। এজন্য কবি বৈজ্ঞানিক সত্তা নটরাজের কল্পনা গ্রহণ করলেন এবং অনিবার্য জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে উদাসীনভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। এই বৈজ্ঞানিক সত্তার নৃত্যলীলা

পরমাণুর মধ্য দিয়ে কিভাবে চলেছে তা উপলব্ধি ক'রে আশ্চর্য কাব্যিক প্রকাশে তা ব্যক্ত করলেন—

নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্রভানু।

বিজ্ঞান-মিশ্রিত কবিকল্পনা ও তার প্রকাশ যে এত মনোজ্ঞ হতে পারে তার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও দেখা যায় না। কবিতাটির শেষে রয়েছে অমোঘ নিয়মের কল্পিত নিয়ন্তার কাছে কবির নিঃশেষে আত্মসমর্পণ—

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে॥

নটরাজের জ্যোতিমঞ্জীরের নিঃশব্দ ধ্বনির সঙ্গে বিশ্বে রূপের জাগরণের বিস্ময় অন্যত্রও কবিকথায় একই রীতিতে প্রকাশিত হয়েছে—

অণুতম অণুকণা আকাশে আকাশে নিত্যকাল
বর্ষিয়া বিদ্যুৎ-বিন্দু রচিছে রূপের ইন্দ্রজাল। (বীথিকা)

এবং গানের সুরেও—'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত'।

পূরবী এবং নটরাজ-ঋতুরঙ্গ উনিশ শ' তেইশ থেকে সাতাশ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লেখা। এর দু'দশক পূর্বে গণিত আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং এক দশক পূর্বে গণিত সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের বিষয়গুলি এই সময়ে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত ও বারংবার ব্যাখ্যাত হয়েছে। আইনস্টাইনের ঐ দুটি সত্য আবিষ্কারের মধ্যে বিশেষভাবে প্রথমটি মহাকাশ-বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছে। ১৯৩৫ খ্রীঃ কবি যখন 'শেষ সপ্তকে'র কবিতাগুলি লিখছেন, তখন তার কয়েকটিতে নীহারিকা-নক্ষত্রময় বৈজ্ঞানিক বিশ্বের আবির্ভাব তিরোভাবের বর্ণনার সূত্রে আইনস্টাইনের দেশকাল-সমীকরণ-তত্ত্বের প্রভাব এসে পড়েছে দেখা যায়। এবিষয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ হ'ল সাত ও একুশ সংখ্যক কবিতা দু'টি। সাত সংখ্যক কবিতায় নীহারিকা ও নক্ষত্রলোকের আবির্ভাব ও নক্ষত্রদের মৃত্যুর পরিস্থিতি বর্ণনা ক'রে কবি দেখালেন, মহাকালের এক নিমেষের মধ্যে এখানে মর্ত্যে হাজার হাজার বছরের নানান্ রাষ্ট্র ও সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটে যাচ্ছে। মহাকাশের সঙ্গে তুলনায় কালদেশের বক্রতাযুক্ত ও মাধ্যাকর্ষণ-সীমিত পৃথিবীর এই অতি সামান্য নিয়েই আমাদের কত আক্ষেপ, কত অবহেলা, কত ইতিহাস। শেষ সপ্তকের একুশ সংখ্যক কবিতাটির মূলে দেশকাল-মিলিত তত্ত্ব সহ মহাকাশ-

দর্শন এবং সেই সঙ্গে পার্থিব পরিস্থিতির বৈপরীত্য অনুভব রয়েছে। আকাশ থেকে সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কি.মি. বেগে ছুটে আসছে তরঙ্গিত আলোককণিকা —আমাদের পৃথিবীতে ধরা-ছোঁওয়া পাওয়া যায় না এমন একটা গতিবেগ, অথচ তা পরীক্ষিত সত্য। আবার এ এমন যে, ঐ আলোকের উৎসের গতিবেগ অথবা যে বস্তুর উপর আলো পড়ছে তার গতিবেগ ওর সঙ্গে যোগ-বিয়োগ করলেও ওর কোনো হেরফের ঘটে না। আলোর অপরিবর্তনীয় গতিবেগকে মধ্যস্থ রেখে আইনস্টাইন গাণিতিক ভাবে প্রমাণ করলেন যে কালমাপ ও দেশমাপ পরস্পরকে অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। সুতরাং নিউটনীয় ধারণার অখণ্ড দেশ ও অখণ্ড কাল সম্পর্কহীন পৃথক্ পৃথক্ সত্তা নয়। মহাকাশ অধ্যয়নে ও বর্তমানে মহাকাশকে ব্যবহারের মধ্যে আইনস্টাইনের দেশকাল-সংহতি ও মহাকর্ষ তত্ত্ব অপরিহার্য হয়েছে। আমাদের দিনরাত্রির আলো-আঁধারের সীমিত পরিস্থিতিতে দেশ ও কাল, আলো-আঁধারের ভেদ-না-থাকা মহাকাশে একত্রিত দেশকাল। আইনস্টাইনের অন্য যুগান্তকারী আবিষ্কার হ'ল বস্তু-পরিমাণের সঙ্গে রূপান্তরিত শক্তি-পরিমাপের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন, যা নিয়ে বর্তমানে পরমাণু-শক্তির ব্যবহার চলছে, যদিও রবীন্দ্র-কাব্যে এর কোনো অনুস্মরণের চিহ্ন তেমন মেলে না। 'শেষ সপ্তকে'র কবিতাটিতে দেখা যায়, কবি ক্ষেত্রের আয়তন বোঝাতে বৎসরের মাপের ধারণাকে স্থান দিয়েছেন, আর অসীম আকাশের বেলায় আলোর গতির মাপ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছেন। কবিতাটির প্রারম্ভে বলেছেন—

নূতন কল্পে
সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হ'ল অসীম আকাশে—
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে ঘেরা।
সবচেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি
অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাপে।

এর পর কবি মহাকাশে জ্যোতির স্ফুরণ এবং চক্রগতিশীল তথা মুহূর্তে মুহূর্তে ধ্বংসপ্রবণ, সুতরাং পতঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় নক্ষত্রনিচয়ের উদ্ভবের বিষয় জানাচ্ছেন—

সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে জ্যোতিষ্ক-পতঙ্গ দিয়েছে দেখা,
গণনায় শেষ করা যায় না।
তারা কোন্ প্রত্যুষের আলোকে
কোন্ গুহা থেকে উড়ে বেরোল অসংখ্য,
পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল চক্রপথে
আকাশ থেকে আকাশে।

কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে আপেক্ষিকতার দৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীর পরিস্থিতি বর্ণনা ক'রে কবি বলছেন—

ধরার ভূমিকায় মানবযুগের
সীমা আঁকা হয়েছে
ছোটো মাপে,
আলোক-আঁধারের পর্যায়ে
নক্ষত্রলোকের বিরাট দৃষ্টির অগোচরে।
সেখানকার নিমেষের পরিমাণে—
এখানকার সৃষ্টি ও প্রলয়।

বলছেন, মহাকাশের জন্ম-মৃত্যুর খেলার তুলনায় পৃথিবীর ছোটমাপের নিসর্গ-সমাজের পরিবর্তন আমাদের কাছে কতই না ধীরগতি, কতই না গুরুত্বপূর্ণ। কবিতাটির শেষে অবশ্য মহাকাশ-পৃথিবীর পরিস্থিতি-বৈপরীত্যের চিন্তায় অভিভূত কবি উদাসীনতা থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছেন পার্থিব প্রেম-সৌন্দর্যের অনুভব-মুহূর্তগুলিকে মানসিক অক্ষয়তা দান ক'রে।

মহাকাশ শূন্যও নয়, নিথর নীরবও নয়। তার মধ্যে সর্বদা চলাচল করছে অগণিত নক্ষত্র-নীহারিকা থেকে বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গরূপী আলোক-রশ্মি-কণিকা, যার মধ্যে কতকগুলির গতি ও শক্তি অতিশয় তীব্র। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে গামা বা কস্‌মিক রশ্মি-কণিকা। চরিত্রের দিক দিয়ে এগুলি 'high-frequency radiation' বা রবীন্দ্র-বর্ণিত 'দ্রুত-বিচ্ছুরিত আলোর সংকেত'। যেন এই কস্‌মিক্ রশ্মির সংকেতে পারস্পরিক আলাপ চলেছে তারায় তারায়। তাদের বিপুল সংসারে একে অন্যের সঙ্গে যেন সম্পর্ক রেখে চলেছে এরই মাধ্যমে। কবি তাই একটি কবিতায় বলছেন—

আকাশে চেয়ে দেখি
অবকাশের অন্ত নেই কোথাও।
দেশকালের সেই সুবিপুল আনুকূল্যে
তারায় তারায় নিঃশব্দ আলাপ,
তাদের দ্রুতবিচ্ছুরিত আলোর সংকেতে
তপস্বিনী নীরবতার ধ্যান কম্পমান।

শেষ সপ্তকেরই অন্য একটি কবিতায় কবি আধুনিক প্রাণবিজ্ঞান-পরীক্ষিত জীনতত্ত্বমূলক জন্মরহস্যের বিষয়টি মেনে নিয়েও পূর্বপুরুষের ধারাবাহী আদিম-বাসনা-জর্জরিত স্থূল দেহবুদ্ধির তাড়নাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন দেখি। আবার, মনোবিজ্ঞানে ডুব দিয়ে মগ্নচৈতন্যের রহস্যলোকে প্রবেশ করেছেন ভিন্ন একটি কবিতায়। মনের ঐ বিরাট অগোচর অংশে প্রসুপ্ত কামনাবাসনারাশির বৈজ্ঞানিক বিবরণ কবিকে প্রশ্নকাতর করেছে—এই

অপরিণত অপ্রকাশিত 'আমি' কিসের জন্য ? কবির 'কেন' এই কৌতূহলী জিজ্ঞাসার সূত্র ধ'রে নবজাতকের 'কেন' কবিতাতেও আসা যায়। মহাকাশ-ব্যাপী এই যে অকল্পনীয় শক্তিস্ফুরণের খেলা চলছে, যার অতি নগণ্য অংশেই আমাদের প্রাণপ্রবাহ চরিতার্থ হচ্ছে, তার বাকি বিরাট অংশ যাচ্ছে কোথায়, কী কাজে লাগছে, কবির এই প্রশ্ন। বস্তুত এই অহরহ বিচ্ছুরণের কোনো সার্থক কারণ বৈজ্ঞানিকেরাও ধরিয়ে দেন নি। তাই কবি মহাকাশের সৃষ্টির রূপরেখা চিহ্নিত ক'রে শেষে প্রশ্ন রেখেছেন—

অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবী অনন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়—
আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।

দেখা যায়, কবির সর্বগ্রাসী প্রতিভা ঊনবিংশ ও বিংশ শতকীয় বিশ্বের মুখ্য ঘটনা, প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের সামাজিক রূপ এবং দর্শন ও বিজ্ঞান কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। অনিবার্যভাবে মনে করতে হয় যে এই আধুনিক মহাকবির কাব্যনির্মাণশালা ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণশালার মতই রহস্যময় ও অপার। কিন্তু তা হ'লেও রবীন্দ্রনাথ অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য কবি নন, বিষয়ের বিচারে দুর্বোধ্যতা কিছু থাকলেও ভাষারীতির দিক থেকে দুর্বোধ্য একেবারেই নন। তবে এটা তো ঠিক কথা যে, গীতিকবির বিচিত্র সূক্ষ্ম ভাবুকতার সঙ্গে একত্রিত হতে গেলে রসপ্রমাতাকেও নানা বিষয়ে বিদগ্ধতা অর্জন করতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র আত্মীয়তা গ'ড়ে ওঠেনি, কবির উল্লিখিত শ্রেণীর কবিতানিচয়কে যথাযথভাবে গ্রহণ করার আনন্দ ও বিস্ময় থেকে তিনি বঞ্চিতই থাকবেন।

আমাদের রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ শেষ হয়ে এল। দেখলাম, একদিকে রূপতৃষায় ও অজানার ব্যাকুলতায় মুখর-প্রলাপী কবির আশ্চর্য রম্যবাণী-প্রকাশ, অন্যদিকে পেলাম পরিবর্তন-সত্যে আস্থাবান, সমাজ-ব্যাখ্যাতা মনীষীর আশা ও আশ্বাসের ঐশ্বর্য। বিরল অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী এই কবি যুগোচিত সাম্যবাদী জীবনমন্ত্রে বাঙালির তথা ভারতীয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাদের সমাজবিপ্লবে উদ্বোধিত করেছেন অভয়বাণীতে। গীতার "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" প্রভৃতি তীব্র

উৎসাহসূচক, জড়ত্বমোচনের ও অকুতোভয়তার বাণীর সঙ্গে এবং নানাভাবে উচ্চারিত মানুষ-প্রেমী মহাপুরুষদের ও কবি-সাধকদের বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্র-বাণী-সত্যের মৌলিক পার্থক্য হয়ত বা নেই, তবে তা কালোপযোগী জীবনদর্শনের মাধ্যমে এবং কবি-স্বভাবের অনুকূলে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি, সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থবুদ্ধির প্রবল শত্রু এই কবির জাতির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত পরিণত অনুভবকে যদি একটি বাণীতে মন্ত্রবৎ সংগ্রথিত আকারে দেখতে হয়, তা হবে—জীর্ণ পুরাতন যাক্‌ ভেসে যাক্‌।

নিসর্গ থেকে সাধারণ মানুষের অভিমুখে ধাবমান রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ কবিসত্তা তার কবিস্বভাব বজায় রেখেও স্থানে স্থানে দর্শনাভাসে ও সামাজিক সাম্য-প্রবণতায় লীন হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রকাব্যপাঠে এর কোনোটিই বাদ না দিয়ে এবং কবির অতিপ্রবল চলিষ্ণু রোম্যান্‌টিক স্বভাবের বিষয় অনুধাবন ক'রে ঐ দুই একত্র গৃহীত হওয়া সম্ভব কিনা তার বিচার করবে বিদগ্ধ পাঠকের মানস-প্রকৃতি ও পরিশীলিত কাব্যবুদ্ধি, আর তারই উদ্বোধনকল্পে আমাদের এই প্রয়াস লিপিবদ্ধ হ'ল।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

মুদ্রণে প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬০, গ্রন্থারম্ভ—বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া। গ্রন্থশেষ—ক'লকাতা।

পঞ্চম সংস্করণ ও শেষ পরিমার্জন—বাসন্তী পূর্ণিমা, চৈত্র ১৩৯৫, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

নাম-নির্দেশিকা

[বিশেষ বিশেষ কবিতা ও গান ‘ ’ চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হ’ল]